রচনা-নির্মাল্য

[(ক) বাংলা ব্যাকরণ ও অলঙ্কার, (খ) পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ (Textual Grammar), (গ) বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (ঘ) প্রবন্ধ রচনা এবং (ঙ) উপপাঠ্য-সহায়িকা, এই পঞ্চপর্বাত্মক সম্ভার]

(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী, এম্. এ.,

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের (অবসরপ্রাপ্ত) অধ্যাপক,

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা ;

ও

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্.এ. (বাংলা),

এম্.এ. (ইংরাজী),

বাংলা এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক,

যোগমায়া দেবী কলেজ (পূর্বনাম—আশুতোষ কলেজ—প্রাতর্বিভাগ)

এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অব কমার্স ;

কলিকাতা ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিবেদন

"রচনা-নির্মাল্যে"র পরিচয়ে বলি, আমাদের এই নির্মাল্য 'পঞ্চমুখী জবা'। দুর্লভ এই যন্ত্রপুষ্পটি শক্তিপূজায় প্রশস্ত বলিয়া বিদিত। বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে অধিকার অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যে শক্তিসাধনা অপরিহার্য, এই 'নির্মাল্য' তাহাতে যন্ত্রপুষ্পের মতই সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের ভিত্তি এইখানে যে একটি জাতের ফুলের চাষে যে কঠিন শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, এখানে তাহার কোনো ত্রুটি ঘটে নাই। সুদীর্ঘ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার বারিসেচনযোগে ঐ প্রভূত পরিশ্রমসাধ্য চাষের কাজটি সম্পন্ন করা হইয়াছে।

এই 'পঞ্চমুখী'র বাহ্য রূপটি পাওয়া যাইবে গ্রন্থখানির পঞ্চ পর্বে : আন্তর রূপের ইঙ্গিতমাত্র আমরা দিয়াছি, বিস্তারিত কিছু আমাদের বলিবার নহে, উহা শুনিবার আশা রাখি মাত্র।

একটি বিষয়ে জাগে আশঙ্কা। এ কালের তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে পুস্তকের আয়তন-বৃদ্ধিতে স্বভাবতই দেখা দেয় বিতৃষ্ণা। কিন্তু এই আয়তন-বৃদ্ধি হইয়াছে অপরিহার্য যেহেতু একখানি পুস্তকেই বিবিধ পুস্তকপাঠের প্রয়োজন মিটাইতে হইয়াছে : এবং এই বিষয়টি বুঝিলেই শুধু যে ঐ বিতৃষ্ণা বা ভয় অমূলক মনে হইবে, তাহাই নহে, এইরূপ একাধারে বিবিধার্থসাধক পুস্তকপাঠ পরম লাভজনক বুঝিয়া ইহার প্রতি শিক্ষার্থিগণ অধিকতর আকৃষ্ট হইবে।

আমাদের সমস্ত আশা-ভরসার মূল বাংলার গুণগ্রাহী শিক্ষক-শিক্ষিকা-সমাজের সহৃদয়তা। গ্রন্থখানি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। আর, অনবধানতাপ্রসূত ভুলত্রুটি-সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী
শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গুণগ্রাহী শিক্ষক-সমাজ ও স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছায় ও আনুকূল্যে 'রচনা-নির্মাল্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল।

সংযোজন ও পরিমার্জনে এই সংস্করণকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। দেশের উপর সাম্প্রতিক বৈদেশিক আক্রমণের ফলে যে সব নূতন সমস্যা ও চিন্তাধারা দেখা দিয়াছে, সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধাংশে 'সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রসঙ্গ'-পর্যায়ে কতিপয় বিশেষ রচনা সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাধারণভাবে রচনা-সম্ভারকে আবও দ্বাদশটি প্রবন্ধযোগে বর্ধিত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিবর্ধন সম্পর্কে অপর যে দুইটি অধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাদের একটি 'অলঙ্কার', অপরটি 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'। ইহাদের প্রশস্ততর রূপ গুণগ্রাহী শিক্ষক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, আশা করা যায়।

গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধি ও সময়-সংক্ষেপ সত্ত্বেও পরিমার্জনেব দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

যাঁহাবা প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে মূল্যবান অভিমত দিয়া আমাদের উপকৃত ও উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদেব সকলকেই জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী
শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠবিধি

[ব্যাকরণ ও অলঙ্কার অংশ]

(*Vide* Circular No. HS/1/58)

পাঠ্যসূচী

(ক) ভূমিকা-প্রকরণ : ভাষা—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা।

(খ) বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ—

১। বর্ণের শ্রেণীবিভাগ : বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের (যথা অ, এ, হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর) ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনিবিলোপ ইত্যাদি।

২। সন্ধি : বাংলা ভাষার সন্ধির বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃত সন্ধির সঙ্গে পার্থক্য : স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ সন্ধির পূর্ণ আলোচনা। ৩। ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান।

(গ) পদ-প্রকরণ—

১। পদের প্রকার ভেদ : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়াপদ। ২। বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ। ৩। লিঙ্গ : স্ত্রী-প্রত্যয় (সংস্কৃত ও বাংলা), লিঙ্গ-পরিবর্তন। ৪। বচন। ৫। পুরুষ। ৬। কারক ও তাহার বিভক্তি : অনুসর্গ : কারক-বিভক্তি ও অন্যপ্রকার বিভক্তি। ৭। বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ ; সংখ্যা ও পূরণবাচক বিশেষণ। ৮। বিশেষণের তারতম্য। ৯। ক্রিয়াপদ : ধাতু ও প্রত্যয়—মৌলিক ধাতু, প্রযোজক ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, নামধাতু, সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ারূপ। Participles and gerunds ; moods. ১০। অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ। ১১। সমাস : আলোচনায় একশেষ দ্বন্দ্ব, অবিগ্রহ সমাস, স্বপদবিগ্রহ ও অস্বপদবিগ্রহ সমাস, প্রাদি সমাস, কু-তৎপুরুষ সমাস, সুপ্‌সুপা সমাস বর্জনীয়।

(ঘ) শব্দ-প্রকরণ—

১। শব্দ ও পদের পার্থক্য। ২। বাংলা শব্দসম্ভার : তৎসম ও তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দ : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত।

৩। কৃৎ-প্রত্যয়—

সংস্কৃত কৃৎ—তব্য, অনীয়, যৎ, শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তি, ণক, তৃচ্। অন—বিবিধ বাচ্যে: ইষ্ণু, ক্বিপ্, আলু ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয় ও অ প্রত্যয় (অচ্, অণ, অপ্, অস্ ক, কঙ্, খঙ, খচ্, খল্, ঘঞ্, ট, ড, শ ইত্যাদি সংস্কৃত প্রত্যয়গুলির অ ছাড়া বাকী অংশ ইৎ যায়, অতএব বাংলায় শুধু অ প্রত্যয় বলিলেই চলিবে)।

বাংলা কৃৎ—অন, অন্ত, আ, আনো, না, আনি, ই, উ, তি, উয়া, ইয়া, ইত্যাদি।

৪। তদ্ধিত প্রত্যয়—

সংস্কৃত-তদ্ধিত—অ (ষ্ণ), ই (ষ্ণি), য (ষ্ণ্য), এয় (ষ্ণেয়), ঈ (ষ্ণীয়), ঈন, ইক, ইত, ইল, ইন্, বিন্, ঈয়স্, ইষ্ঠ, তর, তম, ময়, মতুপ্, তন, তা, ত্ব, ইমন্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

বাংলা-তদ্ধিত—ই, ঈ, ইয়া, উয়া, আ, আই, আনি, আলি, আলো, আনা, পনা, গিরি, আরি (রী), দার, ইয়াল, ওয়ালা ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

৫। উপসর্গ—অর্থপরিবর্তন ও নূতন শব্দগঠন (বিস্তারিত আলোচনা)।

(ঙ) বাক্য-প্রকরণ—

বাক্যের প্রকার-ভেদ: সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য। বাক্যান্তরীকরণ, বিভিন্ন ধরণের বাক্য (অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক ইত্যাদি) ও তাহাদের রূপান্তরসাধন।

বাচ্য: বাচ্য পরিবর্তন।

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ (idiomatic use of words and phrases), প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ ধারা (idioms and proverbs) —বিস্তারিত আলোচনা।

আলোচনার ক্রম বর্ণ-ধ্বনি-প্রকরণে আরম্ভ ও বাক্য-প্রকরণে সমাপ্ত হইবে।

অলঙ্কার—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা রূপক, ব্যতিরেক ও সমাসোক্তি।

কোন ব্যাকরণ পুস্তক পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে না। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত যে-কোন পুস্তক নির্বাচন করা চলিবে।

REVISED SYLLABUS

(Circular No. H.S/6/59, Dated 25. 7. 59.)

BENGALI (FIRST LANGUAGE)

Paper I.

Questions on Composition and Grammar arising out of the detailed study of the prescribed texts. 30

[More attention should be paid to the idiomatic use of words and phrases. Questions may also include filling up of gaps both in prose and poetry.]

Paper II

(1)	Grammar and Composition	25
(2)	Rhetoric (অলংকরণ)	5
(3)	Essay-writing	20
(4)	History of Literature	20

প্রথম খণ্ড—১। বাংলা ভাষার উদ্ভব। ২। মঙ্গলকাব্য—(ক) মনসা-মঙ্গল, (খ) চণ্ডীমঙ্গল, (গ) ধর্মমঙ্গল। ৩। রামায়ণ ও মহাভারত। ৪। চৈতন্যের জীবন ও জীবনী। ৫। গীতি সাহিত্য—(ক) বৈষ্ণব পদাবলী, (খ) শাক্ত পদাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড—১। বাংলা গদ্যের অনুশীলন—(ক) ইউরোপীয় মিশনারী ও বাংলা গদ্য ; (খ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ; (গ) রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর। ২। নাটক ও নাট্যশালা—(ক) কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা ; (খ) নাটক রচনার সূত্রপাত ; (গ) কয়েকজন নাট্যকারের পরিচয়—দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল। ৩। উপন্যাস ও ছোটগল্প—(ক) বঙ্কিমচন্দ্র ; (খ) রমেশচন্দ্র দত্ত ; (গ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; (ঘ) শরৎচন্দ্র। ৪। কাব্য ও কবিতা—(ক) মধুসূদন ; (খ) হেমচন্দ্র ; (গ) নবীনচন্দ্র ; (ঘ) বিহারীলাল। ৫। রবীন্দ্রনাথ।

(5) **Substance (ভাবার্থ), Pre'cis (সার-সংক্ষেপ), and/or Amplification (ভাব-সম্প্রসারণ), of extracts from a number of specified books *of prose and verse for non-detailed study.**

The texts to be read in Classes X & XI will only be included in the final Examination to be conducted by the **Board.**

Answers to questions on Language Subjects must be given in that language unless otherwise specified on the Question Paper.

* Class IX. ১। কুরু-পাণ্ডব—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত। ২। গল্পে উপনিষৎ—সুধীরকুমার দাসগুপ্ত। ৩। গাথাঞ্জলি—কালিদাস রায়।

* Class X. ১। রামায়ণী কথা—দীনেশচন্দ্র সেন। ২। রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ। ৩। কাব্যমঞ্জুষা—মোহিতলাল মজুমদার। [প্রার্থনা, শ্যামসুন্দর, কালকেতুর বিক্রম, ঈশ্বরী পাটনী, সীতার পঞ্চবটী-বাস, রামের বিলাপ, কাশীরাম দাস, আত্মবিলাপ, কবির অন্ধদশা, পলাশীর যুদ্ধ, মানব-বন্দনা, আষাঢ়, নিষ্ফল-উপহার, পূজারিনী, বাসনা, চাষার ঘরে, ছিন্নমুকুল, ভক্তির যুক্তি, হয়ত, বাঙ্গালীর সাধ, 'শাত-ইল আরব', কারার শরৎ]।

* Class XI. ১। সীতার বনবাস—বিদ্যাসাগর (সম্পাদনায় জনার্দন চক্রবর্তী সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। ২। চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ('অনুকূল ভবন' সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। ৩। কমলাকান্ত—বঙ্কিমচন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সংস্করণ)। ৪। সংকল্প ও স্বদেশ—রবীন্দ্রনাথ।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

ব্যাকরণ ও অলঙ্কার

দ্বিতীয় পর্ব

পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ

(প্রথম পত্রের ব্যাকরণ)

তৃতীয় পর্ব

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

চতুর্থ পর্ব

প্রবন্ধ-রচনা

পৃষ্ঠা

সংকেত সূত্র

(খ) ব্যায়াম-ক্রীড়া-প্রমোদ-প্রসঙ্গ ঃ ৪৩—৭২

সংকেত সূত্র

(গ) প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎ-প্রসঙ্গ ঃ ৭৩—১০২

সংকেত সূত্র

সংকেত সূত্র

সংকেত সূত্র

পৃষ্ঠা

সংকেত সূত্র

(ছ) দেশ ও সমাজ-প্রসঙ্গ ঃ ২০১—২৫১

সংকেত সূত্র

(জ) সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রসঙ্গ ঃ ১—৫১

পঞ্চম পর্ব

উপপাঠ্য-সহায়িকা

প্রথম পর্ব

ব্যাকরণ ও অলঙ্কার

ভূমিকা-প্রকরণ

[বাংলা ভাষা—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা]

যাহাকে আমরা বাংলা ভাষা বলি, মনোভাব প্রকাশ করিবার ধ্বনিময় এই সঙ্কেতটি প্রায় হাজার বৎসর হইল, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রথম পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মাগধী প্রাকৃতের একটি বিশেষ অপভ্রংশ ভাষা হইতে বাংলা ভাষা তাহার নিজস্ব উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠে।

বঙ্গভাষার উৎপত্তিস্থল নিরূপণ করিতে গিয়া গবেষকদের অনুসন্ধান ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সুপ্রাচীন ভাষা-গোষ্ঠীর ইন্দো-ইরাণীয় শাখা হইতে ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষার উদ্ভব হইয়াছে। নদীর গতি ও প্রকৃতি যেমন যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, এই প্রাচীন ভাষাও তেমনি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন আর্যভাষা-ভাষী জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর দেশ ও কালের প্রভাবে তাহাদের ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভাষার মধ্যে যে বিকৃতি বা রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য ভাষাবিদ্‌গণ ভাষাকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সংস্কৃত ভাষা তাহার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু তাহাতে ভাষার পরিবর্তনের ধর্মটি খর্বিত হয় নাই। হাজার বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রাকৃতের কথা চিন্তা করিলেই পাওয়া যাইবে সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা-ভাষার সম্পর্কটির খাঁটি পরিচয়। মোটামুটিভাবে সংস্কৃতকে যে বাংলা ভাষার জননী বলা হয়, তাহা সূক্ষ্মবিচারে অভ্রান্ত নহে। প্রাচীন আর্যদের যে **বৈদিক ভাষা** তাহার ছিল দুইটি রূপ—**'কথ্যরীতি'** ও **'সাধুরীতি'**। বৈয়াকরণ সূত্রাদির দ্বারা সাধুরীতির সংস্কার করা হয় বলিয়া উহার নাম হয় **'সংস্কৃত'**। আর 'কথ্যরীতি' চলিতে থাকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের কথ্যভাষার সহিত মিশিয়া নানা রূপান্তরের মধ্যে ক্রমাগত নব নব অভিব্যক্তির পথে। ঐ রূপান্তরের যে দুইটি উল্লেখযোগ্য বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের প্রথমটির নাম **প্রাকৃত**, দ্বিতীয়টির নাম **অপভ্রংশ**। পূর্বাঞ্চলের মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশ আসিয়াছে। তাহার পর এই অপভ্রংশ হইতেই অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে

বাংলা ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা এই প্রাচীন বাংলা ভাষারই ক্রম-বিবর্তিত রূপ।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলিয়াছেন—'ভাষার প্রবাহ নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম।' নদীর উৎপত্তিস্থলের ন্যায়, ভাষার উৎপত্তিস্থলও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। নদী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা যেমন সহজে নির্ণয় করা যায় না, তেমনি ভাষাও যে আদিতে ঠিক কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করা যায় না। নদীর উৎপত্তির মতো প্রাকৃতিক কারণেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। নদীর প্রথম রূপ যে ঝরণা, তাহা ক্ষীণতোয়া—ভাষার আদিরূপও তেমনি হ্রস্বকায়। ঝরণা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পর্বতবাসীর ব্যবহারযোগ্য, আদি-ভাষাও অল্পসংখ্যক মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। নদী যেমন সমভূমিতে নামিয়া আসিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়, নানা উপনদী তাহাতে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে নানা শাখানদী নির্গত হয়,—তেমনই ভাষাও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে, অপর ভাষাও তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে, আবার তাহা হইতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারও উদ্ভব হয়। নদী যেমন অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে, ভাষাও তেমনই ভাবে অনির্দেশ্য পরিণতির দিকে চিরকাল অগ্রসর হইতেছে।

বাংলা ভাষা প্রায় সাতকোটি নরনারীর মাতৃভাষা। কেবল পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই বাংলা ভাষা আবদ্ধ নয়, এই সীমারেখা পার হইয়াও ইহার বিস্তৃতি ও প্রসার। আসামের গোয়ালপাড়া ও কাছাড, এবং সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম ও পূর্ণিয়া জেলার অধিকাংশ অধিবাসীর দেশভাষা বাংলা ভাষা। ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ধরিলে বাংলা ভাষা পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধ আসাম প্রদেশের অসমীয়া ভাষার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ওড়িয়া ভাষার।

পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের যে সুবৃহৎ অঞ্চল জুড়িয়া বাংলা ভাষার প্রসার তাহাতে বাংলা কথ্য ভাষার মধ্যে কতকগুলি আঞ্চলিক রূপ আছে। সমস্ত জীবন্ত ভাষাতেই এইপ্রকার অবস্থা দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি জেলায় এইভাবে এক একটি **উপভাষা** গড়িয়া উঠিয়াছে। এক জেলার ভাষা

অন্য জেলার লোকের পক্ষে বুঝিতে পারা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। এই কথ্য ভাষার মধ্যে একটি রূপ সাহিত্যে ইতিমধ্যেই চলিত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর তীরের কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করিয়াই বাংলা সাহিত্যের **চলিত ভাষা** গড়িয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে ও নাটকে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে চলিত ভাষার এই রূপটি বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে বাংলাভাষা-ভাষীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। এই চলিত ভাষা এখন মাত্র লোকের মুখেই সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান সময়ে প্রচুর পরিমাণে সাহিত্যের ভাষারূপে ইহার ব্যবহার চলিতেছে।

এই কথ্য ভাষা ছাড়া বাংলার একটি লেখ্য রূপ আছে, তাহার নাম **সাধু ভাষা**। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক সাধুভাষাকে নিজস্ব বলিয়া শ্রদ্ধা করে। এই ভাষার বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগের রীতিতে সংস্কৃতের প্রভাব অধিক। ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদগুলির রূপ পূর্ণতর। সাধুভাষাতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমগ্র সাহিত্য রচিত হইয়াছে—এখনও ইহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বাহন হইয়া আছে।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইতেছে।

সাধুভাষার রচনার আদর্শ

(১) মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিক দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য—অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বুলান্বেষণে গেল। (বঙ্কিমচন্দ্র)

(২) ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত চীন জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বার বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত চীন জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়

সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো। (রবীন্দ্রনাথ)

(৩) মাসখানেক হইল কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন। কারণ গৃহ-দেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার যো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ ছয় দিন ছিল। মনের মতন নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল। (শরৎচন্দ্র)

উপরের এই তিনটি নিদর্শন হইতে সাধুভাষা সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যায়। সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বেশী এবং ক্রিয়া ও সর্বনাম পদগুলির আকার পূর্ণতর।

চলিত ভাষার রচনার আদর্শ

(১) অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে বাড়ির বৌ—কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি? কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাইবোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা ভিক্ষাবৃত্তি করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, তা আর বেশি কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসিকৌতুকের আর মালমশলা যুগিয়ে দেব না। (শরৎচন্দ্র)

(২) আমাদের সঙ্গে ফরাসী ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালবাসে, অতিরিক্ত রকম

বাচাল, আর বাদশাহী রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বল্লে বোধহয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রামপ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদেব মত বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা বলে এবা বড় কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী খুব খাটতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প কববার সময়েও জামা সেলাই করছে, শৌখিন জামা। জামাকাপড়েব শখটা ফরাসীদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ কবে ফরাসী মেয়েদেব ও শিশুদেব, পুরুষেরা কতকটা বেপরোয়া। (অন্নদাশঙ্কর বায়)

(৩) "মা এমন কবে একলা বসে যে ?"

বেড়িয়ে ফিবে বাড়ীতে ঢুকেই প্রশ্ন কবে পবেশ—"কি হলো ? শবীব টবীব খারাপ হয়নি তো ?"

মন্দাকিনী ত্রস্তে উঠে পড়েন। বলেন—"না, না, শবীব খাবাপ হবে কেন ? দাদা এসেছিলেন, এইমাত্র গেলেন—"

"মামাবাবু এসেছিলেন ? এক্ষুনি চলে গেলেন ?"

"হ্যাঁ, বললেন কি সব কিনতে টিনতে হবে—"

"ও তা—কিনবেন বৈকি ! লম্বা পাড়ি দিচ্ছেন, কতো কি দবকাব।"

মন্দাকিনী বহস্যেব হাসি হেসে বললেন, "লম্বাপাড়ি ত আমিও দিচ্ছিবে।"

পবেশ সবিস্ময়ে বলে, "তাব মানে ?"

মন্দাকিনী ধীবে বলেন, "তার মানে আমিও যাচ্ছি দাদাব সঙ্গে।"

পরেশ চমকে ওঠে না, শুধু একটি 'থতিয়ে' যায়। তারপব ভুরু কুঁচকে বলে, "তাই নাকি ? হঠাৎ ?"

"হঠাৎ ছাড়া—ধীরে সুস্থে কিছু হবে ? তা—আমি কি চিরদিনই তোদেব সংসারে হাঁড়ি ঠেলবো ? একটু পবকালের কাজ করবো না ?"

(আশাপূর্ণা দেবী)

চলিত ভাষাব নিদর্শনগুলি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, এই রচনা-রীতিতে সংস্কৃত শব্দেব ব্যবহাব অপেক্ষাকৃত কম এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি একটা সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ করিয়াছে।

দ্রষ্টব্য : লিখিবাব সময় হয় সাধু অথবা চলিত যে-কোন একটি রীতিতে লিখিতে হয়! দুইটি রীতি মিশিয়া গেলে ভাষাব গুরুচণ্ডালী দোষ হয়। অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য অথবা ব্যস্ততার জন্য দুইটি রীতি একসঙ্গে মিশিয়া

বাধ্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন কতকগুলি সাধারণ উদাহরণ দিয়া সাধু এবং চলিত শব্দের পার্থক্য দেখান যাইতেছে।

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
চন্দ্র	চাঁদ	সন্ধ্যা	সাঁঝ
কৃষ্ণ	কেষ্ট	হস্ত	হাত
গ্রাম	গাঁ	বন্যা	বান
বধূ	বৌ	উৎসর্গ	উচ্ছুগ্‌গু
অগ্রহায়ণ	অঘ্রাণ	মহোৎসব	মচ্ছব
বৃদ্ধ	বুড়া	মৃত	মড়া
শুষ্ক	শুক্‌না, শুখা	গৌর	গোরা

সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
তাহারা	তারা	যাহার	যার
যাহারা	যারা	ইহাদের	এদের
ইহারা	এরা	আমাদিগের	আমাদের
কাহাদের	কাদের	তাহাদিগের	তাদের
তাঁহাদের	তাঁদের	যাহাদিগের	যাদের
করিব	করব	করিত	করত
করিবার	করবার	করিলাম	করলাম
করিলে	করলে	করিতেছিলাম	করছিলাম

বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ

[বর্ণের শ্রেণী বিভাগ : বাংলা—স্বর-ব্যঞ্জনের ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য]

আমরা ভাষায় যে শব্দ উচ্চারণ করি সেই শব্দের অবিভাজ্য ক্ষুদ্র অংশের নাম **ধ্বনি** এবং যে চিহ্ন ব্যবহার করিয়া ধ্বনি নির্দেশ করি তাহার নাম **বর্ণ।**

বাংলা বর্ণমালায় যে ৪৭টি বর্ণ আছে তাহার মধ্যে ১২টি স্বরবর্ণ ও ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ

হ্রস্ব ও দীর্ঘ—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ এই বারটি স্বরবর্ণের মধ্যে ঌএর ব্যবহার বাংলায় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অ, ই, উ, ঋ এই চারিটি হ্রস্বস্বর এবং আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ এই সাতটি দীর্ঘস্বর। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধি বজায় নাই বলিয়া বাংলায় **হ্রস্বস্বর** ও দীর্ঘস্বর বলিয়া কোন ধরাবাঁধা নিয়ম করা যায় না। বাংলায় **হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ** উচ্চারিত হয়—আবার দীর্ঘস্বরেরও হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। কেবল ঐ ও **ঔ বাংলায়** সংস্কৃতের মতই সর্বদাই দীর্ঘ উচ্চারিত হয়।

বাংলা স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

হ্রস্ব অ—চলা, করা, চটা, ধন, জন। **দীর্ঘ অ**—ঘণ্টা, কর, রণ, কল।

হ্রস্ব আ—ভারত, রামায়ণ। **দীর্ঘ আ**—ভাত, গাছ, হায়, রাম

হ্রস্ব ই—বিশ, তিরিশ, কিষাণ। **দীর্ঘ ই**—ইষ্ট, দিন।

হ্রস্ব ঈ—ধীরেন, দীনেশ। **দীর্ঘ ঈ**—দীন, হীন।

হ্রস্ব উ—উচা, উচিত। **দীর্ঘ উ**—উচ্চ, পুচ্ছ, মুক্ত।

হ্রস্ব ঊ—মূর্খের কথা, কূপের জল। **দীর্ঘ ঊ**—কূপ, মূর্খ, সূর্য।

হ্রস্ব এ—একটি, একলা। **দীর্ঘ এ**—ভেক, এক।

হ্রস্ব ও—ভোমরা, তোমরা, ওল। **দীর্ঘ ও**—ওষ্ঠ, গোষ্ঠ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ঐ এবং ঔ সর্বদাই দীর্ঘ।

প্লুতস্বর—আহ্বানে, রোদনে ও গানে স্বরবর্ণ যখন দীর্ঘতর মাত্রায় উচ্চারিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় প্লুতস্বর। যথা—"**রে** সতি, **রে** সতি, **কাঁদিল** পশুপতি", এখানে 'এ' ও 'আ' প্লুতস্বর; "কাঁদে আর ডাকে **মা— গো—**" এখানে 'আ' ও 'ও' প্লুতস্বর।

ব্যঞ্জনবর্ণ

৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ **স্পর্শ বর্ণ**। কারণ এইগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার সহিত বাগ্‌যন্ত্রের কোন-না-কোন অংশের স্পর্শ হয়। যে স্থান স্পর্শ করে সেই অনুসারে স্পর্শ বর্ণগুলিকে পাঁচটি বর্গে বা শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। এইভাবে ক খ গ ঘ ঙ **কণ্ঠ্য বর্ণ** (ক-বর্গ), চ ছ জ ঝ ঞ **তালব্য-বর্ণ** (চ-বর্গ), ট ঠ ড ঢ ণ **মূর্ধন্য বর্ণ** (ট-বর্গ), ত থ দ ধ ন **দন্ত্য বর্ণ** (ত-বর্গ), প ফ ব ভ ম **ওষ্ঠ্য বর্ণ** (প-বর্গ)।

য র ল ব এই চারিটি **অন্তঃস্থ বর্ণ**। স্পর্শ বর্ণ ও উষ্মবর্ণের 'অন্তঃ' অর্থাৎ মধ্যে আছে বলিয়া ইহাদের অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। শ ষ স হ এই চারিটি **উষ্ম বর্ণ**। 'উষ্ম' অর্থাৎ শ্বাস ধারণ করিয়া ইহাদের উচ্চারণ প্রলম্বিত করা যায় বলিয়া এই চারিটিকে উষ্মবর্ণ বলা হয়।

স্বরতন্ত্রী কাঁপাইয়া যে সমস্ত বর্ণ উচ্চারণ করিতে হয় এবং যাহাদের উচ্চারণে থাকে একটা গাম্ভীর্য, সেগুলি **ঘোষ বর্ণ**, এবং যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না এবং যাহাদের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্যহীন, সেগুলি **অঘোষ বর্ণ**।

সমস্ত স্বরবর্ণ এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ও য র ল ব হ, এইগুলি ঘোষবর্ণ। আর প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স, এইগুলি অঘোষ বর্ণ।

মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ বর্ণ:—প্রতি বর্গের দ্বিতীয় (খ, ছ, ঠ, থ, ফ) ও চতুর্থ (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) বর্ণের উচ্চারণে অধিক 'প্রাণ' বা শ্বাসযোগে ('হ'-কার জাতীয় ধ্বনিযোগে) উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়। আর বর্গের প্রথম (ক, চ, ট, ত, প) ও তৃতীয় (গ, জ, ড, দ, ব) বর্ণের উচ্চারণে এই প্রাণ বা শ্বাসবায়ুর প্রয়োজন নগণ্য বলিয়া ইহাদের অল্পপ্রাণ বর্ণ বলা হয়।

কতিপয় স্বরবর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

অ—

(ক) **প্রকৃত বা সহজ উচ্চারণ**—অলস, অচল, অধম, জল, ঘট, বট।

(খ) **বিকৃত বা ওকার-ঘেঁষা উচ্চারণ**—বন, মন, নদী, মধু, অতি, অনু।

আ—

(ক) **হ্রস্ব উচ্চারণের দৃষ্টান্ত**—আহার, আমরা, আসন।

(খ) **দীর্ঘ উচ্চারণের দৃষ্টান্ত**—আজ, চার, রাত।

এ—

(ক) **সহজ উচ্চারণের দৃষ্টান্ত**—ছেলে, মেয়ে, তেল, বেল, কেশ বেশ।

(খ) **বিকৃত উচ্চারণের দৃষ্টান্ত**—দেখা, মেলা, খেলা, কেন, পেঁচা একা (অ্যা-বৎ উচ্চারণ)।

ঐ—

'ঐ'-এর উচ্চারণের মধ্যে 'ও' আর 'ই' এই দুইটি ধ্বনি মিলিত হইয়া আছে, তাই ইহা একটি **সন্ধ্যক্ষর** বা **যৌগিকস্বর** বলিয়া পরিচিত যথা—চৈতন্য (চোইতন্য), বৈগুণ্য (বোইগুণ্য) প্রভৃতি।

ঔ—

'ঐ' এর মত ইহাও একটি **সন্ধ্যক্ষর** বা যৌগিক স্বর। ইহার মধ্যে আছে 'ও' আর 'উ' এর মিলিত ধ্বনি ; যথা—সৌরভ (সোউরভ), গৌরব (গোউরব) প্রভৃতি।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের নাম ও পরিচয়

স্বরবর্ণ

অ, আ—ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ এবং সেইজন্য ইহাদিগকে **কণ্ঠ্য বর্ণ** বলা হইয়া থাকে। অ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা শায়িত থাকে। আ-কারের উচ্চারণে ভিতরের দিকে জিহ্বার একটু আকর্ষণ থাকে।

ই, ঈ—ইহাদের উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখভাগ প্রায় তালুর কাছাকাছি যায়, সেইজন্য ইহাদিগকে **তালব্য বর্ণ** বলা হয়।

উ, ঊ—ইহাদের উচ্চারণের সময় ওষ্ঠাধর গোল আকার ধারণ করে এবং মুখগহ্বরের বাতাস সেই গোলাকার পথে বাহির হইয়া আসে। উ, ঊকে **ওষ্ঠ্য বর্ণ** বলা হয়।

ঋ, ঌ—বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণে ইহাদের স্থান হইলেও ঌর অস্তিত্ব বাংলায় একেবারেই নাই এবং ঋ-র উচ্চারণ স্বরবর্ণের হিসাবে হয় না। ঋ-র উচ্চারণ রি।

এ ঐ—কণ্ঠ ও তালু এই দুটির উচ্চারণ-স্থান বলিয়া ইহাদিগকে **কণ্ঠ্য-তালব্য বর্ণ** বলে।

ও, ঔ—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান বলিয়া এই দুইটি বর্ণকে **কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ** বলে।

ব্যঞ্জনবর্ণ

পূর্বেই বলা হইয়াছে,—

ক-বর্গ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বলিয়া **কণ্ঠ্যবর্ণ,**

চ-বর্গ তালু হইতে উচ্চারিত বলিয়া **তালব্য বর্ণ,**

ট-বর্গ মূর্ধা হইতে উচ্চারিত হইয়া **মূর্ধন্যবর্ণ,**

ত-বর্গ দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া **দন্ত্যবর্ণ** ও

প-বর্গ ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত বলিয়া **ওষ্ঠ্যবর্ণ** নামে পরিচিত।

এখানে সমগ্র ব্যঞ্জনবর্ণের আরও একটু বিশদ পরিচয় দেওয়া হইল :—

ক—ইহার উচ্চারণের সময় জিহ্বার পশ্চাদভাগ তালুর কোমল অংশে একটু স্পর্শ করে। ক অঘোষ, অল্পপ্রাণ, কণ্ঠ্য ধ্বনি।

খ—ইহা অঘোষ, কণ্ঠ্য, মহাপ্রাণ ধ্বনি। খ আসলে ক ও হ এই দুইটি ধ্বনি সংযুক্ত উচ্চারণ।

গ—ইহা ঘোষ বর্ণ। ক-এর ঘোষরূপই গ। সুতরাং ইহা কণ্ঠ্য, ঘোষ, অল্পপ্রাণ, স্পর্শ ধ্বনি।

ঘ—ইহা কণ্ঠ্য, ঘোষ, মহাপ্রাণ, স্পর্শ ধ্বনি। ঘ আসলে গ ও হ এই দুইটির সংযুক্ত উচ্চারণ।

ঙ—বাংলা উচ্চারণে উঁঅ রূপ পায়। ইহা নাসিক্য কণ্ঠ্য ধ্বনি। গ উচ্চারণ করিতে গিয়া নাক দিয়া নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দিলে ঙ'র উচ্চারণ পাওয়া যায়।

চ—ইহা তালব্য ধ্বনি। জিহ্বার সহিত তালুর স্পর্শ হয়। ইহা অঘোষ ধ্বনি ও অল্পপ্রাণ।

ছ—চ-এর মহাপ্রাণ ধ্বনি হইতেছে ছ। ছ মহাপ্রাণ, অঘোষ, তালব্য, স্পর্শ ধ্বনি।

জ—চ-এর ঘোষরূপ জ।

ঝ—জ ও হ-এর সংযুক্ত উচ্চারণই ঝ। ইহা ঘোষ, মহাপ্রাণ, তালব্য. স্পর্শ ধ্বনি।

ঞ—বাংলায় ইহার উচ্চারণ ইঁঅ। জ বলিতে গিয়া যদি নাসিকার মধ্য দিয়া নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া যায় তবে 'ঞ' ধ্বনির উচ্চারণ পাওয়া যায়। ইহা তালব্য নাসিক্য ধ্বনি।

ট—ইহা অঘোষ, মূর্ধন্য স্পর্শবর্ণ। ইহার উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ মূর্ধা স্পর্শ করে বলিয়া ইহা মূর্ধন্য বর্ণ। ট অল্পপ্রাণ।

ঠ—ট-এর মহাপ্রাণ ঠ। অর্থাৎ ট ও হ এই দুইটির সংযুক্ত উচ্চারণ ঠ।

ড—ইহা ট-এর ঘোষরূপ। এই বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া মূর্ধা স্পর্শ করিতে হয় বলিয়া ইহা মূর্ধন্য বর্ণ।

ঢ—ইহা ড-এর ঘোষরূপ। ঢ মহাপ্রাণ।

ণ—বাঙলায় মূর্ধন্য আলাদাভাবে উচ্চারিত হয় না। ন-এর মত ইহার উচ্চারণ।

ত—এই বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা দাঁতের গোড়ায় ঠেকে। ত অঘোষ বর্ণ।

থ—ইহা ত-এর মহাপ্রাণ রূপ।

দ—ইহা ত-এর ঘোষ রূপ।

ধ—ইহা ঘোষ ও মহাপ্রাণ দন্ত্য বর্ণ। দ ও হ-এর সংযুক্ত রূপ ধ।

ন—দ উচ্চারণ করিতে গিয়া জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া দন্ত স্পর্শ করিয়া যদি নাক দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবেই ন এই নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

প—অধর ও ওষ্ঠ অর্থাৎ উপর ও নীচে দুইটি ঠোঁট সম্পূর্ণ চাপিয়া ধরিয়া

যদি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেওয়া যায় এবং স্বরতন্ত্রী না কাঁপে, তবে প উচ্চারিত হয়। ইহা অঘোষ ও ওষ্ঠ্য বর্ণ।

ফ—প-এর মহাপ্রাণ রূপ ফ।

ব—প-এর ঘোষ রূপ ব।

ভ—ব ও হ এই দুইটির সংযুক্ত রূপ ভ। ইহা মহাপ্রাণ।

ম—ব উচ্চারণ করিতে গিয়া যদি নাক দিয়া নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া যায় তবে ম-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। ইহা নাসিক্য ও ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

য—বাংলায় ইহার উচ্চারণ তালব্য জ-এর মত।

র—ইহার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতের মাড়ীতে ঠেকাইয়া কাঁপাইতে হয়। ইহাকে তাই **কম্পনজাত ধ্বনি** বলা হয়।

ল—জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতে ঠেকাইয়া জিহ্বার দুই পার্শ্ব দিয়া বাতাস ত্যাগ করিলেই ল উচ্চারিত হয়। ইহাকে তাই **পার্শ্বিকধ্বনি** বলা হয়।

ব—বাংলায় অন্তঃস্থ ব-এর কোন স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই।

ং—মুখবিবরের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ং উচ্চারণ করা হয়।

শ, ষ, স—বাংলায় এই তিনেব একই উচ্চারণ, ইংরাজী sh-এর মতো। ইহাদের উচ্চারণে উষ্মা বা শ্বাসবায়ুব আধিক্য প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহাদেব নাম উষ্মবর্ণ।

হ—ইহাকেও শ, ষ, স-এব মত শ্বাসবায়ু প্রয়োগে ইচ্ছামত প্রলম্বিত করা যায়। ইহা **উষ্মঘোষবর্ণ**।

ক্ষ—ক্ ও ষ এর **দ্বিত্ব** উচ্চাবণ লইয়া ইহা একটি যুক্তাক্ষর। সংস্কৃত উচ্চারণে ঐ দ্বিত্ব স্পষ্ট থাকিলেও বাংলায় থাকে না, দুইটি 'খ' এর মতো শোনায়। যেমন—রক্ষা—রখ্খা ; বক্ষ—বখ্খ।

ঃ—ইহার উচ্চারণ হসন্ত হ-এর মত। কিন্তু বাংলায় বিসর্গের পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব করিয়া বিসর্গের উচ্চারণ হইয়া থাকে। যেমন—দুখ্খ—দুঃখ।

ঁ (চন্দ্রবিন্দু)—ইহা স্বরধ্বনির পূর্ণ অনুনাসিক চিহ্ন। সম্পূর্ণ নাসিকা-যোগে ইহার উচ্চারণ। যেমন—পাঁক, চাঁদ, কাঁদ প্রভৃতি।

এক তালিকায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় :—

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
অ, আ, হ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয়
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ,	তালু	তালব্য
ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য
ঌ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য
উ, ঊ, প, ফ, ব়, ভ, ম	ওষ্ঠ	ঔষ্ঠ্য
ব (অন্তঃস্থ—সংস্কৃত উচ্চারণ)	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালব্য
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য

[বাংলা যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য]

একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়া যখন একটি সংযুক্ত বর্ণ হয় তখন সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ থাকা উচিত ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলায় তাহা হয়—কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে। সেগুলি দেখানো হইতেছে।

ক্ষ—কৃষ এই উচ্চারণ হওয়া উচিত কিন্তু কৃখ রূপে উচ্চারিত হয়। অক্ষর (অক্‌খর), রাক্ষস (রাক্‌খোস), বক্ষ (বোক্‌খো)।

জ্ঞ—জ ও ঞ-এর মিলিত উচ্চারণ বাংলায় গ্যঁ। বিজ্ঞান (বিগ্যাঁন), আজ্ঞা (আগ্যাঁ)।

ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন—বিশ্ব (বিশ্‌শ), সত্বর (সত্‌তর), বিল্ব (বিল্‌ল)।

য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনেও 'য' এর উচ্চারণ থাকে না, ব্যঞ্জনটিরই দ্বিত্ব হয়। বিদ্যা (বিদ্দা), সহ্য (সোজ্‌ঝ), সত্য (সত্‌তো)।

ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনেও 'ম' এর প্রভাবে একটি লঘু অনুনাসিক ধ্বনি মাত্র থাকে। পদ্ম (পদ্দঁ), স্মরণ (সঁরণ)।

[একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি]

সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণের বিশুদ্ধি বাংলায় বজায় না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে একই বর্ণ বিভিন্ন ধ্বনি প্রকাশ করিয়া থাকে। 'অ' এর উচ্চারণ অকাল, অসময়, অবিকল প্রভৃতি শব্দে অবিকৃত থাকে কিন্তু অতুল, অনুকুল প্রভৃতি শব্দ একটু ও-ঘেঁষা হয়। লজ্জা ও লজ্জিত, নন্দন ও নন্দিত, শক্ত ও শক্তি এইগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। এ-কারের দুই রকম উচ্চারণ একদা ও একা, একটি ও একলা, ফেনা ও ফেনিল এই শব্দগুলির মধ্যে ধরা পড়ে।

[বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি]

সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণের স্পষ্টতা বাংলায় রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই শ, ষ ও স এই তিনটি বর্ণ আছে কিন্তু তিনটিকেই আমরা একইভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকি। ন ণ বর্ণ আলাদা হইলেও বাংলায় ধ্বনি এক। জ ও য, দ্ব ও দ্দ, ক্ষ ও খ্য বর্ণ পৃথক হইলেও উচ্চারণ একই।

[বাংলায় ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম]

সমীকরণ—একই শব্দের মধ্যে যদি পাশাপাশি দুইটি বিভিন্ন ব্যঞ্জন থাকে, তবে অনেক সময় দুইটি বিভিন্ন ব্যঞ্জন একই ব্যঞ্জনবর্ণে রূপান্তরিত হয়। এই প্রকার রূপান্তর-সাধনের নাম সমীকরণ। যথা :—গল্প—গপ্প, তর্ক—তক্ক, কর্তা—কত্তা, মুর্খ—মুখ্যু, লাল নীল—লাল লীল।

অসমীকরণ—শব্দের মধ্যে পাশাপাশি একই প্রকার স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিলে একটি ধ্বনির পরিবর্তন সাধন করিয়া উচ্চারণে একটি নূতনত্ব আনয়ন করা হয়। উচ্চারণের এই বৈচিত্র্য সাধনের নাম বিষমীকরণ বা অসমীকরণ। যথা :—বয়স—বয়েস, হরিতকী—হরতুকী, হাস্নাহানা—হাস্ন হানা।

বর্ণবিপর্যয়—শব্দের মধ্যে দুইটি বর্ণ যখন পরস্পর স্থান-বিনিময় করে, তখন বর্ণবিপর্যয় হয়। যথা :—পিশাচ—পিচাশ, বাক্স—বাস্ক, হ্রদ—দহ, মুকুট—মটুক, বারাণসী—বেনারসী।

ধ্বনি বিলোপ বা বর্ণলোপ—কোন শব্দের একটি স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ

যখন উচ্চারণে লোপ পায় তখন তাহাকে বর্ণলোপ বলে। যথা—নারিকেল—নারকেল, স্ফটিক—ফটিক, নাতিনী—নাত্‌নী, কাঁচাকলা—কাঁচকলা, অতিথি—অতিথ, মিশিকাল—মিশ্‌কালো।

বর্ণাগম—একটি শব্দের মধ্যে যদি কোন নূতন বর্ণের আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে বর্ণাগম বলে। যথা :—(আদ্যাগম) স্কুল—ইস্কুল, স্টিমার—ইস্টিমার, স্টেশন—ইস্টেশন। (মধ্যাগম) বানর—বান্দর, অম্ল—অম্বল। (অন্ত্যাগম) নস্য—নস্যি, বেঞ্চ—বেঞ্চি, মুণ্ড—মুণ্ডু।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ—উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটি স্বরবর্ণ প্রবেশ করাইয়া অনেক সময় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। যুক্তবর্ণের মধ্যে এইপ্রকার স্বরবর্ণের অনুপ্রবেশের নাম স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। স্বরভক্তিতে অ, ই, উ, এ এবং ও এই পাঁচটি স্বরেরই আগম হয়। যথা :—কর্ম—করম, ধৈর্য—ধৈরজ, গর্ব—গরব, ভক্তি—ভকতি, চক্র—চক্কর, বর্ষ—বরষ, বর্ষা—বরষা, গর্জন—গরজন। শ্রী—ছিরি, বর্ষণ—বরিষণ, চিত্র—চিত্তির, স্নান—সিনান, মিত্র—মিত্তির, প্রীতি—পীরিতি। ভ্রূ—ভুরু, পুত্র—পুত্তুর, শুক্র—শুক্কুর, শূদ্র—শূদ্দুর প্রেত—পেরেত, গ্রাম—গেরাম, শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ, শ্লোক—শোলোক।

স্বরসঙ্গতি—শব্দের মধ্যে যদি একাধিক স্বর থাকে তবে অনেক সময় শব্দটি উচ্চারণ করিবার সময় একটি সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে উচ্চারণটি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। এই বৈশিষ্ট্যের নাম স্বরসঙ্গতি।

পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন, যথা—দেশী—দিশি, অতি—ওতি, শুনা—শোনা, ভুলে—ভোলে।

পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন,—যথা—বিলাতি—বিলিতি, নিরামিষ—নিরিমিষ, উনান—উনুন, হুঁকা—হুঁকো, কুঁজা—কুঁজো, কুড়াল—কুড়ল, পুরোহিত—পুরুত।

অপিনিহিতি—শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকিলে সেই ই বা উ কে যথাকালে উচ্চারণ না করিয়া আগে হইতেই উচ্চারণ করিবার যে বৈশিষ্ট্য বাংলা উচ্চারণে আছে, তাহার নামই অপিনিহিতি। একসময় উচ্চারণের

বৈশিষ্ট্য সমগ্র বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, এখন মাত্র পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ আছে। যথা :—রাতি—রাইত, আজি—আইজ, কালি—কাইল, গাঁঠি—গাঁইট, সত্য—সইত্য, কাব্য—কাইব্য, রাখিয়া—রাইখ্যা, মারিয়া—মাইর্যা, সাধু—সাউধ, গাছুয়া—গাউছা, জলুয়া—জউলা।

অভিশ্রুতি—অপিনিহিতির প্রভাবে যে পরিবর্তন হয় তাহা পূর্ববঙ্গে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া চলিত আধুনিক ভাষায় অপিনিহিত স্বর পূর্বস্থিত স্বরের পরিবর্তন সাধন করে। অভিশ্রুতি বাংলা উচ্চারণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা মোটামুটি দুইভাবে দেখা দেয়,—

(১) অপিনিহিতির মাধ্যমে, যথা—রাখিয়া>রাইখ্যা (অপিনিহিতি)> রেখে (অভিশ্রুতি); এইভাবে, কাটিয়া>কাইট্যা>কেটে: করিয়া> কইর্যা>ক'রে; গাছুয়া>গাউছা>গেছো, জলুয়া>জউলা>জোলো; বলিয়া—বোলে, করিয়া—কোবে, ছাঁটিয়া—ছেঁটে, সাথুয়া—সেথো, পটুয়া—পোটো।

(২) কলিকাতায় প্রচলিত কথ্যরীতি অনুযায়ী, যথা—বলিল,—বোল্লো, করিল—কোরলো, চলিল—চোললো, বলিব—বোলবো, পডিব—পোডবো, কবিরাজ—কোবরেজ, পানিহাটি—পেনেটি।

য়-শ্রুতি ও (অন্তঃস্থ) ব-শ্রুতি—শব্দেব মধ্যে দুইটি পাশাপাশি স্বরধ্বনি থাকিলে, উচ্চারণেব সুবিধাব জন্য বা দ্রুত উচ্চারণের ফলে উহাদের মধ্যে অনেকসময় একটা '-য়' বা '-ব'-ধ্বনির আগম হয়। যথা—মা আমাব= মায়ামার, কে এলো=কেযেলো, না আ=নাওয়া, খা আ=খাওয়া।

ঘোষীভবন—অনেকসময় উচ্চারণেব সুবিধাব জন্য কোনো কোনো অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়, যেমন,—আজকাল—আজগাল, কাক—কাগ, বক—বগ, ঠক—ঠগ।

লোপ—পদমধ্যস্থ 'হ' ও 'র' অনেকসময় সহজ উচ্চারণের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন—করলুম—কল্লুম, ফলাহার—ফলার, বাদশাহ—বাদশা।

অনুশীলনী

১। ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। বাংলায় আ-কার ও এ-কারের যে বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হয় তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি, অপিনিহিতি ও বিপ্রকর্ষ এই সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা কর। উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

৪। উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—

(ক) অ, ঋ, স, ং, ক্ষ (১৯৪৩)। (খ) ঋ, উ, ঞ, ভ, স, হ (১৯৪৪); (গ) ঈ, ঐ, ঙ, য, শ, চ (১৯৪৫); (ঘ) এ, ঙ, চ, ঞ, জ্ঞ (১৯৪৬);

৫। উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও :—অন্তঃস্থ বর্ণ (১৯৬০, ১৯৬২) আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ (১৯৬০) বর্ণাগম (১৯৬০) যৌগিক স্বর, য়-শ্রুতি।

৬। উচ্চারণ সম্বন্ধে টীকা লিখ :—ঐ, ল, হ, ক্ষ, ং, ষ, ণ, ঞ। (১৯৬২)

সন্ধি

সন্ধি অর্থ মিলন। বর্ণের সহিত বর্ণের মিলন হইলে সন্ধি হয়। দুইটি বর্ণ অত্যন্ত সন্নিহিত ও নিকটবর্তী হইলে অর্থাৎ পাশাপাশি থাকিলে দুই বর্ণ মিলাইয়া যে একবর্ণে পরিণত করা হয়, তাহার নাম সন্ধি।

একটি শব্দের শেষবর্ণ আর একটি শব্দের প্রথম বর্ণ তাড়াতাড়ি কথা বলিবার সময় আমরা সর্বদাই মিলাইয়া এক করিয়া দিয়া থাকি। 'কারা আগার', 'হিম অচল' দ্রুত উচ্চারণে 'কারাগার', 'হিমাচল' হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চারণের সুবিধার জন্যই অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণ, ভাষার কর্কশতা-নিবারণ, প্রভৃতির জন্যই সন্ধি করা হয়।

সন্ধি দুই প্রকার—**স্বরসন্ধি** ও **ব্যঞ্জনসন্ধি**।

স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধি হইলে স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বর বা ব্যঞ্জনের সন্ধির নাম ব্যঞ্জনসন্ধি। **বিসর্গসন্ধি** ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

[বাংলা ভাষার সন্ধির বৈশিষ্ট্য]

বাংলার কতকগুলি নিজস্ব সন্ধি আছে। এইগুলির মধ্যে অনেকগুলির এখনও লিখিত রূপ নাই। কেবল উচ্চারণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ আছে।

খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

আর + এক = আরেক ; বার + এক = বারেক ; তিল + এক = তিলেক ক্ষণ + এক = ক্ষণেক।

এখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে তিল, ক্ষণ প্রভৃতি শব্দের শেষের অক্ষরটি অ-কারান্ত কিন্তু বাংলা উচ্চারণে ঐগুলি হসন্ত যুক্ত। এইভাবে, যেমন + ই = যেমনি ; তেমন + ই = তেমনি ; আমার + ও = আমারো ; কাহার + ও = কাহারো ; কখন + ও = কখনো ইত্যাদি সন্ধি হয়।

এই শব্দগুলির দেখাদেখি কয়েকটি শব্দে যেখানে শেষ অক্ষরটি অকারান্ত সেগুলিও উপরের এই নিয়মে পড়িয়া যায়। শত + এক = শতেক ; অর্ধ + এক = অর্ধেক।

বাংলায় কতকগুলি ক্ষেত্রে পূর্বস্বরের লোপ হয়—পানি + ফল = পানফল ; মিশি + কালো = মিশকালো ; ঘোড়া + গাড়ী = ঘোড়গাড়ী ; কাঁচা + কলা = কাঁচকলা ; বেশী + কম = বেশকম ; মাসী + শাশুড়ী = মাসশাশুড়ী।

বাংলাতে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বিসর্গ বর্জিত করিয়া উচ্চারণ করা হয় বলিয়া মন + অন্তর = মনান্তর, বক্ষ + উপরি = বক্ষোপরি, যশ + আকাঙ্ক্ষা = যশাকাঙ্ক্ষা বাংলায় চলিতেছে। বলা বাহুল্য **এগুলি শিষ্ট প্রয়োগ নয়।**

কতকগুলি সন্ধি এখনও লিখিত রূপ পায় নাই কিন্তু উচ্চারণে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। যথা—এত + দিন = এদ্দিন, পাঁচ + জন = পাঁজ্জন, বড় + ঠাকুর = বট্‌ঠাকুর, পাঁচ + সের = পাঁচসের, নাতি + জামাই = নাতজামাই

[স্বরসন্ধি]

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয় ; আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

হিম + অচল = হিমাচল ; ধর্ম + অধর্ম = ধর্মাধর্ম ; অপর + অপর = অপরাপর; মঙ্গল + অমঙ্গল = মঙ্গলামঙ্গল ; নর + অধম = নরাধম ; জল + আশয় = জলাশয়। যথা + অর্থ = যথার্থ ; বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

২। ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে, উভয় মিলিয়া ঈ-কার হয় ; ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র ; অতি + ইব = অতীব ; পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা ; শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র ; সতী + ঈশ = সতীশ।

৩। **উ**-কার কিংবা **ঊ**-কারের পর **উ**-কার কিংবা **ঊ**-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **ঊ**-কার হয় ; ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

কটু + উক্তি = কটূক্তি ; বিধু + উদয় = বিধূদয় ; বধূ + উক্তি = বধূক্তি ; ভূ + ঊর্দ্ধ = ভূর্দ্ধ।

৪। **অ**-কার কিংবা **আ**-কারের পর **ই**-কার কিংবা **ঈ**-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া **এ**-কার হয় ; এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র ; নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র · দেব + ঈশ = দেবেশ ; গণ + ঈশ = গণেশ ; মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র ; যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট ; রমা + ঈশ = রমেশ ; ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী।

৫। **অ**-কার কিংবা **আ**-কারের পর **উ**-কার কিংবা **ঊ**-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া **ও**-কার হয ; ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূর্য্য + উদয় = সূর্য্যোদয় ; নর + উত্তম = নরোত্তম ; চল + ঊর্ম্মি = চলোর্ম্মি ; নব + ঊঢা = নবোঢ়া ; যথা + উচিত = যথোচিত ; মহা + উৎসব = মহোৎসব ; গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

৬। **অ**-কার কিংবা **আ**-কারের পব **এ**-কাব কিংবা **ঐ**-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া **ঐ**-কার হয় ; ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

জন + এক = জনৈক ; এক + এক = একৈক ; মত + ঐক্য = মতৈক্য ; বিপুল + ঐশ্বর্য = বিপুলৈশ্বর্য ; সদা + এব = সদৈব ; তথা + এব = তথৈব ; মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

৭। **অ**-কার কিংবা **আ**-কারের পব **ও**-কার কিংবা **ঔ**-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া **ঔ**-কার হয় ; ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

জল + ওঘ = জলৌঘ ; বন + ওষধি = বনৌষধি ; চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য, পরম + ঔষধ = পরমৌষধ ; মহা + ওষধি = মহৌষধি ; মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮। **অ**-কার কিংবা **আ**-কারের পর **ঋ** থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া **অর্** হয়। অর্-এর অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, এবং র্ রেফ হইযা পরবর্ণের মস্তকে যায়।

দেব + ঋষি = দেবর্ষি ; সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি · মহা + ঋষি = মহর্ষি

৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, **এ**-কার স্থানে **অয়্**, **ঐ**-কার স্থানে **আয়্**, **ও**-কার স্থানে **অব্**, **ঔ**-কার স্থানে **আব্** হয়। অ-কার বা আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। য়্ বা ব্ পরস্বরে যুক্ত হয়।

শে + অন = শয়ন ; নে + অন = নয়ন ; গৈ + অক = গায়ক ; ভো + অন = ভবন ; নৌ + ইক = নাবিক ; ভৌ + উক = ভাবুক।

১০। **ই**, **ঈ** ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, **ই**-কার এবং **ঈ**-কার স্থানে **য্** (য-ফলা) হয় ; য্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য-কারে যুক্ত হয়।

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত ; অতি + আচার = অত্যাচার ; অতি + অন্ত = অত্যন্ত ; প্রতি + অহ = প্রত্যহ ; যদি + অপি = যদ্যপি ; পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা।

১১। **উ**, **ঊ** ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, **উ** বা **ঊ** স্থানে **ব্** হয় : ব্ (ব-ফলা হইয়া) পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব্-কারে যুক্ত হয়।

মনু + অন্তর = মন্বন্তর : পশু + আচার = পশ্বাচার : সু + আগত = স্বাগত : অনু + এষণ = অন্বেষণ।

বিঃ দ্রঃ—স্বরসন্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কেবল সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দেরই সন্ধি হইবে। বাংলা শব্দের সহিত বাংলা শব্দের সন্ধি সাধু ভাষায় হয় না। সংস্কৃত শব্দের সহিত বাংলা শব্দেরও সন্ধি হয় না।

কচু + আলু + আদা সন্ধি করিয়া কচাল্বাদা হইবে না।

আমি + উপরে সন্ধি হইবে না।

তিনি + অধম সন্ধি হইবে না।

বিদেশী শব্দের সন্ধি করা উচিত নয় ; কিন্তু পোস্টাফিস, খরচান্ত, আইনানুসারে, বাপান্ত প্রভৃতি দুই একটি সন্ধিযুক্ত পদ বাংলা ভাষায় বেশ চলিতেছে। শ্রুতিকটু হইলে বাংলাতে সন্ধি করিবে না।

কিন্তু সমাসে ও ধাতুর সহিত উপসর্গের যোগ হইলে সন্ধি করা অবশ্য কর্তব্য।

স্বরসন্ধির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, এইগুলি ব্যতিক্রম অর্থাৎ সূত্র অনুসারে নিষ্পন্ন হয় নাই। ইহাদিগকে **নিপাতনে সিদ্ধ** বলে।

সীম + অন্ত = সীমন্ত (সীঁথি অর্থে) কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'সীমান্ত'।

কুল + অটা = কুলটা কিন্তু হওয়া উচিত 'কুলাটা'।

মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'মার্তাণ্ড'।

স্ব + ঈর = স্বৈর, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'স্বের'।

প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'প্রোঢ়'।

অক্ষ + উহিণী = অক্ষৌহিণী, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'অক্ষোহিণী'।

শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'শুদ্ধৌদন'।

গো + অক্ষ = গবাক্ষ, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল 'গবক্ষ'।

[ব্যঞ্জনসন্ধি]

১। **চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।**

উৎ + চারণ = উচ্চারণ ; জগৎ + চন্দ্র = জগচ্চন্দ্র ; সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র ; উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ ; শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র ; ভগবৎ + চিন্তা = ভগবচ্চিন্তা ; চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র।

২। **জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়।**

তৎ + জন্য = তজ্জন্য ; বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল ; সৎ + জন = সজ্জন ; উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল ; যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন।

৩। **ট** কিংবা **ঠ** পরে থাকিলে, **ত্** ও **দ্** স্থানে **ট্** হয়।

তদ্ + টীকা = তট্টীকা ; বৃহৎ + টীকা = বৃহট্টীকা।

৪। **ড** কিংবা **ঢ** পরে থাকিলে, **ত্** ও **দ্** স্থানে **ড্** হয়।

উৎ + ডীন = উড্ডীন ; বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা।

৫। **ল্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়।**

উৎ + লেখ = উল্লেখ ; উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন।

৬। **শ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে চ্, আর শ্ স্থানে ছ হয়।**

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল ; উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ; চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি।

৭। **ত্ কিংবা দ্ এর পর হ্ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়।**

উৎ + হত = উদ্ধত ; উৎ + হৃত = উদ্ধৃত ; তৎ + হিত = তদ্ধিত।

৮। ক্ চ্ ট্ ত্ প্—ইহাদের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, ক চ ট ত প্ স্থানে যথাক্রমে গ্ জ্ ড্ দ্ ব্ হয়।

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত ; বাক্ + ঈশ = বাগীশ ; ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত ; ষট্ + আনন = ষড়ানন ; জগৎ + ইন্দ্র = জগদিন্দ্র ; জগৎ + ঈশ্বর = জগদীশ্বর।

৯। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকিলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।

বাক্ + দত্ত = বাগ্‌দত্ত ; সৎ + গুরু = সদ্‌গুরু ; উৎ + যোগ = উদ্যোগ ; জগৎ + গুরু = জগদ্‌গুরু ; ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।

১০। স্বরবর্ণের পরবর্তী ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়।

পরি + ছদ = পরিচ্ছদ ; পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ ; বি + ছেদ = বিচ্ছেদ ; আ + ছাদন = আচ্ছাদন ; বট + ছায়া = বটচ্ছায়া।

১১। ন্ কিংবা ম্ পরে থাকিলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

বাক্ + ময় = বাঙ্ময় ; জগৎ + মাতা = জগন্মাতা ; জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ; দিক্ + মণ্ডল = দিঙমণ্ডল ; মৃৎ + ময় = মৃন্ময় ; দিক্ + নাগ = দিঙনাগ ; কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র।

১২। অন্তঃস্থ অথবা উষ্মবর্ণ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ) পরে থাকিলে পদের অন্তঃস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।

সম্ + যোগ = সংযোগ ; সম্ + হার = সংহার ; কিম্ + বা = কিংবা ; সম্ + শয় = সংশয় ; সম্ + বাদ = সংবাদ ; সম্ + সার = সংসার ; সম্ + শোধন = সংশোধন ; সম + লগ্ন = সংলগ্ন।

১৩। স্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম্ পর্যন্ত বর্ণ) পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়, অথবা যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ অথবা সঙ্কীর্ণ ; অহম্ + কার = অহংকার ; অথবা অহঙ্কার ; সম্ + খ্যা = সংখ্যা অথবা সঙ্খ্যা ; সম্ + পূর্ণ = সংপূর্ণ অথবা সম্পূর্ণ ; সম + বুদ্ধ = সংবুদ্ধ অথবা সম্বুদ্ধ।

১৪। **উৎ উপসর্গের পরে স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর স্-কারের লোপ হয়।**

উৎ + স্থান = উত্থান ; উৎ + স্থিত = উত্থিত।

১৫। **বর্গের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ অথবা শ্, ষ্, স্ পরে থাকিলে, বর্গের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়।**

আপদ্ + কাল = আপৎকাল ; ক্ষুধ্ + পীড়িত = ক্ষুৎপীড়িত ; বিপদ্ + কাল = বিপৎকাল ; হৃদ্ + কমল = হৃৎকমল ; বিপদ্ + সময় = বিপৎসময়।

১৬। **সম্ ও পরি উপসর্গের পরে কৃ-ধাতু থাকিলে, উপসর্গের পর স্ আগম হয়।**

সম্ + কৃত = সংস্কৃত ; পরি + কৃত = পরিষ্কৃত।

১৭। **ষ**-কাবেব পব **ত** কিংবা **থ** থাকিলে

হয়।

দুষ্ + ত = দুষ্ট ; ষষ্ + থ = ষষ্ঠ ; হৃষ্ + ত = হৃষ্ট ; প্র + বিশ্ = প্রবিশ্ + ত = প্রবিষ্ট।

১৮। **ত্** পরে থাকিলে পদমধ্যস্থ **ম্** স্থানে **ন্** হয় ;

গম্ + তব্য = গন্তব্য ; সম্ + তাপ = সন্তাপ ; কিম্ + তু = কিন্তু ; পরম্ + তু = পরন্তু।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি

আ + পদ = আস্পদ ; গো + পদ = গোষ্পদ ; আ + চর্য = আশ্চর্য ; হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র ; বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি ; বন + পতি = বনস্পতি ; ষট্ + দশ = ষোড়শ ; দিব + লোক = দ্যুলোক ; তৎ + কর = তস্কর ; হিন্স্ + অ = সিংহ ; পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি।

[বিসর্গসন্ধি]

১। **র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পরে চ্ বা ছ্ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে শ্ হয়।**

নিঃ + চয় = নিশ্চয় ; দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য ; নিঃ + চল = নিশ্চল ; শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ; দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা ; দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র।

২। **র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পরে ট বা ঠ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়।**

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর ; ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার।

৩। **র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পর ত্ বা থ্ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স্ হয়।**

মনঃ + তাপ = মনস্তাপ ; ইতঃ + তত = ইতস্তত ; নিঃ + তার = নিস্তার ; অধঃ + তন = অধস্তন ; দুঃ + তর = দুস্তর ; নভঃ + তল = নভস্তল।

৪। **ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে, অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে স্ হয়।**

নমঃ + কার = নমস্কার ; পুরঃ + কার = পুরস্কার ; অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত ; ভাঃ + কর = ভাস্কর।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম :—

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া ; অধঃ + পাত = অধঃপাত ; মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট ; অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ।

কিন্তু অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়।

আবিঃ + কার = আবিষ্কার ; ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ; নিঃ + কর = নিষ্কর ; নিঃ + ফল = নিষ্ফল।

৫। **স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্, পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত র্-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়।**

অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা ; পুনঃ + আগত = পুনরাগত ; অন্তঃ + গত = অন্তর্গত ; অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী ; প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ ; প্রাতঃ + ভোজন = প্রাতর্ভোজন ; অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত ; পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম।

৬। **অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য্, র্, ল্, ব্, হ্, থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে র হয়।**

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা ; দুঃ + গম = দুর্গম ; দুঃ + নাম = দুর্নাম ; দুঃ + লভ = দুর্লভ। নিঃ + অবধি = নিরবধি ; নিঃ + গত = নির্গত ; ধনুঃ + বিদ্যা = ধনুর্বিদ্যা ; চক্ষুঃ + দান = চক্ষুর্দান ; দুঃ + ভাবনা = দুর্ভাবনা।

৭। অ-কারের পরস্থিত সুজাত বিসর্গের পরে যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ থাকে, তাহা হইলে অ-কার ও পরবর্তী বিসর্গ—উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়।

মনঃ + যোগ = মনোযোগ ; মনঃ + ভাব = মনোভাব ; তপঃ + বল = তপোবল ; যশঃ + লাভ = যশোলাভ ; মনঃ + রম = মনোরম ; বয়ঃ + বৃদ্ধি = বয়োবৃদ্ধি ; অধঃ + গতি = অধোগতি ; যৎপরঃ + নাস্তি = যৎপরোনাস্তি।

৮। যদি পূর্বপদে **অ**-কারের পর **বিসর্গ** থাকে এবং পর পদের প্রথমে **অ**-কার থাকে তাহা হইলে পূর্বপদের **অ**-কার ও **বিসর্গ** উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়, এবং পরপদের **অ**-কার **লুপ্ত অ-কারের 'চিহ্ন' (ঽ)** প্রাপ্ত হয়।

যশঃ + অভিলাষ = যশোঽভিলাষ ; ততঃ + অধিক = ততোঽধিক ; সঃ + অহম্ = সোঽহম।

তবে বাংলায় এই 'ঽ' চিহ্নের ব্যবহার খুব কমই দেখা যায়।

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাহাকে বলে ? কোথায় কোথায় সন্ধি হয় না, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। সূত্র উল্লেখপূর্বক সন্ধি কর :—

রত্ন + আকর ; হিম + ঋত, অপ + জ ; নিঃ + অবধি ; তদ্ + হিত ; দিক্ + অন্ত ; গো + অক্ষ ; উপরি + উপরি।

৩। (ক) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

ক্ষুধার্ত, অক্ষৌহিণী, প্রৌঢ়, উচ্ছ্বাস, প্রাতরাশ, তরুচ্ছায়া, সম্রাট, মনোরম, ষষ্ঠ।

(খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

উল্লেখ, উত্তমর্ণ, হিতৈষী, নীরস, গবাক্ষ।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলিতে সন্ধিঘটিত যে ভুল আছে তাহা দেখাও :—

উজ্জ্বল, ভূম্যাধিকারী, সম্পদ, সম্মুখ, দুরাদৃষ্ট, যশেচ্ছা দুরাবস্থা, সদ্যজাত, জগবন্ধু, মনোকষ্ট।

৫। নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কাহাকে বলে ? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৬। শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(ক) গ্যাসালোকিত রাজপথের উপর আমরা পর্যাটান করিতে লাগিলাম।

(খ) আমাপেক্ষা ভাগ্যহীন আর কে আছে?

(গ) আমার মনোকষ্টের সীমা নাই।

(ঘ) উপরোক্ত বিষয়ে তোমার সম্মতি আছে কিনা জানাইবে।

(ঙ) খুলনাভিমুখে গাড়ী ছাড়িল, এবার আমরা বাট্যাভিমুখে যাইতেছি।

(চ) প্রাতঃভ্রমণ বড়ই প্রীতিপদ।

(ছ) আমি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি তুমি আরোগ্য লাভ কর।

(জ) বর্ত্তমান সময়ে অর্থের অত্যাধিক অভাব।

(ঝ) পুত্রের নিরস বদনমণ্ডল ও তেজহীন চক্ষুদ্বয় দেখিয়া জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

(ঞ) যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বড়ই লজ্জাস্কর।

[ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান]

সংস্কৃত শব্দে কোনখানে ণ ও কোনখানে ষ ব্যবহার করা হয়; এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। এই নিয়মকে ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধি বলে। ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধি প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয় বলিয়াই বাংলা ব্যাকরণেও ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধির আলোচনা প্রয়োজন।

ণত্ব-বিধান

১। ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত পদমধ্যগত ন ণ হয়। ঋণ, বর্ণ, ঘৃণা, তৃষ্ণা, স্বর্ণ, তৃণ, জীর্ণ, কর্ণ ইত্যাদি।

২। ঋ, র ও ষ এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ প-বর্গ, য, ব, হ এবং ং ব্যবধান থাকিলেও ন ণ হয়। কৃপণ, হরিণ, পাষাণ, গ্রহণ, বৃংহণ।

কিন্তু উল্লিখিত বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণের ব্যবধান থাকিলে দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয় না। যথা—দর্শন, অর্চনা, রচনা, প্রার্থনা ইত্যাদি।

৩। ট, ঠ, ড-এর সংযুক্ত হইলে ন সর্বদাই ণ হয়। কণ্ঠ, ঘণ্টা, দণ্ড, পণ্ডিত, কণ্টক, লুণ্ঠন।

৪। প্র, পরা, পরি ও নি এই চারিটি উপসর্গের পরে ন ণ হয়। প্রণাম, পরায়ণ, পরিণাম, নির্ণয়।

৫। প্র, পর, পূর্ব ও অপর শব্দের পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের ন ণ হয়। যথা।—প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

৬। পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নার শব্দের পরবর্তী 'অয়ন' শব্দের ন ণ হয়। যথা—পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ।

৭। পদের শেষে ন ণ হয় না। করেন, করুন।

৮। ত, থ, দ ও ধ-এর সহিত যুক্ত হইলে সর্বদাই ন হয়। চিন্তা, সন্তান, পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা।

৯। কতকগুলি শব্দের ণ স্বাভাবিক।

চাণক্য, মাণিক্য, গণ, বাণিজ্য, লবণ,
কল্যাণ, কণিকা, অণু, পুণ্য, বীণা, কোণ।
লাবণ্য, চিক্কণ, বাণী, গণিক, মৎকুণ,
বেণু, কণা, চূণ, তৃণ, গণিকা, নিপুণ।
গণ, বাণ, পাণি, শোণ, গণনা, শোণিত,
কঙ্কণ, কফোণি, মণি, কণাদ, শাণিত।
বেণী, ফণী, স্থাণু, ফণ, বিপণি, আপণ॥

ষত্ব-বিধান

১। অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক ও র-এর পরবর্তী প্রত্যয়ের স ষ হয়। বিষয়, পরিষ্কার, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, শ্রীচরণেষু।

কিন্তু সাৎ প্রত্যয়ের স ষ হয় না। যথা—অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ।

২। অতি, অধি, অণু, অপি, অভি, নি, পরি, প্রতি, বি, সু এই উপসর্গ-গুলির পর কতকগুলি ধাতুর স ষ হয়। যথা—প্রতিষেধ, অভিষেক, নিষেধ, সুষমা, বিষম।

৩। পিতৃ ও মাতৃ শব্দের সহিত স্বসৃ শব্দের যোগ হইলে স্বসৃ শব্দের প্রথম স ষ হয়। যথা—মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

৪। কতকগুলি শব্দে ষ স্বাভাবিক।

নিকষ, পাষাণ, মেষ, কষায়, প্রদোষ,
আষাঢ়, ষোড়শ, ঊষা, কৃষি, হর্ষ, রোষ।
পাষণ্ড, ঈষৎ, বাষ্প, বিষাণ, দূষণ,
বর্ষণ, বিশেষ্য, ভূষা, বিষয়, বর্ষণ।
কুষ্মাণ্ড, গণ্ডূষ, ঈর্ষা, ঊষর, ঔষধ,
বাষ্প, শ্লেষ্মা, ভীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ, ভিষক, নৈষধ।
তুষার, সর্ষপ, ভাষা, পৌষ, ষট্, মাষ,
পুরুষ, মূষিক, ওষ্ঠ, শেষ অভিলাষ।

অনুশীলনী

১। ণত্ব বিধির প্রধান সূত্রগুলি উদাহরণসহ নির্দেশ কর।

২। ষত্ব বিধির প্রধান সূত্রসমূহের সোদাহরণ নির্দেশ দাও।

৩। কারণ নির্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

মুমূর্ষু, প্রনাম, ভূমিষাৎ, শ্রদ্ধাস্পদেষু, সর্বণাম, কল্যানীয়াষু, কর্ন, অগ্নিষাৎ, ঋসি, রেনু, পুন্য, শ্রীচরনেষু, দর্পন, বিসেশ, শূর্পনখা, সুসম, পিতৃস্বসা, পরাহ্ন, মধ্যাহ্ন, পরায়ন, বীনাপানি।

পদ-প্রকরণ

[পদের প্রকার-ভেদ]

এক বা একাধিক বর্ণ দ্বারা শব্দ গঠিত হয়। বাক্যে ব্যবহার করিবার সময় শব্দগুলিকে বিভক্তিযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। বিভক্তি-যুক্ত শব্দের বা ধাতুর নামই পদ। বিভক্তি দুই প্রকার। শব্দবিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি।

ছেলেরা, লোকে, মানুষের, ঘরে, ঘোড়ায় প্রভৃতি শব্দবিভক্তি-যুক্ত পদ। যাইতেছি, বলিয়াছিল, করিলাম, খাইব প্রভৃতি ধাতুবিভক্তি-যুক্ত পদ।

শব্দ ও পদের এই সংজ্ঞা সংস্কৃত ব্যাকরণের। সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তি-যুক্ত না হইলে কোন শব্দই পদ হইবে না এবং বিভক্তি-যুক্ত না করিয়া কোন বাক্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

. নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত—এই নিয়ম সংস্কৃতে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন পদে বিভক্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

মধু বলিল, আমি এখন বাড়ী যাইব।

এই বাক্যে মধু এবং বাড়ী এই দুইটি পদে কোন বিভক্তির চিহ্ন নাই। সুতরাং বিভক্তির চিহ্ন থাকুক বা না থাকুক বাক্যে ব্যবহৃত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিতেছে এইরূপ হইলেই তাহাদের পদ বলা হয়।

অনেকে বাংলায় যে সমস্ত পদে বিভক্তির চিহ্ন দেখা যায় না সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য 'শূন্য বিভক্তি' কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে বিনা বিভক্তিতে কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহার করা যায় না—সংস্কৃত বাক্যের এই নিয়ম তাঁহারা মানিয়া লন।

পদ পাঁচ প্রকার—**বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।**

[বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ]

যে পদে নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য বলে। এই নাম কোন ব্যক্তি, বস্তু জাতি, সমষ্টি, গুণ বা কার্যের নাম হইতে পারে।

১। যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তি, স্থান বা দেশ বুঝায় তাহাকে **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** বলে। ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম, নদীর নাম, পর্বতের নাম, গ্রন্থের নাম—নাম হইলেই হইল। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি বুঝাইতে হইবে।

রাম, রহিম, রামায়ণ, গঙ্গা এইগুলি সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য।

২। কোন বস্তুর নাম বুঝাইলে তাহাকে **বস্তুবাচক বিশেষ্য** বলে।

লোহা, কয়লা, ধন, দুধ, চিনি এইগুলি কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের নাম নয়, এই-গুলি সাধারণ নাম। সাধারণতঃ বস্তুবাচক বিশেষ্য যে দ্রব্য বুঝায় তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ওজন করিয়া তাহার পরিমাণ নির্দেশ করা যায়।

৩। কোন্ জাতি বা শ্রেণীর নাম বুঝাইলে তাহাকে **জাতিবাচক বিশেষ্য** বলা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ঘোড়া, গরু এইগুলি নির্দিষ্ট একটিকে না বুঝাইয়া সেই জাতি বা শ্রেণীকে বুঝায়।

৪। যাহার দ্বারা কোন গুণ, দোষ বা অবস্থা বুঝায়, তাহাকে **গুণবাচক বিশেষ্য** বলে। ক্রোধ, করুণা, দয়া, ক্ষমা, সাধুতা, আলস্য, চাঞ্চল্য, বার্ধক্য গুণবাচক বিশেষ্য।

৫। যাহার দ্বারা কোন কিছু পৃথকভাবে না বুঝাইয়া সকলের সমষ্টিকে বুঝায়, তাহাকে **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** বলে। সেনা, সভা, শ্রেণী, জনতা, ছাত্রসমাজ এইগুলি সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।

৬। যাহা দ্বারা কোন একটি কার্যের নাম বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বলে। শয়ন, গমন, ভোজন, আহার, মরণ, বাঁচন প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।

বিশেষ্য পদের লিঙ্গ ও বচনভেদে রূপান্তর হয়।

[লিঙ্গ]

বিশেষ্য পদগুলি হয় কোন পুরুষ-জাতীয় জীব বা জন্তু, অথবা কোন স্ত্রী-জাতীয় জীব বা জন্তু, অথবা কোন অচেতন পদার্থ বুঝায়। যে শব্দ পুরুষ-বোধক তাহা **পুংলিঙ্গ**, যে শব্দ স্ত্রীবোধক তাহা **স্ত্রীলিঙ্গ** এবং যে শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না তাহা **ক্লীবলিঙ্গ**। *লিঙ্গ শব্দের আসল অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ।*

ছাত্র, পুত্র, লেখক, সিংহ, তপস্বী প্রভৃতি শব্দ পুরুষজাতীয় জীব বুঝায় বলিয়া এইগুলি **পুংলিঙ্গ**।

ছাত্রী, কন্যা, লেখিকা সিংহী, তপস্বিনী প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীজাতীয় জীব বুঝায় বলিয়া এইগুলি **স্ত্রীলিঙ্গ**।

ফল, জল, ঘৃত, দুগ্ধ, পাথর প্রভৃতি শব্দ স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না, এইজন্য এইগুলি **ক্লীবলিঙ্গ**।

সংস্কৃতে 'বৃক্ষ' শব্দ পুংলিঙ্গ, 'লতা' স্ত্রীলিঙ্গ, 'ফল' ক্লীবলিঙ্গ। 'বন্ধু' শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু 'মিত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। 'পত্নী' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু 'দার' শব্দ পুংলিঙ্গ ও 'কলত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ অর্থগত—অর্থাৎ যে শব্দ পুরুষ-জাতীয় ব্যক্তি বা জীব বুঝাইবে তাহা পুংলিঙ্গ, ও যে শব্দ স্ত্রীজাতীয় ব্যক্তি বা জীব বুঝাইবে তাহা স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলায় কেবল বিশেষ্য পদেরই লিঙ্গ আছে। সর্বনাম পদের লিঙ্গ নির্ণয় করিবার সময় দেখিতে হইবে কোন্ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনামটি বসিয়াছে; সেই অনুসারে সর্বনাম পদের লিঙ্গ হইবে। বিশেষণ পদ যে বিশেষ্যের পূর্বে বসে সেই বিশেষ্যের লিঙ্গ পাইয়া থাকে।

সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর রচনা করিবার সময় বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে, যেমন—মহতী সভা, পল্লবিনী লতা, পয়স্বিনী গাভী, শস্যশ্যামলা ভূমি। কিন্তু সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় প্রচলিত ব্যবহারে বিশেষণের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী মেয়ে, বড় দাদা, বড় দিদি, মেজ বাবু, মেজ গিন্নী—এইগুলি খাঁটি বাংলা প্রয়োগ।

[স্ত্রী-প্রত্যয়—সংস্কৃত ও বাংলা

পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে আ, ঈ, আনী প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়, সেগুলির নাম স্ত্রী-প্রত্যয়।

[**লিঙ্গ পরিবর্তন**]

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিবার সাধারণ নিয়ম তিনটি :—

(১) স্ত্রীবাচক নূতন শব্দের ব্যবহার।

(২) পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ।

(৩) পুরুষবাচক শব্দের পূর্বে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দের যোগ।

(১) স্ত্রীবাচক নূতন শব্দ ব্যবহার দ্বারা লিঙ্গ-পরিবর্তন

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পতি	পত্নী	বেয়াই	বেয়ান
স্বামী	স্ত্রী	বিদ্বান	বিদুষী
পিতা	মাতা	শ্বশুর	শাশুড়ী
বাবা	মা	ভূত	পেত্নী
ভ্রাতা	ভগিনী	ভাই	বোন
ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি	মিঞা	বিবি
খানসামা	আয়া	মর্দ	মাদী
গোলাম	বাঁদি	বর	বধূ
বাদশা	বেগম	কর্তা	গিন্নী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নবাব	বেগম	পুত্র	কন্যা
শুক	শারী	ছেলে	মেয়ে
বলদ	গাই	সাহেব	মেম
পুরুষ	স্ত্রী	ঠাকুরদাদা	ঠাকুরমা
রাজা	রাণী	ফুপা	ফুপু
যুবক	যুবতী	আব্বা	আম্মা
জনক	জননী	শাহ্‌জাদা	শাহ্‌জাদী

(২) বিভিন্ন স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করিয়া লিঙ্গ-পরিবর্তন

(ক) **আ** যোগ করিয়া—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অনাথ	অনাথা	চপল	চপলা
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	অজ	অজা
দীন	দীনা	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা
সুশীল	সুশীলা	কোকিল	কোকিলা
কৃপণ	কৃপণা	সরল	সরলা
কৃশ	কৃশা	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া
বৎস	বৎসা	চতুর	চতুরা
দরিদ্র	দরিদ্রা	অনুকূল	
প্রথম	প্রথমা	শিষ্য	শিষ্যা

(খ) **ঈ** যোগ করিয়া—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দেব	দেবী	ছাত্র	ছাত্রী
গৌর	গৌরী	দূত	দূতী
মানব	মানবী	কুমার	কুমারী
কাকা	কাকী	পিশাচ	পিশাচী
চাচা	চাচী	শৃগাল	শৃগালী
বুড়া	বুড়ী	সুন্দর	সুন্দরী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মৎস্য	মৎস্যী	দাস	দাসী
ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী	তরুণ	তরুণী
খুড়া	খুড়ী	দানব	দানবী
নানা	নানী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
পুত্র	পুত্রী	সিংহ	সিংহী

(গ) স্ত্রীলিঙ্গে **অক**-স্থানে **ইকা** হয়—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পাচক	পাচিকা	পাঠক	পাঠিকা
গায়ক	গায়িকা	নায়ক	নায়িকা
সাধক	সাধিকা	পালক	পালিকা
সেবক	সেবিকা	বালক	বালিকা
গ্রাহক	গ্রাহিকা	নাটক	নাটিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	অভিভাবক	অভিভাবিকা

(ঘ) **অৎ, বৎ, মৎ, ইন্, বিন্, ঈয়স্, বর, চর, দৃশ, ময়** প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে থাকিলে **ঈ** যোগ করিতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সৎ	সতী	মানী	মানিনী
শ্রীমান্ (শ্রীমৎ)	শ্রীমতী	মায়াবী	মায়াবিনী
মহান্ (মহৎ)	মহতী	তপস্বী	তপস্বিনী
ভগবান (ভগবৎ)	ভগবতী	প্রেয়ান্	প্রেয়সী
বলবান (বলবৎ)	বলবতী	গরীয়ান্	গরীয়সী
গুণবান (গুণবৎ)	গুণবতী	মহীয়ান্	মহীয়সী
হিতকর	হিতকরী	সুখকর	সুখকরী
খেচর	খেচরী	ভূচর	ভূচরী
সহচর	সহচরী	নিশাচর	নিশাচরী
তাদৃশ	তাদৃশী	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী
ঈদৃশ	ঈদৃশী	চিন্ময়	চিন্ময়ী

(ঙ) **তা (তৃ)** যে পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে থাকে, তাহাকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করিতে হইলে **ত্রী** করিতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	ধাতা	ধাত্রী
কর্তা	কর্ত্রী	বিধাতা	বিধাত্রী
শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িত্রী	অভিনেতা	অভিনেত্রী
প্রণেতা	প্রণেত্রী	রচয়িতা	রচয়িত্রী

[পিতৃ, মাতৃ, জামাতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে।]

(চ) **অঙ্গবাচক অ-কারান্ত** শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **আ** ও **ঈ** উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সুকেশ	সুকেশা, সুকেশী	বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠা, বিম্বোষ্ঠী
কুন্দদন্ত	কুন্দদন্তা, কুন্দদন্তী	বিমুখ	বিমুখা, বিমুখী
সুকণ্ঠ	সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী	কৃশাঙ্গ	কৃশাঙ্গা, কৃশাঙ্গী
কৃশোদর	কৃশোদরা, কৃশোদরী		

এই নিয়মের কয়েকটি **ব্যতিক্রম** আছে; নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে কেবল আ হয়—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ত্রিনেত্র	ত্রিনেত্রা	ত্রিনয়ন	ত্রিনয়না
চতুর্ভুজ	চতুর্ভুজা	দশভুজ	দশভুজা
শশিবদন	শশিবদনা	করালবদন	করালবদনা

(ছ) **পত্নী অর্থে** কতকগুলি শব্দে—**আনী** প্রত্যয় যোগ করা হয়—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভব	ভবানী	রুদ্র	রুদ্রাণী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী
আচার্য	আচার্যানী	মাতুল	মাতুলানী

(জ) আচার্য, ক্ষত্রিয়, উপাধ্যায় শব্দের উত্তর বিকল্পে আনী যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
	ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয় পত্নী)
	ক্ষত্রিয়ানী
	বা
	ক্ষত্রিয়া (ক্ষত্রিয়-জাতীয়া স্ত্রী)
আচার্য	আচার্যানী (আচার্য পত্নী)
	আচার্যা (স্বয়ং অধ্যাপিকা)
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়-পত্নী)
	উপাধ্যায়া (স্বয়ং অধ্যাপিকা)

(ঝ) স্ত্রী বা পত্নী বুঝাইতে 'নী', 'ইনি' ও আনী' বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

	স্ত্রীলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ
বামুন	বামনী	বেদে	বেদেনী
বাঘ	বাঘিনী		ঠাকুরাণী
সাপ	সাপিনী	চৌধুরী	চৌধুরাণী
কাঙাল	কাঙালিনী	মেছো	মেছুনী
জেলে	জেলেনী	ডাক	ডাকিনী
পূজারী	পূজারিণী	গয়লা	গয়লানী
মালী	মালিনী	রজক	রজকিনী
ভিখারী	ভিখারিণী	চাকর	চাকরাণী
চাতক	চাতকিনী	মাষ্টার	মাষ্টারণী
সরদার	সরদারনী	মেথর	মেথরাণী

(৩) **স্ত্রী বা পত্নী বাচক শব্দ যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়**

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	
পুরুষমানুষ	মেয়েমানুষ	সভ্য	মহিলা-সভ্য
এঁড়ে বাছুর	বক্না বাছুর	কর্মী	নারী কর্মী
মদ্দা কুকুর	মাদী কুকুর	প্রভু	প্রভু-পত্নী
গরু	গাই-গরু	বীর	বীরাঙ্গনা, বীরজায়া

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
হাঁস	মাদী-হাঁস	বন্ধু	বন্ধুজায়া
গয়লা	গয়লা-বৌ	ভ্রাতা	ভ্রাতৃজায়া
গোঁসাই ঠাকুর	মা-গোঁসাই	ঋষি	ঋষি-পত্নী
কবি	মহিলা-কবি	দত্ত	দত্ত-গিন্নী
সভাপতি	সভানেত্রী	ময়রা	ময়রা-বৌ

আয়া, ধাই, সতী, সতীন প্রভৃতি শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ—পুংলিঙ্গে ইহাদের কোনও রূপ নাই।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

শুক, মৎস্য, আচার্য, কবি, ভূত, শিক্ষক, গোলাম, চাকর, মেম, বোন, ননদ, নবাব।

২। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ হইবে বল :—

মালী, মেথর, পক্ষী, ঘোষ, ভ্রমর, বোনাই, শিব, তৃতীয়, তাদৃশ, মনোহর, নায়ক, মাষ্টার, ছাত্র, বাবু।

৩। নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলির পুংলিঙ্গে কিরূপ হইবে বল :—

জননী, গিন্নী, ধাত্রী, বোন, নন্দিনী, গায়িকা, শ্রীমতী, বেগম, শিক্ষয়িত্রী, ননদ।

৪। লিঙ্গঘটিত ভুলগুলি শুদ্ধ কর :—

সুন্দর কন্যা। অচল ভক্তি। শস্যশ্যামল দেশ। মহান সভা। চতুর্থ তিথি। পরাধীনী রমণী। বিদ্বান মহিলা। বুদ্ধিমান ও গুণবান বালিকা।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে 'তিনি' এই পদটি যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে অন্যান্য পদগুলির কি কি পরিবর্তন হইবে লিখ :—

(ক) তিনি অদ্বিতীয় সুরজ্ঞ গায়ক ছিলেন।

(খ) তিনি মধুরভাষী, হিতোপদেষ্টা জননায়ক ছিলেন।

(গ) তিনি আমাদের হিতৈষী আরাধ্য মাতুল।

(ঘ) তিনি রূপবান, বিদ্বান ও যশস্বী।

৬। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

অনুগামিনী, নিরপরাধ, কর্তা, গায়ক, ভাগ্যবান, চাকর, বিদ্বান ও ঘোড়া।

(S.F. 1959)

৭। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

সাধু, প্রণেতা, মহীয়ান, পণ্ডিত, গোঁসাই, আচার্য, বিদুষী, নন্দন।

(S. F. 1959)

৮। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

(ক) পুত্র, তেজস্বী, অশ্ব, শ্বশুর।

(খ) মাতুল, কর্তা, বিদ্বান, সখা।

(গ) ভিখারী, বাঘ, দৌহিত্র, গায়ক, নদী, বোষ্টম, ক্ষত্র।

(ঘ) কানা, মাসী, শূদ্র, নবাব।

(ঙ) পাচক, রজক, বৈশ্য, বিধাতা, রুদ্র।

৯। শূদ্রা ও শূদ্রানী, আচার্যা ও আচার্যানী—অর্থের পার্থক্য কি?

বচন ও পুরুষ

[বচন]

একটি সংখ্যা বুঝাইলে **একবচন** ও একাধিক সংখ্যা বুঝাইলে **বহুবচন** হয়। বাংলায় দ্বিবচন নাই। একবচনের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণতঃ বাংলায় কোন প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই। প্রসঙ্গ দেখিয়া নির্ণয় করিতে হয় পদটি একবচন না বহুবচন।

অনেক সময় টি, টা, খানি, খানা, গাছি, গাছা, ইত্যাদি নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করিয়া একবচনের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়। মেয়েটি, ছেলেটা, দড়িগাছি, ঝাঁটাগাছা, বইখানা, লাঠিখানি, মালাগাছি, ঘরখানি এইরকম ব্যবহার বাংলায় খুব প্রচলিত।

অনেক সময় আকারে একবচন হইলেও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে। যথা—বাগান ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। গাছে আম ধরিতেছে না। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরিতেছিল। আকাশের তারা কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে না।

বহুবচন প্রকাশ করিবার উপায় বাংলায় সাধারণতঃ এই কয়টি :—

(১) রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলিন, গুলান প্রভৃতি বহুবচনবোধক প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করিয়া। ছেলেরা, বালকেরা, কাকগুলি, টাকাগুলা, লোকগুলো প্রভৃতি।

(২) শব্দের শেষে **গণ, সকল, সব, সমূহ, বর্গ, মহল, বৃন্দ, কুল, মালা, গ্রাম, মণ্ডলী, নিচয়** যোগে :—শিশুগণ, লোকসকল, ভাইসব, গ্রামসমূহ, শিক্ষকবর্গ, লেখকমহল, ছাত্রবৃন্দ, বিহঙ্গকুল, তরঙ্গমালা, ইন্দ্রিয়গ্রাম, পণ্ডিতমণ্ডলী, নক্ষত্রনিচয়।

(৩) শব্দের পূর্বে **বহুবচনবোধক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া।** বহু লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, দুই কুড়ি কমলালেবু, একশত পদাতিক সৈন্য।

(৪) **একই বিশেষণ দুইবার ব্যবহার করিয়া।**

বড় বড় গাছ, পাকা পাকা আম, কাল কাল মেঘ।

(৫) **বিশেষ্য ও সর্বনামের দ্বিত্ব দ্বারাও** বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করার রীতি আছে। যেমন—**ঘরে ঘরে** সকলেই জ্বরে পড়িয়াছে। '**গ্রামে গ্রামে** সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'। 'পাগল হইয়া **বনে বনে** ফিরি কস্তুরী মৃগসম।' **যে যে** বেতন দিয়াছে তাহাদের স্কুলে আসিবার দরকার নাই।

[পুরুষ]

পুরুষ তিন প্রকার—**উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ** ও **প্রথম পুরুষ**। ক্রিয়ার যে বক্তা সে উত্তম পুরুষ ; আমি, আমরা উত্তম পুরুষ। ক্রিয়ার **সম্মুখবর্তী** শ্রোতা মধ্যম পুরুষ ; তুমি, তোমরা, তুই, তোরা মধ্যম পুরুষ। **আমি, তুমি** ভিন্ন সমস্তই প্রথম পুরুষ। অনুপস্থিত বা দূরবর্তী যাহাদের সম্বন্ধে ক্রিয়া কিছু বলে তাহা প্রথম পুরুষ।

সে, তিনি, ইনি, উনি প্রভৃতি সর্বনাম ও সমুদয় বিশেষ্যপদ প্রথম পুরুষ।

[কারক ও বিভক্তি]

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয় বা সম্বন্ধ থাকে তাহাকে কারক বলে। বাংলায় অনেক বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকে না। কিন্তু সেখানেও ব্যাকরণের খাতিরে একটি ক্রিয়াপদ কল্পনা করিয়া লওয়া হয়।—বলা হয় ক্রিয়াপদ **উহ্য আছে।** বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সহিত ক্রিয়ার ছয় প্রকার **সম্বন্ধ হইতে পারে।** এই সম্বন্ধ অনুসারে **ছয় প্রকার কারক** হইয়াছে এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে।

"গভীর বনে সুধীর বৃক্ষ হইতে স্বহস্তে ফল আহরণ করিয়া ভিক্ষুককে দিল।

এই বাক্যে 'দিল' ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যের অন্তর্গত অন্য অন্য পদের নানারূপ সম্বন্ধ আছে।

কে দিল?—সুধীর। এইখানে ক্রিয়ার সহিত কর্তৃ সম্বন্ধ। অতএব সুধীর **"কর্তৃকারক**। 'দিল' এই ক্রিয়ার কর্তা 'সুধীর'।

কি দিল?—ফল। এখানে ক্রিয়ার সহিত কর্ম সম্বন্ধ। সুতরাং 'ফল' **কর্মকারক**।

কিসের দ্বারা দিল?—স্বহস্তে। এখানে করণ সম্বন্ধ। সুতরাং 'স্বহস্তে' **করণকারক**।

কাহাকে দিল?—ভিক্ষুককে। এই পদের সহিত ক্রিয়ার সম্প্রদান সম্বন্ধ। অতএব 'ভিক্ষুককে' **সম্প্রদান কারক**।

কোথা হইতে দিয়াছিল?—বৃক্ষ হইতে। এখানে অপাদান সম্বন্ধ। অতএব 'বৃক্ষ হইতে' **অপাদান কারক**।

কোথায় দিল?—বনে। এইখানে অধিকরণ সম্বন্ধ। সুতরাং 'বনে' **অধিকরণ কারক**।

কারক ছয় প্রকার—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় না বলিয়া অর্থাৎ কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়া সম্বন্ধ পদে ক্রিয়া ভিন্ন অন্যান্য শব্দের সহিত বিশেষ্যের বা সর্বনামের সম্পর্ক থাকে। **সম্বন্ধ কারক নহে পদ।**

সম্বোধনও কারক নহে পদ। যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কাহাকেও সম্বোধন করা যায় তাহাকে সম্বোধন পদ বলা যায়।

যে সমস্ত চিহ্নের সংযোগে কারক নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে, সেগুলির নাম বিভক্তি। বাংলায় বিভক্তি দুই প্রকার—

১। **খাঁটি বিভক্তি**—কতকগুলি পদাংশ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া কারকের চিহ্ন হিসাবে কাজ করে। যেমন, **এ, কে, রে, তে** ইত্যাদি। এগুলির কোন স্বাধীন ব্যবহার বাংলায় নাই। পৃথক শব্দ হিসাবে এগুলির কোন অর্থও হয় না। বাংলায় খাঁটি বিভক্তি এইগুলি **এ, য়ে, য়, তে, এতে, কে, রে, এর** ইত্যাদি।

২। **বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত পরপদ**—কতকগুলি পদ বাংলা ভাষায় বিভক্তির কাজ করিয়া থাকে। **দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, উপরে, তবে** ইত্যাদি পরপদ বাংলা শব্দের পরে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এইগুলির স্বতন্ত্র ব্যবহার ভাষায় আছে, তবে বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া এগুলি কারক বিভক্তির কাজ করিয়া থাকে। বাংলা ভাষায় ইহাদের সংখ্যাই বেশী। সংস্কৃত ব্যাকরণের মত বাংলায় এত কারক বিভক্তি নাই, সেইজন্য বাংলা শব্দরূপে জটিলতা নাই বলিলেই চলে।

কারক ও বিভক্তির ব্যবহার

কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা **কর্তা**। কর্তৃকারকে **প্রথমা** বিভক্তি হয়। সাধারণতঃ এই বিভক্তির কোনো চিহ্ন থাকে না বলিয়া ইহাকে শূন্য বিভক্তিও বলা হয়। যথা—জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। 'মহাবীর শিখ এক পথ বহি যায়।' দিন যায়, সন্ধ্যা আসে।

কর্তৃকারকে অপরাপর বিভক্তির প্রয়োগ ঃ—

(ক) **দ্বিতীয়া**—কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কর্তায় দ্বিতীয়া, যথা—**তোমাকে** যাইতে হইবে। **আমাকে** এখন পড়িতে হইবে।

(খ) **তৃতীয়া**—কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া, যথা—**বিধর্মী কর্তৃক** মন্দির লুণ্ঠিত হয়।

(গ) **ষষ্ঠী**—কর্ম ও ভাববাচ্যে কর্তায় ষষ্ঠী, যথা—**তোমার** গান গাওয়া হইল না। **সুনীলের** না গেলেই নয়।

(ঘ) **সপ্তমী**—যেখানে কর্তা সুনির্দিষ্ট কাহাকেও বুঝায় না, প্রায় সেখানেই 'এ', 'য়', 'তে' ইত্যাদি ৭মী বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হইয়া কর্তায় সপ্তমী হয়। যথা—**লোকে** বলে। **চোরে** চুরি করে। **বাঘে বলদে** এক ঘাটে জল খায়। '**পাগলে** কিনা বলে, **ছাগলে** কিনা খায়।' '**দশে** মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' **গাঁয়ে** মানে না আপনি মোড়ল। '**বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?' **রাজায় রাজায়** যুদ্ধ করে।

সমধাতুজ কর্তৃপদের ব্যবহার—তোমার বড় বাড় বেড়েছে। কাল সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটেছিল। এবার তেমন ফল ফলিল না।

কর্মকারক

ক্রিয়াপদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের নাম কর্ম অর্থাৎ কর্তা যাহা করে, খায়, দেখে, তাহাই **কর্ম**। কর্মকারকে **দ্বিতীয়া** বিভক্তি হয়। **কে, রে, এ** ইত্যাদি দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। যথা—**মানুষকে** অবিশ্বাস করিও না রসাল কহিল উচ্চে **স্বর্ণলতিকারে**। ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ **দেশবাসিগণে**।

কর্মকারকে দ্বিতীয়া ভিন্ন অন্য বিভক্তির প্রয়োগ ঃ—

(ক) **প্রথমা**—কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা, যথা—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক **গীতাঞ্জলি** রচিত হইয়াছে।

[বহুক্ষেত্রে কর্মে ২য়া বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত থাকিয়া ১মার মত দেখায়, যেমন,—একটা **গল্প** বলুন। সে **গাড়ী** চালায়।]

(খ) **ষষ্ঠী—মানুষের** সেবা কর। **লক্ষ্মীর** পূজা কর।

(গ) **সপ্তমী—গুরুজনে** কর নতি। **তোমায়** আমি নিয়ে যাবো।

সমধাতুজ কর্মের (Cognate object) ব্যবহার ঃ—

মুখুজ্যে গিন্নী কি **মরণই** মরেছে! এমন **কান্না** কেউ কখনও কাঁদেনি। কুম্ভকর্ণ এমন ঘুম ঘুমিয়েছিল যে দুনিয়ার **বাজনা** বাজিয়েও তা ভাঙানো যায়নি।

করণকারক

যে উপায়ে বা যাহার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহা **করণ-কারক**। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—'**মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জন'। '**ফুলদল দিয়া** কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?' **তরবারি দ্বারা** আঘাত করিল। **তস্করকর্তৃক** গুপ্তধন অপহৃত হইল।

নানা অর্থে করণকারক ব্যবহৃত হয়। যথা—

১। **উপায়াত্মককরণ—সাধুতায়** সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত। **শ্রম দ্বারা** বিদ্যা অর্জন করিতে হয়।

২। **সাধন** বা **যন্ত্রাত্মক করণ—বৈঠা দিয়া** নৌকা যায়। **লাঠিতে** মাথা ফাটাইল।

৩। **হেতুময় করণ—অসৎ সঙ্গে** সর্বনাশ। **রাগে** শরীর জ্বলিয়া গেল।

৪। **লক্ষণাত্মক করণ—ছত্রের দ্বারা** ছাত্র চিহ্নিত হয়। **পৈতায়** বামুন চেনা যায়।

৫। **ক্রীড়ার্থক ও প্রহারার্থক করণ**—সারাদিন **তাস** (তাসের দ্বারা) খেলে। এমন নিমকহারামকে **ঝাঁটা** (দিয়া) মারিতে হয়।

৬। **কালাত্মক করণ—দুই মাসে** টাইপ শিখিতে পারিবে। **আধ ঘণ্টায়** এ প্রশ্নের উত্তর লেখা যায় না।

করণকারকে তৃতীয়া ভিন্ন অন্য বিভক্তির প্রয়োগ:—

(ক) **প্রথমা**—সে খুব ভাল **লাঠি** খেলিতে পারে।

(খ) **পঞ্চমী**—মূর্খ হইলেও **তোমা হইতে** কিঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

(গ) **সপ্তমী**—ভক্তের **সেবায়** ভগবান তুষ্ট হন। সে কোনো কথা **কানে** শোনে না।

সম্প্রদান কারক

যাহাকে কিছু দান করা যায় বা যাহার উদ্দেশ্যে কিছু বলা যায়, তাহাকে **সম্প্রদান কারক** বলে। সম্প্রদানে **চতুর্থী** বিভক্তি হয়। বাংলায় সম্প্রদান কারকের পৃথক কোন বিভক্তি-চিহ্ন নাই। কর্মকারকের **কে, রে, এ, য়** ইত্যাদি বিভক্তি-চিহ্নই সম্প্রদানে ব্যবহার করা হয়।

স্বত্বত্যাগপূর্বক দান হইলেই সম্প্রদান কারক হয়। যথা—**দরিদ্রকে** ধন দাও। **সৎপাত্রে** দান কর। কিন্তু, '**রজককে** বস্ত্র দাও', এখানে সম্প্রদান হইবে না।

সম্প্রদানে চতুর্থী ভিন্ন অন্য বিভক্তির প্রয়োগ

(ক) **ষষ্ঠী**—'**যার** জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর'।

'**কার** তরে তুই শয্যা দাসী রচিস আনন্দে'।

[এখানে যাহার **উদ্দেশে** কোনো কাজ হইতেছে, তাহার সম্প্রদান কারক হইয়াছে 'জন্যে' ও 'তরে' কথার সংযোগে।]

(খ) **সপ্তমী**—'গুরুদেব দয়া কর **দীনজনে**'। '**গৃহহীনে** গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে'। **আমায়** কিছু খেতে দেবে মা ?

অপাদান কারক

যেস্থান হইতে কোন ঘটনার আরম্ভ বা যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির উৎপত্তি, চলন, ভয়, উত্থান, পতন ইত্যাদি সংঘটিত হয়, তাহা **অপাদান কারক**। অপাদান কারকে **পঞ্চমী** বিভক্তি হয়। বাংলার অপাদান কারক বুঝাইবার জন্য কোন খাঁটি বিভক্তি-চিহ্ন নাই। 'হইতে', 'চেয়ে', 'কাছে', 'অপেক্ষা', 'থেকে', 'পর্যন্ত', 'অবধি' ইত্যাদি পরপদ সহযোগে অপাদান কারকের অর্থ বুঝান হইয়া থাকে। যথা :—তাহারা ঘর হইতে বাহির হইল; রাম অপেক্ষা শ্যাম বলবান। ধন থেকে মান বড়।

অপাদান কারকে পঞ্চমী ভিন্ন অন্য বিভক্তির প্রয়োগ :

(ক) **প্রথমা**—'সেই সুমধুর স্তব্ধ-দুপুর, **পাঠশালা** পলায়ন'। একবার **বিলেত** ঘুরে এলেই আর তোমায় পায় কে ?

(খ) **তৃতীয়া**—এখন যে **মুখ দিয়ে** খৈ ফুট্‌ছে ? **নাক** দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

(গ) **ষষ্ঠী**—**ভূতের** ভয় আমার নেই, কিন্তু **সাপের** ভয়, **বাঘের** ভয় আছে বৈ কি।

(ঘ) **সপ্তমী**—**মেঘে** জল হয়। '**বিপদে** মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা।' **চেষ্টায়** বিরত হইও না।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধার অর্থাৎ যেস্থানে বা যেকালে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম অধিকরণ। অধিকরণ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার :—

(ক) **স্থানাধিকরণ**—**বনে** বাঘ থাকে। বাংলা **দেশে** বাঙালী ভাত পায় না।

(খ) **কালাধিকরণ—শৈশবে** বিদ্যাভ্যাস, **যৌবনে** অর্থোপার্জন ও **বার্ধক্যে** ধর্মচর্চা করিবে। **'প্রভাতে** উঠিল রবি লোহিত বরণ।'

(গ) **বিষয়াধিকরণ—ধর্মে** মতি হউক। সে **সঙ্গীতে** পারদর্শী।

(ঘ) **ভাবাধিকরণ**—বড় **দুঃখে** পড়িয়া আমি আপনার শরণ লইয়াছি। **সূর্যোদয়ে** অন্ধকার ঘুচিল।

(ঙ) **ব্যাপ্তি অধিকরণ—তিলে** তৈল থাকে, **দুধে** ঘি থাকে।

অধিকরণ কারকে **সপ্তমী** বিভক্তি হয়। একবচনে এই বিভক্তির চিহ্ন **এ, য়, তে, এতে** ইত্যাদি। যথা—**'কাননে** কুসুমকলি সকলি ফুটিল।' রথের **মেলায়** অনেক লোক জড় হয়। **নদীতে** এখন জোয়ার আসিবে।

ইহা ছাড়া 'মধ্যে', 'উপরে' প্রভৃতি পরপদের সাহায্যেও অধিকরণ কারকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যথা—বাক্সটি **মাথার উপরে** তোল।

অনেক স্থলে অধিকরণে **কোন বিভক্তি থাকে না**। যথা—

আজ নগদ **কাল** ধার। আগামী **শনিবার** আমি কলিকাতা যাইব।

প্রত্যেক অর্থ বুঝাইলে অধিকরণ কারকে **দ্বিত্ব** হয়।

'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।'

এইরূপ, ডালে ডালে, বনে বনে, দ্বারে দ্বারে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ পদ

পূর্বে বলা হইয়াছে ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে, তাহা কারক। ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলে কারক-পদ হয় না। কারক নয় অথচ বিভক্তিযুক্ত এরূপ পদগুলির মধ্যে সম্বন্ধ পদই প্রধান। **র, এর** প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হইয়া অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

এই সম্বন্ধ অনেক প্রকারের হইতে পারে। কয়েকটি বিশেষ প্রকার নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) কর্তৃসম্বন্ধ—শিশুর শয়ন, ঘোড়ার দৌড়।

(২) কর্মসম্বন্ধ—রোগীর সেবা, দেবতার পূজা।

(৩) করণসম্বন্ধ—লাঠির আঘাত, মায়ার খেলা।

(৪) অপাদান সম্বন্ধ—ভূতের ভয়, গুরুর উপদেশ।

(৫) অধিকরণ সম্বন্ধ—আকাশের চাঁদ, বনের বাঘ।

(৬) জন্য-জনক সম্বন্ধ—রাজার ছেলে, গরীবের ঘর।

(৭) রূপক সম্বন্ধ—শোকের আগুন, অজ্ঞানের অন্ধকার।

(৮) বিশেষণ সম্বন্ধ—সুখের সংসার, দিনের উপার্জন।

[কারক বিভক্তি ও অন্যপ্রকার বিভক্তি]

বাংলায় যে-কোন কারকে যে-কোন বিভক্তি ব্যবহার করা হয়। যখন বলা হয় কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়, তখন তাহাতে এইটুকুই বুঝা যায় যে, ইহা মাত্র সাধারণ নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রমের সংখ্যা বিস্তর। আসলে বাংলার কোনও বিভক্তিই কোনও কারকের নিজস্ব নহে। এইজন্য প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা ব্যাকরণে অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

(যেখানে বিভক্তির কোনও চিহ্ন নাই অথচ ব্যাকরণ অনুসারে বিভক্তি কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহাকে শূন্য বিভক্তি বলে। আজকাল অনেক ব্যাকরণকার প্রথমা, দ্বিতীয়া বিভক্তি না বলিয়া 'এ' বিভক্তি, 'কে' বিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তির চিহ্ন অনুসারে নামকরণ করিয়া থাকেন।)

প্রথমা বিভক্তি—

(১) যেখানে কেবল নাম নির্দেশ করিবার জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেখানে সেই শব্দের প্রথমা বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়। যথা—মশা. বাবা, আকাশ, পৃথিবী, বালক, বালিকা ইত্যাদি।

(২) কর্তৃবাচ্যে কর্তায় সাধারণতঃ প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—সূর্য উঠিয়াছে। জল পড়িতেছে।

(৩) অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—রমেশ আসিলে গণেশ যাইবে।

(৪) 'বিনা', 'ব্যতীত', 'বলিয়া', 'নামে' প্রভৃতি অব্যয় যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—বিভাসিন্ধু বলিয়া একটি ছেলের সহিত আমি পড়িতাম। 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?' ডাক্তার ছাড়া এখন কে আর সাহায্য করিতে পারে ? ঔষধ ব্যতীত এ অসুখ ভাল হইবে না।

(৫) বাংলায় সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—বালকগণ, তোমরা স্থির হইয়া শোন। মেয়েরা, গোলমাল করিও না।

দ্বিতীয়া বিভক্তি—

(১) কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ব্যক্তিবাচক কর্ম হইলে 'কে' বিভক্তি বসে। অন্য অবস্থায় বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা—তুমি সুনীলকে ডাকিয়াছিলে কেন? শান্ত ছেলেকে সকলেই ভালবাসে।

(২) দ্বিকর্মক ক্রিয়ার গৌণকর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে) হয়। মুখ্যকর্মে বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা—মামাবাবু রমেশকে একখানি ছবির বই দিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও।

(৩) ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক ও স্থানবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। বিভক্তির অবশ্য কোন চিহ্ন থাকে না। যথা—পাঁচদিন কেবল বৃষ্টি হইতেছে। সম্রাট আকবর পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই পথটি সোজা পাঁচ ক্রোশ গিয়াছে।

(৪) ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা— সত্বর স্নান করিয়া এস। শীঘ্র চল। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে।

(৫) 'বিনা', 'ছাড়া', 'ভিন্ন', 'ধিক্', 'ধন্যবাদ' শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—কৃপণকে ধিক্, স্বজাতিদ্রোহীকে শতবার ধিক্। মাকে ছাড়া ছেলে একদণ্ড থাকিতে পারে না। তোমাকে ভিন্ন এ কথা কাউকেও বলি নাই। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, এবার বাঁচিয়া গিয়াছি।

তৃতীয়া বিভক্তি—

(১) করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—আমরা কান দিয়া শুনি চোখ দিয়া দেখি। নূতন কলম দিয়া তাড়াতাড়ি লেখা যায় না।

(২) কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—দস্যু কর্তৃক পথিক নিহত হইয়াছে। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র তিরস্কৃত হইয়াছিল।

(৩) হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—সে রাগে কাঁপিতে লাগিল। আতঙ্কে তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে। তাহারা আনন্দে নাচিতেছিল।

(৪) হীনার্থ ও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—মধু অপেক্ষা যদু বুদ্ধিতে হীন। কলহে প্রয়োজন নাই। আমাদের অসার জীবনে কি প্রয়োজন?

(৫) ক্রিয়া-বিশেষণে অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। যথা—মন দিয়া পড়াশুনা কর। জোরে চলিতে আরম্ভ কর। সে প্রাণ দিয়া দেশের কাজে লাগিয়া গেল।

চতুর্থী বিভক্তি—

সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

বাংলায় দ্বিতীয়া বিভক্তি ও চতুর্থী বিভক্তির একই চিহ্ন। যথা—ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। তোমাকে আমি সর্বস্ব সমর্পণ করিব।

পঞ্চমী বিভক্তি—

(১) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—গাছ হইতে ফুল পড়িতেছে। তিল হইতে তৈল হয়। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়।

(২) দুই বা বহুর মধ্যে একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইবার জন্য পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহার হয়। যথা—ধন হইতে মান বড়। জন্মভূমি স্বর্গ হইতে বড়। রূপ হইতে গুণ বড।

(৩) 'নিকট' ও 'দূর' শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—আমার বাড়ী কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নয়। তোমাদের বাসা কি রসা রোড হইতে নিকটে?

(৪) হেতু বা কারণ অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—অজীর্ণ হইতে অনেক রোগের সূত্রপাত হয়। এই ছেলে হইতে তোমার কষ্ট দূর হইবে।

(৫) 'পৃথক' ও 'ভিন্ন' শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—আমা হইতে তোমাকে ভিন্ন ভাবিতেছ কেন? পাকিস্তান ভারত হইতে পৃথক।

ষষ্ঠী বিভক্তি—

(১) সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—আমার বাড়ী। তোমার বই। দেশের স্বার্থ।

(২) 'তুল্য' 'সদৃশ' শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—কর্ণের তুল্য দাতা নাই। দয়ার মতন (সমান, তুল্য) ধর্ম নাই। গঙ্গার তুল্য নদী নাই। হিমালয়ের সদৃশ পর্বত নাই।

(৩) নির্ধারণে অর্থাৎ অনেকের মধ্যে একটি বুঝাইলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

যথা—লেখাপড়া শিখ, দশজনের একজন হও। তোমাদের মধ্যে কে বেশী বুদ্ধিমান?

(৪) 'মধ্যে', 'সমীপে', 'উপরে', 'নীচে', 'সম্মুখে', 'পিছনে' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—এই কবিতার মধ্যে বিশেষ বুঝাইবার কিছুই নাই। বিদ্যালয়ের সমীপেই একটি মন্দির। 'মাথার উপরে বাড়ী পড়-পড়।' 'মায়ের কাছে মামারবাড়ীর গল্প।' বাঁধের নীচেই গ্রামের শ্মশান। তাহার মুখের সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? সুখের পিছনে ছুটিলেই কি সুখ পাওয়া যায়?

সপ্তমী বিভক্তি—

(১) অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—আমরা গ্রামে বাস করি। জলে মাছ থাকে। দিনে বড়ই গরম।

(২) 'বিনা' ও 'ধিক্' শব্দ যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—বিনা টাকায় কি আর হইতে পারে? তোমার অহঙ্কারে ধিক্!

(৩) হেতু ও নিমিত্ত বুঝাইলে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—তিনি রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। লজ্জায় যে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

(৪) 'প্রয়োজন' অর্থ বুঝাইলে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—আমার মত হতভাগার জীবনের প্রয়োজন কি? আর বিবাদে কাজ নাই, এখন ক্ষান্ত দাও।

(৫) 'পরস্পর' অর্থ বুঝাইলে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া চলিতেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

(৬) 'সাধু', 'নিপুণ', 'পণ্ডিত', 'প্রবীণ', 'কুশল' প্রভৃতি শব্দ যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—তিনি তর্কে খুব নিপুণ। অঙ্কে তাঁর মত পণ্ডিত খুব কম দেখা যায়। ভূতনাথ বাবু বয়সে প্রবীণ, ব্যবহারে সাধু, সকলেই তাঁহাকে মান্য করে।

[অনুসর্গ]

বাংলায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা বিশেষ্য পদের পরে ব্যবহৃত হইয়া সেই পদকে এক একটি কারকের আসনে বসাইয়া থাকে। এই পদগুলির একটা নিজস্ব অর্থ থাকায় ইহাদের বিভক্তি হইতে পৃথক করিয়া নাম

দেওয়া হইয়াছে **অনুসর্গ**। সংস্কৃত **'কর্মপ্রবচনীয়'**র সহিত অভিন্ন না হইলেও ইহার একটা সাদৃশ্য আছে। **কতিপয় অনুসর্গের ব্যবহার—**

দিয়ে—মুখ দিয়ে খৈ ফুটতে লাগল।

চেয়ে—প্রাণের চেয়ে মান বড়।

সুখের চেয়ে শান্তি ভাল।

ছাড়া—বাড়ী ছাড়া থাকবে কোথায়?

মা ছাড়া শিশু কি বাঁচবে?

থেকে—গাছ থেকে যে বেলটি পড়ল. সেটি তুলে আন।

অবধি—সেই দিন অবধি আমরা দিন গণিতেছিলাম।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ দাও :—

কর্তায় 'কে' বিভক্তি; করণে 'হইতে' বিভক্তি বা পরপদ; অপাদানে 'এ' বিভক্তি; অধিকরণে বিভক্তির লোপ।

২। বাংলায় ব্যবহৃত বিভক্তি-চিহ্নগুলির নাম লিখ। কোন্ বিভক্তিতে কোন্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় লিখ।

৩। বড় অক্ষরের পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) সারা **দিন** বৃষ্টি পড়িতেছে।

(খ) **দিন** গেল, সন্ধ্যা এল।

(গ) **মায়ে ঝিয়ে** ঝগড়া করিতেছে।

(ঘ) **তোমার** এখন না গেলেই নয়?

(ঙ) তাহার **মুখ দিয়া** খৈ ফুটিতে লাগিল।

(চ) **মেঘে** বৃষ্টি হয়।

(ছ) 'তিল হইতে তৈল হয় **দুধে** হয় দৈ।

ধানেতে তৈয়ারী হয় মুড়ী চিড়া খৈ।'

৪। বাংলায় 'এ, বিভক্তিটি সকল কারকেই ব্যবহৃত হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর :—

কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি—**বাঘে বলদে** এক ঘাটে জল খায়।

কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি—**অন্ধজনে** দয়া কর।
করণকারকে 'এ' বিভক্তি—**অতি লোভে** তাঁতী নষ্ট।
সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি—'**ঈশ্বরে** অর্পিত মোর সর্বদেহমন।'
অপাদানে 'এ' বিভক্তি—**মেঘে** জল হয়।
অধিকরণে 'এ' বিভক্তি—এই **গ্রামে** নদী নাই।

৫। বিভক্তি-চিহ্ন বসে নাই এমন কোন কারকের উদাহরণ দিতে পার ?

উত্তর :—প্রায় সমস্ত কারকেই বিভক্তি-চিহ্ন না বসিতে পারে।
কর্তা—চাঁদ উঠিয়াছে।
কর্ম—আমি ভাত খাইব।
করণ—তাহারা এখন তাস খেলিবে।
অপাদান—স্কুল পালিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?
অধিকরণ—এ বৎসর ভাল ধান হয় নাই।

৬। অধিকরণ কারক কয় প্রকার ? উদাহরণ দাও।

৭। ধিক্, বিনা, সঙ্গে, তুল্য, উপরে, নীচে—এই কয়টি শব্দের যোগে যে যে বিভক্তি হয় তাহা বাক্য রচনা করিয়া দেখাও।

৮। বড় অক্ষরে লিখিত পদগুলিতে কোন্ বিভক্তি এবং কেন বসিয়াছে বল :—

(১) **লোভে** পাপ, **পাপে** মৃত্যু। (২) এত বড় **বিপদে** আমাকে রক্ষা করিবে না ? (৩) তুমি আমার **প্রাণের** বন্ধু। (৪) মেঘদূত **কাহার** রচিত ? (৫) **আমা** হতে এ কার্য হবে না। (৬) নদীতে বড় **কুমীরের** ভয়।

অন্য পদের কোন গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য যে পদ ব্যবহার করা হয় তাহার নাম **বিশেষণ**।

[বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ]

বিশেষণপদ প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা—[১] **বিশেষ্যের বিশেষণ,** [২] **বিশেষণের বিশেষণ** ও [৩] **ক্রিয়া-বিশেষণ**।

[১] বিশেষ্যের বিশেষণ

যে পদটি বিশেষ্যের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে **বিশেষ্যের বিশেষণ** বলে। যথা—**শীতল** বাতাস বহিতেছে। **নিন্দিত**

আচরণ কখনও করিও না। **তিনটি** আম কুড়াইয়া পাইয়াছি। **লঘু** আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

বিশেষ্যের বিশেষণকে কতিপয় শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ; যথা—

(ক) **সংজ্ঞাবাচক** বিশেষণ—**কাশীদাসী** মহাভারত, **বাঙালী** আদর্শ।

(খ) **গুণবাচক** বিশেষণ—**ধার্মিক** লোক, **গেঁয়ো** মানুষ, **শহুরে** ছেলে, **লক্ষ্মী** মেয়ে।

(গ) **সংখ্যা বা পরিমাণ বাচক** বিশেষণ—**পাঁচ** মাস, **ষোল** বছর, **দুই বিঘা** জমি, **এক পো** দুধ।

(ঘ) **পূরণ** বা **ক্রমবাচক** বিশেষণ—**পঞ্চম** মাস, **ষোড়শ** বৎসর, **দ্বিতীয়** দফায়, **পাঁচই** আষাঢ়।

(ঙ) **উপাদান বাচক** বিশেষণ—**মেটে** কলসী, **মৃন্ময়ী** প্রতিমা, **বেলে** পাথর, **কেঠো** ঘর।

(চ) **সর্বনামীয়** বিশেষণ—**সেই** লোকটি, **অপর** ব্যক্তি, **সকল** মানুষ।

(ছ) **একপদীয়** বিশেষণ—**নিন্দুক** মানুষ, **বয়াটে** ছেলে, **অনাবশ্যক** ধাপ।

(জ) **বহুপদীয়** বিশেষণ—'**সেই সর্বনাশা পল্লীত্রাস বিশ্বনিন্দুক** মানুষটি', '**উনপাঁজুরে বরাখুরে হাফ্‌শহুরে বয়াটে** ছেলে', '**এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক** বাপ।'

(ঝ) **যৌগিক** বিশেষণ—(সমাস-নিষ্পন্ন বিশেষণপদ)—**স্বর্ণকান্তি** বপু, **হাতে-কাটা** পৈতা, **নাতিশীতোষ্ণ** মণ্ডল, **দ্বিরদ-রদ-নির্মিত** সিংহাসন, **তুষারধবল** মূর্তি।

(ঞ) **কৃদন্ত** বিশেষণ—(কৃৎ প্রত্যয়যুক্ত পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত) **পড়ন্ত** রোদ, **চলন্ত** গাড়ী, **উঠ্‌তি** বয়েস, **দাতব্য** চিকিৎসালয়, **মুক্ত** বেণী, **কর্তব্য** পথ।

(ট) **তদ্ধিতান্ত** বিশেষণ—(তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্তপদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত) —**ভক্তিমান** ছাত্র, **গুণবান** পুরুষ, **পাটনাই** ছাগল, **ঘরোয়া** আলাপ, **ঘুষখোর** পেয়াদা।

(ঠ) **বিভক্তিযুক্ত** বিশেষণ—**সোনার** আংটী, **বেতের** ছড়ি, **দেশের** মাটি, **ঘরের** ছেলে।

(ভ) **উপসর্গযুক্ত** বিশেষণ—**প্রণতা** ছাত্রী, **অপহৃত** দ্রব্য, **বিস্মৃত** প্রতিশ্রুতি, **বেসুরো** গান, **নিলাজ** কানাই।

(চ) **বিধেয় বিশেষণ**—[অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষণপদ বিশেষ্যের আগে না বসিয়া পরে অর্থাৎ উদ্দেশ্য-অংশে না বসিয়া বিধেয় অংশে বসিয়া থাকে] আমি **মুর্খ**, তাই তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম ; তিনি পরম **দয়ালু**।

[২] বিশেষণের বিশেষণ

যে পদ বিশেষণকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করে তাহাকে **বিশেষণের বিশেষণ** বলে। যথা—অঙ্কটি **অত্যন্ত** কঠিন ; রোগ **বড়ই** জটিল ; আমরা **নেহাৎ** গরীব ; **অতি নিখুঁত** সুন্দর ছবি ; **অতি সাংঘাতিক** হিংসুটে মানুষ।

[৩] ক্রিয়া-বিশেষণ

যে পদ ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা বা প্রকৃতির কোনো নির্দেশ দেয়, তাহাকে **ক্রিয়া-বিশেষণ** বলে ;

নানা উপায়ে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠিত হইয়া থাকে। যথা—(ক) **বিভক্তি-হীন পদের** প্রয়োগে—**দ্রুত** পলায়ন কর। **শীঘ্র** এস। **খামকা** লোকটাকে অপমান করিলে কেন ?

(খ) **এ**-বিভক্তি যোগে—**বেগে** ধায় তরী। 'উলঙ্গিয়া অসি **ভৈরবে**।' **'ধীরে** বহে ডন।' 'যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ **নীরবে'**।

(গ) **করিয়া** যোগে—শন্‌শন্ **করিয়া** ; হো হো **করিয়া** ; দয়া **করিয়া** ; মিট্‌মিট্ **করিয়া**।

(ঘ) **পূর্বক, পুরঃসর, সহিত,** প্রভৃতিযোগে—অনুগ্রহ**পূর্বক,** সম্মান **পুরঃসর,** যত্নের **সহিত,** পাত্রমিত্র **সমভিব্যাহারে**।

(ঙ) **মাত্র** যোগে—তাহাকে **দেখিবামাত্র** আমার গা জ্বলিয়া উঠিল। মহাপ্রসাদ **প্রাপ্তিমাত্র** মুখে দিবে। সেই কথা **শুনিবামাত্র** মেঘনাদ ফুলের মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

(চ) **অগত্যা, আচমকা, বারংবার, অকস্মাৎ, তৎক্ষণাৎ, যাবৎ** প্রভৃতিযোগে—**অগত্যা** তোমার কথায় রাজী হইলাম। **আচমকা** ঘাড়ের

উপর লাফাইয়া পড়িল। 'পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তাহার **বারংবার**'। **অকস্মাৎ** দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। **তৎক্ষণাৎ** ব্যাঘ্রটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কয়েকদিন **যাবৎ** নিরন্তর বৃষ্টি হইতেছে। **আজকাল** তোমার ভাব যেন ভাল দেখছি না।

(ছ) **শব্দ-দ্বিত্ব** যোগে—**ঘনঘন** হাই উঠিতেছে কেন? **ক্রমে ক্রমে** সবই বুঝিতে পারিবে। 'অত **চুপিচুপি** কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ!' '**শুনিতে শুনিতে** তনু অবশ হইল গো।'

(জ) বস্তুতঃ, ন্যায়তঃ, বিশেষতঃ, অন্যথা, সর্বথা, বহুধা, শতধা, মাতৃবৎ, পুত্রবৎ, কুত্রাপি, সর্বত্র প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষণপদের ব্যবহারও বিশেষ প্রচলিত।

[বিশেষণের তারতম্য]

উপকর্ষ, অপকর্ষ, অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে তুলনা বুঝাইবার জন্য 'তর' এবং বহুর মধ্যে তুলনা বুঝাইবার জন্য 'তম' যুক্ত পদের ব্যবহার সংস্কৃতে আছে। **'তর তমের ভাব'কেই বলে তারতম্য।**

তর, তম সংস্কৃত শব্দেই যুক্ত হয়। বাংলা অসংস্কৃত শব্দে 'তর', 'তম' যোগ হয় না। খাঁটি বাংলায় তুলনা বুঝাইবার জন্য **থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা** প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়।

যদু **অপেক্ষা** মধু বুদ্ধিমান।
মায়ের **চেয়ে** মাসীর দরদ বেশী।

সংস্কৃতে 'তর', 'তম' এবং 'ঈয়স্' ও 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগ করিবার রীতি আছে। বাংলা ভাষায় এই সমস্ত প্রত্যয়ান্ত পদ ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া কতকগুলি শব্দ বাংলাভাষা-শিক্ষার্থীর পক্ষে জানিয়া রাখা উচিত।

বিশেষণ	তর-যোগ	তম-যোগ
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
দ্রুত	দ্রুততর	দ্রুততম
গুরু	গুরুতর	গুরুতম
ক্ষিপ্র	ক্ষিপ্রতর	ক্ষিপ্রতম

বিশেষণ	তর-যোগ	তম-যোগ
তিক্ত	তিক্ততর	তিক্ততম
প্রিয়	প্রিয়তর	প্রিয়তম
বলবান	বলবত্তর	বলবত্তম
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তর	বুদ্ধিমত্তম
	ঈয়স্-যোগে	**ইষ্ঠ-যোগে**
মহৎ	মহীয়ান্ (স্ত্রী-মহীয়সী)	মহিষ্ঠ
প্রিয়	প্রেয়ান্ (স্ত্রী-প্রেয়সী)	প্রেষ্ঠ
লঘু	লঘীয়ান্ (স্ত্রী-লঘীয়সী)	লঘিষ্ঠ
বহু	ভূয়ান্ (স্ত্রী-ভূয়সী)	ভূয়িষ্ঠ
গুরু	গরীয়ান্ (স্ত্রী-গরীয়সী)	গরিষ্ঠ
উরু	বরীয়ান্ (স্ত্রী-বরীয়সী)	বরিষ্ঠ
বলী	বলীয়ান্ (স্ত্রী-বলীয়সী)	বলিষ্ঠ
যুবা	কনীয়ান্ (স্ত্রী-কনীয়সী)	কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়ান্ (স্ত্রী-বর্ষীয়সী)	বর্ষিষ্ঠ
	জ্যায়ান্ (স্ত্রী-জ্যায়সী)	জ্যেষ্ঠ
দীর্ঘ	দ্রাঘিয়ান্	দ্রাঘিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান্, অল্পীয়ান্	কনিষ্ঠ, অল্পিষ্ঠ
পাপী	পাপীয়ান্ (স্ত্রী-পাপীয়সী)	পাপিষ্ঠ
প্রশস্য	শ্রেয়ান্	শ্রেষ্ঠ

অনুশীলনী

১। বিশেষণ পদ কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। উদাহরণ দাও:—উপাদানবাচক বিশেষণ, সংখ্যা ও পূরণবাচক বিশেষণ, কৃদন্ত বিশেষণ, বহুপদীয় বিশেষণ, তদ্ধিতান্ত বিশেষণ, স্থানীয় বিশেষণ (S. F. 1956)

৩। বিধেয় বিশেষণ কাহাকে বলে? তিনটি দৃষ্টান্ত দাও।

৪। তুলনা বা তারতম্য বুঝাইবার জন্য তৎসম শব্দের বিশেষণে কি বিভক্তি যোগ করা হয় উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৫। 'সব-পেয়েছির আসরে সেদিন মজার মজার কথা বললেন স্বপনবুড়ো, এ যুগের চিরতরুণ চির নবীনের মনের মতো মানুষ।'—এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত বিশেষণপদগুলি বাহির করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও।

৬। তারতম্যসূত্রে অপরাপর রূপগুলি দেখাও :—

শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, প্রিয়, লঘু, দীর্ঘ, বহু, পাপী।

সর্বনামের প্রকার-ভেদ

যে সকল শব্দ বিশেষ্য বা নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে **সর্বনাম** বলে।

মহিম খুব ভাল ছেলে, মহিমের পিতামাতা মহিমকে যাহা করিতে বলেন মহিম তাহাই করে। মহিম খুব মন দিয়া পড়াশুনা করে। এইজন্য মহিমকে সকলেই ভালবাসে।

এই বাক্যে 'মহিম' শব্দটি এতবার ব্যবহার করা হইয়াছে যে, ইহা শুনিতে ভাল লাগে না।

মহিম খুব ভাল ছেলে, **তাহার** পিতামাতা **তাহাকে** যাহা করিতে বলেন **সে** তাহা করে। **সে** খুব মন দিয়া পড়াশুনা করে, এইজন্য **তাহাকে** সকলেই ভালবাসে।

বাক্যটি এইভাবে লিখিলে শুনিতে ভাল লাগে। এই দ্বিতীয় বাক্যটিতে তাহার, তাহাকে, সে, সে, তাহাকে এই শব্দগুলি যথাক্রমে 'মহিমের', 'মহিমকে', 'মহিম', 'মহিম', 'মহিমকে', এই বিশেষ্যপদ কয়টির পরিবর্তে বসিয়াছে। সর্বনাম পদের ব্যবহার করিয়া একই বিশেষ্যপদের ব্যবহার প্রয়োগ নিবারণ করা হয়।

সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ :

১। **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম**—আমি, তুমি, সে, ইনি, তিনি প্রভৃতি ব্যক্তি বা পুরুষকে বুঝায় বলিয়া এইগুলিকে ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক **সর্বনাম** বলে।

তিনি, তাঁহারা, ইঁহারা, এঁদের প্রভৃতি গৌরব বা সম্ভ্রম সূচনা করে। তুই, মুই, তোর প্রভৃতি দীনতা, তাচ্ছিল্য বা স্নেহ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। **নির্দেশক সর্বনাম**—ইহা, উহা, কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে বুঝায়; সে, ইনি, উনি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। এইগুলিকে নির্দেশক সর্বনাম বলা হয়।

ইহা, ইনি দ্বারা নিকটস্থিত ব্যক্তি ও বস্তু বুঝায়—এইজন্য ইহাদিগকে নৈকট্যবাচক নির্দেশক সর্বনাম বলা হয় এবং উহা, উনি দ্বারা নিকটে অবস্থিত নয়, দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায় বলিয়া ইহাদিগকে দূরত্ববোধক নির্দেশক সর্বনাম বলা হয়।

৩। **অনির্দেশক সর্বনাম**—কে, কাহারা, কিছু, পরে, অন্যে প্রভৃতি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় না বলিয়া এইগুলিকে অনির্দেশক সর্বনাম বলে।

৪। **প্রশ্নসূচক সর্বনাম**—কে, কি প্রভৃতি সর্বনাম কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রশ্নসূচক সর্বনাম বলে।

৫। **নিত্যসম্বন্ধী সর্বনাম**—'যে—সে', 'যিনি—তিনি,' 'যাহাদের—তাহাদের' প্রভৃতি জোড়া শব্দ একই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের একটিকে ব্যবহার করিলে আর একটি আপনা হইতেই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া এইগুলিকে নিত্যসম্বন্ধী সর্বনাম বলে।

৬। **পরিমাণবাচক সর্বনাম**—এত, তত, যত, কত, এইগুলি বস্তুর পরিমাণ বুঝায় বলিয়া এইগুলিকে পরিমাণবাচক সর্বনাম বলে।

৭। **আত্মবাচক সর্বনাম**—নিজে, আপনি, স্বয়ং প্রভৃতি আত্মবাচক সর্বনাম।

সর্বনাম শব্দগুলির ব্যবহারিক রূপ মনে রাখা প্রয়োজন।

আমি

কর্তা—১মা	আমি	আমরা
কর্ম—২য়া	আমাকে	আমাদিগকে, আমাদের
করণ—৩য়া	আমা দ্বারা	আমাদের দ্বারা

সম্প্রদান—৪র্থী	আমাকে	আমাদিগকে, আমাদের
অপাদান—৫মী	আমা হইতে	আমাদের হইতে
সম্বন্ধ—৬ষ্ঠী	আমার	আমাদের, আমাদিগের
অধিকরণ—৭মী	আমাতে	আমাদিগেতে

তুমি

কর্তা—১মা	তুমি	তোমরা
কর্ম—২য়া	তোমাকে	তোমাদিগকে, তোমাদের
করণ—৩য়া	তোমাদ্বারা	তোমাদের দ্বারা
সম্প্রদান—৪র্থী	তোমাকে	তোমাদিগকে, তোমাদের
অপাদান—৫মী	তোমা হইতে	তোমাদের হইতে
সম্বন্ধ—৬ষ্ঠী	তোমার	তোমাদের, তোমাদিগের
অধিকরণ—৭মী	তোমাতে	তোমাদিগেতে

তুই

কর্তা—১মা	তুই	তোরা
কর্ম—২য়া	তোকে	তোদিকে, তোদের
করণ—৩য়া	তোর দ্বারা	তোদের দ্বারা
সম্প্রদান—৪র্থী	তোকে	তোদিকে, তোদের
অপাদান—৫মী	তোর থেকে	তোদের থেকে
সম্বন্ধ—৬ষ্ঠী	তোর	তোদের
অধিকরণ—৭মী	তো'তে	তো'দিগেতে

আপনি

কর্তা—১মা	আপনি	আপনারা
কর্ম—২য়া	আপনাকে	আপনাদিগকে, আপনাদের
করণ—৩য়া	আপনার দ্বারা	আপনাদের দ্বারা
সম্প্রদান—৪র্থী	আপনাকে	আপনাদিগকে, আপনাদের
অপাদান—৫মী	আপনা হইতে	আপনাদিগ হইতে
সম্বন্ধ—৬ষ্ঠী	আপনার	আপনাদের, আপনাদিগের
অধিকরণ—৭মী	আপনাতে	আপনাদিগেতে

সে, তিনি

কর্তা—১মা	সে, তিনি	তাহারা, তাঁহারা, তা'রা, তাঁ'রা
কর্ম—২য়া	তাহাকে, তাঁহাকে, তা'কে, তাঁ'কে	তাহাদিগকে, তাঁহাদিগকে তা'দিগকে, তাঁ'দিগকে, তাদের, তাঁদের
করণ—৩য়া	তাহার, তাঁহার, তার বা তাঁর দ্বারা	তাহাদের, তাঁহাদের, তাদের বা তাঁদের দ্বারা
সম্প্রদান—৪র্থী	দ্বিতীয়ার অনুরূপ	
অপাদান—৫মী	তাহা হইতে, তাঁহা হইতে তা'র থেকে, তাঁর থেকে	তাহাদের হইতে, তাঁহাদের হইতে, তাদের থেকে, তাঁদের থেকে
সম্বন্ধ—৬ষ্ঠী	তাহার, তাঁহার, তার বা তাঁর	তাহাদের, তাঁহাদের, তাদের, তাঁদের
অধিকরণ—৭মী	তাহাতে, তাঁহাতে তা'তে, তাঁ'তে	তাহাদিগেতে, তাঁহাদিগেতে তা'দিগেতে, তাঁদিগেতে

এ, ইনি

কর্তা—১মা	এ, ইনি	ইহারা, এরা, ইঁহারা, এঁরা
কর্ম—২য়া	ইহাকে, ইঁহাকে একে, এঁকে	ইহাদিগকে, ইঁহাদিগকে এদিকে, এঁদিকে, এদের, এঁদের
করণ—৩য়া	ইহার দ্বারা, ইঁহা দ্বারা এর দ্বারা, এঁর দ্বারা	ইহাদের দ্বারা, ইঁহাদের দ্বারা এদের দ্বারা, এঁদের দ্বারা
সম্প্রদান—৪র্থী	দ্বিতীয়ার অনুরূপ	
অপাদান—৫মী	ইহা হইতে, ইঁহা হইতে, এর থেকে, এঁর থেকে	ইহাদের হইতে, ইঁহাদের হইতে, এদের থেকে, এঁদের থেকে
সম্বন্ধ—৬ষ্ঠী	এর, ইহার এঁর, ইঁহার	এদের, ইহাদিগের এঁদের, ইঁহাদের

	একবচন	বহুবচন
অধিকরণ—৭মী	ইহাতে, ইঁহাতে এতে, এঁতে	ইহাদিগেতে, ইঁহাদিগেতে এদের মধ্যে, এঁদের মধ্যে

যে, কে, যিনি প্রভৃতির এই প্রকার রূপ হইবে।

ক্রিয়া

যে পদ দ্বারা কোন কার্য করা বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়াপদ** বলে।

সে পড়িতেছে। আমি যাইব। তাহারা স্কুলে গিয়াছে। তুমি এখন ভাত খাও।—এই বাক্যগুলিতে পড়িতেছে, যাইব, গিয়াছে, খাও ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করিলে যে মৌলিক অংশ পাওয়া যায়, যাহার আর ভাগ চলে না, তাহাকে **ধাতু** বলে। এই ধাতুর সহিত প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

মৌলিক ধাতু

বাংলায় সিদ্ধ ও সাধিত এই দুই ভাগে ধাতুসমূহকে ভাগ করা হইয়াছে। যে সমস্ত ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, যেগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, সেইগুলি **মৌলিক ধাতু** বা **সিদ্ধ ধাতু**।

চল্, নে, খা, কর্, যা এইগুলি **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু**।

যে সমস্ত ধাতু বিশ্লেষণ করিলে অন্য একটি ধাতু এবং প্রত্যয় পাওয়া যায় সেগুলির নাম **সাধিত ধাতু**। যেমন—কর্ + আ = করা ; খেল্ + আ = খেলা ইত্যাদি। সাধিত ধাতুর মধ্যে প্রযোজক ও নামধাতু প্রধান।

প্রযোজক ধাতু

ছেলেকে কাঁদাইতেছ কেন? তোমাকে সত্য কথা বলাইব।

এখানে 'কাঁদাইতেছে' ও 'বলাইব' **প্রযোজক ধাতু** এবং সাধিত ধাতু। এইরূপ, পড়া—পড়ানো, নাচা—নাচানো প্রভৃতি একই ক্রিয়ার যে দুইরকম রূপ হয়, তাহার একটি, অর্থাৎ পড়া, নাচা ইত্যাদি হইল সাধারণ ক্রিয়া, আর একটি, অর্থাৎ পড়ানো, নাচানো ইত্যাদি হইল প্রযোজক ক্রিয়া।

নামধাতু

যেখানে ক্রিয়াপদের প্রথমাংশে পাওয়া যায় কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণ

পদ, আর শেষাংশে পাওয়া যায় ক্রিয়ার রূপ, সেখানেই রচিত হয় নামধাতু। যথা—

(১) বিশেষ্য হইতে—জুতাইল (জুতা), ঘামিল (ঘাম), মঞ্জরিছে (মঞ্জরী), ফেনাইল (ফেনা) ইত্যাদি।

(২) বিশেষণ হইতে—উলঙ্গিলা (উলঙ্গ), নীরবিলা (নীরব), রাঙাইয়া (রাঙা), পাকানো (পাকা) ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যায়, বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে কোনো-না-কোনো প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু গঠিত হয়।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু

যে ক্রিয়াপদের মধ্যে ক্রিয়াজনিত বিশেষ ধ্বনিটি কানে আসিয়া বাজে তাহাতেই ধ্বন্যাত্মক ধাতুর উদাহরণ মিলে। যথা—জলটা **টগবগিয়ে** উঠেছে, **গুন্‌গুনিয়ে** যায় যে ভ্রমর, **ঝনঝনিয়ে** বাজলো যত রিপু-প্রহরণ।

সংযোগমূলক ধাতু

সিদ্ধ ও সাধিত দুই প্রকার ধাতু ছাড়া বাংলায় কর্‌ বা হ্‌ এই দুইটি ধাতুর সংযোগে অনেক ধাতু গঠিত হয়। ইহাকে **সংযোগ-মূলক ধাতু** বলে।

রাজী হয়, অগ্রসর হয়, গমন করা, শয়ন করা, সুখী করা, দুঃখী করা, মিন্‌ মিন্‌ করা প্রভৃতি সংযোগ-মূলক ধাতু।

[সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া]

ক্রিয়া দুই প্রকার, সমাপিকা ও অসমাপিকা।

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে বুঝা যায়, অর্থাৎ যাহার পর আর কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যথা—

সূর্য উঠিয়াছে। ভোর হইয়াছে। কাক ডাকিতেছে।

এই বাক্যগুলির ক্রিয়াপদ সমাপিকা।

যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় না, আরও কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যথা—সে না খাইয়া স্কুলে গিয়াছে।

'সে না খাইয়া' পর্যন্ত বলিয়া যদি আর কিছু বলা না হয়, তাহা হইলে

বাক্য সমাপ্ত হইবে না এবং আরও কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। 'খাইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া।

'ইতে', 'ইয়া', 'ইলে', অসমাপিকা ক্রিয়ার চিহ্ন। যেমন—খাইতে বসিয়া আর লজ্জা করিয়া লাভ কি? আমি স্নান করিয়া ভাত খাইব। ভোর হইলে সে রওনা হইবে।

[সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক ক্রিয়া]

গাছ হইতে ফুল পড়িতেছে। গরুগুলি ছুটিতেছে। তুমি চটিতেছ কেন? সূর্য উঠিয়াছে। এই বাক্যগুলিতে পড়া, ছুটা, চটা, উঠা এই ধাতুগুলির কার্য কর্তাতেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইখানে কোনও কর্মপদের আকাঙ্ক্ষা নাই।

যে সকল ক্রিয়ার কোনও কর্ম নাই, তাহারা **অকর্মক ক্রিয়া।** অকর্মক ক্রিয়ার বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার জন্য কর্মপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

কাঁদা, হাসা, উঠা, বসা, নাচা, ডুবা, ভাসা, শোওয়া, দৌড়ান, ঘুমান, প্রভৃতি অকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়াপদের কর্ম থাকে, তাহা **সকর্মক ক্রিয়া।** বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে যেখানে ক্রিয়ার একটি কর্মপদে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে ক্রিয়া সকর্মক হয়। যথা—তুমি আমাকে ডাকিতেছ কেন? সে কিছু না খাইয়া চলিয়া গেল। বাড়ীতে কাহাকেও দেখিলাম না।

এই বাক্যগুলিতে 'ডাকিতেছ', 'খাইয়া', 'দেখিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে 'কাহাকে ডাকিতেছ', 'কি না খাইয়া', 'কাহাকে দেখিলাম বা কি দেখিলাম' প্রভৃতি প্রশ্ন উঠে; এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। সেইজন্য 'ডাকিতেছ', 'খাইয়া', 'দেখিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়া সকর্মক এবং 'আমাকে', 'কিছু' এবং 'কাহাকেও' যথাক্রমে ইহাদের কর্ম।

যে সকল ক্রিয়াপদের দুইটি করিয়া কর্ম থাকে, তাহাদিগকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা—তুমি আমাকে এ কথা কখনও বল নাই। শিক্ষক মহাশয় রমেশকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

প্রথম বাক্যটিতে 'বল নাই' ক্রিয়ার দুটি কর্ম—'আমাকে' ও 'কথা'; দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'জিজ্ঞাসা করিতেছেন' ক্রিয়ার দুটি কর্ম—'রমেশকে ও 'প্রশ্ন'

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার যে কর্মটি প্রধান তাহা **মুখ্য কর্ম** এবং যে কর্মটি অপ্রধান তাহা **গৌণ কর্ম**। বস্তুবাচক কর্মই মুখ্য কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্ম গৌণ কর্ম হইয়া থাকে।

[ধাত্বর্থক বা সমধাতুজ কর্ম]

(Cognate Object)

অনেক সময় দেখা যায় অকর্মক ক্রিয়ারও একরকম কর্ম থাকে—এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত স্থলে অকর্মক ক্রিয়ার সমধাতুজ বিশেষ্য পদগুলি কর্মরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যথা,—(১) অনর্থক কাষ্ঠ হাসি হাসিও না। (২) কত খেলাই খেলিতেছ! (৩) খুব লম্বা ঘুম ঘুমাইলে। এখানে 'হাসি', 'খেলা', 'ঘুম' সমধাতুজ কর্ম।

বাংলায় কোন কোন ক্রিয়াকে **অকর্মক ও সকর্মক উভয় রূপেই** ব্যবহার করা যায়। যেমন—অকর্মক—মেঘ ডাকিতেছে, সকর্মক—মিছামিছি আমাকে ডাকিতেছ কেন? অকর্মক—বইখানি বেশ কাটিতেছে, সকর্মক—পোকায় বইখানি কাটিতেছে। অকর্মক—নদী বহিয়া যাইতেছে, সকর্মক—মোট বহিয়া সে সংসার চালায়। অকর্মক—বাতের ব্যথায় পা কামড়ায়, সকর্মক—কুকুরে তাহার পা কামড়াইয়াছে।

[যৌগিক ক্রিয়া]

'ইয়া' বা 'ইতে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সহকারীরূপে অন্য একটি ক্রিয়া মিশিয়া যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যৌগিক ক্রিয়া দুইটি ক্রিয়ার মিলিত রূপ। যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ একটি অর্থ প্রকাশ করে এবং প্রথম অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থই প্রধান হয়। বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার সংখ্যা অগণ্য। যথা—জাগিয়া থাকা, বকিয়া যাওয়া, মারিয়া ফেলা, খাইতে যাওয়া, রাখিতে দেওয়া ইত্যাদি।

'করা' বা 'হওয়া' যোগ করিয়া অসংখ্য প্রকার মিশ্র যৌগিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং এইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন, ভোজন করা, মনে করা, শান্ত হওয়া, উদাস হওয়া ইত্যাদি।

এইভাবে ক্রিয়াপদ গঠন করিবার প্রবণতা বাংলা ভাষায় এত বেশী যে, **বিদেশী** শব্দগুলির সাহায্যেও নূতন নূতন ক্রিয়াপদ সর্বদা গঠিত হইতেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে:—**কৈফিয়ৎ দাও,** নইলে **বরখাস্ত হবে।** ছেলেটার দিকে একটু **নজর রাখবেন। ফরমাস করুন,** কি গাইব? **জবরদস্তি করলে** কোন কাজ হবে না। **হাওলাত করে** টাকা এনে আপনাকে দিলাম। সারাদিন **মেহনৎ করে হয়রান হয়েছি।** আর নাম **জাহির করতে** হবে না। **সর্দারি করার** অভ্যাস সব সময় ভাল নয়। কেমন **জব্দ হয়েছ? ওস্তাদী করো** না। ওরা শুনছি **আপীল করবে।**

[ক্রিয়ার কাল]

ক্রিয়া যে সময়ে ঘটিতেছে, তাহার উপর ক্রিয়ার রূপ নির্ভর করে। একটি ক্রিয়া পূর্বেই ঘটিয়া যাইতে পারে, বর্তমান সময়ে ঘটিতে পারে এবং পরে অর্থাৎ ভবিষ্যতেও ঘটিতে পারে। ক্রিয়াটি কখন ঘটিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য ক্রিয়াপদে বিভিন্ন চিহ্ন বা বিভক্তি যোগ করা হয়।

সময়ানুসারে ক্রিয়ার কালকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

বর্তমান কাল

যে ক্রিয়া এখন ঘটিতেছে, তাহাকে বর্তমান কালের ক্রিয়া বলে। যথা—আমি ভাত খাই। ছেলেটি স্নান করে। সে বই পড়িতেছে। গরু ঘাস খায়।

বর্তমান কালের তিনটি প্রকারভেদ আছে:—

(১) নিত্য বা সাধারণ বর্তমান। (২) ঘটমান বর্তমান। (৩) পুরাঘটিত বর্তমান।

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান—যখন সাধারণভাবে কোন ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, তখন তাহার নাম সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান। যথা—'পাখী সব **করে** রব।' 'কাশীরাম দাস **ভণে** শুনে পুণ্যবান্।' রাজা প্রজা পালন **করেন।**

কোন ঐতিহাসিক ঘটনা জানাইবার জন্যও নিত্য বর্তমান প্রযুক্ত হয়।

যথা—বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন। হজরত মোহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

(২) ঘটমান বর্তমান—যে কাজ চলিতেছে, এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, তাহা ঘটমান বর্তমান। যথা—বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি এখন লিখিতেছি।

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান—যে ক্রিয়ার কাজ অল্পক্ষণ পূর্বে ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য পুরাঘটিত বর্তমান ব্যবহৃত হয়। যথা—

আজ তাহার চিঠি পাইয়াছি। সে শুইয়াছে।

অতীতকাল

যে ক্রিয়া পূর্বে হইয়া গিয়াছে তাহাকে অতীতকালের ক্রিয়া বলে। অতীতকালের চারিটি প্রকারভেদ আছে :—

(১) নিত্য বা সাধারণ অতীত। (২) নিত্যবৃত্ত অতীত। (৩) ঘটমান অতীত। (৪) পুরাঘটিত অতীত।

(১) সাধারণ বা নিত্য অতীত—সাধারণতঃ অতীত সময়ে যে কাজ হইয়াছে, তাহা সাধারণ বা নিত্য অতীত। এইরূপ অতীত বুঝাইতে 'ইল' প্রত্যয়যুক্ত সাধারণ অতীত ব্যবহৃত হয়। যথা—

আমি বাড়ী ফিরিলাম। রাম বনগমন করিলেন।

(২) নিত্যবৃত্ত অতীত—যে কাজ অতীতে কিছুকাল নিয়মিতভাবে করা হইত বা যাহা করা একপ্রকার অভ্যাসের মতই ছিল, তাহা বুঝাইতে নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ হয়। যথা—দিদিমা প্রত্যহ নদীতে স্নান করিতেন। তুমি রোজই কানমলা খাইতে।

(৩) ঘটমান অতীত—অতীতকালে যে ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহা ঘটমান অতীত। যথা :—রাজকন্যা চুল বাঁধিতেছিলেন। 'আপন মনে গাহিতেছিলাম গান।'

(৪) পুরাঘটিত অতীত—যে ব্যাপার অনেক পূর্বে ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাঘটিত অতীত। যথা—আমাদের গ্রামে একবার ডাকাত পড়িয়াছিল সেবার বন্যায় সমস্ত দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল।

ভবিষ্যৎকাল

যে ক্রিয়া এখনও ঘটে নাই, পরে বা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহাকে ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়া বলে। ভবিষ্যৎকালের তিনটি প্রকারভেদ আছে :—(১) সামান্য ভবিষ্যৎ। (২) ঘটমান ভবিষ্যৎ। (৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ।

(১) সামান্য ভবিষ্যৎ—যাহা এখনও পর্যন্ত হয় নাই ভবিষ্যতে হইবে, তাহা সামান্য ভবিষ্যৎ। কাজটি পরে হইবে—অল্প পরেও হইতে পারে, অনেক পরেও হইতে পারে। যথা—জেলায় জেলায় কলেজ হইবে। আর কখনও একাজ করিব না।

(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ—ক্রিয়ার কার্য ভবিষ্যতে কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকিবে, এই অর্থে ঘটমান ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার হয়। যথা—

আমি খাইতে থাকিব। খোকা ঘুমাইতে থাকিবে।

(৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—অর্থাৎ ভবিষ্যতে পুরাঘটিত ভাব। অতীত-কালে কোনো ক্রিয়া হয়ত ঘটিয়াছিল, অথবা ঘটিয়া থাকিতে পারে, এই অর্থে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ হয়। যথা—কি জানি, হয়তো একথা বলিয়া থাকিব। আমার কথা তুমি শুনিয়া থাকিবে। সে হয়তো অন্যায় করিয়া থাকিবে।

মৌলিক কাল ও যৌগিক (মিশ্র) কালঃ—তিনটি কালেরই বিভিন্ন রূপগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভাজ্য, (ক) মৌলিক ও (খ) যৌগিক।

(ক) যেখানে কেবলমাত্র মূল ধাতুটির উপর বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় সেখানে ক্রিয়ার **মৌলিক কাল** হয়। যথা—কর্ + ই = করি ; কর্ + ইতাম = করিতাম ; কর্ + ইব = করিব। মৌলিক কাল চারিটি,—(১) নিত্য বর্তমান, (২) সামান্য অতীত, (৩) নিত্যবৃত্ত অতীত ও (৪) সামান্য ভবিষ্যৎ।

(খ) যেখানে মূলধাতুর উত্তর **ইতে** বা **ইয়া** যোগ করিয়া পরে উহারই সহিত 'আছ্' ধাতুর যোগে সমগ্র ক্রিয়াপদটি গঠিত হয় ('আছ্' ধাতুর ভবিষ্যৎ কালের রূপ 'থাক্') সেখানে ক্রিয়ার **যৌগিক কাল** হয়। যথা—কর্ + ইয়া + আছ্ (পুরাঘটিত বর্তমান) = করিয়াছি ; কর্ + ইতে + আছ্ (ঘটমান বর্তমান) = করিতেছি ; কর্ + ইতে + আছ্ (ঘটমান ভবিষ্যৎ) = করিতে থাকিব ইত্যাদি। যৌগিক কাল আটটি,—(১) ঘটমান বর্তমান, (২) পুরাঘটিত বর্তমান, (৩) ঘটমান অতীত, (৪) পুরাঘটিত অতীত, (৫)* ঘটমান পুরানিত্য-

বৃত্ত ; (৬)* পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত, (৭) ঘটমান ভবিষ্যৎ, (৮) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। উপর্যুক্ত তারকাচিহ্নিত দুইটি কালের ব্যবহার বিরল বলিয়া এই গ্রন্থের **ধাতুরূপ** শীর্ষক আলোচনায় উহাদের বাদ দেওয়া হইয়াছে। এখানে উহাদের নমুনা দেওয়া হইল :—**ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত**—আমি চলিতে থাকিতাম ; তুমি, তুই বা আপনি চলিতে থাকিতে, থাকিতিস্ বা থাকিতেন ; সে বা আপনি চলিতে থাকিত বা থাকিতেন। **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত**—আমি চলিয়া থাকিতাম ; তুমি, তুই বা আপনি চলিতে থাকিতে, থাকিতিস্ বা থাকিতেন ; সে বা আপনি চলিয়া থাকিত বা থাকিতেন।

[ক্রিয়ার প্রকার]

ক্রিয়ার সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রীতি বা প্রকার বুঝাইবার জন্য ইংরাজীতে যে Mood এর ব্যবহার আছে বাংলায় তাহারই পরিচয়ে **ক্রিয়ার প্রকার** নামটি প্রচলিত হইয়াছে। বাংলায় এই প্রকার (Mood) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—(১) **নির্দেশক** (Indicative), (২) **অনুজ্ঞা** (Imperative), (৩) ঘটনান্তরাপেক্ষিত বা সংযোজক (Subjunctive)।

(১) **নির্দেশক প্রকার**—যেখানে শুধু একটি কার্যের নির্দেশ বা সাধারণ ঘোষণা হইয়া থাকে সেখানে ক্রিয়ার নির্দেশক প্রকার হয়। যেমন—আমি যাই, সে পড়ে। এইসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'যাওয়া' বা 'পড়া' ক্রিয়াটির নির্দেশ বা সাধারণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(২) **অনুজ্ঞা প্রকার**—যেখানে বক্তার কোনো আদেশ, ইচ্ছা, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি বুঝায় সেখানে ক্রিয়ার অনুজ্ঞা প্রকার হয়। যেমন,—এখনই চলিয়া যাও। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ভগবান মঙ্গল করুন। বলুন না কি করে রক্ষা পাবো।

(৩) **ঘটনান্তরাপেক্ষিত** বা **সংযোজক প্রকার**—ক্রিয়ার এই প্রকার হয় সেইখানে যেখানে একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার অপেক্ষায় থাকে, একটি ক্রিয়া ঘটিলে তবে অপর ক্রিয়া ঘটিবে এইরূপ ভাব থাকে, সুতরাং যেখানে দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে একটা সংযোজনের ভাব থাকে। যেমন—যদি বৃষ্টি হয় তবে ফসল হইবে। এখানে 'ফসল হওয়া' ক্রিয়াটি 'বৃষ্টি হওয়া' ক্রিয়ার অপেক্ষিত, এবং এই দুইটি ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত।

[ক্রিয়ারূপ]

ক্রিয়া-বিভক্তি

কাল (অর্থাৎ বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ) ও পুরুষ (অর্থাৎ উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ) অনুসারে ক্রিয়া বা ধাতুর পরে যাহা যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাহার নাম **ক্রিয়া বিভক্তি**। 'চলিল' এই ক্রিয়াপদে 'চল্' মূলধাতু বা ক্রিয়া, 'ইল্' ক্রিয়া-বিভক্তি।

'চলিতেছে' এই ক্রিয়াপদে 'চল্' মূলধাতু, 'ইতেছে' ক্রিয়া-বিভক্তি। করিয়া, যাইতে, হইলে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের 'ইয়া', 'ইতে', 'ইলে' প্রভৃতিকেও ক্রিয়া-বিভক্তি বলা হয়।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা ভেদে বাংলা ভাষায় ক্রিয়া-বিভক্তির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান ঃ—

		(১) **নিত্য বর্তমান**	(২) **ঘটমান বর্তমান**
উত্তম পুরুষ	আমি	—ই (করি)	—ইতেছি (করিতেছি)
মধ্যম পুরুষ	তুমি	—অ (কর)	—ইতেছ (করিতেছ)
	তুই	—ইস্ (করিস্)	—ইতেছিস্ (করিতেছিস্)
	আপনি	—এন্ (করেন)	—ইতেছেন (করিতেছেন)
প্রথম পুরুষ	সে	—এ (করে)	—ইতেছে (করিতেছে)
	তিনি	—এন্ (করেন)	—ইতেছেন (করিতেছেন)

(৩) **পুরাঘটিত বর্তমান**

উত্তম পুরুষ	আমি	—ইয়াছি
মধ্যম পুরুষ	তুমি	—ইয়াছ
	তুই	—ইয়াছিস্
	আপনি	—ইয়াছেন
প্রথম পুরুষ	সে	—ইয়াছে
	তিনি	—ইয়াছেন

	(১) সামান্য অতীত		(২) ঘটমান অতীত	
উত্তম পুরুষ	আমি	—ইলাম	আমি	—ইতেছিলাম
মধ্যম পুরুষ	তুমি	—ইলে	তুমি	—ইতেছিলে
	তুই	—ইলি	তুই	—ইতেছিলি
	আপনি	—ইলেন	আপনি	—ইতেছিলেন
প্রথম পুরুষ	সে	—ল	সে	—ইতেছিল
	তিনি	—ইলেন	তিনি	—ইতেছিলেন

	(৩) পুরাঘটিত অতীত	(৪) নিত্যবৃত্ত অতীত
উত্তম পুরুষ	—ইয়াছিলাম	—ইতাম
মধ্যম পুরুষ	—ইয়াছিলে	—ইতে
	—ইয়াছিলি	—ইতিস্
	—ইয়াছিলেন	—ইতেন
প্রথম পুরুষ	—ইয়াছিল	—ইত
	—ইয়াছিলেন	—ইতেন

ভবিষ্যৎ ঃ—

	(১) সামান্য ভবিষ্যৎ	(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ	(৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
উত্তম পুরুষ	—ইব	—ইতে থাকিব	—ইয়া থাকিব
মধ্যম পুরুষ	—ইবে	—ইতে থাকিবে	—ইয়া থাকিবে
	—ইবি	—ইতে থাকিবি	—ইয়া থাকিবি
	—ইবেন	—ইতে থাকিবেন	—ইয়া থাকিবেন
প্রথম পুরুষ	—ইবে	—ইতে থাকিবে	—ইয়া থাকিবে
	—ইবেন	—ইতে থাকিবেন	—ইয়া থাকিবেন

ধাতুরূপ

উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ বা প্রথম পুরুষ প্রভৃতি স্থলে 'আমি,' 'তুমি', 'তিনি' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া কয়েকটি বিশেষ প্রচলিত ধাতুর রূপ নিম্নে দেওয়া হইল। ধাতুরূপ লিখিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান কালের তিনটি প্রকার—(১) নিত্য বর্তমান, (২) ঘটমান বর্তমান ও (৩)

পুরাঘটিত বর্তমান। অতীত কালের চারিটি প্রকার—(১) সামান্য অতীত, (২) নিত্যবৃত্ত অতীত, (৩) ঘটমান অতীত ও (৪) পুরাঘটিত অতীত। ভবিষ্যৎকালের তিনটি প্রকার—(১) সামান্য ভবিষ্যৎ (২) ঘটমান ভবিষ্যৎ ও (৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। নিম্নে উহাদের রূপ দেখান হইল।

চল্-ধাতু

বর্তমানকাল

নিত্য বর্তমান		ঘটমান বর্তমান	পুরাঘটিত বর্তমান
আমি	চলি	চলিতেছি	চলিয়াছি
তুমি	চল	চলিতেছ	চলিয়াছ
তুই	চলিস্	চলিতেছিস্	চলিয়াছিস্
আপনি	চলেন	চলিতেছেন	চলিয়াছেন
সে	চলে	চলিতেছে	চলিয়াছে
তিনি	চলেন	চলিতেছেন	চলিয়াছেন

অতীতকাল

সামান্য অতীত		নিত্যবৃত্ত অতীত	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত
আমি	চলিলাম	চলিতাম	চলিতেছিলাম	চলিয়াছিলাম
তুমি	চলিলে	চলিতে	চলিতেছিলে	চলিয়াছিলে
তুই	চলিলি	চলিতিস্	চলিতেছিলি	চলিয়াছিলি
আপনি	চলিলেন	চলিতেন	চলিতেছিলেন	চলিয়াছিলেন
সে	চলিল	চলিত	চলিতেছিল	চলিয়াছিল
তিনি	চলিলেন	চলিতেন	চলিতেছিলেন	চলিয়াছিলেন

ভবিষ্যৎ কাল

সামান্য ভবিষ্যৎ		ঘটমান ভবিষ্যৎ	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
আমি	চলিব	চলিতে থাকিব	চলিয়া থাকিব
তুমি	চলিবে	চলিতে থাকিবে	চলিয়া থাকিবে
তুই	চলিবি	চলিতে থাকিবি	চলিয়া থাকিবি
আপনি	চলিবেন	চলিতে থাকিবেন	চলিয়া থাকিবেন
সে	চলিবে	চলিতে থাকিবে	চলিয়া থাকিবে
আপনি	চলিবেন	চলিতে থাকিবেন	চলিয়া থাকিবেন

খা-ধাতু

বর্তমান

	নিত্য বর্তমান	ঘটমান বর্তমান	পুরাঘটিত বর্তমান
আমি	খাই	খাইতেছি	খাইয়াছি
তুমি	খাও	খাইতেছ	খাইয়াছ
তুই	খাস্	খাইতেছিস্	খাইয়াছিস্
আপনি	খান	খাইতেছেন	খাইয়াছেন
সে	খায়	খাইতেছে	খাইয়াছে
তিনি	খান	খাইতেছেন	খাইয়াছেন

অতীত

	সামান্য অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত
আমি	খাইলাম	খাইতাম
তুমি	খাইলে	খাইতে
তুই	খাইলি	খাইতিস্
আপনি	খাইলেন	খাইতেন
সে	খাইল	খাইত
তিনি	খাইলেন	খাইতেন

	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত
আমি	খাইতেছিলাম	খাইয়াছিলাম
তুমি	খাইতেছিলে	খাইয়াছিলে
তুই	খাইতেছিলি	খাইয়াছিলি
আপনি	খাইতেছিলেন	খাইয়াছিলেন
সে	খাইতেছিল	খাইয়াছিল
তিনি	খাইতেছিলেন	খাইয়াছিলেন

ভবিষ্যৎ

সামান্য ভবিষ্যৎ		ঘটমান ভবিষ্যৎ	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
আমি	খাইব	খাইতে থাকিব	খাইয়া থাকিব
তুমি	খাইবে	খাইতে থাকিবে	খাইয়া থাকিবে
তুই	খাইবি	খাইতে থাকিবি	খাইয়া থাকিবি
আপনি	খাইবেন	খাইতে থাকিবেন	খাইয়া থাকিবেন
সে	খাইবে	খাইতে থাকিবে	খাইয়া থাকিবে
তিনি	খাইবেন	খাইতে থাকিবেন	খাইয়া থাকিবেন

হ-ধাতু (চলতি ভাষায়)

বর্তমান

নিত্য বর্তমান		ঘটমান বর্তমান	পুরাঘটিত বর্তমান
আমি	হই	হ'চ্ছি	হ'য়েছ
তুমি	হও	হ'চ্ছ	হ'য়েছি
তুই	হস্	হ'চ্ছিস্	হ'য়েছিস্
আপনি	হন	হ'চ্ছেন	হ'য়েছেন
সে	হয়	হ'চ্ছে	হ'য়েছে
তিনি	হন	হ'চ্ছেন	হ'য়েছেন

অতীত

সামান্য অতীত		নিত্যবৃত্ত অতীত	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত
আমি	হ'লাম	হ'তাম	হ'চ্ছিলাম	হ'য়েছিলাম
তুমি	হ'লে	হ'তে	হ'চ্ছিলে	হ'য়েছিলে
তুই	হ'লি	হ'তিস্	হ'চ্ছিলি	হ'য়েছিলি
আপনি	হ'লেন	হ'তেন	হ'চ্ছিলেন	হ'য়েছিলেন
সে	হ'ল	হ'ত	হ'চ্ছিল	হ'য়েছিল
তিনি	হ'লেন	হ'তেন	হ'চ্ছিলেন	হ'য়েছিলেন

ভবিষ্যৎ

	সামান্য ভবিষ্যৎ	ঘটমান ভবিষ্যৎ	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
আমি	হব	হ'তে থাকব	হ'য়ে থাকব
তুমি	হবে	হ'তে থাকবে	হ'য়ে থাকবে
তুই	হবি	হ'তে থাকবি	হ'য়ে থাকবি
আপনি	হবেন	হ'তে থাকবেন	হ'য়ে থাকবেন
সে	হবে	হ'তে থাকবে	হ'য়ে থাকবে
তিনি	হবেন	হ'তে থাকবেন	হ'য়ে থাকবেন

দে-ধাতু (চলিত ভাষায়)

বর্ত্তমান

	নিত্য বর্ত্তমান	ঘটমান বর্ত্তমান	পুরাঘটিত বর্ত্তমান
আমি	দেই	দিচ্ছি	দিয়েছি
তুমি	দাও	দিচ্ছ	দিয়েছ
তুই	দিস্	দিচ্ছিস্	দিয়েছিস্
আপনি	দেন	দিচ্ছেন	দিয়েছেন
সে	দেয়	দিচ্ছে	দিয়েছে
তিনি	দেন	দিচ্ছেন	দিয়েছেন

অতীত

	সামান্য অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত
আমি	দিলাম	দিতাম	দিচ্ছিলাম	দিয়েছিলাম
তুমি	দিলে	দিতে	দিচ্ছিলে	দিয়েছিলে
তুই	দিলি	দিতিস্	দিচ্ছিলি	দিয়েছিলি
আপনি	দিলেন	দিতেন	দিচ্ছিলেন	দিয়েছিলেন
সে	দিল	দিত	দিচ্ছিল	দিয়েছিল
তিনি	দিলেন	দিতেন	দিচ্ছিলেন	দিয়েছিলেন

ভবিষ্যৎ

সামান্য ভবিষ্যৎ		ঘটমান ভবিষ্যৎ	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
আমি	দেব	দিতে থাক্‌ব	দিয়ে থাক্‌ব
তুমি	দেবে	দিতে থাক্‌বে	দিয়ে থাক্‌বে
তুই	দিবি	দিতে থাক্‌বি	দিয়ে থাক্‌বি
আপনি	দেবেন	দিতে থাক্‌বেন	দিয়ে থাক্‌বেন
সে	দেবে	দিতে থাক্‌বে	দিয়ে থাক্‌বে
তিনি	দেবেন	দিতে থাক্‌বেন	দিয়ে থাক্‌বেন

অনুজ্ঞা—

অনুজ্ঞা প্রকারের দুইটি ভাগ আছে, সাধারণ অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা। উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য আছে।

কর্-ধাতু

সাধারণ অনুজ্ঞা—আমি করি, তুমি কর, তুই কর্, আপনি করুন, সে করুক, তিনি করুন।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—তুমি করিও, তুই করিবি, আপনি করিবেন, সে করিবে, তিনি করিবেন।

খা-ধাতু

সাধারণ অনুজ্ঞা—আমি খাই, তুমি খাও, তুই খা, আপনি খান, সে খাক, খাউক, তিনি খান, খাউন।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—তুমি খাইও, খেয়ো, খাইবে, খাবে,
তুই খাস্, খাবি, খাইবি,
আপনি, খাবেন, খাইবেন,
সে খাইবে, খাবে।

শিখ্-ধাতু

সাধারণ অনুজ্ঞা		ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	
আমি	শিখি (শিখিতে দেওয়া হউক)		
তুমি	শেখো	তুমি	শিখো
তুই	শেখ	তুই	শিখিস্
আপনি	শিখুন	আপনি	শিখবেন
সে	শিখুক	সে	শিখবে
তিনি	শিখুন		

অব্যয়

[শ্রেণী বিভাগ ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ]

যে সকল পদের কোনও বিভক্তিতেই ব্যয় বা রূপান্তর হয় না, তাহাদিগকে **অব্যয়** বলে। সকল অবস্থাতেই অব্যয় একরূপ থাকে ; লিঙ্গ, বচন ও কারকে এ পদের কোনও পরিবর্তন হয় না এবং অব্যয় শব্দে কোনও বিভক্তিযুক্ত হয় না।

কিন্তু বাংলায় 'হঠাৎ', অকস্মাৎ', 'দৈবাৎ', 'পশ্চাৎ' প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত পদ অব্যয় হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 'না,' 'হাঁ', 'আবার' প্রভৃতি শব্দ অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি পদও অনেক সময় বাক্যে বা বাক্যাংশে অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। 'রাম রাম', 'দূর ছাই', 'মরে যাই', 'বলিহারি' প্রভৃতিকেও বাংলায় অব্যয় বলিয়া ধরা হয়।

অব্যয় শব্দ বহুপ্রকার, কয়েকটি প্রধান প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) সংযোজক অব্যয়—যে সকল শব্দ একপদের সহিত অন্যপদের অথবা এক বাক্যের সহিত অন্যবাক্যের সংযোগ সাধন করে, তাহাদিগকে সংযোজক অব্যয় বলে। যথা—ডাল **ও** ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। অঙ্ক **এবং** ভূগোল দুইটি বিষয়েই যতীনের বড় ভয়।

ও, এবং, অথচ, সুতরাং, তবু, বরং ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়।

(২) বিয়োজক অব্যয়—যে সকল অব্যয় শব্দ দুইটি পদ বা দুইটি বাক্যকে বিযুক্ত করে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহাদিগকে বিয়োজক অব্যয় বলে। যথা—

তুমি **বা** তোমার ছোট ভাই একজনকে যাইতে হইবে। এখন হইতে মন দিয়া পড **নতুবা** পরীক্ষার ফল ভাল হইবে না।

(৩) সম্বোধন-সূচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় দ্বারা সম্বোধন সূচিত হয় অর্থাৎ ডাকিতে গেলে যে সমস্ত অব্যয় শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে সম্বোধন-সূচক অব্যয় বলে। যথা—'**ওহে** মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?' '**হে** ধনিন্, বৃথা তুমি হয়েছ গর্বিত বহুমূল্য পরিচ্ছদে হইয়া সজ্জিত।'

হে, ওহে, রে, ওরে, ওগো প্রভৃতি এই জাতীয় অব্যয়।

(৪) প্রশ্ন-সূচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হ. তাহাদিগকে প্রশ্ন-সূচক অব্যয় বলে। যথা—তুমি **কেমন** আছ? **কেন** ঝগড়া করিতেছ? পণ্ডিত মহাশয় আজ **কি** কলিকাতা যাইবেন?

কি, কেন, কেমন প্রভৃতি এই জাতীয় অব্যয়।

(৫) বিভক্তি-সূচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় দ্বারা বিভক্তি সূচিত হয়, তাহাদিগকে বিভক্তি সূচক অব্যয় বলে। যথা—ছেলেটি ছোট বোনের **সহিত** খেলা করিতেছে। ধান **হইতে** চাল হয়। কৃপণ**কে** ধিক্।

দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে, জন্য, অপেক্ষা প্রভৃতি অব্যয় শব্দের পরে বসি বিভক্তির কাজ করে।

(৬) বাক্যালঙ্কার-সূচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় বাক্যের শোভা বর্ধন করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে উপমা-সূচক বা বাক্যালঙ্কার-সূচক অব্যয় বলা হয়। যথা—'ভূতের **মতন** চেহারা **যেমন** নির্বোধ অতি ঘোর।' সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের **প্রায়**'। 'এ মেয়ে **তো** মেয়ে নয়, দেবতা **নিশ্চয়**।

(৭) অনুকার-সূচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় কোন বিশেষ ধ্বনি ব অবস্থার অনুকরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে অনুকার-সূচক অব্যয় বলে। এই প্রকার অব্যয়ে এক শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—'বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর** নদী এল বান'। 'মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল **ঢং ঢং**।'

(৮) মনোভাব-বাচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি, লজ্জা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করে, তাহাদিগকে মনোভাব-বাচক অব্যয় বলে। যথা—**ছি,** তোমার এই কাজ! **ইস্,** অনেকটা কেটে গেছে যে! **যাদু আমার,** এইটুকু খেয়ে নাও।

হাঁ, হুঁ, আচ্ছা, যে আজ্ঞে প্রভৃতি অব্যয় **সম্মতি** বুঝায়। না, আদপে না, কখনো না প্রভৃতি **অসম্মতি** বুঝায়। ছি, ছি ছি, ধেৎ, দুত্তোর, **ঘৃণা** ও **বিরক্তি** বুঝায়। বাহবা, বেশ বেশ, বহুত আচ্ছা, বলিহারি, কেয়াবাৎ প্রভৃতি **প্রশংসা** বুঝায়। বাবারে, মারে, হায় হায়, ইস্ প্রভৃতি **দুঃখ** ও **ভয়** বুঝায়। আহা, আহা রে, আহা হা, সোনা আমার, মাণিক আমার প্রভৃতি **দয়া, দুঃখ** বা **আদর** বুঝায়।

(৯) নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়—একটি বাক্যে ব্যবহৃত একটি অব্যয় যখন আর একটির জন্য অপেক্ষা করে, অর্থাৎ একটি ব্যবহার করিলে আর একটি যখন আপনা হইতে আসিয়া পড়ে, নিত্যসম্বন্ধ-যুক্ত সেই দুইটি অব্যয়ের নাম নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়। যথা—**হয়** এসপার, **নয়** ওসপার। **যেমন** বুনো ওল, **তেমনি** বাঘা তেঁতুল।

অনুশীলনী

১। সর্বনাম কয় প্রকার? উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

২। উদাহরণসহ বুঝাইয়া লিখ :—(ক) সিদ্ধ ধাতু, (খ) সাধিত ধাতু, (গ) মৌলিক ক্রিয়া, (ঘ) যৌগিক ক্রিয়া, (ঙ) প্রযোজক ধাতু,, (চ) নামধাতু, (ছ) সংযোগমূলক ধাতু, (জ) সমধাতুজ কর্ম।

৩। অতীতকালের বিভিন্ন রূপগুলির পূর্ণ পরিচয় দাও। প্রত্যেকটি রূপের উদাহরণস্বরূপ এক একটি বাক্য রচনা কর।

৪। সাধু ও চলিত ভাষায় 'শো'-ধাতুর সম্পূর্ণ ধাতুরূপ লিখ।

৫। অব্যয় কাহাকে কহে? সাতটি বিভিন্ন শ্রেণীর অব্যয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া বাক্য রচনা কর।

সমাস

একের অধিক পদকে একপদে পরিণত করার নাম সমাস। বাক্যকে শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য সমাসের প্রয়োজন। অযথা শব্দবাহুল্যে ভাব আড়ষ্ট ও শ্রুতিকটু হয়। অনেক সময় একাধিক পদকে একপদে পরিণত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে ভাষা সরল হয় ও প্রকাশভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী হয়।

সমাস দ্বারা যে শব্দ গঠিত হয় তাহাকে **সমস্ত পদ** বলে এবং সমাসের অন্তর্গত পদগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বা পৃথক করিয়া দেখাইলে **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য** হয়।

সমাস ছয় প্রকার :—

(১) দ্বন্দ্ব সমাস, (২) কর্মধারয়, (৩) তৎপুরুষ, (৪) বহুব্রীহি, (৫) দ্বিগু ও (৬) অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে দুইটি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ মিলিয়া একপদে পরিণত হয় কিন্তু প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এই সমাসের ব্যাসবাক্যে ও, এবং প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহার করিতে হয়। যথা—নদ ও নদী = নদনদী, মাতা ও পিতা = মাতাপিতা, সৎ ও অসৎ = সদসৎ, জায়া ও পতি = দম্পতি, গ্রাস এবং আচ্ছাদন = গ্রাসাচ্ছদন, কেনা ও বেচা = কেনাবেচা, মেয়ে ও জামাই = মেয়েজামাই, কায়, মন এবং বাক্য = কায়মনোবাক্য।

অলুক দ্বন্দ্ব—যেখানে দ্বন্দ্ব সমাসে আবদ্ধ হইলেও সমস্তপদে সমস্যমান পদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না সেখানে অলুক দ্বন্দ্ব হয়। যথা—দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে ; এরূপ—সাপে-নেউলে, বুকে-পিঠে, গোঠে-মাঠে, হাতে-পায়ে, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে-বাটে, জলে-কাদায়, আগে-পিছে, ঝোপে-ঝাড়ে, ঠারে-ঠোরে ইত্যাদি।

সমার্থক দ্বন্দ্ব—যেখানে সমস্যমান পদগুলিতে অনুরূপ বস্তু বা তাহার সমষ্টি বুঝায় সেখানে সমার্থক দ্বন্দ্ব হয়। যথা—কাগজ-পত্র, রাজা-বাদশা,

ডাক্তার-বৈদ্য, রাজা-উজির, জজ-ব্যারিষ্টার, কাপড়-চোপড়, জন-মানব, ছেলে-ছোকরা, জারি-জুরি, চাল-চলন ইত্যাদি।

কর্মধারয়

বিশেষণ পদের সহিত বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাহাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়। এই সমাসে বিশেষ্য পদের অর্থই প্রধান।

বিশেষণ + বিশেষ্য ঃ—মহান যে জন = মহাজন, মহান্ যে রাজা = মহারাজা, নীল যে অম্বর = নীলাম্বর, কু যে অন্ন = কদন্ন, নীল যে শাড়ী = নীলশাড়ী, পোড়া যে মুখ = মুখপোড়া, ভাজা যে চাল = চালভাজা।

বিশেষ্য + বিশেষ্য ঃ—যিনি দাদা তিনিই বাবু = দাদাবাবু, যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি, যিনি পণ্ডিত তিনিই মহাশয় = পণ্ডিতমহাশয়, যিনি পিতা তিনিই ঠাকুর = পিতাঠাকুর, সেইরূপ—মাগোঁসাই, গুরুদেব, ব্রাহ্মণপণ্ডিত লাটসাহেব ইত্যাদি।

বিশেষণ + বিশেষণ ঃ—যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, যে হৃষ্ট সেই পুষ্ট = হৃষ্টপুষ্ট ; সেইরূপ,—শক্তসমর্থ, চালাকচতুর, প্রথমে দত্ত পরে অপহৃত = দত্তাপহৃত, অগ্রে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত, কিছু মিঠা কিছু কড়া = মিঠাকড়া ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঃ—কর্মধারয় সমাসে মধ্যপদের লোপ হইলে তাহাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** বলা হয়। যেমন,—সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, হাসি মাখা মুখ = হাসিমুখ, পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন, দুধ মিশ্রিত সাগু = দুধসাগু, ঘরে থাকে যে জামাই = ঘরজামাই, আতপে শুখান ধানের চাল = আতপচাল, ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু, প্রীতিপূর্ণ উপহার = প্রীতিউপহার, হাত দিয়া চালিত পাখা = হাতপাখা, ওলের আকৃতি-বিশিষ্ট কপি = ওলকপি, ঘিয়ে পাক করা ভাত = ঘিভাত, তেল মাখিবার ধুতি তেলধুতি, ষট্ বা ছয় অধিক দশ = ষোড়শ, মণি অর্থাৎ টাকা রাখিবার ব্যাগ মণিব্যাগ, সমাধির স্মৃতি প্রকাশক মন্দির = সমাধিমন্দির।

উপমিত কর্মধারয় ঃ—উপমা বা তুলনা বুঝাইতে উপমানের সহিত উপমেয়ের সমাসকে **উপমিত কর্মধারয়** সমাস বলে। যাহার সহিত কোন পদের তুলনা হয় তাহা উপমান আর যে পদের তুলনা হয় তাহা উপমেয়।

যথা,—সিংহের ন্যায় নর=নরসিংহ, এখানে 'নর' উপমেয়, 'সিংহ' উপমান। সেইরূপ,—চরণকমল, করপল্লব, পাদপদ্ম, মুখচন্দ্র, নরপুঙ্গব, রাজর্ষি, চন্দ্রপুলি, ফুলঝুরি,—ফুলবাবু, ফুলবাতাসা ইত্যাদি।

উপমান কর্মধারয়—উপমান পদের সহিত সাধারণ ধর্মবাচক পদের সমাসকে **উপমান কর্মধারয়** সমাস বলে। যথা,—বকের ন্যায় ধার্মিক=বকধার্মিক, শাঁখের মত আলু=শাঁখআলু, বজ্রের ন্যায় গম্ভীর=বজ্রগম্ভীর, সেইরূপ,—তুষারধবল, দূর্বাদলশ্যাম, কুসুমকোমল, মিশ্‌কালো, অরুণরাঙা, নিমতিতা ইত্যাদি।

উপমান ও উপমিত কর্মধারয়ের পার্থক্য—উপমান কর্মধারয়ে সাধারণ ধর্মবাচক পদের পরিষ্কার উল্লেখ থাকে, কিন্তু উপমিত কর্মধারয়ে উহার কোনো উল্লেখ থাকে না, উহা উহ্য থাকে,—যেমন, 'তুষারধবল' এখানে 'ধবল' এই সাধারণ ধর্মটির পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে, সুতরাং ইহা উপমান কর্মধারয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'পুরুষসিংহ' এখানে 'পুরুষ' সিংহের ন্যায় এই পর্যন্ত বলা হইল, সিংহের ন্যায় "বীর" বা "পরাক্রমশালী" বা "তেজস্বী" এই জাতীয় যে সাধারণ ধর্মটির কথা এখানে উহ্য রহিয়াছে, সুতরাং ইহা উপমিত কর্মধারয়ের দৃষ্টান্ত।

রূপক কর্মধারয়—পরস্পরের অভেদ বুঝাইয়া উপমানের সহিত উপমেয়ের যে সমাস, তাহাকে **রূপক কর্মধারয়** সমাস বলে। যথা,—ক্রোধ রূপ অগ্নি=ক্রোধাগ্নি, শোক রূপ অনল=শোকানল, আশা রূপ লতা=আশালতা, সংসার রূপ সমুদ্র=সংসারসমুদ্র, হৃদয় রূপ পিঞ্জর=হৃদয়পিঞ্জর।

তৎপুরুষ সমাস

দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত পূর্বপদের সহিত পরপদের যে সমাস হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয়। পূর্বপদের যে বিভক্তি লোপ পায়, সেই বিভক্তির নাম অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের নাম হয়।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ—পূর্বপদে কর্মকারকের বিভক্তি বা দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পাইলে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। যথা—আত্মাকে রক্ষা=আত্মরক্ষা, বধূকে বরণ=বধূবরণ, বিস্ময়কে আপন্ন=

বিস্ময়াপন্ন সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্যপ্রাপ্ত, গঙ্গাকে প্রাপ্ত = গঙ্গাপ্রাপ্ত, লোককে দেখানো = লোক-দেখানো। চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, মাস ব্যাপিয়া অশৌচ = মাসাশৌচ। এইরূপ, ছেলেভুলানো, রথদেখা, কলাবেচা, গাঁটকাটা ইত্যাদি।

তৃতীয়া তৎপুরুষ—পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন লোপ পাইলে, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—রোগের দ্বারা আক্রান্ত = রোগাক্রান্ত, শোকের দ্বারা আকুল = শোকাকুল, এইরূপ,—তৃণাচ্ছন্ন, জরাজীর্ণ, জলকাচা, ঢেঁকি-ছাঁটা, বজ্রাহত, বিদ্যাহীন, অশ্রুসিক্ত, পদদলিত, বাগ্‌দত্তা, ভিক্ষালব্ধ, চোখ-ইসারা, দাঁতখিচানি, মনগড়া, গুণমুগ্ধ ইত্যাদি।

চতুর্থী তৎপুরুষ—পূর্বপদে চতুর্থী বা সম্প্রদান কারকের বিভক্তি লোপ পাইলে, চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—যূপের জন্য কাষ্ঠ = যূপকাষ্ঠ, ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল, এইরূপ,—পানপাত্র, বিয়েপাগলা, মালগুদাম, ধনলোভ, রান্নাঘর, জীয়নকাঠি, মরণকাঠি, হিন্দু-স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি।

পঞ্চমী তৎপুরুষ—পূর্বপদে পঞ্চমী বা অপাদান কারকের বিভক্তি লোপ পাইলে, পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—অগ্নি হইতে ভয় = অগ্নিভয়, পদ হইতে চ্যুত = পদচ্যুত, এইরূপ, বিদেশাগত, বিলাতফেরত, প্রাণাধিক, স্বর্গভ্রষ্ট, আদ্যন্ত, আগাগোড়া, লোকনিন্দা, দলছাড়া, ঘর-পালানো, গাঁ-ছাড়া, থলে-ঝাড়া, ঘোষজা, দত্তজা ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ—পূর্বপদে ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ বিভক্তি লোপ পাইলে, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—বিশ্বের ঈশ্বর = বিশ্বেশ্বর, রাজ্যের পাল = রাজ্যপাল, পথের রাজা = রাজপথ, হংসীর ডিম = হংসডিম্ব, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ, সেইরূপ,—মাতৃতুল্য, ধর্মরাজ্য, রাজহংস, বিশ্বামিত্র (বিশ্বমিত্র), বৃহস্পতি, ভাইপো, বোনঝি, ঠাকুরপো, পিতৃতুল্য, চা-বাগান, হিন্দুস্থান, ফুলবাগান, মাঝদরিয়া, গুণিগণ, সৎসঙ্গ, মৌচাক ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ—পূর্বপদের সপ্তমী বা অধিকরণ কারকের বিভক্তি লোপ পাইলে, সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা,—দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা ধ্যানে মগ্ন = ধ্যানমগ্ন; সেইরূপ,—বচনবাগীশ, বিশ্ববিখ্যাত, রণকুশল, তীরলগ্ন, লোকবিশ্রুত, রাতকানা, বস্তাপচা, গাসহা, গাছপাকা ইত্যাদি।

এই প্রধান কয়েকটি তৎপুরুষ সমাস ছাড়া নঞ্ তৎপুরুষ, উপপদ তৎপুরুষ ও অলুক্ তৎপুরুষ সমাসের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

নঞ্ তৎপুরুষ—না, নয় প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিতে নঞ্ এই অব্যয়ের সহিত যে সমাস হয়, তাহা নঞ্ তৎপুরুষ। যথা,—ন শিষ্ট=অশিষ্ট, ন সৎ=অসৎ, এইরূপ,—অচেনা, নাতিদূর, অনাবাদি, অনভিজ্ঞ, বেসরকারী, বেমানান নপুংসক, অনন্য, অরন্ধন, অনাছিষ্টি, (অনাসৃষ্টি), আলুনি, অনামুখ, আগাছা ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ—উপপদের সহিত কৃদন্তপদের সমাসকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যথা,—বনে চরে যে=বনচর, পঙ্কে জন্মে যাহা=পঙ্কজ, এইরূপ,—পাদপ, তীর্থবাসী, বাস্তহারা, গাঁজাখোর, কুম্ভকার, ইন্দ্রজিৎ, গৃহস্থ, মধুপ, হিতৈষী, গিরিশ, পাশকরা, বর্ণচোরা, ঋত্বিক, বাজীকর, কালুইকর, কারিকর ইত্যাদি।

অলুক তৎপুরুষ—পূর্বপদের বিভক্তি যেখানে লোপ হয় না সেখানে অলুক্ তৎপুরুষ হয়। অলুক্ অর্থ অলোপ। যথা,—

হাতেকাটা, তেলেভাজা, কলেছাঁটা, পায়েচলা, বাপেতাড়ানো, মায়েখেদান প্রভৃতি অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ। পেটেরদায়, মুড়িরচাল প্রভৃতি অলুক্ চতুর্থী তৎপুরুষ। ঘানির তেল, কলের জল প্রভৃতি অলুক্ পঞ্চমী তৎপুরুষ। ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগের মা, বাঘের দুধ, টাকার কুমীর, মামার বাড়ী, গোরুর-গাড়ী, প্রভৃতি অলুক্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ। যুধিষ্ঠির, গায়েপড়া, হাতেখড়ি, গায়েহলুদ, ধারেবিক্রী, তেলেভাজা প্রভৃতি অলুক্ সপ্তমী তৎপুরুষ।

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান কোন পদের অর্থ প্রধানভাবে না বুঝাইয়া অপর কোন পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায় তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা,—পীত অম্বর যাহার=পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ), দশ আনন যাহার=দশানন (রাবণ) বীণাপাণিতে যাহার=বীণাপাণি (সরস্বতী); এইরূপ,—সমান জাতি যাহার=সজাতি, সমান বয়স যাহার=সমবয়স্ক, চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার=চন্দ্রমুখী রক্তের ন্যায় বর্ণ যাহার=রক্তবর্ণ, অন্য বিষয়ে মন যাহার=অন্যমনস্ক, একদিকে

গোঁ যাহার = একগুঁয়ে, এক দিকে রোখ যাহার = একরোখা, চিরুণীর মত দাঁত যাহার—চিরণ-দাঁতী, হায়া নাই যাহার = বেহায়া, ইত্যাদি।

এইরূপ,—ধৃতরাষ্ট্র, নদীমাতৃক, নির্জন, অমূল্য, মহাশয়, উন-পাঁজুরে, বরাখুরে, শুচিবেয়ে, সাতনহরা, ছয়-নলা, দেখন-হাসি, পেঁচামুখো ইত্যাদি,

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ আছে; যথা,—

(ক) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হইলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হয়। যথা—পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, রক্তবর্ণ, কালোবরণ, মন্দগতি, বহুব্রীহি ইত্যাদি।

(খ) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ না হইলে, তাহাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে। যথা—পদ্মনাভ, শূলপাণি, কমলানন, আশীবিষ, সোনামুখ ইত্যাদি।

(গ) **ব্যতিহার বহুব্রীহি**—পরস্পরসাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইলে, একই শব্দের পুনরুক্তির দ্বারা যে বহুব্রীহি হয়, তাহাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলে। যথা,—কানাকানি (কানে কানে যে কথা), গলাগলি (পরস্পর গলা জড়াইয়া যে মিলন); এইরূপ,—কোলাকুলি, টানাটানি, হাতাহাতি, কেশাকেশি, লাঠালাঠি ইত্যাদি।

(ঘ) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—যেখানে ব্যাসবাক্যে আগত পদের লোপ হইয়া বহুব্রীহি হয়, তাহাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যথা,—চাঁদের মত মুখ যাহার = চাঁদমুখ, পাঁচ হাত পরিমাণ যাহার এমন ধুতি = পাঁচহাতী, এইরূপ,—বিশ-মণী, দশ-সেরী, মৃগনয়না, পেঁচামুখো, বরাখুরে, উট-কপালী, চিরুণ-দাঁতী, দেখন-হাসি ইত্যাদি।

(ঙ) **অলুক বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না, তাহাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। যথা—যুধিষ্ঠির, গায়েহলুদ (গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে), মুখে-ভাত, হাতে-খড়ি, কোঁচা-হাতে (বাবু), গায়ে-পড়া (লোক), ছড়ি-হাতে, ঘড়ি-হাতে, মাথায়-ছাতি (বাবু) তেলেভাজা (খাবার) ইত্যাদি।

(চ) **নঞ্ বহুব্রীহি**—নঞর্থক অর্থাৎ 'নাই' বা 'অভাব' অর্থবোধক পদের যোগে যে বহুব্রীহি হয় তাহাকে নঞ্ বহুব্রীহি বলা যায়। যথা,—নাই ভয় যাহার = নির্ভীক, নাই অন্ত যাহার = অনন্ত, এইরূপ,—অনাদি, অবোধ,

অকেজো, অভাগী, অলক্ষণে, বেহায়া, বেসুরো, নির্জলা, নিখাউস্তি, নিষ্কৈফিয়ৎ ইত্যাদি।

(ছ) **সংখ্যা বহুব্রীহি**—পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হইলে তাহাকে সংখ্যা-বহুব্রীহি বলা চলে। যথা,—ত্রি (তিনটি) ভুজ (বাহু) যাহার = ত্রিভুজ, পঞ্চ আনন যাহার = পঞ্চানন; এইরূপ,—দশানন, ছ'নলা, সাতনহরা, একনলা (বন্দুক), একপেয়ে, তেপায়া, তেমোহনা, চৌরাস্তা, একতারা, সেতার ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাস

যে সমাসে সমাহার অর্থাৎ অনেক বস্তুর একত্র মিলন বুঝায় এবং পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হয় তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে। যথা—পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, পঞ্চনদের সমাহার = পঞ্চনদ, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, এইরূপ সপ্তাহ, ত্রিফলা, চৌরাস্তা, ত্রিসীমানা, পাঁচফোড়ন, নবরত্ন, ত্রিভুবন, দশচক্র, পঞ্চভূত, অষ্টধাতু, তেমাথা চৌমুহানী, দুয়ানী ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয় পদ পূর্বে বসিয়া যে সমাস হয় তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্য শব্দ দিয়া ব্যাসবাক্য রচনা করিতে হয়, সমাসের পদ ভাঙ্গিয়া ব্যাসবাক্য দেখান যায় না। যথা,—কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ, জানু পর্যন্ত—আজানু, এইরূপ,—আমূল, আবাল্য, আশৈশব, আপাদ-মস্তক, আব্রাহ্মণচণ্ডাল, আবালবৃদ্ধবনিতা, বনের সদৃশ = উপবন, দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ, ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি, কণ্ঠের নিকট = উপকণ্ঠ, কূলের নিকট = উপকূল, দিনে দিনে = প্রতিদিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ, অহে অহে—প্রত্যহ, সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া = যথাসাধ্য, বিধিকে অতিক্রম না করিয়া = যথা-বিধি, বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন, ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ, বন্দোবস্তের অভাব = বেবন্দোবস্ত, আমিষের অভাব = নিরামিষ, ইত্যাদি।

প্রধান ছয় প্রকার সমাস ছাড়া তিনটি অপ্রধান সমাসের নামও প্রচলিত আছে।

প্রাদি সমাস

ইহা তৎপুরুষের রূপান্তর। প্রথমে উপসর্গ ও পরে কৃদন্ত-পদ-যোগে এবং

অব্যয়ের সহিত নাম-পদ-যোগে প্রাদিসমাস হইয়া থাকে। যথা,—প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (জ্যোতিযুক্ত) = প্রভাত। এইরূপ,—সুশীল, অতিমানব, উদ্বেল, অতিপ্রাকৃত ইত্যাদি।

নিত্য সমাস

যেখানে সমস্যমান পদগুলি পাশাপাশি অবস্থান করিয়াই সমাস সৃষ্টি করে সেখানে নিত্যসমাস হয়। প্রায়ই নিত্যসমাসে প্রথম অংশটি প্রাতিপদিক রহিয়া যায়। যথা,—অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, অন্য ভাব = ভাবান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র। 'নিভ', 'সন্নিভ' 'সঙ্কাশ' প্রভৃতি তুল্যার্থ-বোধক পদের যোগেও নিত্য সমাস হয়; যথা—দুগ্ধ-ফেন-নিভ, অনল-সন্নিভ, জবাকুসুম-সঙ্কাশ ইত্যাদি।

সহসুপা বা সুপ্‌সুপা

কোনো সুপ্ অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত আর একটি সুপ্ বা বিভক্তিযুক্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে সহসুপা বা সুপসুপা কহে। যথা,—পূর্বে (পূর্বম্) ভূত = ভূতপূর্ব : এইরূপ, পূর্বরাত্র, দৃষ্টপূর্ব, প্রত্যক্ষভূত ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। ব্যাসবাক্য বল ও কোন্ সমাস উল্লেখ কর :—

ঢাকঢোল, বিদ্যাহীন, খাঁসাহেব, বাসনমাজা, কদাচার, মামরা, খাইখরচ, বস্তাপচা, ঋণমুক্ত, আপ্রাণ, কুমারবাহাদুর, বিয়েপাগলা, দম্পতি, শশব্যস্ত, বদ্ধাঞ্জলি, মিহিদানা।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলি একপদে পরিণত কর :—

সমান উদর যাহার, পত্নীর সহিত বর্তমান, হাজির নয় যে, জলে জন্মে যাহা, এলোকেশ যাহার, যশ হরণ করে যে, মনরূপ রথ, যুদ্ধ হইতে উত্তর, বিগত হইয়াছে অর্থ যাহা হইতে।

৪। রাজপুরুষ ও পুরুষরাজ—অর্থে পার্থক্য কি! ইহাদের কোনটি কোন্ সমাস? চন্দ্রমুখ ও মুখচন্দ্র এই পদ দুইটি ব্যবহার করিয়া দুইটি বাক্য রচনা কর।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :—(ক) ঘিভাত, অবুঝ, আগুসার, গাছপাকা, মেয়েস্কুল, গন্ধবণিক (C. U. 1941) ; (খ) কাগজপত্র, বিলাতফেরত সপ্তাহ, ছায়াতরু, মনমরা, ঘরজামাই (C. U. 1942) ; (গ) অগ্নিভয়, ভ্রাতুষ্পুত্র ভিক্ষান্ন, তেমাথা, রাজাবাদশা, ডাক্তার-সাহেব (C. U. 1949) ; (ঘ) লাঠিখেলা, চোখেদেখা, বরযাত্রী, হররোজ, গরমিল, রাঙামূলো, চোখাচোখি, (C. U. 1951) ; (ঙ) জোরবরাত, লোকদেখানো, কলেছাঁটা, বেগতিক স্মৃতিমন্দির, লেজঝোলা, গায়েপড়া (S. F. 1952) ; (চ) তেলধুতি, ত্রিভুবন, কোলাকুলি, মধুপ, কাপুরুষ, ঘরমুখো, হাটবাজার, মনমাঝি, দশগজ (S. F. Comp. 1954) ; (ছ) যথাসত্য, মহাতর্ক, ঠেলাঠেলি, দর্শকজন, প্রলয়লোলুপ, গেরুয়াবসনা, ভূতলে, চরণপদ্ম (S. F. 1956)।

৬। উপমান কর্মধারয়, উপমিতকর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের প্রভেদ উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (S. F. 1955)

৭। বিভিন্ন প্রকার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ দাও।

শব্দ-প্রকরণ

[শব্দ ও পদের পার্থক্য]

শব্দ ও পদের পার্থক্য প্রথমেই বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। একাধিক পদের সমষ্টি বাক্য। বাক্যে পদ ব্যবহার করা হয়—শব্দ বা ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইলেই পদ হয়। বিভক্তিহীন পদই শব্দ। ক্রিয়া-বিভক্তিযুক্ত পদ হইতে ক্রিয়া-বিভক্তির চিহ্ন বাদ দিলে যেমন ধাতু পাওয়া যায় তেমনি পদ হইতে কারক-বিভক্তি তুলিয়া দিলে শব্দ পাওয়া যায়।

[বাংলা শব্দ সম্ভার]

বাংলায় প্রচলিত শব্দগুলি মোটামুটি চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (১) সংস্কৃত বা তৎসম, (২) সংস্কৃতজ বা তদ্ভব, (৩) দেশী, (৪) বিদেশী।

সংস্কৃতজ বা তৎসম শব্দ—যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ কোনরূপ বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে সেইগুলি তৎসম শব্দ

(তৎসম = সংস্কৃত সম)। লতা, বৃক্ষ, ফল, গমন, ভোজন, শয়ন, জয়, পরাজয়, চন্দ্র, সূর্য, লাভ, ক্ষতি, ভক্তি, মুক্তি, কর্ম ইত্যাদি তৎসম শব্দ।

সংস্কৃতজ বা তদ্ভব শব্দ—যে শব্দগুলির মূল সংস্কৃত অথচ যেগুলি কালক্রমে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া কতকগুলি নিয়মের শাসনে শাসিত হইয়া রূপান্তর লাভ করিয়াছে সেইগুলি তদ্ভব শব্দ। (তদ্ভব = তৎ অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে ভব, সংস্কৃত হইতে জাত)। যেমন,—

সোণা (স্বর্ণ), হাত (হস্ত), মাথা (মস্তক), ঘব (গৃহ), ষাঁড় (ষণ্ড), কাণ (কর্ণ), কুমার (কুম্ভকার), বাজ (বজ্র), মিছা (মিথ্যা), খায় (খাদতি), শোনে (শৃণোতি), বসে (উপবিশতি)।

আর একপ্রকার শব্দ আছে তাহাদিগকে **অর্ধতৎসম** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শব্দগুলি মূল সংস্কৃত শব্দ হইতেই আসিয়াছে, কিন্তু অশিক্ষিত লোকের মুখে শৃঙ্খলাহীনভাবে ইহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ বিকৃত হইয়া ও ভাঙিয়া একটা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। যেমন,—

পুরুত, গতর, কেষ্ট, নেমন্তন্ন, গিন্নী, বেরাহ্মণ, ছেরাদ্দ, কেত্তন প্রভৃতি অর্ধ-তৎসম-শব্দ।

দেশী শব্দ--বাংলাদেশে আর্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্বে এই দেশে বহু অনার্য জাতি বাস করিত। তাহাদের ভাষা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। এই প্রাচীন অধিবাসীদেব ভাষা হইতে কিছু কিছু শব্দ বাংলায় আসিয়াছে। যেমন,—

ঢেঁকি, কুলা, খোলা, খুকি, বাখারি, ঝাঁটা, ডিঙ্গি প্রভৃতি দেশী শব্দ।

বিদেশী শব্দ—বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে সমস্ত জাতি নানা কার্য্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত স্বাভাবিক কারণে ভারতীয়গণের ভাবজীবনে ও কর্মজীবনে নানাপ্রকার আদান-প্রদান হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদেশী ভাষার কতকগুলি শব্দ ভারতীয় ভাষাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে এই শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলিকে এখনও বিদেশী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকগুলি শব্দ এদেশে বহুকাল লোকমুখে প্রচলিত থাকায় বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া এরূপভাবে বাংলার আপনার হইয়া গিয়াছে যে, ঐগুলিকে আর এখন বিদেশী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(ক) **প্রাচীন পারসিক**—মোজা, মুচি, পুঁথি ইত্যাদি।

(খ) **গ্রীক**—কোণ, সুড়ঙ্গ, দাম ইত্যাদি।

(গ) **তুর্কী**—বাবু, বাবা, কোর্মা, চাকু, দারোগা, লাশ, উজবুক, বোঁচকা ইত্যাদি।

(ঘ) **পারসী**—জমি, জমা, দরবার, শিকার, কাগজ, কলম, হিসাব, নালিশ, আইন, নরম, সরম, বরফ, দোকান, গজল, আয়না, জামা, বাগিচা, শাল, শিশি, হাজার, পোলাও, কালিয়া, কামান, বন্দুক, বারুদ, উকিল, চশমা, হালুয়া, রুমাল, হুকা, মোকদ্দমা, দরখাস্ত, মোকাবিলা, হাজির, ইত্যাদি।

(ঙ) **আরবী**—নমাজ, মউলবি, কোরাণ, (কুর-আন), হদীশ ইত্যাদি।

(চ) **পর্তুগীজ**—আনারস, সাবান, কাকাতুয়া, পেঁপে, পিস্তল, পাঁউরুটি, পেরেক, বৈয়াম, আচার, মাশুল, বোতাম, বালতি, চাবি, মিস্ত্রী, জানালা, বিস্তি ইত্যাদি।

(ছ) **ওলন্দাজ**—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ ইত্যাদি।

(জ) **ফরাসী**—কুপন, ফিরিঙ্গী, কার্তুজ, বুর্জোয়া, বুরুশ, ইত্যাদি।

(ঝ) **ইংরাজী**—পকেট, কলেজ, ইস্কুল, বল, মাস্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, চেয়ার, টেবিল, পাশ, ফেল, রেল, স্টিমার, ফাউন্টেন পেন, পেন্সিল, শ্লেট, কলেরা ইত্যাদি।

(ঞ) **চীনা**—চা, চিনি, লুচি, গুলাচি ইত্যাদি।

(ট) **জাপানী**—রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি।

(ঠ) **বর্মী**—ফুঙ্গি, লুঙ্গি, লামা, নাপ্পি ইত্যাদি।

(ড) **রাশিয়ান**—ভড্‌কা, বলশেবিক, সোভিয়েট ইত্যাদি।

(ঢ) **মালয়**—গুদাম, সাগু, চুরুট (সুলুট্টু) ইত্যাদি।

এই চারিটি প্রধান শ্রেণী ছাড়াও বাংলায় কয়েকটি মিশ্রশব্দ বা Hybrid word দেখিতে পাওয়া যায়।

বে (ফারসী প্রত্যয়) হেড্‌ (ইংরাজী শব্দ) = বেহেড্‌।

গুরু (সংস্কৃত শব্দ) গিরি (ফারসী প্রত্যয়) = গুরুগিরি।

[ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত]

যে সকল শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশেষ ধরণের ধ্বনিবোধ জাগিয়া উঠে, অথচ যাহাদের ব্যুৎপত্তিগত পৃথক কোনো অর্থ নাই তাহাদের নাম **ধ্বন্যাত্মক শব্দ**। যথা—টপ্‌টপ্‌, কন্‌কন্‌, কড্‌কড়্‌, খাঁখাঁ, ঝম্‌ঝম্‌, শন্‌শন্‌ ইত্যাদি।

ভাষায় অনেক সময় একই ধ্বনিযুক্ত শব্দ পর পর দুইবার প্রয়োগ করা হয়, ইহার ফলে অর্থের পরিবর্তন ঘটে, অনেক সময় নূতন অর্থও সূচিত হয়।

ঘরে ঘরে এখন ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা, **শিশি শিশি** ওষুধ খেয়ে সকলের কান মাথা **চন্‌ চন্‌** করছে, সকলেই **দুধ দুধ** করছে, কিন্তু **টাকা টাকা** করে দুধের সের, তাই **বাটী বাটী** বার্লি খাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

'ঘরে ঘরে' অর্থ প্রতি ঘরে, 'শিশি শিশি' ও 'বাটী বাটী' অর্থ অনেক শিশি ও অনেক বাটী, 'চন্ চন্' একপ্রকার কাল্পনিক শব্দ বুঝাইতেছে, 'দুধ দুধ' প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুঝাইতেছে এবং 'টাকা টাকা' অর্থ এক টাকা করিয়া।

শব্দদ্বৈতের বিচিত্র ব্যবহার আমাদের বাংলা ভাষার অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ। কিন্তু অসংখ্য প্রকার শব্দদ্বৈতের বিভাগ করা বা কোন্ কোন্ অর্থে ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম আবিষ্কার করা এক রকম অসম্ভব।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে :

(১) বহুত্ব অর্থাৎ বহুবচন বুঝাইবার জন্য :—

ঘরে ঘরে আজ উৎসব। **থালা থালা** ভাত আর **বাটী বাটী** ডাল সব উঠে গেল। **বড় বড়** বানরের **বড় বড়** লেজ। **নূতন নূতন** জামা গায়ে ছেলেমেয়েদের দল ছুটছে।

(২) সর্বদা লাগিয়া থাকা ও অবিরাম গতি বুঝাইবার জন্য :—

কাছে কাছে থাকবে। **পিছনে পিছনে** আসছ কেন? সর্বদা **পাশে পাশে** চল।

(৩) তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুঝাইবার জন্য :—

তিন মাস বৃষ্টি নাই, **জল জল** করিয়া সারা দেশ চীৎকার করিতেছে। **ছেলে ছেলে** করিয়াই মায়ের মন সর্বদা অস্থির। **টাকা টাকা** করিয়াই ভদ্রলোক অবশেষে পাগল হইলেন।

(৪) 'ঈষৎ' বা কম বুঝাইবার জন্য :—

শরীরটা **জ্বর জ্বর** করছে। জামাটা **ভিজে ভিজে** লাগছে। আজ কেমন যেন **শীত শীত** ভাব। একটু **মেঘ মেঘ** করছে কিনা, কেমন যেন **ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা** বোধ হচ্ছে।

(৫) নকল খেলা বা অনুকরণ বুঝাইবার জন্য :—

ছেলেমেয়েরা **চোর চোর** খেলছে। মেয়েরা সারা দুপুর ধরে **বিয়ে বিয়ে** খেলছিল।

(৬) 'প্রত্যেক' এই অর্থ বুঝাইবার জন্য :—

বছর বছর সে অসুখে ভোগে। **দ্বারে দ্বারে** ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতেছে। **জন্মে জন্মে** যেন এই দেশেই আসি।

(৭) উপক্রম বা ক্রিয়ার পূর্বকালীন অবস্থা বুঝাইবার জন্য :—

বাতিটা **নিবু নিবু** হয়েছে। অনেকক্ষণ থেকেই **যাব যাব** করছি। ছেলেটির একেবারে **যায় যায়** অবস্থা। ঘরটি একেবারে **পড় পড়** হয়েছে। নৌকাখানা যে একেবারে **ডুবু ডুবু**।

(৮) আরও কিছু (অনির্দিষ্ট) বুঝাইবার জন্য :—

জলটল খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে, **ভাতটাত** বা **লুচিফুচি** দরকার নাই।

(৯) 'প্রভৃতি' বুঝাইবার জন্য :—

'লয়ে **রশারশি** করি **কশাকশি পোঁটলা পুঁটলি** বাঁধি।'

উদাহরণ যতই বাড়ান হউক না কেন, বাংলা শব্দদ্বৈতের অর্থপ্রকাশের যে বৈচিত্র্য আছে তাহার অন্ত পাওয়া যাইবে না।

গঠনের দিক হইতে অবশ্য কয়েকটি ভাগে শব্দদ্বৈতগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

(ক) প্রকৃত শব্দদ্বৈত—পরপদটি অবিকল পূর্বপদের ন্যায়। যেমন,—

আমতা আমতা, কাঁদ কাঁদ, পায় পায়, গরম গরম, পেটে পেটে, তলে তলে, হাড়ে হাড়ে, ইত্যাদি।

(খ) দ্বিরুক্ত অনুচর শব্দ—পরপদটি সামান্য বিকৃত হয় :

মোটা সোটা, মেরে ধরে, কেঁদে কেটে, বাসন কোসন, দহরম মহরম, উঁকিঝুঁকি, ছাইভস্ম, সৈন্যসামন্ত, ইত্যাদি।

(গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত—

কট কট, ঝন ঝন, খাঁ খাঁ, মস্ মস্, ধূ ধূ, গুট গুট, হন্‌হন্, চট্‌পট্, গুন্‌গুন্, ঝুমুর ঝুমুর ইত্যাদি।

[কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়]

ধাতুর পরে যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দ গঠন করা হয়, সেগুলিকে **কৃৎপ্রত্যয়** বলে। শব্দের পরে যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ হয়, তাহাকে **তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে। বাংলা ভাষায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যুক্ত বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। আবার বাংলার নিজস্ব কতকগুলি কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগেও নিত্য নূতন শব্দ সৃষ্ট হইতেছে।

ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয়, য প্রভৃতি প্রত্যয়কে কৃৎ প্রত্যয় বলে। 'চলন্ত' ট্রেন হইতে নামিবার চেষ্টা করিও না। এই বাক্যে 'চলন্ত' কথাটির অর্থ 'যাহা চলিতেছে।' চল্ এই ধাতুটির সহিত অন্ত এই কৃৎ প্রত্যয় যোগ করিয়া 'চলন্ত' এই পদটি নিষ্পন্ন হইতেছে। কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে এইভাবে অনেক নূতন নূতন শব্দ গঠিত হয়। 'করা উচিত' এই অর্থে কৃ ধাতুর উত্তর তব্য বা অনীয় প্রত্যয় যোগ করিয়া 'কর্তব্য' বা 'করণীয়' পদটি সাধিত হয়। এইভাবে কৃৎ প্রত্যয় যোগে বাংলা ভাষায় অসংখ্য শব্দের সৃষ্টি হইতেছে। এই কৃৎ প্রত্যয়ের কতকগুলি সংস্কৃত, কতকগুলি বাংলা। উভয় প্রকার কৃদন্ত শব্দই আমরা সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি।

কৃদন্ত পদ তিনভাবে গঠিত হয় :—

(১) ধাতুর পরে প্রতয় যোগ করিয়া—কৃ + তব্য = কর্তব্য।

(২) উপসর্গের পরে ধাতু ও তাহার পর প্রত্যয় যোগ করিয়া—সম্—কৃ + ক্ত = সংস্কৃত।

(৩) শব্দের পরে ধাতু ও তাহার পর প্রত্যয় যোগ করিয়া—রস্—জ্ঞা + ক = রসজ্ঞ।

[সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়]

তব্য—কৃ + তব্য = কর্তব্য, দা + তব্য = দাতব্য, গম্ + তব্য = গন্তব্য, মন্ + তব্য = মন্তব্য, ভূ + তব্য = ভবিতব্য।

অনীয়—পা + অনীয় = পানীয়, কৃ + অনীয় = করণীয়, বৃ + অনীয় = বরণীয়, দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়, স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়।

য—দা + য = দেয়, গম্ + য = গম্য, পা + য = পেয়, সহ + য = সহ্য, গ্রহ্ + য = গ্রাহ্য।

ক্ত—গম্ + ক্ত = গত, স্থা + ক্ত = স্থিত, মৃ + ক্ত = মৃত, ভূ + ক্ত = ভূত কৃ + ক্ত = কৃত।

তি (ক্তি)—মন্ + তি = মতি, গম্ + তি = গতি, খ্যা + তি = খ্যাতি, স্থা + তি = স্থিতি, ভজ্ + তি = ভক্তি।

তৃ (তৃচ্)—দা + তৃ = দাতৃ, কৃ + তৃ = কর্তৃ, নী + তৃ = নেতৃ, ক্রী + তৃ = ক্রেতৃ, ভুজ্ + তৃ = ভর্তৃ। প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে এইগুলি দাতা, কর্তা, নেতা, ক্রেতা, ভোক্তা, এইরূপ হইবে।

অন (অনট্)—দা + অন = দান, পা + অন = পান, শী + অন = শয়ন, চি + অন = চয়ন, গম্ + অন = গমন।

অক—পচ্ + অক = পাচক, গৈ + অক = গায়ক, নৈ + অক = নায়ক, সাধ্ + অক = সাধক, লিখ্ + অক = লেখক।

শানচ্ (আন্, মান্)—আস্ + আন = আসীন, শী + আন = শয়ান, বৃধ্ + আন = বর্ধমান, কম্প্ + আন = কম্পমান, ঘূর্ণ্ + আন = ঘূর্ণমান।

[খাঁটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয়]

ই—হাস্ + ই = হাসি, মার্ + ই = মারি, হাঁচ্ + ই = হাঁচি, কাশ্ + ই = কাশি, ডুব্ + ই = ডুবি, চুর্ + ই = চুরি, ঝাঁপ্ + ই = ঝাঁপি, ফাঁস্ + ই = ফাঁসি।

আ—নাচ্ + আ = নাচা, কাঁদ্ + আ = কাঁদা, চল্ + আ = চলা, শু + আ = শোয়া, (এইগুলি বিশেষ্য)।

বাঁধ্ + আ = বাঁধা, কাট্ + আ = কাটা, শুন্ + আ = শোনা, পাক্ + আ = পাকা, (এইগুলি বিশেষণ)।

অন, আন—নাচ্ + অন = নাচন, মাজ + অন = মাজন, চল্ + অন = চলন, মিল্ + অন = মিলন, ঝাড়্ + অন = ঝাড়ন, দেখ্ + আন = দেখান।

উনি—চাল্ + উনি = চালুনি, ছাঁ + উনি = ছাঁউনি, চির্ + উনি = চিরুনি, চাহ্ + উনি = চাহুনি, রাঁধ + উনি = রাঁধুনি, গাঁথ্ + উনি = গাঁথুনি।

উক—পেট + উক = পেটুক, লাজ + উক = লাজুক, মিশ + উক = মিশুক।

অন্ত—জীব্ + অন্ত = জীবন্ত, পড্ + অন্ত = পড়ন্ত, এইরূপ,—ঘুমন্ত, ফলন্ত, বাড়ন্ত, উড়ন্ত, ফুটন্ত।

না—খেল্ + না = খেলনা, ঝর্ + না = ঝরণা, বাজ্ + না = বাজ্না, রাঁধ্ + না = রান্না, ঢাক্ + না = ঢাক্না, দোল্ + না = দোলনা।

তি, তা, আই—কম্ + তি = কম্তি, বাড়্ + তি = বাড্তি, উঠ্ + তি = উঠ্তি, পড়্ + তা = পড়তা, লড়্ + আই = লড়াই, ঢাল্ + আই = ঢালাই।

ইয়ে, উয়া, উরি, আরি—বল্ + ইয়ে = বলিয়ে, গাহ্ + ইয়ে = গাইয়ে, বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে, নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে, পড্ + উয়া = পড়ুয়া, ডুব্ + আরি = ডুবারি, ধুন্ + আরি = ধুনারি, ডুব্ + উরি = ডুবুরি, ধুন্ + উরি = ধুনুরি।

নি, আনি—জ্বালা + আনি = জ্বালানি, নিড্ + আনি = নিড়ানি, বেড + আনি = বেড়ানি।

[সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ]

অ, ই, আয়ন, এয়, (ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণায়ন, ষ্ণেয়)—এই প্রত্যয়গুলি অপত্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনুর অপত্য = মানব, দনুর অপত্য = দানব, পাণ্ডুর অপত্য = পাণ্ডব, ভৃগুর অপত্য = ভার্গব, কুরুর অপত্য = কৌরব, পৃথার অপত্য = পার্থ, যদুর অপত্য = যাদব, রঘুর অপত্য = রাঘব, কশ্যপের অপত্য = কাশ্যপ, ভরতের অপত্য = ভারত, পুত্রের পুত্র = পৌত্র, দুহিতার পুত্র = দৌহিত্র, চণকের অপত্য = চাণক্য, অদিতির অপত্য = আদিত্য, দিতির অপত্য = দৈত্য, দশরথের পুত্র = দাশরথি, রাবণের অপত্য = রাবণি, সুমিত্রার অপত্য = সৌমিত্র, কুন্তীর পুত্র—কৌন্তেয়, বিমাতার পুত্র = বৈমাত্রেয়, ভগ্নীর পুত্র = ভাগিনেয়।

ভক্ত বা উপাসক অর্থে অ (ষ্ণ, ষ্ণ্য)

বিষ্ণুর ভক্ত = বৈষ্ণব, শক্তির ভক্ত = শাক্ত, শিবের ভক্ত = শৈব, বুদ্ধের ভক্ত বৌদ্ধ, ব্রহ্মের ভক্ত = ব্রাহ্ম, জিনের ভক্ত = জৈন, সূর্যের ভক্ত = সৌর, গণপতির ভক্ত = গাণপত, স্ত্রীর ভক্ত = স্ত্রৈণ।

অস্ত্যর্থে অর্থাৎ আছে এই অর্থে মতুপ্, বতুপ্, ইন্, বিন্ ময়, ল্, আলু, শ, ইল

শ্রী + মতুপ্ (শ্রী আছে যার) = শ্রীমান, গুণ + বতুপ্ (গুণ আছে যাহার), = গুণবান, আয়ু + মতুপ্ (আয়ু আছে যাহার) = আয়ুষ্মান, মাংস + ল (মাংস আছে যাহাতে) = মাংসল, দয়া + লু (দয়া আছে যাহার) = দয়ালু, রোম + শ = রোমশ, পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল, মহিমা + ময় = মহিমাময়। সুখ + ইন্ = সুখী, গুণ + ইন্ = গুণী, ধন + ইন্ = ধনী ; মেধা + বিন্ = মেধাবী, মায়া + বিন্ = মায়াবী।

কার্য বা জীবিকা অর্থে তা, অ, য, ইক (তা, ত্ব, ষ্ণ, বৃষ্ণিক)

নেতার কার্য + নেতৃত্ব, শিক্ষকের কার্য = শিক্ষকতা, চোরের কার্য = চৌর্য, সারথির কার্য = সারথ্য, তাম্বুল বিক্রয় জীবিকা যাহার = তাম্বুলিক।

ভাব বা ধর্ম বুঝাইতে তা, ত্ব—জড় + তা = জড়তা, সাধু + তা = সাধুতা, মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব, মনুষ্য + ত্ব = মনুষ্যত্ব।

উৎপন্ন জাত অর্থে ইক, ইত—মাসে মাসে উৎপন্ন = মাসিক, পুষ্প জন্মিয়াছে যাহাতে = পুষ্পিত।

সাদৃশ্য বা স্থানীয় অর্থে বৎ—পিতার মত = পিতৃবৎ, মাতার মত = মাতৃবৎ, ভ্রাতার মত = ভ্রাতৃবৎ।

কিঞ্চিৎ ন্যূন অর্থে কল্প—মৃত হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = মৃতকল্প, ইন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = ইন্দ্রকল্প, পিতা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = পিতৃকল্প, ঋষি হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = ঋষিকল্প।

সম্বন্ধীয় অর্থে ইক, ইয়, ইন

শরীর + ইক (শরীর সম্বন্ধীয়) = শারীরিক, বিদেশ + ইক (বিদেশ সম্বন্ধীয়) = বৈদেশিক, এইরূপ—তার্কিক, দার্শনিক, বৈদিক, নৈতিক। দেশ + ঈয় (দেশ সম্বন্ধীয়) = দেশীয়, এইরূপ—জলীয়, বাষ্পীয়, শাস্ত্রীয়। সর্বজন সম্বন্ধীয় = সর্বজনীন, সার্বজনীন সার্বজনিক।

[বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়]

জীবিকা, কার্য বা ভাব অর্থে ই, ঈ, মি, গিরি, পনা প্রভৃতি

সাহেব + ই (সাহেবের ভাব) = সাহেবি, ডাক্তার + ই (ডাক্তারের ব্যবসা)

ডাক্তারি, এইরূপ—উকিলের ব্যবসা = ওকালতি, বড়র ভাব = বড়াই, বামুনের ভাব = বামনাই, চালাকের ভাব = চালাকি, ঢাক বাজান জীবিকা যাহার = ঢাকী, ঢোল বাজান জীবিকা যাহার = ঢুলী, ভিক্ষা করা জীবিকা যাহার = ভিখারি, কাঁসার কাজ করে যে = কাঁসারি, শাঁখার কাজ করে যে = শাঁখারি, কুঁড়ের ভাব = কুঁড়েমি, ছেলের ভাব = ছেলেমি, বুড়োর ভাব = বুড়োমি, পাকার ভাব = পাকামি, ফাজিলের ভাব = ফাজলামি, পাগলের ভাব = পাগলামি, জ্যাঠার ভাব = জ্যাঠামি, গিন্নির ভাব = গিন্নিপনা, দুরন্তের ভাব = দুরন্তপনা, বেহায়ার ভাব = বেহায়াপনা।

আগত, উৎপন্ন, নির্মিত, জাত, নিপুণ, অর্থে ই, আই, আ প্রভৃতি

পাটনা + ই (পাটনায় উৎপন্ন) = পাটনাই, এইরূপ—পাবনায় উৎপন্ন = পাবনাই, ঢাকায় উৎপন্ন = ঢাকাই, বিলাতে উৎপন্ন = বিলাতী, পাঞ্জাবে উৎপন্ন = পাঞ্জাবী, জাপানে নির্মিত = জাপানী, কাবুলে প্রস্তুত = কাবুলী, হিসাবে নিপুণ = হিসাবী, সেতারে নিপুণ = সেতারি, আলাপে নিপুণ = আলাপী, চীন হইতে আগত = চীনা, মহিষ হইতে উৎপন্ন = ভঁয়সা।

আদর অর্থে আই

কানু + আই = কানাই, মাধব + আই = মাধাই, বলদেব + আই = বলাই।

অস্তি অর্থাৎ আছে এই অর্থে আল

দাঁত + আল (দাঁত আছে যাহার) = দাঁতাল, লাঠি আছে যাহার = লাঠিয়াল, লেঠেল, জোর আছে যাহার = জোরাল, এইরূপ—শাঁসাল, সারাল, ধারাল, জঁাকাল, জমকাল, ঝাঁঝাল, দুধাল।

সম্বন্ধীয় অর্থে উয়া, ও, এ প্রভৃতি

গাছ সম্বন্ধীয় = গেছো, ধান সম্বন্ধীয় = ধেনো, বন সম্বন্ধীয় = বুনো, ঘর সম্বন্ধীয় = ঘরোয়া, বাঁদর সম্বন্ধীয় = বাঁদুরে।

তুল্য ও ঈষৎ অর্থে আনা, টে

ঈষৎ রোগা = রোগাটে, ঈষৎ ধোঁয়াযুক্ত = ধোঁয়াটে, ঈষৎ ঘোলা = ঘোলাটে, তামার মত = তামাটে, ক্ষেপার মত = ক্ষেপাটে, জলের মতন = জলপানা।

বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঃ

আন, ওয়ান—বাগ + আন (বাগ আছে যাহাতে) = বাগান, গাড়ী + ওয়ান (গাড়ী চালায় যে) = গাড়োয়ান, দ্বার + ওয়ান (দ্বার রক্ষা করে যে) = দ্বারোয়ান, দরোয়ান।

আনা, আনি—বাবু + আনা (বাবুর ভাব) = বাবুয়ানা, বিবির ভাব = বিবিয়ানা, হিন্দু + আনী (হিন্দুর ভাব) = হিন্দুয়ানী, গরীবের ভাব = গরীবানা, সাহেবের ভাব = সাহেবিয়ানা।

খানা—ছাপা + খানা (ছাপার স্থান) = ছাপাখানা, মুদী + খানা (মুদীর দোকান) = মুদীখানা, বৈঠক + খানা (বসার স্থান) = বৈঠকখানা, নহবৎ বাজে যেখানে = নহবৎখানা, গোসল (স্নান) করা হয় যেখানে = গোসলখানা।

খোর—গুলি + খোর (গুলি খায় যে) = গুলিখোর, এইরূপ,—গাঁজাখোর, আফিংখোর, ঘুষখোর।

কর, গর—সওদা + গর (যে সওদা করে) = সওদাগর, কারু + কর (যে কারু করে) = কারিকর, কারিগর।

গিরি—মুটিয়া + গিরি (মুটিয়ার কাজ) = মুটিয়াগিরি, এইরূপ,—কেরাণী-গিরি, দারোগাগিরি, বাবুগিরি, গোয়েন্দাগিরি, গুরুগিরি।

চা, চি, দান, দানী—ডেক + চি (ছোট ডেক) = ডেকচি, নল + চা (ছোট নল) = নলিচা, দোয়াত + দানী (দোয়াতের আধার) = দোয়াতদানী, ধুনা + চি (ধুনার আধার) = ধুনুচি, বেঙ্ + চি (ছোট ব্যাঙ) = বেঙাচি, নস্য + দানী (নস্যের আধার) = নস্যদানী, পিক + দান (পিক ফেলিবার পাত্র) = পিকদানী, নিমক + দান (নিমকের আধার) = নিমকদান।

দার—জমি + দার (জমি আছে যাহার) = জমিদার, বাজনা + দার (বাজায় যে) = বাজনদার, ভাগ + দার (ভাগ আছে যাহার) = ভাগীদার এইরূপ,—অংশীদার, মজাদার, বুটিদার, জিম্মাদার, চটকদার, চৌকি + দার (চৌকি দেয় যে) = চৌকিদার, চড় (চড়া) + দার (চড়ে যে) = চড়নদার।

সই—টেক্ + সই (টেকার যোগ্য) = টেকসই, মানান + সই (মানানের যোগ্য) = মানানসই, পছন্দ + সই (পছন্দের উপযুক্ত) = পছন্দসই, প্রমাণ + সই (প্রমাণের উপযুক্ত) = প্রমাণসই।

পদ-পরিবর্তন

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য হইতে বিশেষণ—

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অগ্নি	আগ্নেয়	দংশন	দষ্ট
অধুনা	আধুনিক	দিন	দৈনিক
অবধান	অবহিত	ধ্যান	ধ্যেয়
অনুরাগ	অনুরক্ত	নক্ষত্র	নাক্ষত্রিক
অনুবাদ	অনূদিত	নিধন	নিহত
অরণ্য	আরণ্য	নিশা	নৈশ
অনুভব	অনুভূত	নিন্দা	নিন্দিত, নিন্দার্হ
আঘাত	আহত	পশু	পাশব, পাশবিক
আয়ু	আয়ুষ্মান	পুর	পৌর
আরোহণ	আরূঢ়	পরলোক	পারলৌকিক
আহ্বান	আহূত	পিতা	পৈতৃক
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক, ইষ্ট	প্রাচী	প্রাচ্য
ইহ	ঐহিক	প্রণাম	প্রণম্য
ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক	প্রমাণ	প্রামাণ্য
ঈশ্বর	ঐশ্বরিক	ফেন	ফেনিল
উন্মাদ	উন্মত্ত	বধ	বধ্য
উদ্ভব	উদ্ভূত	অতিথি	আতিথেয়
ঋষি	আর্ষ	অধ্যয়ন	অধীত
গ্রহণ	গৃহীত	অণু	আণবিক
গ্রাম	গ্রাম্য	অভিধান	অভিহিত
চক্ষু	চাক্ষুষ	অভ্যাস	অভ্যস্ত
চন্দ্র	চান্দ্র	অকস্মাৎ	আকস্মিক
জন্তু	জান্তব	অংশ	আংশিক
জ্ঞান	জ্ঞেয়	আদি	আদ্য
দয়া	দয়ালু	আশ্বাস	আশ্বস্ত
দর্শন	দার্শনিক	ইতিহাস	ঐতিহাসিক

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
উদ্যম	উদ্যত	বিমান	বৈমানিক
উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক	বিষাদ	বিষণ্ণ
কায়	কায়িক	বৈশাখ	বৈশাখী
গিরি	গৈরিক	ভয়	ভীত
গ্রাস	গ্রস্ত	ভূমি	ভৌম
জটা	জটিল	ভোজন	ভোজ্য, ভুক্ত
জগত	জাগতিক	মন	মানসিক
ত্যাগ	ত্যক্ত	মোচন	মুক্ত
দহন	দাহ্য	মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়
দম্পতি	দাম্পত্য	মেধা	মেধাবী
দেব	দৈব	লোভ	লুব্ধ
নগর	নাগরিক	শরৎ	শারদ, শারদীয়
নাশ	নষ্ট	ভ্রম	ভ্রান্ত
নীতি	নৈতিক	সমুদ্র	সামুদ্রিক
পঙ্ক	পঙ্কিল	সম্প্রতি	সাম্প্রতিক
পান	পীত, পানীয়, পেয়	স্পর্শ	স্পৃষ্ট
		সূর্য	সৌর
পঞ্চবর্ষ	পঞ্চবার্ষিক	হর্ষ	হৃষ্ট
প্রসঙ্গ	প্রাসঙ্গিক	হরণ	হৃত
প্রতীচী	প্রতীচ্য	বরণ	বৃত
প্রশ্ন	পৃষ্ট	বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক
বন	বন্য	ব্যবহার	ব্যবহারিক
বস্তু	বাস্তব	বিপদ	বিপন্ন
বসন্ত	বাসন্ত, বাসন্তী	বিষ্ণু	বৈষ্ণব
বায়ু	বায়বীয়	বুদ্ধ	বৌদ্ধ
বিধি	বৈধ	ভূত	ভৌতিক
ব্যাঘাত	ব্যাহত	ভোগ	ভোগ্য
বিধান	বিহিত	ভূগোল	ভৌগোলিক

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মাংস	মাংসল	সময়	সাময়িক
মুখ	মৌখিক	সংযম	সংযত
মূল	মৌলিক	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
যজ্ঞ	যাজ্ঞিক	স্নেহ	স্নিগ্ধ
লাভ	লব্ধ	স্নায়ু	স্নায়বিক
লবণ	লবণাক্ত	হেম	হৈম
শয়ন	শায়িত	হেমন্ত	হৈমন্তিক
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	হিংসা	হিংস্র, হি

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আদর	আদুরে	কাজ	কেজো
আমোদ	আমুদে	জল	জোলো
গাঁ	গেঁয়ো	তেজ	তেজী
কাবুল	কাবুলি	ভাত	ভেতো
ঘর	ঘরোয়া	ভূত	ভূতুড়ে
ঝগড়া	ঝগড়াটে	মাঠ	মেঠো
দরদ	দরদী	মেয়ে	মেয়েলী
বন	বুনো	পেট	পেটুক
পাথর	পাথুরে	হিংসা	হিংসুটে
মাটি	মেটে	সোনা	সোনালি
বেগুন	বেগুনি	লাজ	লাজুক
পুষ্টি	পোষ্টাই	রঙ	রংদার, রঙীন
খেয়াল	খেয়ালী	সর্বনাশ	সর্বনেশে
গাছ	গেছো		

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য ঃ—

সংস্কৃত প্রত্যয় সাহায্যে

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অধিক	আধিক্য	অলস	আলস্য
অতিশয়	আতিশয্য	অনুকূল	আনুকূল্য
এক	ঐক্য	ঋজু	আর্জব, ঋজুতা
কপট	কাপট্য	করুণ	কারুণ্য
কিশোর	কৈশোর	কুমার	কৌমার্য
কুলীন	কৌলীন্য	কৃপণ	কার্পণ্য
কৃশ	কার্শ্য	গম্ভীর	গাম্ভীর্য
গুরু	গৌরব	উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
চঞ্চল	চাঞ্চল্য	চতুর	চাতুর্য
তরল	তারল্য	দরিদ্র	দারিদ্র্য
দীন	দৈন্য	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
নব	নবত্ব	নবীন	নবীনতা
লাল	লালিমা	দৃঢ়	দৃঢ়তা
প্রচুর	প্রাচুর্য	বীর	বীর্য, বীরত্ব
বিচিত্র	বৈচিত্র্য	মহৎ	মহিমা, মহত্ত্ব
মধুর	মধুরতা, মধুরত্ব, মাধুর্য, মধুরিমা, মাধুরী	রক্ত	রক্তিমা, রাগ
		লঘু	লঘিমা, লঘুত্ব
ললিত	লালিত্য	শিথিল	শৈথিল্য
হ্রস্ব	হ্রাস, হ্রস্বতা	সম	সাম্য, সমতা
শূর	শৌর্য	স্বাদু,	স্বাদ, স্বাদুতা
সুস্থ	স্বাস্থ্য, সুস্থতা		

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় সাহায্যে

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
কুঁড়ে	কুঁড়েমি	গরীব	গরীবানা
মাতাল	মাতলামি	পাকা	পাকামি

বিশেষণ	**বিশেষ্য**	**বিশেষণ**	**বিশেষ্য**
বেহায়া	বেহায়াপনা	ইতর	ইতরামি
ধূর্ত	ধূর্তামি	দুরন্ত	দুরন্তপনা
ভণ্ড	ভণ্ডামি	চালাক	চালাকি
ন্যাকা	ন্যাকামি	পাগল	পাগলামি

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত ধাতু ও প্রত্যয়গুলি যোগ করিয়া শব্দ গঠন কর :—

হন্ + ঘঞ্, হন্ + ত, বৃৎ + শানচ্, বৃধ্ + শানচ, মুচ্ + তি, স্মৃ + অনীয়, স্মৃ + তব্য, দহ্ + ত, স্পৃশ্ + ঘঞ।

২। নিম্নের শব্দগুলি কিভাবে গঠিত হইয়াছে লিখ :—

রাঁধুনি, পাওনা, চোরাই, কাটারি, টনটনানি।

৩। নিম্নের বাক্যাংশগুলির পরিবর্তে একটি করিয়া শব্দ বসাও :—

বাজার হইতে ফিরিয়াছে যাহা, শয়ন করা যায় যাহাতে, যাহা ফুরায় না, যাহা দেওয়া উচিত, যাহা দেওয়া যায় না, জল দান করে যে, সব জানে যে, পূজা করে যে, যাহা দেখা উচিত, অগ্রে জন্মিয়াছে যে, পরে জন্মিয়াছে যে, যাহা জ্বালান যায়, যাহা চিন্তা করা যায় না, যাহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

৪। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলিকে বিশেষ্য পদে পরিবর্তিত কর :—

আবৃত, চালাক, মাতাল, বিরত, নষ্ট, শান্ত, অবসন্ন, পরাভূত, নিহত, চতুর, কৃপণ, পাগল, আরূঢ়।

৫। নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে পরিবর্তিত কর :—

প্রমাদ, লোভ, কাবুল, ঝগড়া, চন্দ্র, সূর্য, স্নেহ, মোহ, বিস্তার, সমাজ, ঢাকা, পরিবার, বিষয়, মেয়ে।

৬। এক কথায় কি হইবে লিখ :—

মহিষ হইতে উৎপন্ন, পাড়াগাঁ হইতে আগত, দালালের কাজ, রাবণের পুত্র, হিঁদুর ভাব, সারথির কাজ, ঘটকের কাজ, বাজনা বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ করে যে।

উপসর্গ

যে সকল অব্যয় ক্রিয়াবাচক শব্দের পূর্বে বসিয়া উহার বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে উপসর্গ বলে। বাংলায় তিন প্রকার উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) সংস্কৃত, (খ) বাংলা ও (গ) বিদেশী।

[সংস্কৃত উপসর্গ]

প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ। এই কুড়িটি সংস্কৃত উপসর্গ সংস্কৃত ধাতুর পূর্বে বসিয়া ক্রিয়াপদের অর্থের নানারূপ পরিবর্তন ঘটায়।

'হৃ' ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হওয়াতে বিভিন্ন অর্থবোধক কত নূতন পদ গঠিত হইয়াছে তাহা দেখা যাইতে পারে :—

প্রহার (আঘাত), সংহার (হত্যা), আহার (ভোজন), বিহার (ভ্রমণ), উপহার (উপঢৌকন), পরিহার (ত্যাগ), উদ্ধার (রক্ষা), ব্যবহার (আচরণ), প্রত্যাহার (ফিরাইয়া লওয়া)। এইরূপ **'দা'** ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ বসাইয়া আমরা বিভিন্ন শব্দ পাই—আদান (গ্রহণ করা), প্রদান (দান করা), উপাদান (উপকরণ), প্রতিদান (পরিবর্তে অন্য বস্তু গ্রহণ)। অনেক সময় দুইটি বা তিনটি উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসিয়া শব্দ গঠন করিয়া থাকে।—অভিনিবেশ (অভি + নি), উপনিবেশ (উপ + নি), প্রত্যাদেশ (প্রতি + আ), অধ্যবসায় (অধি + অব), দুরপনেয় (দুর্ + অপ), দুরভিসন্ধি (দুর্ + অভি + সম)।

বিভিন্ন উপসর্গের দ্বারা বিভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ কয়েকটি দেওয়া হইতেছে

কৃ-ধাতু

লোকটির **আকৃতি** যেমন কুৎসিৎ, তাহার **প্রকৃতিও** সেইরূপ ক্রূর। রোগী **বিকারের** ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল। কাহারও **উপকার** করিবার শক্তি ভগবান দেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও **অপকারও** করিব না। এবার রবীন্দ্রনাথের **প্রতিকৃতিতে** মাল্যদান করা হইবে। তোমার **দুষ্কৃতির** অন্ত নাই, তুমি **নিষ্কৃতি** পাইবে কিসে তাহা ভাবিতেছ

কি ? নিজের **অধিকার** বজায় রাখিবার জন্য আজকাল সকলেই সচেষ্ট। শাসক যদি উদাসীন হন তবে অত্যাচারের **প্রতিকার** করিবে কে ?

জ্ঞা-ধাতু

পিতামাতার **আজ্ঞা** প্রত্যেক সন্তানেরই পালন করা উচিত। অধ্যয়ন করিয়া, বহুদর্শন করিয়া খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মে কিন্তু যথার্থ **প্রজ্ঞা** লাভ করা যায় না। তোমার চেয়ে যে ছোট, তাহাকে কখনও **অবজ্ঞা** করিও না। **প্রতিজ্ঞা** করিলে উহা রক্ষা করিতে হয়। মাথায় আঘাত পাইয়া তিনি **সংজ্ঞা** হারাইয়াছিলেন। **বিজ্ঞানের** চর্চা আধুনিক যুগে খুব ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রহ্-ধাতু

অধ্যয়নে আধুনিক বিদ্যার্থিগণের **আগ্রহ** হ্রাস পাইয়াছে। **যুদ্ধবিগ্রহে** অধিকাংশ লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লাভবান হয় দু'চারজন। সারা বৎসরের খাদ্য **সংগ্রহ** করিয়া রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কৃত্রিম **উপগ্রহ** লইয়া আজকাল বেশ হৈ-চৈ পড়িয়াছে। **অনুগ্রহ** করিয়া আমার বক্তব্যটি ধীরভাবে শুনুন।

নী-ধাতু

বিনয় মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। শুভ **পরিণয়ের** নিমন্ত্রণ ত পাইলাম, কিন্তু যাওয়া হইবে কিনা বলিতে পারিতেছি না। অনেক **অনুনয়** করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না। **অভিনয়** দেখিলাম, কিন্তু ভাল লাগিল না। পল্লী-**উন্নয়ন** ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব। **উপনয়ন** দ্বিজাতির একটি সংস্কার।

গম্-ধাতু

পূর্বের কত **দুর্গম** পথ আজকাল **সুগম** হইয়াছে। **বিগত** দিনের জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ কি ? **বরানুগমনের** সময় স্থির হইয়াছে সন্ধ্যা ছয়টা। যার প্রবেশ-**নির্গমের** কোন জ্ঞান নাই তাহার অভিনয় করা সাজে না। এখন **প্রগতির** যুগ, তোমার এইরূপ মনোভাব বর্জন করাই উচিত।

বদ্‌-ধাতু

অনেকদিন তোমার **সংবাদ** পাই নাই। মিছামিছি গায়ে পড়িয়া **বিবাদ** করিয়া লাভ কি? এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সভায় বিস্তর **প্রতিবাদ** উঠিল। মেঘদূতের বাংলা **অনুবাদের** মধ্যে কাহারটি ভাল হইয়াছে জান কি? মিথ্যা **অপবাদ** দেওয়া একশ্রেণীর লোকের অভ্যাস।

উপসর্গের দ্বারা শব্দ গঠনের নমুনা

(ক) সংস্কৃত উপসর্গ

প্র—প্রভেদ, প্রস্থান, প্রগাঢ়, প্রধান, প্রশংসা, প্রচণ্ড, প্রস্ফুটিত, প্রগতি, প্রণাম, প্রচলন। **পরা**—পরাকাষ্ঠা, পরাঙ্মুখ, পরাজয়, পরাভব, পরামর্শ, পরাক্রম। **অপ**—অপদার্থ, অপকর্ম, অপকৃষ্ট, অপমৃত্যু, অপমান, অপহরণ। **সম**—সম্পর্ক, সম্মুখ, সমুচিত, সঙ্কল্প, সম্ভাষণ, সম্মেলন, সমবেদনা। **নি**—নিষেধ, নিষ্ঠুর, নিক্ষেপ, নিকৃষ্ট, নিবৃত্তি, নিবেদন, নিদারুণ। **অব**—অবসর, অবকাশ, অবগত, অবনত, অবহেলা, অবগুণ্ঠন, অবতরণ। **অনু**—অনুচর, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, অনুকরণ, অনুমতি, অনুষ্ঠান, অনুমান, অনুশীলন, অনুবাদ, অনুক্ষণ, অনুশাসন। **নির্**—নির্ভীক, নিরক্ষর, নিরাশ্রয়, নির্ণয়, নির্বাক, নির্বংশ, নির্গুণ। **দুর্**—দুর্ভিক্ষ, দুর্বল, দুর্গতি, দুশ্চিন্তা, দুরদৃষ্ট, দুশ্চরিত্র। **অভি**—অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, অভীষ্ট, অভিভাষণ, অভিনন্দন, অভিশাপ, অভিযান, অভিসম্পাত, অভিষেক। **বি**—বিখ্যাত, বিস্তৃত, বিক্রয়, বিচার, বিজ্ঞাপন, বিবর্ণ, বিগর্হিত। **অধি**—অধ্যক্ষ, অধ্যবসায়, অধ্যায়, অধিবেশন, অধিকার, অধিত্যকা, অধিরোহণ। **সু**—সুলভ, সুগম, সুদূর, সুহৃদ, সুজলা, সুফলা। **উৎ**—উদ্বাস্তু, উৎসর্গ, উৎক্ষিপ্ত, উৎপীড়ন, উৎপত্তি, উদ্বেগ, উদ্ভূত, উচ্চারণ, উদ্যম, উৎকর্ষ। **অতি**—অতিভোজন, অতিপ্রাকৃত, অত্যাবশ্যক, অত্যাচার, অতিরিক্ত, অতিশয়।

প্রতি—প্রতিঘাত, প্রতিরোধ, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবিধান, প্রতিপালন, প্রতিশ্রুতি, প্রত্যুত্তর। **পরি**—পরিণাম, পরিপন্থী, পরিতৃপ্ত, পরিবর্জন, পরিস্থিতি, পরিতুষ্ট, পরিষ্কার, পরিত্যাগ, পরিগণিত। **অপি**—অপিধান, অপিনদ্ধ, অপিনিহিতি। **উপ**—উপবাস, উপাসনা, উপহার, উপকরণ,

উপনয়ন, উপন্যাস, উপঢৌকন, উপজীবিকা, উপচার, উপদেশ, উপযাচক, উপনিবেশ। **আ**—আচরণ, আকর্ষণ, আরাধনা, আচ্ছাদন, আদেশ, আগমন, আহার, আধার, আদান, আকুল, আকুঞ্চিত, আবেদন, আকণ্ঠ।

(খ) বাংলা উপসর্গ

অ, আ—অভাব, মন্দ ও নিন্দিত অর্থে। যথা,—অবেলা, অপযা, অদিন, আকাট, অজানা, অখুশী, অচেনা, অনামা, অথই, আগাছা, আকাঁড়া, আলুনী, আধোয়া, আছোলা, আচালা, আঘাটা।

অনা—অভাব, অশুভ অর্থে। যথা,—অনাদায়, অনামুখো, অনাসৃষ্টি। **নি**—নাই অর্থে। যথা,—নিঝুম, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ। **ভর**—পূর্ণ অর্থে—ভরপেট, ভরদিন, ভরসাঁজ, ভরপুর। **হা**—নাই অর্থে,—হাভাত, হাঘর, হাপুত।

(গ) বিদেশী উপসর্গ

কতকগুলি আরবী, ফার্সী উপসর্গযুক্ত শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় কয়েকটি ইংরেজি শব্দও বাংলায় উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—

বে—বেআক্কেল, বেকার, বেসুর, বেচাল, বেআইন, বেকায়দা, বেগতিক, বেমালুম, বেরসিক, বেবন্দোবস্ত, বেনামী, বেহাত, বেজার, বেহেড, বেইজ্জত, বেইমান, বেওয়ারিশ, বেকসুর, বেদখল, বেপরোয়া, বেহায়া, বেফাঁস।

না—নাহক, নাছোড, নাচার, নাবালক।

গর—গরমিল, গরহজম, গরহাজির, গরহিসাবী।

দর—দরকচা (দরকাঁচা), দরখাস্ত, দরদালান, দরদস্তুর।

বদ—বদমেজাজ, বদরাগ, বদহজম, বদখেয়াল, বদমাইস।

নিম—নিমরাজি, নিমখুন।

ফি—ফিরোজ, ফিহাত, ফিবছর, ফিসন।

হর—হরদিন, হররোজ।

ইংরেজি **হাফ, ফুল ও হেড** শব্দগুলির বাংলায় উপসর্গরূপে ব্যবহারের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

হাফ-সার্ট, হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-স্কুল, হাফ-টিকিট, হাফ-মোজা, হাফ-হাতা হাফ-গিনি, হাফ-ইয়ার্লি, হাফ-পে।

ফুল-প্যাণ্ট, ফুল-মোজা, ফুল-হাতা, ফুল-সার্ট, ফুল-পে।

হেড-মাষ্টার, হেড-পণ্ডিত, হেড-ক্লার্ক, হেড-আপিস, হেড-কনষ্টেবল, হেড মিস্ত্রী।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উপসর্গযুক্ত পদগুলি দেখাইয়া কোথায় ি অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ হইয়াছে প্রকাশ কর :—

(ক) ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

(খ) নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান সাধুর ধর্ম।

(গ) তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

(ঘ) তোমার এ নাছোড়বান্দা ভাব কেন?

(ঙ) তোমার ভাইয়ের মত বদমেজাজী লোক আমার চোখে পড়ে নি।

২। চারিটি সংস্কৃত উপসর্গ ও চারিটি বাংলা উপসর্গযুক্ত পদ দ্বারা বাক রচনা কর।

৩। গ্রহ্ ও ভূ ধাতুর পূর্বে উপসর্গ বসাইয়া কয়টি শব্দ গঠন করিতে পা লি: এবং শব্দগুলির অর্থ বল।

[নির্দেশক ও অনির্দেশক প্রত্যয়]

বস্তু নির্দেশ করিবার জন্য **টা, টি, টে, গাছি, গাছা, খানি, খান খান** প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয়গুলির প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

টা ও **টি** দুইটিই নির্দেশক প্রত্যয়—বড় জিনিষ বুঝাইবার জন্য **টি** ব্যবহ হয় না। অনাদর, তাচ্ছিল্য বা অশ্রদ্ধার ভাব বুঝাইবার জন্য **টা** ব্যবহ করা হয়।

বাঁদর**টা** এই রোদে গেল কোথায়?

চোরটা-কে ধরতে পারা গেল না।

পক্ষান্তরে টি বক্তার স্নেহ ও আদর বুঝায়।

মেয়েটির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

আমাদের ছেলেটি, নাচে যেন ঠাকুরটি।

তুলনীয়—ওদের ছেলেটা, খায় যেন এতটা, নাচে যেন হাতীটা। **টে** প্রত্যয়ের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, স্বরসঙ্গতির প্রভাবে অনেক সময় **টি টে** হইয়া যায়।

একটা পয়সা, দুটো টাকা, তিনটে আম।

সর্বনাম পদের উত্তব **টি** বা **টা** যুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়। কয়েকটি—কয়েকটা ; যেটি—যেটা ; যতটি—যতটা ; যেমনটি—যেমনটা ; এতটি—এতটা ; এটি—এটা ; কয়টি—কয়টা।

টি, টা-এর মতন **খানি, খানা**তেও অনুরূপ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

খানি, খানা বা খান সংস্কৃত খণ্ড শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আধখানা রুটি অর্থ রুটিব অর্ধেক অংশ।

চারখানা মাছ অর্থ মাছের চারিটি টুকবা।

বইখানা, মুখখানি, পাঁচখানা, চাবিখানি, চেহাবাখানা, বাগানখানা।

সারা দিন রোদে ঘুবে ঘুবে রাধাবিলাসবাবুব **মুখখানি** শুকিয়ে গিয়েছে। দিন রাত পাখাব নীচে বসে বসে সুজনবাবু **চেহারাখানা** বেশ বাগিয়েছেন।

গাছি, গাছা, গাছ—যে সমস্ত জিনিষ দীর্ঘ অথচ দৈর্ঘ্যেব অনুপাতে স্থূলত্ব কম সেই সব জিনিষেব সঙ্গে গাছি, গাছা যোগ করা হয়।

লাঠিগাছা, মালাগাছি, পাঁচ-সাতগাছি লিকলিকে সরু ডাটা, ছ গাছা ক'রে বাবগাছা চুড়ি।

ছবিগাছা, মেয়েগাছি, কলমগাছি—এইরূপ ব্যবহার বাংলায় অচল। অভগ্ন অর্থাৎ অখণ্ড জিনিষ বুঝাইতে **গোটা** ব্যবহৃত হয়।

গোটা কাঁঠাল, গোটা তরমুজ, গোটা চাবেক আম, গোটা দশেক পান্তুয়া।

টুকু, টুকুন, টুক—ক্ষুদ্র বা সামান্য অংশ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় চারসের চালের ভাত ভাতটুকু নয়, পাঁচসেরী হাড়ীব দৈ দৈটুকু নয়।

জলটুকুও পেটে থাকছে না।

আধভরিটেক জর্দা বোজ খেলে অম্বলের আর দোষ কি?

রোদটুকু বেশ মিষ্টি লাগছে। **ক্ষীরটুকু** খেয়ে ফেলুন।

অনির্দেশক প্রত্যয় (ইংরাজি A and An-এর মত) বাংলায় তেমন কিছু নাই। 'এক', শব্দটি অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করে মাত্র।

এক রকম, এক পেয়ালা।

পাঁচটি টাকা দরকার—টি অনির্দেশক।

তোমার দেওয়া টাকা পাঁচটি খরচ হইয়া গিয়াছে। টি-নির্দেশক 'জন' শব্দটিও অনির্দেশকভাবে ব্যবহৃত হয়। তিনজন লোক, সাতজন চোর।

বাক্য-প্রকরণ

[বাক্যের প্রকারভেদ]

অর্থের দিক হইতে বাক্যের শ্রেণীবিভাগ করা যায়, আবার গঠনের দিক হইতেও বাক্যকে কয়েকটি বিশেষ প্রকারে ভাগ করা যায়।

অর্থের দিক হইতে বাক্যের সচরাচর প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :—

(১) **নির্দেশাত্মক**—কোনও কথা সাধারণভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। সুতরাং এই প্রকার বাক্যের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী দেখা যায় (ক) অস্ত্যর্থক ও (খ) নাস্ত্যর্থক।

অস্ত্যর্থক—দয়া পরম ধর্ম।

নাস্ত্যর্থক—দয়ার ন্যায় ধর্ম আর নাই।

(২) **প্রশ্নাত্মক**—কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন,—তুমি কি কাল বাড়ী গিয়াছিলে? তাহারা কি খাইয়াছে?

(৩) **ইচ্ছাত্মক**—ইচ্ছা, আশীর্বাদ প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। যেমন,—তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর। দশের ও দেশের মঙ্গল হোক।

(৪) **অনুজ্ঞাত্মক**—কোন আদেশ বা অনুরোধ এই শ্রেণীর বাক্যে প্রকাশিত হয়। যেমন,—এখন সভা ভঙ্গ হোক। তুমি এখন বাড়ী যাও। আপনারা কাল আসিবেন।

(৫) **কার্যকারণাত্মক**—একটি ঘটনা বা কার্য অন্য একটি ঘটনা বা কার্যের উপর যদি নির্ভর করে, তবে এই শ্রেণীর বাক্য গঠিত হয়। যেমন,—

"যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।"

(৬) **আবেগাত্মক**—ভয়, বিনয় প্রভৃতি মনোভাব এই শ্রেণীর বাক্যে প্রকাশিত হয়। যেমন,—

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !
কি রমণীয় প্রভাত !

বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন না করিয়া নির্দেশাত্মক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে, এবং অস্ত্যর্থক বাক্যকে নাস্ত্যর্থক বাক্যে পরিবর্তনের নাম **বাক্যের রূপান্তর-সাধন।**

[বাক্যান্তরীকরণ]

নির্দেশাত্মক হইতে প্রশ্নবোধক

নির্দেশাত্মক—খাঁটি ঘি আজকাল পাওয়া যায় না।
প্রশ্নবোধক—খাঁটি ঘি আজকাল কোথায়ই বা পাওয়া যায় ?
নির্দেশাত্মক—পৃথিবী গোল।
প্রশ্নবোধক—পৃথিবী কি গোল নয় ?
নির্দেশাত্মক—'পথের পাঁচালী' এ বৎসরের সেরা ছবি।
প্রশ্নবোধক—'পথের পাঁচালী' কি এ বৎসরের সেরা ছবি নহে ?

অনুজ্ঞাত্মক বা আবেগাত্মক হইতে নির্দেশাত্মক

অনুজ্ঞাত্মক—তুমি এখন পড়িতে বস।
নির্দেশাত্মক—আমি আদেশ করিতেছি তুমি এখন পড়িতে বস
অথবা, তোমাকে এখন পড়িতে বসিতে আমি আদেশ করিতেছি
আবেগাত্মক—কী মনোরম সূর্যাস্তের দৃশ্য !
নির্দেশাত্মক—সূর্যাস্তের দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।

অস্ত্যর্থক হইতে নাস্ত্যর্থক

অস্ত্যর্থক—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।
নাস্ত্যর্থক—তুমি ছাড়া কেহ আমার সঙ্গে যাইবে না।
অস্ত্যর্থক—তোমাকে এখন ঘুমাইতে হইবে।
নাস্ত্যর্থক—তোমার এখন না ঘুমাইলে চলিবে না।
অস্ত্যর্থক—আমাদের বাড়ীর সম্মুখে একটি বাগান আছে।
নাস্ত্যর্থক—আমাদের বাড়ীর সম্মুখে যে বাগান নাই তা নয়।
অস্ত্যর্থক—তোমার সম্বন্ধে আমি সর্বদাই চিন্তা করি।
নাস্ত্যর্থক—তোমার সম্বন্ধে যে আমি সর্বদা চিন্তা করি না তা নয়।
অস্ত্যর্থক—নিজের আহার সম্বন্ধে রামবাবু সচেতন।
নাস্ত্যর্থক—নিজের আহার সম্বন্ধে রামবাবু সচেতন নহেন।

গঠনের দিক হইতে আবার বাক্য **তিন শ্রেণীতে** বিভক্ত—সরল, জটিল (মিশ্র) ও যৌগিক। অর্থের কোন তারতম্য না করিয়া এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তিত করা যায়। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

সরল হইতে জটিল (মিশ্র)

সরল—আমি তাহার নাম জানি না।
জটিল—তাহার নাম কি তাহা আমি জানি না।
সরল—মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।
জটিল—যে মিথ্যা কথা বলে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।
সরল—পাপী লোকেরা সর্বদা মানসিক অশান্তি ভোগ করে।
জটিল—যাহারা পাপী লোক তাহারা সর্বদা অশান্তি ভোগ করে।
সরল—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।
জটিল—আমার যতদূর সাধ্য আমি ততদূর চেষ্টা করিব।
সরল—শরণাগত-রক্ষণ সাধুর ধর্ম।
জটিল—যাহারা শরণাগত তাহাদিগকে রক্ষা করা সাধুর ধর্ম।

সরল হইতে যৌগিক

সরল—রান্না করিবার জন্য কাঠ আন।
যৌগিক—রান্না করিতে হইবে, কাঠ আন।
সরল—আমি তোমাদের গ্রামে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম।
যৌগিক—আমি তোমাদের গ্রামে গেলাম ও ফিরিয়া আসিলাম।
সরল—দরিদ্র হইলেও তাঁহার মন ছোট নয়।
যৌগিক—তিনি দরিদ্র কিন্তু তাঁহার মন ছোট নয়।
সরল—সে অসুস্থ বলিয়া পরীক্ষা দিতে পারিল না।
যৌগিক—সে অসুস্থ ছিল, সেইজন্য পরীক্ষা দিতে পারিল না।
সরল—সত্য কথা বলাতে তোমাকে কিছু বলিলাম না।
যৌগিক—তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, এইজন্য তোমাকে কিছু বলিলাম না।

জটিল হইতে সরল

জটিল—তুমি যে পুরস্কার পাইয়াছ এ কথা শুনিয়াছি।
সরল—তোমার পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনিয়াছি।
জটিল—যে মিথ্যা কথা বলে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না।
সরল—মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।
জটিল—যাঁহারা বিনয়ী তাঁহারা কটুকথা বলেন না।
সরল—বিনয়ী লোকেরা কটুকথা বলেন না।
জটিল—তুমি যে ঘরে বসিয়া থাক, উহা এত অন্ধকার কেন?
সরল—তোমার বসিবার ঘর এত অন্ধকার কেন?
জটিল—যে ভদ্রলোকটি গাড়ী চাপা পড়িয়াছিলেন, তিনি এখন ভাল হইয়াছেন।
সরল—গাড়ীচাপা-পড়া ভদ্রলোকটি এখন ভাল হইয়াছেন।

জটিল হইতে যৌগিক

জটিল—যখন বড় হইবে তখন সব কথা বুঝিতে পারিবে
যৌগিক—বড় হও, সব কথা বুঝিতে পারিবে।

জটিল—যদিও সে মূর্খ, তবুও তাহার অহঙ্কার কম নয়।
যৌগিক—সে মূর্খ কিন্তু তাহার অহঙ্কার কম নয়।
জটিল—যদি সত্য কথা বল, তবে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।
যৌগিক—সত্য কথা বল, তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।
জটিল—সেদিন যে বইখানি হারাইয়াছিলাম, আজ তাহা পাইয়াছি।
যৌগিক—সেদিন এই বইখানি হারাইয়াছিলাম, আজ ইহা পাইয়াছি
জটিল—যদি বড়বাজার হইতে মাল কেন, তবে ভাল লাভ হইবে।
যৌগিক—বড়বাজার হইতে মাল কেন, ভাল লাভ হইবে।

যৌগিক হইতে সরল

যৌগিক—দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইলেন এবং কয়েকদিন মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন।
সরল—দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন।
যৌগিক—এখনই বাহির হও, নতুবা সময়মত উপস্থিত হইতে পারিবে না।
সরল—এখনই বাহির না হইলে সময়মত উপস্থিত হইতে পারিবে না।
যৌগিক—আমি পারি নাই কিন্তু তুমি পারিবে।
সরল—আমি না পারিলেও তুমি পারিবে।
যৌগিক—এখন হইতে সাবধান হও, নতুবা শক্ত অসুখ দেখা দিবে।
সরল—এখন হইতে সাবধান না হইলে শক্ত অসুখ দেখা দিবে।
যৌগিক—ছেলেটি অনেক পড়াশুনা করিযাছিল, কিন্তু পাশ করিতে পারে নাই।
সরল—ছেলেটি অনেক পড়াশুনা করিয়াও পাশ করিতে পারে নাই।

যৌগিক হইতে জটিল

যৌগিক—আমার অর্থ নাই, এজন্য আমি দুঃখিত নই।
জটিল—যদিও আমার অর্থ নাই তথাপি আমি দুঃখিত নই।
যৌগিক—সময়ে কাজ করি নাই, অতএব এখন দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

জটিল—যখন সময়ে কাজ করি নাই, তখন দুঃখ করিয়া লাভ নাই।
যৌগিক—সে সারাজীবন খাটিয়া গেল, তবু দারিদ্র্য দূর হইল না।
জটিল—যদিও সে সারাজীবন খাটিয়া গেল, তবু দারিদ্র্য দূর হইল না।
যৌগিক—বাবু না খেয়ে কাছারি চলিয়া গেলেন, তথাপি মা উঠিলেন না।
জটিল—যদিও বাবু না খেয়ে কাছারি চলিয়া গেলেন, তথাপি মা উঠিলেন না।
যৌগিক—এখন অপব্যয় কর, ভবিষ্যতে কষ্টে পড়িবে।
জটিল—যদি এখন অপব্যয় কর, ভবিষ্যতে কষ্টে পড়িবে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে **জটিল** বাক্যে পরিণত কর :—

(১) সুশীলবাবুর বাসা আমি চিনি।
(২) এই নূতন দোকানখানার মালিককে আমরা চিনি না।
(৩) যত্ন বিনা রত্ন লাভ হয় না।
(৪) গৃহহীন, অভিভাবকহীন বালকটির প্রতি সদয় হও।
(৫) অসৎকে ঘৃণা কর।
(৬) অহঙ্কারীকে কেহ ভালবাসে না।
(৭) তোমার শরীরে বল নাই কিন্তু মনে বল আছে।
(৮) কথা শুন, নচেৎ আমি তোমাকে কিছুই দিব না।
(৯) তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু তাঁহার মন উচ্চ।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে **যৌগিক** বাক্যে পরিবর্তন কর :—

(১) যদিও তিনি ধনী, তথাপি তাঁহার অহঙ্কার নাই।
(২) তাঁহার গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।
(৩) যদি কথা না শুন, আমি তোমাকে শাস্তি দিব।
(৪) তুমি আমার বন্ধু বলিয়া তোমাকে কিছু বলিলাম না।
(৫) যখন সাবধান হই নাই, তখন ফল ভুগিতেই হইবে।
(৬) বড় হইতে হইলে আগে ছোট হও।
(৭) লোকটি কৃপণ বলিয়া সকলেই তাহার নিন্দা করে।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে **সরল** বাক্যে পরিবর্তিত কর :—

(১) সে আমার বন্ধু, সেইজন্য তাহাকে স্নেহ করি।
(২) পিতামাতা আমাকে ভালবাসেন কারণ আমি কখনও তাঁহাদের অবাধ্য হই না।
(৩) আর কিছু টাকা দাও, চালাইব কি করিয়া ?
(৪) লোকটি দেখিতে মোটা বটে, কিন্তু গায়ে বিশেষ বল নাই।
(৫) আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়াছি।
(৬) যাহারা কুকর্ম করে, তাহারা তাহার ফলভোগ করে।
(৭) যখন বিপদ আসিবে, তখন আমার পাশে দাঁড়াইও।
(৮) আমি যে সেওড়াফুলি যাইতেছি তাহা তোমাকে কে বলিল ?
(৯) যদিও আমরা দরিদ্র তথাপি আমরা দুঃখী নই।
(১০) তোমরা আমার উপকার করিয়াছ, সেজন্য চিরদিন তোমাদের নিকট ঋণী থাকিব।

[বাচ্য ও বাচ্য-পরিবর্তন]

ক্রিয়া যাহাকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া কার্য সম্পাদিত করে সেই অনুসারে ক্রিয়ার রূপে ভেদ দেখা যায় ; ক্রিয়ার এইপ্রকার রূপভেদের নাম **বাচ্য**।

বাচ্য চার প্রকার—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

কর্তৃবাচ্য : যে বাচ্যে ক্রিয়া কর্তার সহিত প্রধানরূপে অন্বিত হয়, তাহাকে কর্তৃবাচ্য বলে। কর্তৃবাচ্যে কর্তার অর্থই প্রধানরূপে প্রতীত হয়।

আমরা খাইয়াছি। শিশির পড়িতেছে। তাহারা চাঁদ দেখিতেছে।—এই বাক্যগুলির ক্রিয়াপদ কর্তৃবাচ্য।

কর্মবাচ্য : যে বাচ্যে ক্রিয়া কর্মের সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, তাহাকে কর্মবাচ্য বলে। কর্মবাচ্যে কর্মের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীত হয়।

সকর্মক ধাতুই কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হয়। কর্মবাচ্যে কর্মের প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

গ্রামবাসিগণ কর্তৃক দস্যু ধৃত হইয়াছে। বালক দ্বারা চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে।

ভাববাচ্য ঃ যে বাচ্যে ভাব অর্থাৎ ক্রিযাব অর্থই প্রধান, তাহা ভাববাচ্য। ভাববাচ্যেব ক্রিযাপদটি সব সময় প্রথম পুরুষেব হইয়া থাকে। ভাববাচ্যেব ক্রিয়া 'হ' ধাতু হইতে জাত অকর্মক ক্রিয়া।

তাঁহাব খাওয়া হইয়াছে। আমাব যাওযা হইবে না। তোমায় এখন পডিতে হইবে।

ভাববাচ্যে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, কখনও দ্বিতীযা বিভক্তিও হইযা থাকে। আমাকে যাইতে হইবে। তোমাকে যাইতে হইবে।

কর্মকর্তৃবাচ্য ঃ কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মটিকেই কর্তাব মত দেখায়। এখানে ক্রিয়াপদটিব রূপ কর্তৃবাচ্যেব রূপ, কিন্তু ক্রিযাব অন্বয় কর্মেব সহিত। অর্থাৎ কর্তাব সাহায্য ছাডাই এখানে কর্ম সম্পাদিত হয।

ঘণ্টা বাজে। জামা ছেঁডে। বাঁশ ভাঙ্গে। ছেলেটিকে বোগা দেখায ফল পাকে।

বাচ্য-পবিবর্তন বা বাচ্যান্তবীকবণেব অর্থ এক বাচ্যেব বাক্যকে অন্য বাচে ব বাক্যে পবিবর্তন কবা। কেবল ক্রিয়াপদটি পবিবর্তন কবিলে চলে না, সমস্ত বাক্যটিবই পবিবর্তিত রূপ লিখিতে হয।

এই কয়টি পবিবর্তন হইতে পাবে ঃ

(১) কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পবিবর্তন
(২) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পবিবর্তন
(৩) কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পবিবর্তন
(৪) ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পবিবর্তন।

(১) **কর্তৃবাচ্য**—আমি বইখানি পাঠ করিয়াছি।
কর্মবাচ্য—আমাকর্তৃক (আমাদ্বারা) বইখানি পঠিত হইয়াছে।
কর্তৃবাচ্য—তিনি কখনই এই কার্য সম্পাদন কবেন নাই।
কর্মবাচ্য—তৎকর্তৃক (তাঁহাদ্বাবা) কখনই এই কার্য সম্পাদিত হয় নাই
কর্তৃবাচ্য—আমি আকাশে চাঁদ দেখিয়াছি।
কর্মবাচ্য—আমাকর্তৃক আকাশে চাঁদ দৃষ্ট হইয়াছে।
আমাদ্বাবা আকাশে চাঁদ দেখা হইয়াছে।

(২) কর্তৃবাচ্য—আপনি কি এখন যাইবেন ?
ভাববাচ্য—আপনার কি এখন যাওয়া হইবে ?
কর্তৃবাচ্য—আমি এখন শুইতে যাইব।
ভাববাচ্য—এখন আমাকে শুইতে যাইতে হইবে।
কর্তৃবাচ্য—প্রত্যহ আহারের পর তুমি শুইতে যাইবে।
ভাববাচ্য—প্রত্যহ আহারের পর তোমায় শুইতে যাইতে হইবে।

(৩) কর্মবাচ্য—রাবণ রাম কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।
কর্তৃবাচ্য—রাম রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন।
কর্মবাচ্য—শিক্ষক মহাশয় ছাত্রগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।
কর্তৃবাচ্য—ছাত্রগণ শিক্ষক মহাশয়কে অভিনন্দন জানাইয়াছিল।
কর্মবাচ্য—দরিদ্রগণ ধনীদের দ্বারা অনেক সময় উৎপীড়িত হয়।
কর্তৃবাচ্য—ধনীরা দরিদ্রগণকে অনেক সময় উৎপীড়ন করেন।

(৪) ভাববাচ্য—রাত্রিতে আমার কিছু খাওয়া হইবে না।
কর্তৃবাচ্য—রাত্রিতে আমি কিছু খাইব না।
ভাববাচ্য—আপনার কোন্ বাসায় থাকা হয় ?
কর্তৃবাচ্য—আপনি কোন্ বাসায় থাকেন ?
ভাববাচ্য—তোমার আজ বৃষ্টিতে বাহির হওয়া হইবে না।
কর্তৃবাচ্য—তুমি আজ বৃষ্টিতে বাহির হইবে না।

[শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ]

[বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ]

মাথা

(১) তোমার দেখছি অঙ্কে খুব ভাল **মাথা**।
(২) চক্রবর্তী মশাই আমাদের গ্রামের **মাথা**।
(৩) হঠাৎ রাগের **মাথায়** কোন কাজ করা উচিত নয়।
(৪) দিদিমা আদর দিয়ে নাতিটির **মাথা** খেয়েছেন।

(৫) তোমার আচরণে আমাদের সকলের **মাথা** হেঁট হয়েছে।

(৬) একটু উপকার করেই ভেবো না একেবারে **মাথা** কিনে ফেলেছ।

গা

(১) কোনও কাজেই **গা** করছ না কেন ?

(২) **গা** ঢাকা দেওয়া ছাড়া তার আর উপায় কি ?

(৩) সে ভয়ানক দিনের কথা মনে করলে এখনও **গায়ে** কাঁটা দেয়।

(৪) **গায়ে** ফুঁ দিয়ে বেড়ান যাদের অভ্যাস, তাদের উপর কি এত বড় কাজের ভার দেওয়া যায় ?

(৫) সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে ষোলজন ডাকাত একসঙ্গে **গা** ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মুখ

(১) ছেলের **মুখ** চেয়ে এতদিন কোনরকমে বুড়ী বেঁচে ছিল।

(২) **মুখ** নাড়া সহ্য করবো না. **মুখ** সামলে কথা কইবে।

(৩) ভগবান যদি **মুখ** রাখেন তবেই এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

(৪) তোমার **মুখ** ভার দেখছি কেন ?

(৫) তোমাদের **মুখে** ফুলচন্দন পড়ুক।

চোখ

(১) এখনও তোমার **চোখ** ফুটল না।

(২) তোমার **চোখ** রাঙানি সহ্য করবো না।

(৩) গয়লার **চোখের** চামড়া নেই, যে হাবে দুধে জল দিচ্ছে।

(৪) মাঝে মাঝে **চোখের** দেখা যেন পাই।

(৫) **চোখের** মাথা খেয়েছ বুঝি ? ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

(৬) মনকে **চোখ** ঠেরে কিছুই লাভ হয় না।

হাত

(১) **হাত** খরচের টাকা নাই, মাসের শেষে কোথায় **হাত** পাতবো ?

(২) দশজন লোক **হাত** করতে যে পারে, সেইতো ভোট পায়।

(৩) একবার **হাতে** পেলে মজা বুঝিয়ে ছাড়ব।

(৪) ডাক্তারিতে **হাত**-যশই হ'ল বড় কথা।

(৫) **হাতে** কলমে কাজ না করলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

বুক

(১) ভয় কি? সাহসে **বুক** বাঁধ।

(২) **বুক** ঠুকে তো দাঁড়ালে, কিন্তু ওর সঙ্গে পারবে কি?

(৩) বিপদে পরের জন্য এমন **বুক** পেতে দেওয়া আর দেখি নি।

(৪) **বুক** ফাটে তবু মুখ ফুটে না।

বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কড়া—কড়া কথা, কড়া ওষুধ, কড়া আঁচ, কড়া হুকুম, কড়া পাহারা, কড়া মেজাজ, কড়া পাক, কড়া রোদ, কড়া শাসন।

কাঁচা—কাঁচা বয়স, কাঁচা রাস্তা, কাঁচা গাঁথুনি, কাঁচা রং, কাঁচা কাজ, কাঁচা খাতা, কাঁচা পয়সা, কাঁচা দুধ, কাঁচা ছেলে, কাঁচা মাল।

পাকা—পাকা চোর, পাকা কথা, পাকা দেখা, পাকা খাতা, পাকা সোনা, পাকা দলিল, পাকা ঘুঁটি, পাকা মাথা, পাকা হাড়।

ভাঙ্গা—ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা মন, ভাঙ্গা বুক, ভাঙ্গা আসর, ভাঙ্গা হাট, ভাঙ্গা শরীর।

সাদা—সাদা কাগজ, সাদা রং, সাদা চোখ, সাদা কথা, সাদা মন, সাদা মাথা।

মোটা—মোটা গলা, মোটা বুদ্ধি, মোটা কাগজ, মোটা বেতন, মোটা ভাত, মোটা টাকা।

বড়—বড় বৌ, বড় বাড়ী, বড় মন, বড় ঘর, বড় নজর, বড় দিন, বড় কুটুম, বড় বিদ্যা, বড় বাবু, বড় সাহেব, বড় কথা।

ছোট—ছোট মন, ছোট নজর, ছোট লোক, ছোট আদালত, ছোট কাজ, ছোট সাহেব, ছোট জাত।

খোলা—খোলা মন, খোলা কথা, খোলা হাওয়া, খোলা ঘর, খোলা চুল, খোলা রাস্তা।

পোড়া—পোড়া কাঠ, পোড়া কপাল, পোড়া মুখ, পোড়া চোখ, পোড়া ভাগ্য, পোড়া বিধি।

উচ্চ—উচ্চ মূল্য, উচ্চ মন, উচ্চ নজর, উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ বেতন, উচ্চ ধ্বনি, উচ্চ হৃদয়।

নরম—নরম কথা, নরম গলা, নরম মেজাজ, নরম বাজার, নরম মুড়ি, নরম সুর, নরম মাছ, নরম বিছানা।

বাঁকা—বাঁকা সীঁথি, বাঁকা লাঠি, বাঁকা কথা, বাঁকা বুদ্ধি, বাঁকা চাহনি, বাঁকা শ্যাম।

একই ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

লাগা—(১) জামায় কালির দাগ লেগেছে। (২) কাজে মন লাগছে না। (৩) সারাদিনই ছেলেটার পিছনে লেগে আছ দেখছি। (৪) কাপড়ে খোঁচা লেগেছে। (৫) এই কথাটি মনে লাগছে না। (৬) নৌকা ঘাটে লাগল বুঝি? (৭) আগুন লেগেছে কোন্ পাড়ায়? (৮) মুখে শেষ পর্যন্ত চুণকালি লাগল তো? (৯) ভাঙ্গা মন জোড়া লাগে না। (১০) চুল টানছ কেন? লাগছে যে।

উঠা—(১) উঠ শিশু মুখ ধোও। (২) যা খাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই তা উঠে যাচ্ছে। (৩) তোমরা আবার নতুন বাসায় উঠে এলে কবে? (৪) এতসব জিনিস পেয়েও বরকর্তার মন উঠল না। (৫) সরস্বতীপূজায় কত টাকা চাঁদা উঠল? (৬) এ রংটা বোধহয় শেষ পর্যন্ত উঠে যাবে। (৭) তোমার নিশ্চয়ই চোখ উঠেছে। (৮) হাই উঠছে, ঘুম পেয়েছে। (৯) বর্ষা এসে পড়ল, কিন্তু বাজারে পটল উঠছে না কেন?

কাটা—(১) রোগীর এখন তখন অবস্থা, দিন কাটে তো রাত কাটে না। (২) কলেজে ঢুকবার আগে তো বাবলুর এমন তেড়ি কাটা দেখিনি। (৩) ফাঁড়া বোধহয় কাটল। (৪) চিমটি কাটছ কেন? (৫) কোন বই এবার তেমন কাটবে না। (৬) গান গাইলে বটে, কিন্তু তিনবার তাল কাটল। (৭) ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। (৮) ধান কাটা এখন শেষ হয়েছে। (৯) জামা পোকায় কেটেছে।

পড়া—(১) অনেকক্ষণ থেকেই জল পড়ছে। (২) তোমাদের বাইরের ঘরটি তো পড়েই আছে, ঐখানে লাইব্রেরীটা বসালে হয় না? (৩) এবার

শীত পড়ছে না কেন? (৪) কাটারির ধারটা একেবারে পড়ে গিয়েছে। (৫) এই বয়সেই মাথায় এমন টাক পড়ল কেন? (৬) জিনিসপত্রের দাম না পড়লে মধ্যবিত্তের বাঁচা দায়। (৭) দুর্জনের পাল্লায় পড়ে দুর্দশার একশেষ হ'ল। (৮) কিছু কি পড়েছ' যে পাশ করবে?

রাখা—(১) ধামাটা এখানে রাখলে কে? (২) ছেলেটা বেঁচে থাকলে বাপের নাম রাখবে তা বলে দিচ্ছি। (৭) সামান্য অনুরোধটা আশা করি রাখবেন। (৪) গরীবকে প্রাণে মারবেন না, পায়ে রাখবেন। (৫) ছেলেটি কারও কথা গ্রাহ্য করে না, কারও তোয়াক্কা রাখে না।

আসা—(১) অনেকদিনই মনে করি, কিন্তু আসতে পারি না। (২) লিখতে বসলে একটা কথাও মনে আসে না। (৩) দোকানটি কেমন হয়েছে, দু'পয়সা আসছে তো? (৪) ঝড় আসছে আর বাইরে থেকো না। (৫) বিপদ কখনও একা আসে না।

করা—(১) অসুখ করেছে খবর পেয়ে ডাক্তারবাবু গাড়ী করে এলেন। (২) মাসীমা মুখ গম্ভীর করে বসেছিলেন। (৩) ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিন দাগ ওষুধেই তিনি ভাল করে দেবেন। (৪) ইচ্ছা করে সাঁতার কাটি, কিন্তু ভয় করে। (৫) হাট বাজার করব, না ছেলে মানুষ করব, ভেবে পাই না। (৬) হারুর মা অসময়ে আমাদের অনেক করেছে, বরং আমরাই তার কিছু করতে পারিনি।

খাওয়া—(১) পান তামাক না খেয়েই ভাদুড়ী মশাই উঠলেন যে! (২) কথায় কথায় ধমক খেলে কি আনন্দের সঙ্গে কাজ করা যায়? (৩) ঘুষ খাওয়া তার বহুদিনের অভ্যাস, এখন ছাড়া শক্ত। (৪) মাছগুলো সব খাবি খাচ্ছে! (৫) অনেক নুন খেয়েছ' তোমার একাজ করা সঙ্গত হয় নাই। (৬) সামান্য চাকরিটা পাঁচজনে মিলেই খেলে। (৭) সংসারে সবাই হাবুডুবু খাচ্ছে, তুই একজন যা আরামে আছে।

ছাড়া—(১) এই বদ অভ্যাসটা ছাড়। (২) জ্বর ছেড়েছে, আর ভয় নেই। (৩) গলা ছেড়ে গান গাইতে পার না কেন? (৪) জনতা এক্সপ্রেস ঠিক ক'টায় ছাড়ে বল দেখি? (৫) এখন তোমায় ছাড়া হবে না। (৬) নাড়ী ছাড়ছে, এখন হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি? (৭) ছেড়ে কথা কইবার লোকই তিনি কিনা! (৮) মদ ছাড়তে না পারলে শেষ পর্যন্ত চাকরি ছাড়তে হবে।

চলা—(১) এখন বাড়ী চল, অনেক হয়েছে। (২) ঘড়িটার দম ফুরিয়েছে তাই চলছে না। (৩) ছবিটা তো বেশ চলল! (৪) চিরকাল কি সমান চলে? (৫) এ রকম বাঁদরামি এখানে চলবে না। (৬) গানটাই এখন তা হলে চলুক। (৭) ওষুধটা আরও কয়েক সপ্তাহ চলবে। (৮) সৎপথে চল, যা হয় হবে। (৯) বাবা তো চললেন, এখন আমাদের উপায় কি হবে?

দেওয়া—(১) আমাকে কয়েক দিনের ছুটি দিবেন কি? (২) মুলতানী গরু অনেক দুধ দেয়। (৩) এই খবরটি দিয়ে আসবে। (৪) জানলা দাও, ঘরে মশা আসছে। (৫) তারা পরীক্ষা দিতে গেল। (৬) টাকাগুলি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল। (৭) পরের ছেলেকে ভাতকাপড় দিয়ে মানুষ করতে কয়জন পারে? (৮) সেই থেকে কড়া নাড়ছি, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। (৯) চিঠিগুলি ডাকে দিয়ে এস।

যাওয়া—(১) দেশে যাও, এখানে থাকলে শরীর মোটেই ভাল যাবে না। (২) ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে দেখতে পাও না? (৩) মাস গেল, বছর গেল কিন্তু তিনি আর ঘরে ফিরলেন না। (৪) যা মুখে আসে, তাই বলে যাচ্ছে। (৫) এ টাকায় সাত দিনও যাবে না মনে হচ্ছে।

লওয়া, নেওয়া—(১) আরও ভাত নাও, ঝোল নাও। (২) ভগবান, অপরাধ নিও না। (৩) এবার দেখে নেব কত ধানে কত চাল। (৪) বাড়ী-ঘর, চাষবাস, উপার্জনের সব পথই গেল, আর কি নিয়ে পাকিস্তানে পড়ে থাকা! (৫) গোবিন্দবাবু প্রতি রবিবার জোলাপ নিতে ভোলেন না।

ধরা—(১) আগামী রবিবারে আমরা মাছ ধরতে যাব। (২) এ বইখানার যা দাম ধরা হয়েছে তাতে খরচ উঠে লাভ হবে বলে মনে হয় না। (৩) ভাল কথা শুনবে কেন? ওকে যে ভূতে ধরেছে। (৪) ছোড়দাকে ধরে এবার ক্লাবে খেলার ব্যবস্থা করেছি। (৫) সোজা পথ ধরে চল। (৬) দুধটা ধরে গেছে, টের পাচ্ছ না? (৭) চোরদায়ে ধরা পড়েছি নাকি?

বাঁধা—(১) সবাই দল বেঁধে কোন্‌দিকে যাত্রা করছ? (২) সাহসে বুক বাঁধ, ভয় কি? (৩) ট্রাম এ রাস্তার মোড়ে নিশ্চয়ই বাঁধবে। (৪) বিছানা বাঁধতে পারলে না। (৫) কমবেশী নাই, সকলেরই বাঁধা বরাদ্দ। (৬) ওসব বাঁধা বুলি অনেক শুনেছি।

দেখা—(১) তার মুখ দেখলেও পাপ হয়। (২) দেখ তো আকাশে মেঘ আছে কিনা। (৩) ডাক্তার দেখছেন, কিন্তু অসুখ ছাড়ছে না। (৪) চেহারা দেখে বোঝা যায় না যে, ইনি এতবড় একজন ধনী। (৫) ঢের দেখেছি, আর দেখতে চাই না। (৬) আমিও দেখে নেব, এর শোধ তুলবো।

থাকা—(১) গাঁয়ে এখন আর কেউ থাকতে চায় না। (২) যা বললাম তা যেন মনে থাকে। (৩) যা অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানও থাকবে না প্রাণও থাকবে না। (৪) বাজে কথা এখন থাক, কাজের কথা বল (৫) রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়া চাই।

তোলা—(১) ফুল তুলতে তোমরা কে কে যাবে আমার সঙ্গে চল (২) হাত দু'টি মাথার উপর তোল। (৩) বাক্সটা দোতলায় তুলতে পারবে কি ? (৪) এবার বেশী চাঁদা তোলা গেল না। (৫) ছেলেটা আবার হাই তুলছে কেন ? (৬) যা খাচ্ছে মেয়েটি সব তুলে ফেলছে।

টানা—(১) জামাটা টানছ কেন ? (২) একটু টেনে চলতে হবে টাকা তো ফুরিয়ে আসছে। (৩) নিজের ভাইয়ের দিকে টেনে কথা সকলেই বলে। (৪) রাতদিন বসে বসে বিড়ি টানছে, ছেলেটার হ'ল কি ?

ডাকা—(১) তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে হবে। (২) ভগবানকে এক মনে ডাকলে ফল পাবেই। (৩) আজ গঙ্গায় বান ডাকবে। (৪) চৌধুরী মশায়ের নাক ডাকছে, মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে। (৫) জমিটা তিনি নীলামে ডেকে নিয়েছেন। (৬) তাস দেওয়া হয়েছে, কে ডাকবে, ডাকো।

বাক্য-সঙ্কোচন

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে এবং সমাসের সাহায্যে সহজেই বাক্য বা বাক্যাংশকে সঙ্কুচিত বা সংহত করা যায়। বাংলা ভাষায় এইরূপ বাক্য সঙ্কোচন বা **বাক্‌সংহতির** যে বহুল প্রচলন রহিয়াছে নিম্নের তালিকা তাহারই প্রমাণ বহন করে।

জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা।

শুনিবার ইচ্ছা—শুশ্রূষা।

করিবার ইচ্ছা—চিকীর্ষা।
উপকার করিবার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা।
অনুকরণ করিবার ইচ্ছা—অনুচিকীর্ষা।
পান করিবার ইচ্ছা—পিপাসা।
ভোজন করিবার ইচ্ছা—বুভুক্ষা।
হনন করিবার ইচ্ছা—জিঘাংসা।
জয় করিবার ইচ্ছা—জিগীষা।
বরণ করিবার যোগ্য—বরেণ্য
শরণ লইবার যোগ্য—শরণ্য।
স্মরণ করিবার যোগ্য—স্মরণীয়।
নিন্দা করিবার যোগ্য—নিন্দনীয়, নিন্দার্হ।
শ্রদ্ধা করিবার যোগ্য—শ্রদ্ধেয়, শ্রদ্ধার্হ।
ক্ষমা করিবার যোগ্য—ক্ষমার্হ।
প্রশংসা করিবার যোগ্য—প্রশংসনীয়, প্রশংসার্হ।
বিশ্বাস করিবার যোগ্য—বিশ্বাস্য।
যাহা চিবাইয়া খাইতে হয—চর্ব্য।
যাহা চুষিয়া খাইতে হয চোষ্য, চূষ্য।
যাহা চাটিয়া খাইতে হয—লেহ্য।
যাহা পান করিয়া খাইতে হয বা পানের যোগ্য—পেয়, পানীয়।
যাহা ভাসিয়া যাইতেছে—ভাসমান।
যাহা ডুবিয়া যাইতেছে—নিমজ্জমান।
যাহা কেবলই চলিয়াছে—চলমান।
যাহা বহিয়া যাইতেছে—বহমান, প্রবহমান।
যাহা চরিয়া বেড়াইতেছে—সঞ্চরমান।
যাহা উড়িয়া যাইতেছে—উড্ডীয়মান।
যাহা মিলাইয়া যাইতেছে—অপস্রিয়মান
যাহা ঘনাইয়া আসিতেছে—ঘনায়মান।
যাহা ক্রমশ লয় পাইতেছে—বিলীয়মান
যাহা ক্রমশ ক্ষয় পাইতেছে—ক্ষীয়মান।

যাহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে—বর্ধমান।
যাহা রহিয়াছে—বর্তমান।
যাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে—বিবর্তমান।
যাহা অনবরত দুলিতেছে—দোদুল্যমান।
যাহা একবার এদিক একবার ওদিক দুলিতেছে—দোলায়মান।
যে অনবরত কাঁদিতেছে—রোরুদ্যমান।
যাহা দেখা যাইতেছে—দৃশ্যমান।
যাহা দেওয়া যায় না—অদেয়।
যাহা শোনা যায় না—অশ্রাব্য।
যাহা দেখা যায় না—অদৃশ্য, অদর্শনীয়।
যাহা স্পর্শের যোগ্য নহে—অস্পৃশ্য।
যাহার আস্বাদ লওয়া ঠিক নহে—অনাস্বাদ্য
যাহার ঘ্রাণ লওয়া ঠিক নহে—অনাঘ্রেয়।
যাহা পানের যোগ্য নহে—অপেয়।
যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না—অনির্বাচ্য, অনির্বচনীয়।
যাহার পরিমাণ করা যায় না—অপরিমেয়।
যাহা অনুমান করা যায় না—অননুমেয়।
যাহার প্রতিবিধান করা যায় না—অপ্রতিবিধেয়।
যাহার প্রতিকার সম্ভব নহে—অপ্রতিকার্য।
যাহা নিবারণ করা যায় না—অনিবার্য।
যাহা মুছিয়া ফেলা যায় না—অনপনেয়।
যাহা মুছিয়া ফেলিতে কষ্ট হয়—দুরপনেয়।
যাহা ভোলা যায় না—অবিস্মরণীয়।
যাহা পূর্বে কখনও হয় নাই—অভূতপূর্ব।
যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব।
যাহা পূর্বে কখনও শুনা যায় নাই—অশ্রুতপূর্ব।
যাহা পূর্বে কখনও অনুভব করা হয় নাই—অননুভূত
যাহা পূর্বে কখনও আস্বাদন করা হয় নাই—অনাস্বাদিতপূর্ব।
যাহার কোনো শত্রু জন্মে নাই—অজাতশত্রু

যাহার এখনও দাড়ি উঠে নাই—অজাতশ্মশ্রু।
অন্য উপায় নাই যাহার—অনন্যোপায়।
যিনি বিবাহ করেন নাই—অকৃতদার।
যাহার কোথা হইতেও ভয় নাই—অকুতোভয়।
যে নারীর বিবাহ হয় নাই—অনূঢ়া। ×
যে নারীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে—নবোঢ়া। ×
যে নারী কখনও সূর্যের মুখ দেখে নাই—অসূর্যম্পশ্যা। ×
যে নারী পতিপুত্রহীনা—অবীরা। ×
যে নারীর স্বামী বিদেশবাসী—প্রোষিতভর্তৃকা, পথিক-বধূ।
যে নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নাই—বন্ধ্যা
যে নারীর সন্তান হইয়া মরিয়া যায়—মৃতবৎসা
বীর সন্তান প্রসব করেন যিনি—বীরপ্রসূ। ×
রত্নতুল্য সন্তান যে নারীর—রত্নগর্ভা, রত্নপ্রসূ।
সুন্দর দন্তরাজি যে নারীর—সুদতী
যে নারীর হাস্য পবিত্র—শুচিস্মিতা
যে স্ত্রীলোক প্রিয় কথা বলে—প্রিয়ংবদা।
যে নারীর স্বামী মারা গিয়াছে—বিধবা।
একই পতি যাহাদের—সপত্নী।
পত্নী বিয়োগ হইয়াছে যাহার—বিপত্নীক।
জয়লাভ করিতে অভ্যস্ত যে—জিষ্ণু
সহ্য করিতে অভ্যস্ত যে—সহিষ্ণু।
চলিতেই যাহা অভ্যস্ত—চলিষ্ণু।
বৃদ্ধির পথে গতি যাহার—বর্ধিষ্ণু।
ক্ষয়ের পথে গতি যাহার—ক্ষয়িষ্ণু।
ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে—আস্তিক
ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই—নাস্তিক।
যাহা মাটিতে (স্থলে) চরিয়া বেড়ায়—ভূচর, স্থলচর।
যাহা জলে চরিয়া বেড়ায়—জলচর।
যাহা জলে ও স্থলে চরিয়া বেড়ায়—উভচর

যাহা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—খেচর।
ইতিহাসে যিনি পারদর্শী—ঐতিহাসিক
ভূগোল রচনায় যিনি খ্যাতিমান—ভৌগোলিক।
উপন্যাস রচনায় যিনি খ্যাতিমান—ঔপন্যাসিক।
ব্যাকরণে যিনি অভিজ্ঞ—বৈয়াকরণ।
যিনি গুণের সমাদর করেন—গুণগ্রাহী।
গুণ নাই যাহার—নির্গুণ।
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে—কৃতজ্ঞ।
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে—কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ
যাহারা পুনঃ পুনঃ বুকে ভর দিয়া গমন করে—সরীসৃপ।
যাহা বুকে হাঁটিয়া চলে—উরগ।
যাহা আকাশে গমন করে—খগ।
যাহা বক্রগতিতে চলে—জিহ্মগ।
যাহা মাটি ভেদ করিয়া উঠে—উদ্ভিদ।
যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায়—ওষধি
যে গাছের ফুল না হইলেও ফল হয়—বনস্পতি
যে জমিতে দুইরকম ফসল হয়—দো-ফসলী।
যাহা সহজেই পাওয়া যায়—সুলভ।
যাহা পাইতে কষ্ট হয়—দুর্লভ।
পঙ্কে জন্ম যাহার—পঙ্কজ।
সরোবরে জন্মে যাহা—সরোজ, সরসিজ।
মনে জন্মে যাহা—মনোজ, মনসিজ।
যে দুইবার জন্মগ্রহণ করে—দ্বিজ।
যিনি কারও গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই—অজ।
নিজেকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—স্বয়ম্ভূ।
যে গাছ অপর গাছে জন্মে—পরগাছা।
যাহা গাছের মধ্যে গণ্য নহে—আগাছা।
পরের অন্নে যে জীবনধারণ করে—পরান্নজীবী।
যে পরের মুখ চাহিয়া থাকে—পরমুখাপেক্ষী।

যে পরের সৌভাগ্যে কাতর—পরশ্রীকাতর
যে পরিণাম না ভাবিয়া কাজ করে—অপরিণামদর্শী।
যে কোনরূপ বিবেচনা না করিয়াই কাজ করে—অবিমৃষ্যকারী।
যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য।
যে সুপথ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছে—উন্মার্গগামী
যে কর্তব্য স্থির করিতে পারে না—কিংকর্তব্যবিমূঢ়
ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছে যে—জিতেন্দ্রিয়।
যে জীবিত থাকিয়াও মৃতের মত—জীবন্মৃত।
যে পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়—ছিদ্রান্বেষী
যে সব সহ্য করিতে পারে—সর্বংসহ।
যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে—সর্বভুক
যে অতিরিক্ত কথা বলে—বাচাল।
যে স্ত্রীর বশীভূত—স্ত্রৈণ।
যে বিদেশে থাকে—প্রবাসী।
বিদেশে যাহাকে থাকিতে হয় না—অপ্রবাসী।
যে কেবলই একস্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়—যাযাবর।
যে দিবসে একবার আহার করে—একাহারী।
যে নিরামিষ আহার করে—নিরামিষাশী।
যাহা সহজেই পরিপাক হয়—সুপাচ্য, লঘুপাক।
যাহা সহজে পরিপাক হয় না—দুষ্পাচ্য, গুরুপাক।
যাহা কোথাও নীচু কোথাও উঁচু—বন্ধুর।
যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়—ভঙ্গুর।
যাহার মর্ম স্পর্শ করে—মর্মস্পর্শী।
যাহা মর্মে আঘাত করে—মর্মন্তুদ।
নিতান্ত দগ্ধ হয় লোকে যে কালে—নিদাঘ।
যাহার পূর্ব-জন্মের কথা মনে থাকে—জাতিস্মর।
যাহার দুই হাত সমান চলে—সব্যসাচী।
একবার শুনিলেই যাহার মুখস্থ হয়—শ্রুতিধর।
একই গুরুর শিষ্য যাহারা—সতীর্থ

যাহা সর্বজনের সম্বন্ধীয়—সর্বজনীন, সার্বজনীন, সার্বজনিক।
যাহা খুব ঠাণ্ডাও নয় খুব গরমও নয়—নাতিশীতোষ্ণ
যাহা খুব দীর্ঘ নহে—নাতিদীর্ঘ।
যাহা খুব হ্রস্ব নহে—নাতিহ্রস্ব।
সাপ খেলানো বৃত্তি যাহার—সাপুড়ে
লাঠি খেলায় নিপুণ যে—লাঠিয়াল।
খেলায় নিপুণ যে—খেলোয়াড়।
তীর নিক্ষেপে নিপুণ যে—তীরন্দাজ।
গোলা নিক্ষেপে নিপুণ যে—গোলন্দাজ।
যে জামাই শ্বশুরবাড়ী থাকে—ঘরজামাই।
তটে উপস্থিত যে—তটস্থ।
পান করিতে ইচ্ছুক—পিপাসু।
ভোজন করিতে ইচ্ছুক—বুভুক্ষু।
মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক—মুমুক্ষু।
করিতে ইচ্ছুক—চিকীর্ষু।
পথে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা—প্রত্যুদ্গমন।
সতীমাতার সন্তান—সন্মাতুর।
দরবিগলিত ঘর্ম যাহার—গলদ্ঘর্ম।
বাস্তু হারাইয়াছে যে—বাস্তুহারা, উদ্বাস্তু।
অগ্রে জন্ম যাহার—অগ্রজ।
পরে জন্ম যাহার—অনুজ।
বয়সে যে সকলের বড়—জ্যেষ্ঠ।
বয়সে যে সকলের ছোট—কনিষ্ঠ।
সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত—আসমুদ্রহিমাচল।
যাহা একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক, সমকালীন
যাহা প্রতি বৎসর ঘটে—বাৎসরিক।
যাহা প্রতি ছয় মাস অন্তর ঘটে—ষাণ্মাসিক।
যাহা প্রতি তিন মাস অন্তর ঘটে—ত্রৈমাসিক।
যাহা প্রতি মাসে ঘটে—মাসিক।

যাহা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ঘটে—পঞ্চবার্ষিক
যাহা ঈষৎ উষ্ণ—কবোষ্ণ।
যাহা সদ্য দোহনের ফলে উষ্ণ—ধারোষ্ণ।
ধান হইতে উৎপন্ন যাহা—ধেনো।
মাঠ হইতে উৎপন্ন যাহা—মেঠো।
কাঠ হইতে উৎপন্ন যাহা—কেঠো।
মাটি হইতে উৎপন্ন যাহা—মেটে।
যে আট মাসে জন্মিয়াছে—আটাশে।
নাই অন্ত যাহার—অনন্ত।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

১। **অকাল কুষ্মাণ্ড** (কোন কাজের নয়, অপদার্থ)—মুখুজ্জে শায়ের ছেলেটি একেবারে অকাল কুষ্মাণ্ড, না আছে লেখাপড়া, না আছে াজকর্ম।

২। **অগস্ত্য যাত্রা** (চিরকালের জন্য যাওয়া)—মুখে ব'ললাম, "দুর্গা র্গা, স্বচ্ছন্দে ফিরে এসো ভাই;" মনে মনে ব'ললাম, "তুমি যা ধড়িবাজ াবা, এই যাত্রাই যেন তোমার অগস্ত্য যাত্রা হয়!"

৩। **অন্ধের যষ্টি** (একমাত্র অবলম্বন)—বিধবার আর কেউ নেই—ঐ হলেটিই অন্ধের যষ্টি।

৪। **অরণ্যে রোদন** (বৃথা আবেদন)—মুনাফা-শিকারী মালিকের াকট বেতন-বৃদ্ধির আবেদন জানানো অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কি?

৫। **আক্কেল সেলামী** (বোকামির দণ্ড)—তার মতো অপদার্থের াপর নির্ভর করে আমাকে আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে।

৬। **আষাঢ়ে গল্প** (অসম্ভব কাহিনী)—নিজের দোষ ঢাকবার জন্য ামি যে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদলে হে।

৭। **উত্তম মধ্যম** (প্রহার)—এরকম বদমায়েসকে কিঞ্চিৎ উত্তম ধ্যম দেওয়াই উচিত;

৮। **উভয় সঙ্কট** (দুই দিকেই বিপদ)—জমিদারকে তুষ্ট করেন, না াজাদের ঠাণ্ডা করেন, নায়েব মশায়ের হ'ল উভয় সঙ্কট।

৯। একাদশে বৃহস্পতি (প্রভূত সৌভাগ্য)—ব্যবসাতে লাভ হ'ল, ছেলেরও মোটা মাইনের চাকরি হ'ল—হরিবাবুর দেখছি একাদশে বৃহস্পতি।

১০। কলুর বলদ (অন্ধের মত ঘুরে মরা)—মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।

১১। কাঁচা পয়সা (সহজলভ্য নগদ টাকা)—চাষবাসে খেটে পয়সা করতে হতো, এখন চাকরিতে কাঁচা পয়সার মুখ দেখে তার দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে।

১২। কান পাতলা (কোন কথা শুনে বিচার না করে তাইতে বিশ্বাসী)—রামবাবু এদিকে দিলদরাজ কিন্তু বড়ো কানপাতলা, তার উপর লাগাবার লোকের অভাব তো নেই।

১৩। কূপমণ্ডূক (বৃহৎ পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য সংকীর্ণচেতা)—সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হওয়ায় মধ্যযুগের বাঙালী কূপমণ্ডূক হয়ে পড়েছিল।

১৪। কেঁচেগণ্ডূষ (আবার শুরু থেকে আরম্ভ)—দেবনাগরী হরফ ভুলেই গিয়েছিলাম, বুড়ো বয়সে এখন কেঁচেগণ্ডূষ করতে হচ্ছে।

১৫। গড্ডলিকা প্রবাহ (ভেড়ার মতো গতানুগতিকতার বশবর্তী)—বাঙালী আজ স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম, গড্ডলিকা প্রবাহের মতো পরানুগামী।

১৬। তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত)—একটু জলের জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছি।

১৭। ধর্মের ষাঁড় (নিষ্কর্মা)—শিবুদা তো ধর্মের ষাঁড়ের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৮। গোবর গণেশ (অপদার্থ)—শ্যামবাবু বুদ্ধিমান ও করিৎকর্মা, কিন্তু তাঁর ছেলেটি গোবর গণেশ, মাথায় যদি কিছু ঢোকে।

১৯। গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা)—আর গৌরচন্দ্রিকা করতে হবে না, যা বলবার আছে সংক্ষেপে বলে ফেল।

২০। বাস্তু ঘুঘু (মতলববাজ)—নিমাইবাবুকে চেনো নি, একটি আসল বাস্তু ঘুঘু।

২১। চাঁদের হাট (সৌন্দর্যের সমাবেশ)—সাত ভাই আর একটি বোন, গাছের নীচে যেন চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছে।

২২। **চিনির বলদ** (যাহা ভোগ করা যায় না এমন জিনিসের ভার-বাহী)—ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী চিনির বলদ ছাড়া আর কি, টাকা গোনাই সার।

২৩। **চোরা বালি** (অলক্ষ্য বিপদ)—জীবনের পথে কত যে চোরাবালি আছে!

২৪। **ডান হাতের কাজ** (আহার)—বিয়ে পরে দেখো, এখন ডান হাতের কাজটা সেরে নাও।

২৫। **ডুমুরের ফুল** (দুর্লক্ষ্য)—আর যে তোমায় দেখতেই পাই না, ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে।

২৬। **ঢাকের বাঁয়া** (যে কোনো লোকের প্রতি কাজে বা কথায় সায় দেয়)—তুমি তো সব তাতেই সায় দিয়ে তার ঢাকের বাঁয়া হয়ে আছ।

২৭। **দক্ষযজ্ঞ** (লণ্ডভণ্ড ব্যাপার)—পাগলা হাতী ক্ষেপে গিয়ে মেলাটাকে একেবারে দক্ষযজ্ঞ করে তুলল।

২৮। **দুষ্টা সরস্বতী** (দুষ্ট বুদ্ধি)—সে তো আমাদের ভাল কথা শুনবে না, মাথায় দুষ্টা সরস্বতী ভর করেছে।

২৯। **ননীর পুতুল** (আদরে লালিত, কষ্ট সহিতে অক্ষম)—তোমার ঠাকুমা তোমাকে ননীর পুতুল করে মানুষ করেছেন, তুমি কি আর আমাদের মত কষ্ট সইতে পার?

৩০। **পায়া ভারি** (দেমাক)—দু'পয়সা হয়ে আজকাল ভজহরির পায়া ভারি হয়েছে।

৩১। **পুকুর চুরি** (অবিশ্বাস্য রকমের চুরি)—পাঁচ বিঘে জমির ধান গেল কোথায়? তুমি যে পুকুর চুরি আরম্ভ করেছ দেখছি!

৩২। **পোয়া বারো** (খুব সুবিধা)-জমিদার তো শহরে গেছে, নায়েবের এখন পোয়া বারো।

৩৩। **বকধার্মিক** (ধর্মের আবরণে শঠ)—বকধার্মিক মোড়ল বারোয়ারীর ঘরের নামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপ করে নিলে।

৩৪। **বালির বাঁধ** (অস্থায়ী)—'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥'

৩৫। **ব্যাঙের আধুলি** (অল্পবিত্তের সামান্য ও একমাত্র সম্পত্তির গর্ব)—সেই জমিটুকুর দরুণ মাসিক কুড়ি টাকা, এই এখন হারাধনের ব্যাঙের আধুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩৬। **ব্যাঙের সর্দি** (অতিমাত্রায় অভ্যস্ত যে, তার অনুভূতির অভাব)—সারাদিন মাঠে কাজ করি আর এইটুকু রোদে যেতে কষ্ট হবে! ব্যাঙের আবার সর্দি।

৩৭। **ভরাডুবি** (সর্বনাশ)—ব্যবসা চলছিল মন্দ নয়, হঠাৎ শেয়ার মার্কেট প'ড়ে গিয়ে ভরাডুবি হয়ে গেল।

৩৮। **ভূষণ্ডী কাক** (প্রাচীন ব্যক্তি)—আমি আর এসব ব্যাপার জানি না, আমি কি এ যুগের লোক, আমি হচ্ছি ভূষণ্ডী কাক।

৩৯। **শিরে সংক্রান্তি** (আসন্ন বিপদ)—তোর না শিরে সংক্রান্তি, এখনও সন্ধ্যে বেলা আড্ডা চলছে? বলি, পরীক্ষার আর কটা দিন আছে?

৪০। **সাক্ষী গোপাল** (নামমাত্র কর্তা)—ছেলেরাই যা করবার করে, আমি তো সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে আছি।

৪১। **সোনায় সোহাগা** (যোগ্য সংযোগ)—এমন গাইয়ে, তার সঙ্গে ভাল বাজিয়ে পাওয়া গেলে তো সোনায় সোহাগা।

৪২। **স্বখাত সলিল** (নিজকৃত বিপদ)—'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

৪৩। **হাত টান** (চুরির অভ্যাস)—নূতন চাকরটার একটু হাতটান আছে।

৪৪। **হাতের পাঁচ** (অতিরিক্ত নিশ্চিত পাওনা)—ব্যবসায়ে চেষ্টা কর, হাতের পাঁচ জমিজমা তো আছেই।

৪৫। **রাবণের চিতা** (অনির্বাণ জ্বালা)—বঙ্গবিচ্ছেদের পর থেকে ওঁদের বুকে যেন রাবণের চিতা জ্বলছে।

৪৬। **শাঁখের করাত** (উভয়ত বিপদ বা ক্ষতি)—বাবা, জানো না তো, আদালত হলো শাঁকের করাত!—যেতে কাটে, আসতে কাটে!

৪৭। **শাপে বর** (মন্দ অভিপ্রায়ে ভালো ফল)—বিমাতার ক্রূর বঞ্চনা মহিমের শাপে বর হলো, কারণ সম্পত্তিচ্যুত হয়েছিল বলেই আজ সে নিজের চেষ্টায় এত বড় ব্যবসায়ের মালিক।

৪৮। **শিবরাত্রির সলতে** (একমাত্র ক্ষীণ সম্বল)—ঐ রুগ্ন ছেলেটি মিত্তির বংশের শিবরাত্রির সলতে।

৯। শ্মশান বৈরাগ্য (সাময়িক বৈরাগ্যের ভাব)—ছেলেদের ব্যাপার দেখে মধুবাবুর শ্মশান বৈরাগ্য এসে গেল।

৫০। সোনার পাথর বাটি (অসম্ভব বিষয়)—এ যুগে দল-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সোনার পাথর বাটি। [অনুরূপ 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব']

৫১। ঠোঁট কাটা (স্পষ্ট বক্তা)—লোকটা কী রকম ঠোঁট কাটা—কিছু রেখে ঢেকে বলে না।

৫২। গোড়ায় গলদ (মূলেই ভুল)—তুমি তাহ'লে যদু নও সিধু,—আমার গোড়ায় গলদ হয়েছে। [অনুরূপ—'বিসমিল্লায় গলদ']

৫৩। রাঘব বোয়াল (সর্বগ্রাসী বড়ো লোক)—সুরেনবাবু একটি রাঘব বোয়াল, কত সম্পত্তি যে গ্রাস করেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই।

৫৪। বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য জিনিস)—তুমি একবার বললে, পয়সা পেলেই আমি বাঘের দুধ এনে দিতে পারি।

৫৫। গোকুলের ষাঁড় (নিষ্কর্মা)—ছেলে ক'টি গোকুলের ষাঁড়, খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়।

৫৬। আদায় কাঁচকলায় (বিরুদ্ধ ভাব)—তাতে আমাতে আদায় কাঁচকলায় হয়ে আছে।

৫৭। রাহুর দশা (ক্ষতির সময়)—ব্যবসায় ক্ষতি হ'ল, জমিজমা ভেসে গেল—তার দেখছি রাহুর দশা চলেছে। [অনুরূপ 'শনির দশা']

৫৮। সুখের পায়রা (যারা কেবল সুখই খোঁজে)—অনেক বন্ধুই সুখের পায়রা, দুঃখের দিনে দেখা যায় না।

৫৯। মাটির মানুষ (শান্ত প্রকৃতি)—বিধুবাবু মাটির মানুষ, কোন আঘাতেই চটেন না।

৬০। জিলিপির প্যাঁচ (কুটিলতা)—তোমার মনে মনে যে জিলিপির প্যাঁচ দেখছি।

৬১। কথার কথা (গুরুত্বহীন উক্তি)—ও একটা কথার কথা—ওটা ধরে বসে থাকলে চলে না।

৬২। মগের মুল্লুক (অরাজক রাজ্য)—এত দাম নিয়ে এই বাজে জিনিস দেবে—এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ?

৬৩। **চোখের বালি** (চরম বিরাগভাজন)—আমি এখন হয়েছি তার চোখের বালি, তাই পাশ দিয়ে গেলেও কথা বলে না।

৬৪। **মাছের মা** (বহুজনের বা বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন)—অমন দু'চারটে গেল আর এল—মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক!

৬৫। **আমড়া কাঠের ঢেঁকি** (অপদার্থ)—লোকটি একটি আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

৬৬। **তুলসী বনের বাঘ** (ভণ্ড ধার্মিক)—নায়েব মহাশয়ের মুখে রাধাকৃষ্ণ, কিন্তু আসলে উনি তুলসী বনের বাঘ।

৬৭। **উপুড় হস্ত** (দেওয়া)—খালি নিয়েই যাচ্ছ, উপুড় হস্ত করার নাম নেই।

৬৮। **কালনেমির লঙ্কা ভাগ** (কোনো কিছু পাওয়ার আগেই সে সম্পর্কে চিন্তা)—বাগানের এখন কোথায় কি? আর তুমি মনে মনে লঙ্কা ভাগ করছ।

৬৯। **তাসের ঘর** (পলকা)—তোমার এ পরিকল্পনা তাসের ঘর, দু'দিন পরে ভেঙে যাবে।

৭০। **বুদ্ধির ঢেঁকি** (বুদ্ধিহীন)—'হুকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে, বেটা বুদ্ধির ঢেঁকী।'

৭১। **গভীর জলের মাছ** (সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে)—ঐ সব ব্যবসাদার গভীর জলের মাছ, ওদের ধরা-ছোঁওয়া শক্ত!

৭২। **শেয়াল রাজা** (ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বড়ো)—এই বনগাঁয়ে রামধন শর্মাই শেয়াল রাজা। [অনুরূপ 'শেওড়াতলার চক্রবর্তী']

৭৩। **অষ্টরম্ভা** (কিছুমাত্র না)—কথা বলছ লম্বা লম্বা, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

৭৪। **বাড়া ভাতে ছাই** (প্রায় লাভের অবস্থায় ক্ষতি)—আড়তদার চাল কিনে চড়া মুনাফা করবে ভেবেছিল, কিন্তু সরকারি রেশনব্যবস্থা তার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে গেল।

৭৫। **পাথরে পাঁচ কিল** (সৌভাগ্যসূচক অবস্থা)—এ মোকদ্দমা যদি জিতি তো পাথরে পাঁচ কিল।

৭৬। **ভাঁড়ে মা ভবানী** (শূন্যগর্ভ অবস্থা)—এখন অনেক জমিদার বংশের বাইরের ঠাট ঠিক আছে, আসলে ভাঁড়ে মা ভবানী।

৭৭। **বুকের পাটা** (সাহস)—ছেলেটার বুকের পাটা দেখেছ?

৭৮। **মাথার ঠাকুর** (পূজ্য)—তুমি যদি একাজ করতে পার, তাহলে তোমাকে মাথার ঠাকুর করে রাখব।

৭৯। **ভূতের বেগার** (প্রতিদানহীন খাটুনি)—সারাদিন ভূতের ব্যাগার খাটতে খাটতে প্রাণ গেল।

৮০। **আকাশ কুসুম** (অসম্ভব আশা)—উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেকে বিলেতে পাঠানো আমার মতো মবা গরীবের পক্ষে আকাশ কুসুম ছাড়া আর কী বলুন?

৮১। **তালপাতার সেপাই** (অত্যন্ত রোগা)—ছেলেটি বিদ্বান বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যটি যা, একেবারে তালপাতার সেপাই।

৮২। **সাপের পাঁচ পা** (অতিরিক্ত বাড়ানি)—যা খুশি তাই করবে—সাপের পাঁচ পা দেখেছ না কি?

৮৩। **হাতযশ** (সুনাম)—কলেরা কেসে নন্দ ডাক্তারের বেশ হাতযশ আছে।

৮৪। **আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ** (আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য শ্রীবৃদ্ধি)—তেলের কল করে ভজহরি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

৮৫। **আকাশ পাতাল** (সুদূর পার্থক্য)—তোমাতে আর তাতে আকাশ পাতাল তফাত। (বিস্তৃত পরিসর) প্রশ্ন শুনে সে আকাশ পাতাল ভাবতে সুরু করল।

৮৬। **যক্ষের ধন** (ব্যয় না করিয়া রক্ষিত সম্পত্তি)—রামহরি পুকুরের মাছগুলোকে যক্ষের ধনের মতো আগলে আছে।

৮৭। **বিড়াল তপস্বী** (ভণ্ড ধার্মিক)—সব দুষ্কর্মের মূল তুমি এখন বিড়ালতপস্বী সেজে বসে আছ।

৮৮। **সাতপাঁচ** (সব দিক)—আমি তো আর সাত পাঁচ ভেবে একথা বলিনি।

৮৯। **দা-কুমড়ো** (অত্যন্ত বিরুদ্ধতা)—ছোটোবেলায় ওরা দু'জন

ছিল হরিহর আত্মা, এখন বিশেষ করে ঐ বাগানটা নিয়ে মামলা রুজু হওয়ার পর থেকে, ওদের মধ্যে হয়েছে দা-কুমড়ো সম্পর্ক।

৯০। **আমড়া-গাছি** (অতিরিক্ত তোষামুদি)—থাক্ থাক্, তোমাকে আর আমায় আমড়া-গাছি ক'রতে হবে না, আমি ঢের ঢের তোষামুদে দেখেছি।

৯১। **কাষ্ঠহাসি** (কৃত্রিম হাসি)—সরকার মশাই কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "বেশ তো, মামলায় জিত, এ তো সুখবর!'

৯২। **হ-য-ব-র-ল** (এলোমেলো)—সে কী সব হ-য-ব-র-ল বলে গেল, কিছুই বুঝলাম না।

৯৩। **নেই আঁকড়া** (জেদী, নাছোড়বান্দা)—সে নেই-আঁকড়া হয়ে টাকা ধার চাইলে।

৯৪। **তালকানা** (ভালো করে যে দেখে না ; সাধারণ বোধশক্তি-হীন)—সে এমন তালকানা, কাকে কী বলবে খেয়াল করলে না।

৯৫। **ভিজে বেড়াল** (আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুষ্ট)—সারাদিন দুষ্টুমি করে এখন ভিজে বেড়ালটি সেজে বসে আছ।

৯৬। **পুঁটিমাছের প্রাণ** (অল্পশক্তি সম্পন্ন)—আমাদের পুঁটি মাছের প্রাণ, অত কি আর সহ্য হয়।

৯৭। **ঝাঁকের কই** (দলের একজন)—শহর থেকে গ্রামে ফিরে চাষীটি ঝাঁকের কই ঝাঁকে ভিড়ল।

৯৮। **বিদুরের ক্ষুদ** (প্রীতির সহিত প্রদত্ত সামান্য বস্তু)—কী আর দিতে পারব, বিদুরের ক্ষুদ এই যা আছে।

৯৯। **আঠার মাসে বছর** (দীর্ঘসূত্রতা)—তার তো আঠারো মাসে বছর—কাজটা কবে শেষ করবে কে বলতে পারে।

১০০। **মিছরির ছুরি** (বাহ্যতঃ মিষ্ট প্রকৃতপক্ষে কটুবাক্য)—আহা, তো কথা নয় মিছরির ছুরি, বুকে একেবারে বিঁধে যায়।

১০১। **হাতে খড়ি** (প্রথম শিক্ষা)—এ বিদ্যায় তার কাছে আমার হাতে খড়ি।

১০২। **ক-অক্ষর গোমাংস** (একেবারে অক্ষর-পরিচয় হীন)—অনেক ব্যবসায়ী ক-অক্ষর গোমাংস, কিন্তু ব্যবসায়ে বেশ দড়।

১০৩। **আক্কেল গুড়ুম** (বিস্ময়ে হতবাক)—এই ব্যাপার দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

[প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্‌ধারা]

অতি চালাকের গলায় দড়ি—বেশী চালাকি করিয়া অন্যকে ঠকাইতে গেলে অনেক সময় নিজেকেই ঠকিতে হয়।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—বেশী বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। বাড়াবাড়ি দেখলেই মনে সন্দেহ হয়, ভিতরে কিছু মতলব আছে।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট—বেশী লোভ করিতে নাই, বেশী লোভ করিলে যাহা আকাঙ্ক্ষিত তাহা তো পাওয়া যায়ই না, অনেক সময় যাহা আছে তাহাও হারাইতে হয়।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—কাজের ভার দুই একজনের উপর থাকিলেই তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; কিন্তু কর্মকর্তার সংখ্যা যদি বেশি হয়, তবে প্রায়ই কাজ পণ্ড হয়।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে—হঠাৎ নূতনতর জীবন যাপন করিতে গেলে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রায় সুখ পাওয়া যায় না।

কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাজী—কার্যসাধনের সময় সাধাসাধির অন্ত নাই, কিন্তু কাজ শেষ হইলে তখন আর পূর্বের কথা মনে থাকে না।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—কেহ মানিতে চাহে না, অথচ নেতৃত্ব করিবার লোভ আছে।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—গুণীর আদর তাঁহার নিজের দেশে বা নিজের গ্রামে নিজের পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খুব কম হয়।

চাচা আপন বাঁচা—আগে নিজে রক্ষা পাও, তারপর অন্য কথা।

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারা পাপীর মত পরিবর্তন হয় না।

দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ—একই উদ্দেশ্য-সাধনে সকলে মিলিয়া কাজ করিলে, কার্যে সফলতা লাভ করিতে না পারিলেও লজ্জার কারণ হয় না।

দশের লাঠি একের বোঝা—একজনের পক্ষে যাহা খুবই কঠিন, সকলে মিলিয়া করিলে তাহা খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে—চেষ্টা করিয়াও সত্য গোপন করা যায় না, হঠাৎ একদিন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে।

নাচতে না জানলে উঠানের দোষ—নিজের অজ্ঞতা বা নৈপুণ্যের অভাব ঢাকিবার জন্য আঙ্গিকের উপর অসমর্থনীয় দোষ চাপাইবার চেষ্টা।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়—মন্দ উপায়ে যে ধন অর্জিত হইয়াছে তাহা নিরুপদ্রবে ভোগ করা যায় না।

পেটে খেলে পিঠে সয়—লাভের প্রত্যাশা থাকিলে অনেক কিছুই সহ্য করা যায়।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফারসী পড়ে তাঁতী—বড় বড় লোক যে কাজ করিতে পারে না, সেই কাজ করিবার জন্য সাধারণ লোক চেষ্টা করে এবং অকৃতকার্য হইয়া অপদস্থ হয়। "হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।"

গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল—কার্যসিদ্ধি হইবার বহু পূর্ব হইতেই আনন্দে আত্মহারা হওয়া, কার্যসিদ্ধি যে নাও হইতে পারে সে চিন্তা না করা।

যত গর্জে তত বর্ষে না—কাজের আড়ম্বরটা প্রথমে অতিরিক্ত হইলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না এবং কাজটা প্রায়ই সুসমাপ্ত হয় না।

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা—যাহাকে পছন্দ হয় না, তাহার প্রত্যেক কার্যে একটা-না-একটা কাল্পনিক দোষ বাহির করা হয়।

যার জ্বালা সেই জানে—ভুক্তভোগী না হইলে দুঃখের যথার্থ স্বরূপ অন্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ—খাটিয়া মরে একজন, আর তার ফল ভোগ করে অন্যে।

যার লাঠি তার মাটি—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল—যেমন উৎকট রোগ, তেমনি ভয়ঙ্কর তার ঔষধ। যেমন আঘাত তেমনি প্রতিঘাত।

রথ দেখা ও কলা বেচা, এক ঢিলে দুই পাখী মারা—প্রধান একটি কাজ বা উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতে যেখানে প্রসঙ্গক্রমে একসঙ্গে দুইটি কাজ সিদ্ধ হইয়া যায়।

পান্তা ভাতে ঘি—যাহার সঙ্গে যাহার সামঞ্জস্য নাই, যেখানে যাহা খাটে না, সেখানে তাহা খাটাইতে যাওয়া।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—যদি জবাবদিহি না করিতে হয়, তবে পরের টাকা খরচ করিতে বাধে না।

বিসমিল্লায় গলদ—গোড়ায় গলদ। মূলগত ধারণাতেই ভুল।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—দুর্জনের সঙ্গীর অভাব হয় না। ইহারা পরস্পরকে সমর্থন করে, কিন্তু ইহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সবুরে মেওয়া ফলে—অসহিষ্ণু হইলে বাঞ্ছিত ফললাভ প্রায়ই বিঘ্নিত হয়, সহিষ্ণুকে অনেক সময়েই বিলম্বে আশাতীত ফল পাইতে দেখা যায়।

মুখে মধু পেটে বিষ—কথায় সহৃদয়তার অভাব নাই, কিন্তু মনে মনে সর্বনাশের চেষ্টা।

সস্তার তিন অবস্থা—লাভের প্রত্যাশায় খুব সস্তায় জিনিষ কিনিলে অবশেষে পস্তাইতে হয়, জিনিষ প্রায়ই খারাপ থাকে।

অনুশীলনী

১। কাঁচা ও মুখ এই দুইটি শব্দের প্রত্যেকটির চারিটি করিয়া রীতিসম্মত প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া সর্বসমেত আটটি বাক্য রচনা কর। (C. U. 1940)

২। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলির সাহায্যে বাক্য গঠন কর :—

(ক) কথার কথা, মুখ রাখা, জলে ফেলা, আকাশ থেকে পড়া, অরণ্যে রোদন, বালির বাঁধ, চোখের বালি, ভরাডুবি হওয়া। (S. F. 1954)

(খ) শিমুল ফুল, বর্ণচোরা, সুখের পায়রা, রাহুর দশা, জিলিপির প্যাঁচ। (S. F. 1953)

৩। একপদে পরিণত কর :—

যাহার মমতা নাই, যিনি শত্রুকে বধ করিয়াছেন, যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, যাহার ভাতের অভাব আছে, যাহা উড়িয়া যাইতেছে, খেলায় যে পটু, কাঠের দ্বারা নির্মিত, পা হইতে মাথা পর্যন্ত, বাস্তববোধের অভাব। (C. U. 1947)

৪। নেচে ওঠা, মন ওঠা, রব ওঠা, রক্ত ওঠা।

বিশিষ্ট অর্থে এই প্রয়োগগুলির ব্যবহার দেখাইয়া বাক্য রচনা কর।

ব্যাকরণের পরিশিষ্ট

বিপরীতার্থক শব্দ

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	আরম্ভ	শেষ
অধম	উত্তম	আর্দ্র	শুষ্ক
অল্প	অধিক	আরোহণ	অবরোহণ
অনুরাগ	বিরাগ	আবির্ভাব	তিরোভাব
অনুলোম	বিলোম	আবৃত	অনাবৃত
অলস	পরিশ্রমী	আবিল	অনাবিল
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	আশা	নিরাশা
অন্তর	বাহির	আস্তিক	নাস্তিক
অন্ধকার	আলোক	আসল	নকল
অপকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	অনুগ্রহ	নিগ্রহ
অর্পণ	গ্রহণ	আস্থা	অনাস্থা
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	আহার	অনাহার
অর্থ	অনর্থ	আকুঞ্চন	প্রসারণ
অলীক	সত্য	আত্মীয়	অনাত্মীয়
অবনত	উন্নত	আপন	পর
অধিত্যকা	উপত্যকা	ইতর	ভদ্র
অনুকূল	প্রতিকূল	ইচ্ছা	অনিচ্ছা
আগমন	গমন	ইষ্ট	অনিষ্ট
আবাহন	বিসর্জন	ইহকাল	পরকাল
আদান	প্রদান	ইহলোক	পরলোক
আদি	অন্ত	উচিত	অনুচিত
আয়	ব্যয়	উচ্চ	নীচ
উগ্র	সৌম্য, শান্ত	গুণ	দোষ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	গুরু	লঘু

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
উত্থান	পতন	গুপ্ত	ব্যক্ত
উদয়	অস্ত	গ্রহণ	বর্জন
উন্নতি	অবনতি	গ্রাম্য	পৌর, নাগরিক
উন্মীলন	নিমীলন	গোপন	প্রকাশ
উপচয়	অপচয়	ঘন	তরল
উপকার	অপকার	ঘাত	প্রতিঘাত
উপস্থিত	অনুপস্থিত	ঘৃণা	শ্রদ্ধা
ঊর্ধ্বগ	নিম্নগ	চঞ্চল	স্থির
উষ্ণ	শীতল	চড়াই	উৎরাই
ঋজু	বক্র	চেতন	জড়, অচেতন
ঐক্য	অনৈক্য	জন্ম	মৃত্যু
ঐহিক	পারত্রিক	জাগরণ	নিদ্রা
	নির্বাপিত	তরুণ	বৃদ্ধ
কোমল	কঠিন	তন্বী	স্থূলাঙ্গী
কুটিল	সরল	তিরস্কার	পুরস্কার
কুৎসিৎ	সুন্দর	তিক্ত	মধুর
কুৎসা	প্রশংসা	তস্কর	সাধু
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন	তিমির	আলোক
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	দক্ষিণ	বাম
কৃত্রিম	মৌলিক, স্বাভাবিক, খাঁটি	দাতা	গ্রহীতা
ক্রয়	বিক্রয়	দীর্ঘ	হ্রস্ব
কৃশ	স্থূল	দুরন্ত	শান্ত
ক্রোধ	প্রীতি, ক্ষমা	দুর্লভ	সুলভ
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	দুষ্কৃতি	সুকৃতি
গরল	অমৃত	দুর্বল	সবল
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	দৃঢ়	শিথিল
দেনা	পাওনা	বাদী	বিবাদী, প্রতিবাদী
ধনী	দরিদ্র, নির্ধন	বিনীত	দুর্বিনীত

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
নিন্দা	স্তুতি	বিপথ	সুপথ
নিরাকার	সাকার	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
নির্মল	সমল, পঙ্কিল	ব্যর্থ	সার্থক
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট	ভূত	ভবিষ্যৎ
শ্বাস	প্রশ্বাস	ভদ্র	ইতর
পাপ	পুণ্য	মিলন	বিরহ
পুরোভাগ	পশ্চাদ্ভাগ	মুখ্য	গৌণ
প্রকৃতি	বিকৃতি	মৃদু	উগ্র, তীব্র
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	শ্রম	বিশ্রাম
প্রতিযোগী	সহযোগী	সন্ধি	বিগ্রহ
প্রবল	দুর্বল	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
প্রভু	ভৃত্য	স্মৃতি	বিস্মৃতি
প্রবীণ	নবীন	সমষ্টি	ব্যষ্টি
প্রসন্ন	বিষণ্ণ	স্থাবর	জঙ্গম, অস্থাবর
প্রাচীন	নবীন, অর্বাচীন	সুস্পষ্ট	অস্পষ্ট
বন্ধন	মুক্তি	হর্ষ	বিষাদ
বন্ধু	শত্রু	হ্রাস	বৃদ্ধি
বিধি	নিষেধ	হৃদ্য	ঘৃণ্য
বেশী	কম, অল্প	হরণ	পূরণ

ভিন্নার্থক শব্দ

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয়। প্রসঙ্গ অনুসারে একই শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ শব্দের ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

অর্থ—তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। (টাকাকড়ি)

কবিতাটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। (মানে)

ছেলেটির এই প্রকার আচরণের অর্থ বুঝিতে পারিলে কি ?

(উদ্দেশ্য, রহস্য)

অঙ্ক—আমার অঙ্কে মাথা নাই। (গণিত)

পাঁচ অঙ্কের নাটক বড় হয়, অভিনয়ে অনেক সময় লাগে।

(নাটকের অংশ)

মাতা সকল সন্তানকেই অঙ্কে স্থান দিতে প্রস্তুত। (ক্রোড়)

উত্তর—চুপ করিয়া আছ কেন? উত্তর দাও। (জবাব)

ভারতের উত্তরে হিমালয়। (দিক বিশেষ)

উত্তরকালে এই বালকই দেশবরেণ্য হইয়াছিল। (পরবর্তী, ভবিষ্যৎ)

কথা—রামায়ণের কথা শুনিলে না কেন? উহাতে অনেক শিখিবার ছিল। (গল্প)

শেষ পর্যন্ত আমার কথা রাখিলে না! (অনুরোধ)

যেখানে যাই সর্বত্রই এক কথা, চালের দাম কবে পড়িবে? (প্রসঙ্গ)

তোমার সঙ্গে কথা আছে। (পরামর্শ)

বাপে ব্যাটায় কথা নাই। (সদ্ভাব)

ভরা গঙ্গা সাঁতরে পার হওয়া—একি সহজ কথা! (ব্যাপার)

গুণ—আগুনের গুণ উত্তাপ। (বিশিষ্ট ধর্ম)

মেয়েটির কোন গুণ নাই। (উৎকর্ষ)

ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত। (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ)

"বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।" (অঙ্কের গুণ)

চাল—চালের দাম কমিতেছে না। (চাউল)

চালে খড় নাই। (ঘরের উপর আচ্ছাদন)

চাল-চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। (প্রতিমার পিছনে চিত্র)

বনেদি চাল এবার সকলেরই ছাড়তে হবে। (ব্যবহার)

এক চালে বাজী চাৎ। (ফন্দি, দাবা খেলার কৌশল)

ছল—"অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল।" (কপট)

ঠাট্টাচ্ছলেও তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। (প্রসঙ্গ)

দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। (অছিলা)

'ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু পানে।' (ছলনা)

কথায় কথায় ছল ধরা তার অভ্যাস। (দোষ)

জাল—জালে এবার বড় বড় রুই কাৎলা ধরা পড়েছে। (ফাঁদ)

জাল নোট চালাইতে গিয়াই সে ধরা পড়িল। (মেকি).
ইন্দ্রজালে সকলেই মুগ্ধ হইল। (মায়ার খেলা)
জোর—জোর যার মুলুক তার। (শক্তি)
তোমার যে বড় জোর গলা। (তীব্র)
জোর করিয়া কাহারও উপর নিজের মত চাপাইতে নাই। (জবরদস্তি)
তত্ত্ব—সৃষ্টিতত্ত্ব বড়ই জটিল। (মতবাদ)
তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট সংসার মায়া মাত্র। (ব্রহ্ম)
অনেকদিন তোমাদের কোন তত্ত্ব-তল্লাস নাই। (সংবাদ)
এবার পূজার তত্ত্ব ভালভাবে করিতে না পারায় মেয়ের মা মনমরা হইয়া রহিলেন। (উপঢৌকন)
তন্ত্র—তন্ত্রের জন্ম বোধ হয় বাংলাদেশেই। (শাস্ত্রবিশেষ)
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু আমলাতন্ত্রের শাসন এখনও বলবৎ আছে। (শাসন-পদ্ধতি)
পরতন্ত্র হওয়াই পরাধীনতা। (অধীন)
তাল—ভাদ্রমাসে তাল পাকে। (ফলবিশেষ)
কেবল গান গাহিলেই হয় না, তাল জ্ঞান থাকা দরকার।
(সঙ্গীতের সময়-পরিমাণ বোধ)
তাল ঠুকে তো এলে? ওর সঙ্গে পারবে কি? (বাহুতে করতলাঘাত)
তাল-বেতালের নাচ আরম্ভ হ'ল দেখছি। (অপদেবতা)
দল—"যাত্রীদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হ'ল মেলা।" (সমূহ)
"ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" (পাপড়ি)
"তরুণ দল, চলরে চল্। (সম্প্রদায়)
ধারা—কোন্ আইনের কোন্ ধারায় গ্রেপ্তার করা হ'ল জানতে পারি কি? (আইনের বিধান)
তোমরা কেমন ধারার লোক, কথা বুঝতে পার না। (স্বভাব)
এই স্কুলের এই ধারা, পরীক্ষা দিলেই প্রমোশন। (রীতি)
পদ্মা গঙ্গারই একটি ধারা। (প্রবাহ)
বর্ষার বারিধারায় নদ-নদীগুলি স্ফীত হইয়া উঠে। (বর্ষণ)
নাম—তোমার নাম কি? (আখ্যা, পরিচয়)

[illegible] ডাক ভগবানে। ([illegible] নাম)
[illegible] নাম হ'ল কি ? (খ্যাতি)
[illegible] খেয়েই উঠে পড়লে যে ! (সামান্য)
পক্ষ—বরপক্ষের ব্যবহারে কন্যাপক্ষ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। (দল)
ঘরে যার তৃতীয় পক্ষ, তার শান্তি কোথায় ? (তৃতীয় বিবাহের পত্নী)
হঠাৎ দাদা মশায়ের পক্ষাঘাত দেখা দিল। (ব্যাধিবিশেষ)
এটা কোন্ পক্ষ, রাত্রির আকাশ দেখেও বুঝতে পারছ না কেন ? (মাসার্ধ)
রাবণের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নপক্ষ হইয়াও জটায়ু রাবণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। (পাখা)
পূর্ব—বাংলার পূর্বে আসাম। (দিকবিশেষ)
আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষগণের চেয়ে সুখী ? (বিগত)
পূর্বে দেশে এত সমস্যা ছিল না, সেইজন্য সুখ না থাকিলেও শান্তি ছিল। (প্রাচীনকাল)
পূর্বের সঙ্গে পশ্চিম মিলিবে কবে ? (প্রাচ্যদেশ)
তোমার না পূর্বাহ্ণে আসিবার কথা ছিল ? (অংশ বা ভাগ)
বর্ণ—ছেলেটির বর্ণ-পরিচয় হয় নাই। (অক্ষর)
তেমন গৌর বর্ণ বাংলাদেশে বেশী দেখা যায় না। (গায়ের রং)
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণবিভাগ বৈদিক যুগেই হইয়াছিল। (জাতি)
বিধি—বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়। (ঈশ্বর, নিয়তি)
এই কাজের এই বিধি। (নিয়ম, রীতি)
সমস্ত বিধিমতে সম্পন্ন হইয়াছে। (শাস্ত্র)
ভারতীয় দণ্ডবিধি তাঁহাব পড়া আছে। (বিধান, আইন)
ভাব—বেশ আছে তারা, এই আড়ি, এই ভাব। (সম্প্রীতি)
তোমার ভাব বুঝি না, কি করতে চাও ? (অভিপ্রায়)
'সোনার তরী' কবিতাটির ভাব বুঝিতে পারিলে কি ? (মর্ম, অর্থ)
নাম-সংকীর্তনে যোগ দিলেই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। (উন্মাদনা)
ভার—পৃথিবী পাপের ভার আর কত সইবে ? (বোঝা)
ধারে কাটে, ভারেও কাটে। (গুরুত্ব)

সারাদিনই মুখ ভার করে বসে রইলে [illegible]

সামান্য বেতনে আজকাল গৃহস্থের ভদ্রভাবে চলা [illegible]

তোমার উপর এ কাজের ভার দেওয়া উচিত হয় নাই। [illegible]

মাথা—আপনি হলেন গ্রামের মাথা, আপনি দেখবেন না তো কে দেখবে

(প্রধান

মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যা প্রয়োজন তা উপার্জন করা যায় না।

(অঙ্গবিশেষ

বাজে বকছ কেন? তোমার কথার মাথা নেই। (অর্থের সঙ্গতি)

সব বিষয়েই ছেলেটির বেশ মাথা খেলে। (বুদ্ধি)

মুখ—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। (প্রত্যঙ্গ)

মুখে মধু, মনে বিষ। (বাক্য)

সোজা দক্ষিণ মুখে সে ছুটতে লাগল। (দিক্)

এখন সরে পড়, নইলে মুখ থাকবে না। (মর্যাদা)

ননদের মুখের ভয় নতুন বৌকে করতে হয় বৈকি। (তিরস্কার)

যোগ—তাঁহারা নৌকাযোগে নদী পার হইলেন। (সাহায্য)

তোমার কথার সহিত কার্যের যোগ কোথায়? (মিল)

দুইএর সঙ্গে তিন যোগ করিলে পাঁচ হয়। (অঙ্কের সমষ্টি)

এবারও অর্ধোদয় যোগ আছে। (বিশেষ পর্ব)

যোগবল পরম বল, ইহার দ্বারা অনেক অভাবনীয় কার্য ঘটান যায়।

(চিত্তবৃত্তি-নিরোধের শক্তি)

রস—লেবুর রস নিয়মিত খাইলে অনেক অসুখ সারে। (নির্যাস)

সাহিত্য-সমালোচকের রসজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। (কাব্যের প্রীতিকর বস্তু)

রস পরিপাক না পেলে কবিরাজ মশাই কখনও অন্নপথ্য দিবেন না।

(শরীরের ধাতুবিশেষ)

রাগ—অনর্থক রাগ কর কেন? (ক্রোধ)

রাগ-রাগিণীর জ্ঞান নাই, ওস্তাদী গান গাইতে এসেছেন। (সঙ্গীতে স্বরবিন্যাসের স্তব)

পূর্বাকাশ নবারুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। (রং)

রূপ—'রূপে মুগ্ধ কে নয়?' (সৌন্দর্য)

'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?' (মূর্তি)
এরূপ ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করি নাই। (প্রকার)
ভিক্ষুকের রূপ ধরিয়া দারোগা বাবু মেলার ভিড়ে মিশিয়া গেলেন। (বেশ)

লোক—কত লোক প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করে আর তুমি শীতের ভয়ে কাতর হচ্ছ! (জন)

ত্রিলোকে তাঁর মত বীর আর কেহ ছিল না। (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল)

ইহলোক তো দেখলাম, এবার পরলোকে কি হয় দেখব। (এই জীবনে, মৃত্যুর পরে)

তাঁর নিজের কিছুই করতে হয় না, মাইনে-করা লোক আছে। (ভৃত্য)

সার—সমস্ত উপদেশের সার হইতেছে সংযম (মূল বিষয়)
জমিতে সার না দিলে ফসল ভাল হয় না। (উর্বরতা-সাধক বস্তু)
এই সার কথা বলছি, তোমার এখানে থাকা পোষাবে না। (আসল)
যা লিখেছ সব বাজে কথা, লেখায় সার কিছু নেই। (যথার্থ বস্তু)

সন্ধি—যুদ্ধ শেষ হ'লে সন্ধি হয়। (যুদ্ধ-বিরতি)

সন্ধিস্থানে গুরুতর আঘাত, অজ্ঞান হওয়া অসম্ভব নয়। (শরীরের অস্থির মিলন-স্থান)

বিসর্গ-সন্ধি ব্যঞ্জন-সন্ধির অন্তর্গত। (বর্ণের মিলন)

সুর—সুর ও অসুর চিরকালই আছে। (দেবতা)
হালকা সুরের গান আমি ভালবাসি। (সঙ্গীতের ধ্বনি)
তোমার নাকি সুরের কান্না ভাল লাগে না। (কণ্ঠস্বর)
সুর বদলাচ্ছ কেন ? মতলব ধরা পড়েছে ? (উদ্দেশ্য)

সূত্র—ব্যাকরণের সূত্রগুলি এখন আর কেউ মুখস্থ করে না। (স্বল্পাক্ষর বাক্য)

কার্পাস সূত্রের বস্ত্রও দানে চলে। (সূতা)

এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পারা গেল না। (সঙ্কেত)

সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

অনু—পশ্চাৎ।
অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ।
অন্ন—ভাত।
অন্য—অপর।
অনিল—বায়ু
অনীল—যাহা নীল নয়।
অন্নপুষ্ট—খাদ্যদ্রব্যে পুষ্ট।
অন্যপুষ্ট—কোকিল।
অশন—ভোজন।
অসন—নিক্ষেপ।
অপচয়—ক্ষতি।
অবচয়—চয়ন।
অসিত—কৃষ্ণ।
অশিত—ভক্ষিত।
অসক্ত—অনাসক্ত।
অশক্ত—অসমর্থ।
আপন—নিজের।
আপণ—দোকান।
আভাষ—ভূমিকা।
আভাস—ইঙ্গিত।
আহুতি—হোম।
আহূতি—আহ্বান।
আদি—মূল।
আধি—মনঃকষ্ট।
আবরণ—আচ্ছাদন।
আভরণ—অলঙ্কার।
উদ্যত—প্রবৃত্ত।
উদ্ধত—দুর্বিনীত।
উপাদান—মূল উপকরণ
উপাধান—বালিশ।
ওষধি—একবার ফল দিয়া যে গাছ মরিয়া যায়।
ঔষধি—রোগ-নিবারক দ্রব্য।
অবদান—সম্পাদিত কর্ম, কীর্তি।
অবধান—মনোযোগ।
অবিহিত—অনুচিত।
অভিহিত—কথিত।
অর্ঘ—মূল্য।
অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ।
অবিরাম—অবিরত।
অভিরাম—সুন্দর।
কৃতি—কর্ম।
কৃতী—কৃতকর্মা।
কৃত্তিবাস—মহাদেব; রামায়ণ-রচয়িতা কবি।
কীর্তিবাস—যশস্বী।
গিরিশ—মহাদেব।
গিরীশ—হিমালয়।
চির—দীর্ঘকাল।
চীর—ছিন্নবস্ত্র।
জড়—অনড়।
জ্বর—রোগ।
তত্ত্ব—সত্য, জ্ঞান।
তথ্য—সংবাদ।

তরণী—নৌকা।

তরুণী—কিশোরী, নবীনা।

দার—পত্নী।

দ্বার—দরজা।

দ্বিপ—হস্তী।

দীপ—প্রদীপ।

দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূখণ্ড।

পরস্ব—পরধন।

পরশ্ব—আগামী দিনের পরদিন।

কোটি—সংখ্যা।

কটি—কোমর।

কুল—বংশ।

কূল—নদীর তীর।

কূট—পর্বত, দুর্গ।

কুট—কপট, জটিল।

কুজন—মন্দ লোক।

কূজন—পক্ষীর রব।

কৃত—সম্পন্ন।

ক্রীত—কেনা।

কৃত্য—কার্য।

কৃত্ত—ছিন্ন।

কোন—কিছু।

কোণ—বিদিক

গোলক—মণ্ডল।

গোলোক—বিষ্ণুর বাসস্থান।

চ্যুত—ভ্রষ্ট।

চূত—আম্র।

জালা—বড় মাটির পাত্র।

জ্বালা—যন্ত্রণা, অগ্নিশিখা।

ধরা—পৃথিবী।

ধড়া—কটিবাস।

নিশীথ—মধ্যরাত্রি।

নিশিত—শাণিত।

নীর—জল।

নীড়—পাখীর বাখা।

দেবত্ব—দেবতার ভাব।

দেবত্র—দেবোদ্দেশে দত্ত।

প্রকার—ভেদ, রূপ।

প্রাকার—প্রাচীর।

বিত্ত—ধন।

বৃত্ত—গোলাকার।

বঙ্গ—দেশ বিশেষ।

ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ।

বলি—উপহার।

বলী—বলবান।

বিস্মিত—চমৎকৃত।

বিস্মৃত—স্মৃতিভ্রষ্ট।

যাম—প্রহর।

জাম—ফলবিশেষ।

যতি—মুনি, বিরামস্থান।

জ্যোতি—দীপ্তি।

লক্ষণ—চিহ্ন।

লক্ষ্মণ—রামানুজ।

শঙ্কর—মহাদেব।

সঙ্কর—মিশ্র।

শিকার—মৃগয়া।

স্বীকার—অঙ্গীকার।

দিন—দিবস।
দীন—দরিদ্র।
দূত—চর।
দ্যূত—পাশাখেলা।
শ্রবণ—কর্ণ, শোনা।
স্রবণ—ক্ষরণ।
শব—মৃতদেহ।
সব—সমস্ত।
শম—শান্তি।
সম—তুল্য।
ধনী—ধনবান।
ধ্বনি—রব।
নিরশন—অনাহার।
নিরসন—মীমাংসা, দূর করা।
পুরুষ—নর।
পরুষ—কঠোর।
প্রসাদ—অনুগ্রহ।
প্রাসাদ—অট্টালিকা।
প্রোথিত—ভূগর্ভে নিহিত।
প্রথিত—বিখ্যাত।
বান—বন্যা।
বাণ—শর।
বিনা—ব্যতীত।
বীণা—বাদ্যযন্ত্র।
বসন—বস্ত্র।
ব্যসন—বিলাস।
বাণী—বাক্য।
বানি—সেকরার মজুরি।

মুখ—বদন।
মূক—বাক্যহীন।
যজ্ঞ—হোম।
যোগ্য—উপযুক্ত।
লক্ষ—সংখ্যা।
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য।
শিকড়—গাছের মূল।
শীকর—জলকণা।
সাক্ষর—অক্ষর-জ্ঞান বিশিষ্ট।
স্বাক্ষর—দস্তখত।
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী।
শ্মশ্রু—দাড়ি।
শান্ত—ধীর।
সান্ত—সসীম।
শরণ—আশ্রয়।
স্মরণ—চিন্তা, মনে রাখা।
শুক্ল—সাদা।
শুল্ক—কর।
শূর—বীর।
সুর—দেবতা।
শীত—শীতকাল।
সিত—সাদা।
সুত—পুত্র।
সূত—সারথি।
সর্গ—অধ্যায়।
স্বর্গ—দেবলোক।
সীতা—জানকী।
সিতা—শুক্লা, শর্করা।

শয্যা—বিছানা।
সজ্জা—বেশভূষা।
শুচি—পবিত্র।
সূচী—ছুঁচ, তালিকা।
শারদা—দুর্গা।
সারদা—সরস্বতী।
শর—বাণ।

স্বর—শব্দ।
স্মর—কামদেব।
সরঃ—সরোবর।
সত্ত্ব—গুণ বিশেষ।
স্বত্ব—অধিকার।
সহিত—সঙ্গে।
স্বহিত—নিজের কল্যাণ।

একই শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ

অন্ধ—(বিশেষ্য)—অন্ধকে দয়া কর।
(বিশেষণ)—অন্ধ ভিক্ষুকটিকে ভিক্ষা দাও।

অন্যায়—(বিশেষ্য)—শক্তি থাকিতেও যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না সে অপরাধী।
(বিশেষণ)—তুমি অন্যায় কথা কহিতেছ কেন?

উপর—(বিশেষ্য)—যারা চিরকাল উপরেই থাকল, যারা কখনও নীচে নামল না, তারা দুঃখীর দুঃখ কি করে বুঝবে?
(বিশেষণ)—তোমরা হ'চ্ছ উপর তলার মানুষ।
(ক্রিয়াবিশেষণ)—উপর উপর কেবল ভুল করেই যাচ্ছি।
(বিশেষণের বিশেষণ)—তোমার মত উপর চালাকের কাজ নয়।

কর্তব্য—(বিশেষ্য)—আমার কি কর্তব্য আদেশ করুন।
(বিশেষণ)—যে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করে, সে পরিণামে কষ্ট পায়।

গুরু—(বিশেষ্য)—গুরুর আদেশ সর্বদা পালনীয়।
(বিশেষণ)—গুরু ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।

ঘোর—(বিশেষ্য)—তাহার ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নাই।
(বিশেষণ)—সম্মুখে ঘোর বিপদ।

জোর—(বিশেষ্য)—গায়ের জোরে সব কাজ করা যায় না।
(বিশেষণ)—হঠাৎ জোর তলব কেন?

ঠিক—(বিশেষ্য)—আমার মাথার ঠিক নাই।
(বিশেষণ)—ঠিক খবর বল, মিথ্যা বলো না।
(ক্রি-বিশেষণ)—ঠিক করে বলবে, কোন কথা গোপন করবে না।

দুষ্ট—(বিশেষ্য)—দুষ্টের দমন না হইলে সমাজে বাস করা যাইবে না।
(বিশেষণ)—দুষ্ট লোকের সংসর্গ ত্যাগ কর।

দরিদ্র—(বিশেষ্য)—দরিদ্রের বন্ধু কেহ নয়।
(বিশেষণ)—দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি কেবল পরিশ্রমের বলেই উন্নতি করিলেন।

পশ্চাৎ—(বিশেষ্য)—পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা আসিল।
(বিশেষণ)—তাহারা পশ্চাৎ দিকে লুকাইয়া ছিল।
(ক্রি-বিশেষণ)—উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছ কেন?
(অব্যয়)—এখন হইবে না, পশ্চাৎ তোমার কথা শুনিব।

ভাল—(বিশেষ্য)—ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'ভালোর দিকেই দেখা যাচ্ছে।'
(বিশেষণ)—ভাল বই, ভাল কলম সকলেই চায়।
(ক্রি-বিশেষণ)—সে ভাল খেলেছে।
(অব্যয়)—ভালোরে ভাল! আমি আবার কখন্ একথা বলেছি।

বড়—(বিশেষ্য)—'বড়'র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'
(বিশেষণ)—আজকাল বড় লোক সকলেই।
(ক্রি-বিশেষণ)—গোবিন্দ, তুই বড় বকিস্।

সাধ—(বিশেষ্য)—মনে কতই সাধ ছিল।
(ক্রিয়া)—আমার সঙ্গে বাদ সেধে লাভ কি?

তার—(বিশেষ্য)—অনেক দিন খবর নাই, তার করতে হবে।
(সর্বনাম)—তার অনেক টাকা আছে।
(ক্রিয়া)—'তনয়ে তার তারিণী।'

বাঁধা—(বিশেষণ)—বাঁধা বেতনে আর কয়দিন চলে?
(ক্রিয়া)—বিপদে ভীত হইও না, সাহসে বুক বাঁধ।

ভাজা—(বিশেষ্য)—ডালের সঙ্গে ভাজা দরকার।

(বিশেষণ)—ভাজা মাছগুলি কোথায় রাখিয়াছ ?

মূর্খ—(বিশেষ্য)—মূর্খের অশেষ দোষ।

(বিশেষণ)—মূর্খ পুত্র পরম শত্রু।

যে—(সর্বনাম)—যে পরিশ্রম করিতে পারে সে কৃতকার্য হয়।

(বিশেষণ)—তুমি যে কথা বলিয়াছ তাহা বড়ই অন্যায় হইয়াছে।

(অব্যয়)—তুমি যে বলিয়াছিলে বাড়ী যাইবে না তাহা আমি শুনি নাই।

রৌদ্র—(বিশেষ্য)—ফাল্গুনমাস হইতেই রৌদ্র প্রখর হয়।

(বিশেষণ)—রৌদ্র রসের বর্ণনা মধুসূদন ব্যতীত অন্য কাহারও কাব্যে বিশেষ দেখা যায় না।

সত্য—(বিশেষ্য)—সত্য, ত্যাগ ও ক্ষমা এই তিনটি সাধুর লক্ষণ।

(বিশেষণ)—সত্য কথা বল, ভয় নাই।

সাধু—(বিশেষ্য)—সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ ধর্মজীবনে উন্নতির সূচনা করে।

(বিশেষণ)—তাঁর সাধু ব্যবহারে সকলেই সুখী হইল।

ঘষা—(বিশেষণ)—পকেট হইতে শৈলেনবাবু একটি ঘষা আধুলি বাহির করিলেন।

(ক্রিয়া)—বড় লোকের সঙ্গে গা ঘষা তাহার অভ্যাস।

(বিশেষ্য)—মাথা-ঘষা আজকাল বিশেষ কেহ ব্যবহার করে না।

গরম—(বিশেষণ)—অনর্থক মাথা গরম করিয়া লাভ কি ?

(বিশেষ্য)—মাঘ মাসেই বেশ গরম পড়িয়াছে।

উক্তি-পরিবর্তন

বাক্যে দুইপ্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি।

বক্তার কথা অবিকল বক্তার ভাষাতে বিবৃত করিলে প্রত্যক্ষ উক্তি হয় এবং বক্তার কথা অন্যে বিবৃত করিলে পরোক্ষ উক্তি হয়।

উক্তি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

বক্তার কথা যখন অবিকল উদ্ধৃত করিতে হয়, তখন সেই কথাগুলি উদ্ধরণ-চিহ্নের " " মধ্যে থাকে। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিহ্ন উঠিয়া যায় এবং

পরোক্ষ উক্তি আরম্ভ করিবার ঠিক পূর্বে 'যে' এই অব্যয়টি ব্যবহার করিতে হয়।

রাম বলিল, "আমি খাইব না।"

রাম বলিল যে, সে খাইবে না।

এই উদাহরণটিতে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম ও ক্রিয়া পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে সময়-নির্দেশক শব্দগুলি অর্থাৎ 'আগামীকাল', 'গতকাল' 'এখন' প্রভৃতি শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে 'পরদিন', 'পূর্বদিন', 'তখন' প্রভৃতি হয়।

যদু মধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আগামীকাল স্কুলে যাবি ?"

যদু মধুকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে পরদিন স্কুলে যাইবে কি না।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি কোনও আবেগ-প্রকাশক অব্যয় থাকে, তবে পরোক্ষ উক্তিতে সেই আবেগের ভাবটি অন্য কথায় প্রকাশ করিতে হয়।

তিনি ছেলেটিকে বলিলেন "খবরদার, ফের যদি চুরি করিস্ তবে পুলিশ ডাকব।'

তিনি ছেলেটিকে শাসাইয়া সাবধান করিলেন যে, পুনরায় চুরি করিলে তিনি পুলিশ ডাকিবেন।।

উক্তি-পরিবর্তনের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

(ক) কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

পরোক্ষ—কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথিক বলিয়া সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সে পথ হারাইয়াছে কিনা।

(খ) শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমিও না হয় চার টাকাই দেব—টাকা আগে না প্রাণ আগে ? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আনগে।"

পরোক্ষ—শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনিও না হয় চার টাকাই দিবেন। তিনি অবিচলিত সিদ্ধান্তের মত জানাইলেন যে, টাকা আগে নহে প্রাণই আগে এবং (রামলালকে) আদেশ করিলেন যে, সে যেন চামারটাকে ডাকিয়া আনে।

(গ) নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার সব কথা আড়াল থেকে শুনেছেন ? যদি শুনে থাকেন তাতে ক্ষতি নেই, কেননা এসব কথা আমি নিজেই একদিন আপনাকে বলতুম।"

পরোক্ষ—নবীন জানিতে চাহিল যে, তিনি তাহার সব কথা আড়াল থেকে (হইতে) শুনিয়াছেন কিনা। যদি তিনি শুনিয়া থাকেন তাহাতে ক্ষতি হয় নাই, কেননা, ও সব কথা সে নিজেই একদিন তাঁহাকে বলিত।

(ঘ) রাম শ্যামকে বলিল, "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া এখন আসিয়াছ? তুমি রুগ্ন, এখনও অতি দুর্বল, নদীর ধারে এই সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অসুখ করিবে। আজ বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

পরোক্ষ—রাম শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে কিনা। সে রুগ্ন, তখনও অতি দুর্বল। নদীর ধারে সেই সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার অসুখ করিবে। (রাম) সেদিন তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিল।

(ঙ) প্রতাপ বলিলেন, "ভাই, আজ পরাজয়ের দিন নহে, আজ বিজয়ের দিন। যেন আমরা পূর্বের শত্রুতা বিস্মৃত হই। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব, বিদেশী শত্রুকে ভয় করিব না।"

পরোক্ষ—প্রতাপ (শক্তকে) ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, সেদিন পরাজয়ের দিন নহে, সেদিন বিজয়ের দিন। তিনি অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহারা পূর্বের শত্রুতা বিস্মৃত হন। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া তাঁহারা স্বদেশ রক্ষা করিবেন, বিদেশী শত্রুকে ভয় করিবেন না।

(চ) বিপিন ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, "বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ? আজ বৌঠান আমাকে না হ'ক দশটা বাজে কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।"

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বৌঠান কাজের কথা কবে বলেন, আজকেই কি শুধু বাজে কথা শুনিয়েছেন।"

বিপিন বলিলেন—"আজ তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। কবে তোমার এই স্বভাব যাবে?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা, আমার কোলে ছেলেপিলে আছে, মাথার উপর ভগবান আছেন।"

পরোক্ষ—বিপিন ক্রোধভরে জানিতে চাহিলেন, কেন বৌঠানের ভাইকে লইয়া সেদিন (হেমাঙ্গিনী) একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়া আছেন। তিনি

জানাইলেন সেদিন বৌঠান তাঁহাকে না হ'ক দশটা বাজে কথা শুনাইয়া দিয়াছেন।

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন যে, বৌঠান কাজের কথা কখনও বলেন না। বাজে কথা শুধু সেই দিনই নয়, অন্য দিনও শুনাইয়াছেন।

বিপিন বলিলেন যে, বৌঠান অন্ততঃ সেদিন ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি জানিতে চাহিলেন তাঁহার (হেমাঙ্গিনীর) এই স্বভাব কবে যাইবে।

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিলেন যে, তাঁহার স্বভাব মরণ হইলে তবে যাইবে, তাহার আগে নয়। তিনি মা, তাঁহার কোলে ছেলেপিলে আছে, মাথার উপরে ভগবান আছেন।

(ছ) সাহেব—দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন ?

রঙ্গরাজ—দিবেন না। তাই বলিতে আমায় পাঠাইয়াছেন।

সাহেব—আর তোমরা ?

রঙ্গরাজ—আমরা কারা ?

সাহেব—দেবী চৌধুরাণীর দল ?

রঙ্গরাজ—আমরা ধরা দিব না।

সাহেব—আমি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

পরোক্ষ—সাহেব রঙ্গরাজকে দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে রঙ্গরাজ উত্তর করিল যে, তিনি ধরা দিবেন না এবং জানাইল যে, সেই কথা বলিতে তিনি (দেবী চৌধুরাণী) তাহাকে (রঙ্গরাজকে) পাঠাইয়াছেন। সাহেব পুনরায় তাহারা কি করিবে জানিতে চাহিলে রঙ্গরাজ, তাহারা বলিতে সাহেব কাহাদিগকে বুঝাইতে চান জানিতে চাহিল। সাহেব যখন বলিলেন, দেবী চৌধুরাণীর দল, তখন রঙ্গরাজ জানাইল যে, তাহারা ধরা দিবে না। ইহাতে সাহেব বলিলেন যে, তিনি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছেন।

(জ) চাণক্য। বন্ধু, ডেকে আন।

কাত্যায়ন। কাকে ?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি ?

চাণক্য। যাও ভাই।

পরোক্ষ—চাণক্য কাত্যায়নকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিয়া

আনিতে বলিলেন। কাত্যায়ন কাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, চাণক্য বলিলেন, ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। কাত্যায়ন এই কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, চাণক্য কাত্যায়নকে পুনরায় উহাদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য যাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন।

(ঝ) কণ্ব কহিলেন, বৎসে, ইহাদের বিবাহ হয় নাই ; অতএব সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না।"

পরোক্ষ—কণ্ব শকুন্তলাকে স্নেহভরে বৎসে বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার কথায় অসম্মতি জানাইলেন। তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, তাহাদের বিবাহ হয় নাই বলিয়া তাহাদের সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখাইবে না।

(ঞ) কাদম্বিনী কেষ্টকে কহিলেন, "আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসো গে—বলি, ফুলেল তেল টেল মাখা অভ্যাস নেই ত ?"

পরোক্ষ—কাদম্বিনী কেষ্টকে আর মায়াকান্না কাঁদিতে নিষেধ করিয়া পুকুর হইতে ডুব দিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার ফুলেল তেল টেল মাখার অভ্যাস আছে কি না।

(ট) রামচরণ বলিল, "আরে ছাই। আমি কি জানতাম আগে ইস্কুল কার নাম ? আজ না শুনলাম ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে ইস্কুল বলে।"

পরোক্ষ—রামচরণ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল যে, সে আগে ইস্কুল কাহার নাম তাহা জানিত না। সেই দিনই সে শুনিল যে, ইঞ্জিরি (ইংরাজি) পড়ার পাঠশালাকে ইস্কুল বলে।

উক্তিপূরণ

বাক্যের মধ্যে একটি বা একাধিক পদ যদি অনুক্ত থাকে, তবে তাহা পূরণ করার নাম অনুক্তপূরণ বা উক্তিপূরণ। অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উপযুক্ত পদ-নির্বাচনই ইহার একমাত্র শিখিবার জিনিষ।

(ক) তখন ক্ষীণচন্দ্র — যায় যায়। চারিদিকে — হইয়া আসিতেছে — সাড়াশব্দ নাই। — প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির — পড়িয়াছে। ক্রমে সেটুকুও — গেল।

পূরণার্থ পদ ঃ—অস্ত, আঁধার, কোথায়ও, গৃহের, ছায়া, মিলাইয়া।

(খ) তখন — করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। — করিয়াও যাওয়া হইল না। — খেদ — রাখিলাম। পরদিন তাঁহারা শাসাইলেন, "এক — শীত — না; জানিয়া রাখ, তুমি — বুনো —, আমরা তেমনই — —।"

পূরণার্থ পদ ঃ—ঝমঝম, যাই যাই, মনের, মনে, মাঘে, পালায়, যেমন, ওল, বাঘা, তেঁতুল।

(গ) সায়ংকালে জলধিতটের—নিরীক্ষণ করিতে করিতে — অপূর্ব — পূর্ণ হয়। সময় — দিয়া চলিয়া — তাহা — জানিতে পারি না।

পূরণার্থ পদ ঃ—শোভা, হৃদয়, আনন্দে, কোথা, যায়, আমরা।

(ঘ) তোমার — পালন করিতে আমি কবে — হইয়াছি? তুমি আমার প্রতি যে সকল — আনয়ন করিয়াছে, তাহা সর্বৈব —। তুমি আমাকে—রূপে জানিয়াও যে এরূপ — ধারণা করিতে পারিয়াছ, ইহা বড়ই — বিষয়।

পূরণার্থ পদ ঃ—আদেশ, পশ্চাৎপদ, অভিযোগ, মিথ্যা, বিশেষ, অন্যায়, দুঃখের।

(ঙ) সাধু — চলিতে — এ পৃথিবীতে — সময়ে নিন্দা — হইতে হয় এবং — রূপ কষ্টে — হয়। যাঁহারা মানুষ — ভগবানকে — ভয় করেন, তাঁহারা — আমাদিগের মধ্যে পাগল — পরিচিত হন।

পূরণার্থ পদ ঃ—পথে, গেলে, অনেক, ভাজন, নানা, পড়িতে, অপেক্ষা, অধিক, প্রায়ই, বলিয়া।

(চ) তাহার কথার উপর তুমি — স্থাপন করিলে কেন? সে চিরকাল — ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর এরূপ কাজের ভার দেওয়া — হয় নাই। এখন যদি শেষ মুহূর্তে তাহাকে না — যায়, তবে বল, কাহাকে দিয়া সমাধা করিব? এইভাবে একজন — প্রকৃতির লোকের কথায় নির্ভর করিয়া তুমি — কাজ করিয়াছ।

পূরণার্থ পদ ঃ—আস্থা, বিশ্বাস, উচিত, পাওয়া, চঞ্চল, কাঁচা।

(ছ) অসময়ে — বপন করিলে শস্য ভাল হয় না। ভাল ছেলেকে — না দিলে তাহার পড়ায় উৎসাহ হয় না। বিনয় মানুষের —। অভাবে লোকের — নষ্ট হয়। ক্রোধ মানুষের প্রধান —। পলাশ ফুল দেখিতে — কিন্তু — না থাকাতে কেহ তাহার — করে না।

পূরণার্থ পদ ঃ—রাজ, পারিতোষিক, ভূষণ, স্বভাব, শত্রু, সুন্দর, গন্ধ, আরম্ভ।

(জ) সে যতই ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল আমি — তাহাকে মিষ্ট কথা — লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই — শান্ত করিতে পারিলাম না। বারংবার — করিয়াও যখন বিফল হইলাম, আমিও রাগিয়া উঠিলাম। আশ্চর্যের — এই যে, আমার রাগ দেখিয়া সে — পাইল, তাহার সুর — গেল।

পূরণার্থ পদ ঃ—ততই, বলিতে, তাহাকে, চেষ্টা, বিষয়, ভয়, নামিয়া।

(ঝ) প্রাকৃতিক — আমাকে মুগ্ধ করিল। বাঙ্গালীর কেবল মাঠ দেখা —। ছোট পাহাড় দেখিয়া — হইল। চারিদিকে — দেখিতে লাগিলাম। পরে — বোধ হওয়ায় এক — খণ্ডের উপর বসিয়া খানিক — করিলাম। যখন — ফিরিলাম, তখন — উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে — বাজিতেছে।

পূরণার্থ পদ ঃ—সৌন্দর্য, অভ্যাস, আনন্দ, পাহাড়, ক্লান্ত, শিলা, বিশ্রাম, তাঁবুতে, সন্ধ্যা, শাঁখ।

(ঞ) আমি কাল সকালে তোমার — দেখা করিব। তুমি অতি — বাড়ী আসিবে, — আমার বৃথা পরিশ্রম — সময় নষ্ট —। তাহার চাল — বেশ সাদা —। ডাল — ভাত খায়। সমুদ্রের জল — কিন্তু গঙ্গার জল —।

পূরণার্থ পদ ঃ—সঙ্গে, অবশ্য, নতুবা, ও, হইবে, চলন, সিধে, ও নীল, ঘোলা।

(ট) সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াই ময়ূরের —, অশ্বের —, গজের —, সিংহব্যাঘ্রের —, কোকিলের — এবং — স্বন্‌স্বন্‌ ইত্যাদি শুনিতে পাইলাম।

পূরণার্থ পদ ঃ—কেকা, হ্রেষা, বৃংহিত, গর্জন, কুহু, বাতাসের।

(ঠ) রাম — প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে — শাসন ও — নির্বিশেষে প্রজা — করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন — স্বল্প — সমস্ত কোশল — সর্বত্র সর্বপ্রকার — পরিপূর্ণ — উঠিল।

পূরণার্থ পদ ঃ—রাজপদে, রাজ্য, অপত্য, পালন, গুণে, দিনেই, রাজ্যের সমৃদ্ধিতে, হইয়া।

অশুদ্ধি-সংশোধন

অশুদ্ধি-সংশোধন ব্যাকরণ শিক্ষার শেষ সোপান। শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছু

লিখিতে গেলেই ভাষায় নানাপ্রকার ভুল হয়। বানানের ভুল এই সমস্ত ভুলের মধ্যে সর্বপ্রথম। লিঙ্গঘটিত ভুল, সমাস বা প্রত্যয়ঘটিত ভুল প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাকরণগত ভুল ছাড়াও ভাষা ব্যবহারে রীতিবিরুদ্ধ প্রয়োগ প্রভৃতি আরও কতকগুলি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত পদ বা শব্দ শিষ্টপ্রয়োগ-সম্মত এবং বহুপ্রচলিত, সেগুলি ব্যাকরণ অনুসারে ভুল হইলেও শিষ্ট প্রয়োগসিদ্ধ বলিয়াই চলিতেছে।

নিম্নে কয়েক প্রকার ভুলের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

বানান ঘটিত অশুদ্ধি

হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কার ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অতিত	অতীত	স্বাধিন	স্বাধীন
নিচ	নীচ	নিতি	নীতি
রিতি	রীতি	প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
দির্ঘ	দীর্ঘ	দাশরথী	দাশরথি
মিমাংসা	মীমাংসা	জিবীকা	জীবিকা
ভাগিরথি	ভাগীরথী	সারথী	সারথি
দধিচি	দধীচি	বিকির্ণ	বিকীর্ণ
বিকীরণ	বিকিরণ	শির্ষ	শীর্ষ
পরিক্ষা	পরীক্ষা	কির্তী	কীর্তি
পৃথিবি	পৃথিবী	কিরিট	কিরীট
নিশিথ	নিশীথ	নিরিহ	নিরীহ
হৃষিকেশ	হৃষীকেশ	কালীদাস	কালিদাস
আশীষ	আশিস	কুটীল	কুটিল
আশির্বাদ	আশীর্বাদ	ব্যতিত	ব্যতীত
শারিরীক	শারীরিক	বাল্মিকি	বাল্মীকি
বিভিষিকা	বিভীষিকা	সমিচীন	সমীচীন
পিপিলিকা	পিপীলিকা	নিপিড়িত	নিপীড়িত
কৃষিজীবি	কৃষিজীবী	উন্মিলিত	উন্মীলিত

ঊ-কার ও উকার-ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনুকুল	অনুকূল	দূর্গা	দুর্গা
কৌতুহল	কৌতূহল	কৌতূক	কৌতুক
ময়ুর	ময়ূর	বধু	বধূ
ভূল	ভুল	স্থুল	স্থূল
অকুল	অকূল	পূণ্য	পুণ্য
পুর্ণ	পূর্ণ	তূল্য	তুল্য
সমুহ	সমূহ	লঘূকরণ	লঘুকরণ
মধুসুদন	মধুসূদন	প্রতূ্যষ	প্রত্যুষ
উনবিংশ	ঊনবিংশ	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
শুকর	শূকর	নুপুর	নূপুর
জাগরুক	জাগরূক	স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
অদ্ভূত	অদ্ভুত	বিদূষী	বিদুষী
চ্যূত	চ্যুত		
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব	মুহুর্ত	মুহূর্ত
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু	সিন্দুর	সিন্দূর

ন ও ণ ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনি	মণি	গুন	গুণ
নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ	লাবন্য	লাবণ্য
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ	দর্শণ	দর্শন
বনিক	বণিক	বানিজ্য	বাণিজ্য
চিক্কন	চিক্কণ	কঙ্কন	কঙ্কণ
কল্যান	কল্যাণ	গৃহিনী	গৃহিণী
মৃনাল	মৃণাল	শোনিত	শোণিত
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
পুন্য	পুণ্য	বহ্নি	বহ্নি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ	অগ্রনী	অগ্রণী
বর্ষন	বর্ষণ	মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
মৃণ্ময়	মৃন্ময়	গগণ	গগন
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	ফেণ	ফেন
মূর্দ্ধণ্য	মূর্দ্ধন্য	হিরন্ময়	হিরণ্ময়
ষান্মাসিক	ষাণ্মাসিক	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ

শ, ষ ও স ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রসংশা	প্রশংসা	দুস্কর	দুষ্কর
অভিসেক	অভিষেক	বিসুদ্ধ	বিশুদ্ধ
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	পুস্প	পুষ্প
অভিলাস	অভিলাষ	বহিস্কার	বহিষ্কার
অভিভাসন	অভিভাষণ	বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি
সম্ভাসণ	সম্ভাষণ	সুসুপ্তি	সুষুপ্তি
পুরষ্কার	পুরস্কার	সুসমা	সুষমা
বিসাদ	বিষাদ	ধ্বংশ	ধ্বংস
আবিস্কার	আবিষ্কার	তিরষ্কার	তিরস্কার
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	আসাঢ়	আষাঢ়
সংষ্কৃত	সংস্কৃত	পরিস্ফুট	পরিস্ফুট
ভূমিষাৎ	ভূমিসাৎ	শষ্য	শস্য
পিতৃস্বষা	পিতৃষ্বসা	বিমর্শ	বিমর্ষ
শুশ্রুসা	শুশ্রূষা	কল্যানীয়াষু	কল্যাণীয়াসু

এইগুলি ব্যতীত খ ও ক্ষ-এর প্রয়োগে ভুল হয়। র, ড় ও ঢ়-এর প্রয়োগেও ভুল অনেক সময়েই দেখা যায়। উচ্চারণে গোলমাল থাকে বলিয়া ট ও ঠ-এর প্রয়োগে অনেক ভুল থাকে। ব্য স্থানে ব্যা এবং ব্য-ঘটিত ভুলও দেখা যায়। এই প্রকার ভুলের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	কামাক্ষা	কামাখ্যা
পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ	কাপর	কাপড়
	পড়শী	জড়ায়ু	জরায়ু
গড়ুর	গরুড়	আষাড়	আষাঢ়
মাকরসা	মাকড়সা	প্রৌড়	প্রৌঢ়
হটাৎ	হঠাৎ	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
কোষ্টি	কোষ্ঠি	জ্যেষ্ট	জ্যেষ্ঠ
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট	ব্যাথা	ব্যথা
ব্যায়	ব্যয়	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
ব্যাবহার	ব্যবহার	ব্যাতীত	ব্যতীত
ব্যাবসায়	ব্যবসায়	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
ব্যঘাত	ব্যাঘাত	ব্যয়াম	ব্যায়াম
কাষ্ট	কাষ্ঠ	কাট	কাঠ

বাংলায় ব-ফলার উচ্চারণ প্রায়ই হয় না। সেইজন্য লিখিবার সময় **ব-ফলা ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি** প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এইগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় আবার যেখানে ব-ফলা নাই সেখানেও ভুল করিয়া ব-ফলা যোগ করা হয়।

		অশুদ্ধ	
সাস্থ্য	স্বাস্থ্য	পার্শ	পার্শ্ব
সতন্ত্র	স্বতন্ত্র	দ্বন্দ	
		সান্তনা	সান্ত্বনা
স্বার্থক	সার্থক	কজ্জ্বল	কজ্জল
স্বরস্বতী	সরস্বতী	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উজ্জল	উজ্জ্বল	সচ্ছল	স্বচ্ছল

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্বত্ব, সত্ত্ব, সত্তা এই তিনটি বানান অনেকেরই ভুল হয়। এই শব্দ তিনটির বানান ও ইহাদের ব্যবহার প্রত্যেকেরই জানিয়া লওয়া প্রয়োজন।

দ্রুত উচ্চারণে অনেকেই কতকগুলি ভুল করিয়া থাকে। লিখিবার সময় এই উচ্চারণ-ভুল হইতে কতকগুলি বানান-ভুল ঘটিয়া থাকে। এইগুলির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অনাটন	অনটন
অত্যাধিক	অত্যধিক	অদ্ব্যৈত	অদ্বৈত
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	আর্দ	আর্দ্র
আমাবস্যা	অমাবস্যা	অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
উচিৎ	উচিত	উত্যুঙ্গ	উত্তুঙ্গ
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত	অন্তহিত	অন্তর্হিত
কুৎসিৎ	কুৎসিত	জাম্বুবান	জাম্ববান
গিরিশ্চন্দ্র	গিরিশচন্দ্র	ব্রহ্মোত্তর	ব্রহ্মত্র
দেবোত্তর	দেবত্র	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	সাক্ষ্যাৎ	সাক্ষাৎ
সামিগ্রী	সামগ্রী	মুখস্ত	মুখস্থ
বিদ্যান	বিদ্বান	যুগ্য	যোগ্য
নেয্য	ন্যায্য	সাহার্য	সাহায্য
মঞ্জুরী	মঞ্জরী (রি)	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
সন্মুখ	সম্মুখ	গর্ধব	গর্দভ
ব্যাক্তি	ব্যক্তি	পিচাশ	পিশাচ
অপগণ্ড	অপোগণ্ড	গৃহীতা	গ্রহীতা
শ্মশ্মান	শ্মশান	জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান

সন্ধি ও সমাস-ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অত্যাধিক	অত্যধিক
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী	সম্বাদ	সংবাদ
বশম্বদ	বশংবদ	যদ্যাপি	যদ্যপি
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
পশ্বাধম	পশ্বধম	জাগ্রতবস্থা	জাগ্রদবস্থা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু	ভগবানদত্ত	ভগবদ্দত্ত
পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়	পৃথকান্ন	পৃথগন্ন
অধগতি	অধোগতি	রক্ষরাজ	রক্ষোরাজ
কতকাংশ	কতক অংশ	নভতল	নভস্তল
আপনাআপন	আপন আপন	এমতাবস্থা	এমত অবস্থা
বয়াধিক	বয়োধিক	শিরোপরি	শির-উপরি
জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	মনহর	মনোহর
স্রোতবেগ	স্রোতোবেগ	যশরাশি	যশোরাশি
শিরপীড়া	শিরঃপীড়া	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
মনযোগ	মনোযোগ	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শিরমণি	শিরোমণি	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	ইহাপেক্ষা	ইহা অপেক্ষা
আইনানুসারে	আইন অনুসারে	হস্তীদন্ত	হস্তিদন্ত
নদিতট	নদীতট	কালিমাতা	কালীমাতা
কালিপদ	কালীপদ	কালীদাস	কালিদাস
গুণীগণ	গুণিগণ	পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক
স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র	প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা
প্রণয়ীযুগল	প্রণয়িযুগল	অধিবাসীগণ	অধিবাসিগ
মহিমাবর	মহিমবর	মহিমাময়	মহিমময়
সুন্দরিগণ	সুন্দরীগণ	যুবাগণ	যুবগণ
রোগীসেবা	রোগিসেবা	দাসিপুত্র	দাসীপুত্র
কু-অর্থ	কদর্থ	চণ্ডীদাস	চণ্ডিদাস
নিরোগী	নীরোগ	কু-অন্ন	কদন্ন
নির্ধনী	নির্ধন	নিরপরাধী	নিরপরাধ
রাজদিগের	রাজাদিগের	মহারাজা	মহারাজ
সানন্দিত	আনন্দিত	পাখিগুলি	পাখীগুলি
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি	সাপরাধী	অপরাধী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	সন্ন্যাসী-প্রদত্ত	সন্ন্যাসি-প্রদত্ত
সপ্রণামপূর্বক	প্রণামপূর্বক	পিতাহীন	পিতৃহীন
যোদ্ধাগণ	যোদ্ধৃগণ	মহত্বপকার	মহোপকার
পিতৃঠাকুর	পিতাঠাকুর	ছাগীদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ
ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ	সক্ষম	ক্ষম, সমর্থ
সবিনয়পূর্বক	সবিনয়, বিনয়পূর্বক	সলজ্জিত	সলজ্জ, লজ্জিত
সশঙ্কিত	সশঙ্ক, শঙ্কিত	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
নিশ্চিন্তিত	নিশ্চিন্ত	অল্পজ্ঞানী	অল্পজ্ঞান
সাবধানপূর্বক	সাবধানে, অবধানপূর্বক	নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার
ত্রৈবার্ষিক	ত্রৈবর্ষিক, ত্রিবার্ষিক	ফণীভূষণ	ফণিভূষণ
সবিতাদেব	সবিতৃদেব	দেবিদাস	দেবীদাস
স্বামীভক্তি	স্বামিভক্তি	সাবধানী	সাবধান
		পত্নিপ্রেম	পত্নীপ্রেম

লিঙ্গ-ঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	অপ্সরা		
গায়কী	গায়িকা	উলঙ্গী	উলঙ্গিনী
সুকেশিনী	সুকেশা	ননদিনী	ননদ
প্রস্তরময়মূর্তি	প্রস্তরময়ী মূর্তি	ওজস্বী ভাষা	ওজস্বিনী ভাষা
এতাদৃশরচনা	এতাদৃশী রচনা	সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ	সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি
মুখরা স্ত্রীলোক	মুখরা স্ত্রী		
উর্বরা দেশ	উর্বর দেশ	বিধবা স্ত্রীলোক	বিধবা স্ত্রী
তাদৃশী গরিমা	তাদৃশ গরিমা	অদ্বিতীয়া মহিমা	অদ্বিতীয় মহিমা
বিদুষী রমণীগণ	বিদুষী রমণীরা	সুন্দরী মহিলাবর্গ	সুন্দরী মহিলারা
অর্থকরী ব্যবসায়	অর্থকর ব্যবসায়	শারদীয় পূর্ণিমা	শারদীয়া পূর্ণিমা
সুন্দরী চন্দ্রমা	সুন্দর চন্দ্রমা	মনোহারিণী বাক্য	মনোহর বাক্য, মনোহারিণী বাণী
শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ	শস্যশ্যামল ভারতবর্ষ, শস্যশ্যামলা ভারতভূমি		

প্রত্যয়-ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	আরোগ্য লওয়া	অরোগ হওয়া,
অসহ্যনীয়	অসহ্য, অসহনীয়		আরোগ্য লাভ করা
আলস্যতা	আলস্য	সৌহৃদ্যতা	সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য
মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরতা	আধিক্যতা	আধিক্য
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা	প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল
ভাগ্যমান	ভাগ্যবান	বপিত	উপ্ত
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	বাহ্যিক	বাহ্য
একত্রিত	একত্র	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	গ্রাহ্যণীয়	গ্রাহ্য, গ্রহণীয়
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা	সুরভিত	সুরভি
নিঃশেষিত	নিঃশেষ	জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে
গৌরবত্ব	গৌরব, গুরুতা,	মনমুগ্ধকর	মনোমোহকর
	গুরুত্ব	সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য, আয়ত্ত
ধৈর্যতা	ধৈর্য, ধীরতা	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
প্রসারতা	প্রসার	রক্তিমতা	রক্তিমা
বিশুদ্ধতা	বিশুদ্ধি	আরক্তিম	আরক্ত
বুদ্ধিমানতা	বুদ্ধিমত্তা	পূজ্যস্পদ	পূজ্য, পূজাস্পদ
বৈরতা	বৈর, বৈরিতা	নির্দোষিতা	নির্দোষতা
মান্যনীয়	মান্য, মাননীয়	চোষ্য	চূষ্য
কম্পবান	কম্পমান	সিঞ্চন	সেচন
দোষণীয়	দূষণীয়	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য, দারিদ্র,
সহ্যাতীত	সহনাতীত		দরিদ্রতা
ইচ্ছিত	ইষ্ট	বিবরিত	বিবৃত
অজ্ঞানিত	অজ্ঞাত	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ
প্রবর্ত	প্রবৃত্ত	আগত কল্য	আগামী কল্য
দায়গ্রস্থ	দায়গ্রস্ত	সন্তোষ হওয়া	সন্তুষ্ট হওয়া
প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীন বৃক্ষ	আশ্চর্য হওয়া	আশ্চর্যান্বিত হওয়া

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বালকবৃন্দেরা	বালকেরা, বালকবৃন্দ	পক্ষিগণেরা	পক্ষিগণ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	কেবলমাত্র	কেবল, মাত্র
সমতুল্য	সম, তুল্য	কাপড় পড়া	কাপড় পরা
ঘোড়ায় চরা	ঘোড়ায় চড়া	বই পরা	বই পড়া
পরিয়া যাওয়া	পড়িয়া যাওয়া	গরুবধ	গোহত্যা, গরুমারা।
শবপোড়ান	শবদাহ, মড়াপোড়ান	ভাতবস্ত্র	অন্নবস্ত্র, ভাতকাপড়
পাকাকেশ	পক্ককেশ, পাকাচুল	বৃক্ষরাজিসমূহ	বৃক্ষরাজি, বৃক্ষসমূহ
ঘরনির্মাণ	গৃহনির্মাণ, ঘরতৈরী	নিজস্ব ধন	নিজস্ব, নিজধন
সমুদয় পক্ষিগুলি	পক্ষিসমুদয়, পাখীগুলি	সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত, অধীন		

অশুদ্ধ—ধনী কি নির্ধনী নগরবাসীগণ মাত্রই তাহার অত্যাচারে সদা-সর্বদা সশঙ্কিত থাকিত। সবিনয় পূর্বক নিবেদন এই যে আপনার ঔষধ ব্যভার করিয়া আমি আরাম হইয়াছি। নিরোগী এবং নিশ্চিন্তাহীন ব্যক্তিগণ দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে সমর্থ হন। আমাদের শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে তাহার হৃদয়াকাশে কারণ্যতার উৎস ঝরিতে লাগিল। আগতকল্য কালীদাস সভার মহতী অধিবেশনের পর জ্ঞানমান লোকেরা অকারণে কাহারও মানের লাঘবতা করেন না এ বিষয় প্রমাণ করিবেন।

শুদ্ধ—ধনী কি নির্ধন নগরবাসীমাত্রই তাহার অত্যাচারে সর্বদা শঙ্কিত থাকিত। সবিনয় নিবেদন এই যে,আপনার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমি আরাম পাইয়াছি। নীরোগ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তিগণ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হন। আমাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া (দর্শনে) তাহার হৃদয়ভূমিতে কারুণ্যের বীজ উপ্ত হইল। আগামী কল্য কালিদাস মহতী সভার অধিবেশনের পর জ্ঞানবান লোকেরা অকারণ কাহারও মানের লাঘব করেন না এ বিষয় প্রমাণিত করিবেন।

অশুদ্ধ—উত্তর স্পষ্ট হওয়া আবশ্যকীয়। তিনি রূপে কুবের, গুণে রতিপতি ও ঐশ্বর্যে বৃহস্পতির সমতুল্য ছিলেন এবং পুরুষ বচন প্রযুক্ত প্রাণান্তে অন্যের মনোপীড়া উৎপত্তি করেন নাই। সদেশী যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভবসঙ্কর এই সালে মারা গেছেন। ঋণগ্রস্থ

হওয়ায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দুরাবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি বিলোপ সাধন হইয়াছে ; নির্দোষী বলিয়া এখনও তাহার দুর্ণাম রটে নাই, তথাপি সে সশঙ্কিত চিত্তে দিন যাপিত করিতেছে।

শুদ্ধ—উত্তর স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। তিনি রূপে রতিপতি, ঐশ্বর্যে কুবের ও গুণে বৃহস্পতির তুল্য ছিলেন এবং পরুষবচন প্রয়োগে প্রাণান্তে অন্যের মনঃপীড়া সৃষ্টি করেন নাই। স্বদেশী যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভবশঙ্কর এই বৎসর মারা গিয়াছেন। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি বিলুপ্ত হইয়াছে। সে নির্দোষ বলিয়া এখনও তাহার দুর্নাম রটে নাই, তথাপি সে শঙ্কিতচিত্তে দিন যাপন করিতেছে।

অশুদ্ধ—আমরা পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর বক্ষ হইতে বাঙলার দিগন্ত চওড়া শষ্যশ্যামল প্রান্তর দেখিয়া ভীষণ আনন্দিত হইলাম। কিন্তু শীঘ্র মধ্যে জলধী-জালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, আমরা কূলে অবতরণ করিলাম। জগবন্ধু-বাবুকে পীড়িত দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। তখন রোগি প্রলাপ জপ করিতেছিল। পীড়িতাবস্থায় ঋণগ্রস্থ হইয়া এই মাননীয় ব্যক্তিকে সম্পত্যি আবদ্ধ রাখিতে হইবে।

শুদ্ধ—আমরা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বক্ষ হইতে বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তর দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কিন্তু অনতিবিলম্বে জলদজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, আমরা কূলে অবতরণ করিলাম। জগদ্বন্ধুবাবুকে পীড়িত দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। তখন রোগী প্রলাপ বকিতেছিল। পীড়িতাবস্থায় ঋণগ্রস্ত হইয়া এই মাননীয় ব্যক্তিকে সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইবে।

অশুদ্ধ—অত্যাধিক অধ্যয়নের ফলে বালকটি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। গিরিশচন্দ্র সেই নিশিথকালে সেখানে উপস্থিত। তাঁহার শুশ্রুষাগুণে মুমুর্ষ বালক মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্য হইল। এই সংবাদে আমি আনন্দসাগরে পুলকিত হইলাম ও তাহার সদয়পূর্ণ ব্যবহারে কৃতার্থ হইয়া অবশেষে ধন্যবাদ দিলাম।

শুদ্ধ—অত্যধিক অধ্যয়নের ফলে বালকটি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। গিরিশচন্দ্র সেই নিশীথকালে সেখানে উপস্থিত। তাঁহার শুশ্রূষাগুণে মুমূর্ষু বালক মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিল। এই সংবাদে আমি আনন্দসাগরে ভাসমান হইলাম ও তাহার সদয় ব্যবহারে কৃতার্থ হইয়া অবশেষে ধন্যবাদ দিলাম।

অশুদ্ধ—দুরাবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্বল হাসি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। তুমি মৌন হইয়া আছ কেন, আমি তো তোমাকে অপমান করি নাই। ঋণগ্রস্থ হওয়ায় প্রচুর সম্পাত্যিসমূহ উচ্ছন্ন গিয়াছে।

শুদ্ধ—দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। তুমি মৌনী হইয়া আছ কেন? আমি তো তোমাকে অপমান করি নাই। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি উৎসন্ন গিয়াছে।

অশুদ্ধ—বয়জেষ্ঠ গুরুজন সমূহ এবং স্বজাতির উচ্চবর্ণ পদস্থদিগের প্রতি হতাদার আমাদিগের অবনতির প্রক্রিষ্ট কারণ, 'বিদ্দেষবুদ্ধি' ছাড়িয়া স্বসম্প্রদায় ভুক্ত মনিষীগণের সম্মান করিতে শেখ। সজাতির অনুষ্ঠিত জ্ঞানধরমের অনুশীলন কর—দেখিবে উন্নতি করায়ত্ব হইয়াছে।

শুদ্ধ—বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন এবং স্বজাতির উচ্চপদস্থগণের প্রতি অনাদর আমাদিগের অবনতির প্রকৃষ্ট কারণ। বিদ্বেষবুদ্ধি ছাড়িয়া স্বসম্প্রদায়ভুক্ত মনীষিগণের সম্মান করিতে শেখ। স্বজাতির অনুষ্ঠিত জ্ঞানধর্মের অনুশীলন কর—দেখিবে উন্নতি করায়ত্ত হইয়াছে।

অশুদ্ধ—আমি কৃষিজীবি লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া অবগত হইয়াছি, তাহারা জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে সম্মত নহে। দারিদ্রই তাহার কারণ ; তাহারা বলে প্রবল জমিদার কোপিত হইলে তাহাদের আর ভদ্রস্থত থাকিবে না ; সদাসর্বদাই সশঙ্কিত হইয়া বাস করিতে হইবে।

শুদ্ধ—আমি কৃষিজীবী লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইয়াছি তাহারা জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত নহে। দারিদ্র্যই তাহার কারণ ; তাহারা বলে—প্রবল জমিদার কুপিত হইলে তাহাদের আর ভদ্রতা থাকিবে না, সর্বদাই শঙ্কিত হইয়া বাস করিতে হইবে।

অনুশীলনী

অশুদ্ধি-শোধন কর :—

(ক) নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মড়াদাহ দেখিতে লাগিলাম, চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ আঁধার করে তুলেছিল যে আমাদের নিশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর সৈকতে দাঁড়াইয়া জীবনের নাশ্বর্য্য ও ক্ষণভাঙ্গুর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলাম!

(খ) বাংলা দেশের সকল পল্লীগুলিই অদ্যাপিও জঙ্গলাকীর্ণ, পানায় দীঘি পুষ্করিণী পূর্ণ, ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর করাল কবলে দলে দলে লোক সকল পতিত হইতেছে, তাহাদের গৃহ পুলকহীন, গোধন হাড্ডিসার, ভাগাড়মুখী অথচ নাছোড়বান্দা ভূম্যাধিকারীর রাজস্ব কড়া কান্তিতে দেওয়া চাই। দেশের দুরাবস্থা অবর্ণয়িতব্য।

(গ) ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বহুকাল পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য সচেষ্টিত আছেন, কিন্তু তথাপি উহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় হয় নাই। ইতিপূর্বে পৃথিবীর সমুদয় সভ্যজাতি এই বিষয়ে অনুশীলন করিতে প্রবর্তিত হইয়াছেন. কেহই কৃতকার্যতা হইতে পারেন নাই।

(ঘ) মনমোহনবাবু মাতৃশ্রাদ্ধে বিস্তর ব্যয় বাহুল্যতা করিয়াছেন। চৈব্য, চোষ্য, লেজ্য, পেয় সকল প্রকার ব্যবস্থাই অতি পরিপাটী হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ হইয়াছিলেন।

(ঙ) কৃষকদের সর্বদা যত্নে সেইবার অসহ্য ধান হইয়াছিল। তদ্দারা জমিদারের ঋণ পরিশোধ হইয়া তাহারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ দুরাদৃষ্ট বশত বিলাসের গহ্বরে উত্থিত হইয়া স্বীয় উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

(চ) দেশে অর্থের অত্যাধিক অনাটন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ নাই গৃহস্ত ঋণের দায়ে বিপৎগ্রস্থ। ধনী নির্ধনী প্রায় সমানাবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্দিষ্ট বেতন ভোগীদের অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল। তাহাদেরও বাড়ির আত্মিয় সজনকে সাহায্য করিতে হয়। এই অর্থ সঙ্কট হইতে মুক্ত পাওয়ার উপায় কি? উত্তরের জন্য আমরা প্রধানত দেশের বিদ্বান গণের মুখোপেক্ষী হইয়া আছি।

অলঙ্কার

অলঙ্কার-প্রয়োগ রচনার সৌন্দর্যবৃদ্ধির একটি কৌশল।

আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি তাহা কেবল নিত্যকার প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্যই নয়। যেমন তেমন করিয়া বা কোন প্রকারে মনের ভাবটি প্রকাশ করাতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। মানুষ সুন্দরের পূজারী; সেইজন্যই সে যাহা বলিতে চায় তাহা সাধ্যমত সুন্দর করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, তাহার বক্তব্য বিষয়কে তাহার শিল্পিমনের সাহায্যে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে। এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই আমরা দেখি যে, কাব্যে নাটকে—সাহিত্যের সকল বিভাগেই ভাবপ্রকাশের রীতিটি ও ভাষাটি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাষার সাহায্যেই কতপ্রকার সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাহিত্যে রসসৃষ্টির পক্ষে, চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবার পক্ষে ভাষার মনোহারিত্ব একটি প্রধান অবলম্বন। ভাষার বিভিন্ন অলঙ্কার—অর্থাৎ ভাষার সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য কত বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা করা যাইতে পারে—সেই সমস্ত প্রয়াসের একটা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ বহুশত বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ করিয়াছিলেন এবং বহু শতাব্দীর আলোচনার ফলে আমাদের দেশে এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শাস্ত্রের নাম অলঙ্কারশাস্ত্র। অলঙ্কার অর্থ ভূষণ। কাব্যের বা সাহিত্যের অলঙ্কার বলিতে বুঝিতে হইবে সেই গুণকে, যাহা শব্দের বা অর্থের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত একটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

অলঙ্কার **দুইপ্রকার—শব্দালঙ্কার** ও **অর্থালঙ্কার**। যে অলঙ্কার শব্দের ধ্বনির সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে, যে সৌন্দর্য শব্দের ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহা শব্দালঙ্কার। আর অর্থকে আশ্রয় করিয়া যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহা অর্থালঙ্কার।

অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস ও ধ্বন্যুক্তি এই ছয়টিই প্রধান শব্দালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার

[অনুপ্রাস]

একই প্রকার ধ্বনির (স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি) পুনঃ পুনঃ বিন্যাস দ্বারা অনুপ্রাস অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়।

অনুপ্রাসের মোটামটি পাঁচটি রূপ :—সরল অনুপ্রাস, গুচ্ছানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস ও অন্ত্যানুপ্রাস।

(১) **সরল অনুপ্রাসে** সাধারণত একটি বর্ণই দুই বা ততোধিক বার ধ্বনিত হয় ; যথা—

(ক) একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে
নীরবে।

—মধুসূদন। ('ক'-ধ্বনি ও 'র'-ধ্বনি)

(খ) পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল চললো বনে।

—মধুসূদন। ('ক'-ধ্বনি ও 'ল'-ধ্বনি)

(২) **গুচ্ছানুপ্রাসে** দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণের গুচ্ছ যুক্ত বা অযুক্ত-ভাবে একাধিকবার ধ্বনিত হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) **নন্দ-নন্দন-চন্দ-চন্দন**-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।

—গোবিন্দদাস।

(খ) না মানে **শাসন বসন** বাসন **অশন** আসন যত।

—রবীন্দ্রনাথ।

(৩) **শ্রুত্যনুপ্রাসে** একই বর্ণের আবৃত্তির পরিবর্তে একই উচ্চারণ-স্থান-বিশিষ্ট কতিপয় বর্ণের মধুর সমাবেশ হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) আজি **ফাল্গুন-বন-পল্লব**-ছায় কোন্ কোন্ রঙ ফুটল।

—করুণানিধান।

এখানে ফ, ব, প, তিনটিরই উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ।

(খ) মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে **দীপখানি দ্বারে নামাইয়া** আইলা সম্মুখে।

—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে ধ, দ, ও ন সব কয়টিরই উচ্চারণস্থান দন্ত।

(৪) **ছেকানুপ্রাসে** দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণের একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি ঘটে, কিন্তু ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে। যথা—

(ক) **পাণ্ডু** আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানিমাখা।

—রবীন্দ্রনাথ।

(খ) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

—ভারতচন্দ্র।

(৫) **অন্ত্যানুপ্রাসে** কবিতার দুইচরণের শেষে ঠিক একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটে। মিত্রাক্ষর কবিতার অন্ত্য মিল মাত্রই অন্ত্যানুপ্রাসের দৃষ্টান্ত। যথা—

ভালবাসি এ ধরারে
করি চুমা বৃষ্টি।
মৃত্যুর অধিকারে
অমরতা স্বষ্টি ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ।

[যমক]

একই শব্দ অথবা সমোচ্চারিত শব্দ দুই বার দুইটি ভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হইলে যমক অলঙ্কার হয়।

(ক) **আনা** দরে **আনা** যায় কত আনারস।
(আনা = এক আনা ; ক্রয় করা)

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

(খ) **ভারত ভারত** খ্যাত আপনার গুণে।
(ভারত = কবি ভারতচন্দ্র ; ভারতবর্ষ)

—ঐ।

(গ) যত কাঁদে বাছা বলি **সর সর**
আমি অভাগিনী বলি **সর সর**। (সর = দুধের সর ; সরিয়া যাও)

—কৃষ্ণকমল।

(ঘ) আট পণে আধসের কিনিয়াছি **চিনি**
অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি **চিনি**। —ভারতচন্দ্র।
(চিনি = শর্করা ; চিনিতে পারি)

(ঙ) **ঘন ঘনা**কারে ধূলা উড়িল আকাশে। (ঘন = নিবিড় ; মেঘ)

—মধুসূদন।

[শ্লেষ]

একটি শব্দ একবার ব্যবহৃত হইল, কিন্তু ঐ একটি শব্দই বিভিন্ন অর্থ বুঝাইল। এই প্রকার হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়।

(ক) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর। —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

[গুপ্ত অর্থ কৌলিক উপাধি, অন্য অর্থ লুক্কায়িত।
প্রভাকর অর্থ 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্রিকা, অন্য অর্থ সূর্য।]

(খ) মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে। —মধুসূদন।
[মধু অর্থ কবি মধুসূদন, অন্য অর্থ মকরন্দ।]

(গ) গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ। —ভারতচন্দ্র।

[গোত্র অর্থ বংশ, অন্য অর্থ পর্বত। মুখবংশ অর্থ মুখোপাধ্যায় বংশ, অন্য অর্থ প্রধান বংশ। কুলীন অর্থ কৌলিন্যযুক্ত উচ্চবংশীয়, অন্য অর্থ কু (পৃথিবীর) কথায় মগ্ন। বন্দ্যবংশ অর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, অন্য অর্থ পূজনীয় বংশ, অর্থাৎ দেববংশ। পিতামহ অর্থ ঠাকুরদাদা, অন্য অর্থ ব্রহ্মা। পতি অর্থ স্বামী (বিবাহসূত্রে), অন্য অর্থ প্রভু। বাম অর্থ বিরূপ, অন্য অর্থ মহাদেব। কুকথায় অর্থ খারাপ কথায় বা গালিগালাজে, অন্য অর্থ সংসারের কথায়। পঞ্চমুখ অর্থ বচনপটু, অন্য অর্থ পঞ্চানন। কণ্ঠভরা বিষ অর্থ অপ্রিয়ভাষী, অন্য অর্থ নীলকণ্ঠ মহাদেব। দ্বন্দ্ব অর্থ কলহ, অন্য অর্থ মিলন।]

শ্লেষ দুইপ্রকার ; **অভঙ্গশ্লেষ** ও **সভঙ্গশ্লেষ** ; অভঙ্গের দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সভঙ্গশ্লেষ যথা—

অপরূপ রূপ কেশবে।
দেখ্‌রে তোরা এমন ধারা কালো রূপ কি আছে ভবে।।
—দাশরথি।

'কেশব' এর একটি অর্থ শ্রীকৃষ্ণ ; কিন্তু 'কেশবে' শব্দটিকে ভাঙিলে পাওয়া যায় 'কে শবে', অর্থাৎ শবের উপর কে? তখন শবাসনা 'কালী'-কে বুঝাইল।
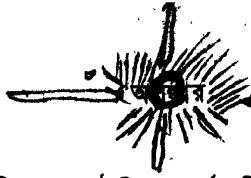
[বক্রোক্তি]

কোনো উক্তি যদি বক্তার ঈপ্সিত অর্থে গৃহীত না হইয়া অন্য অর্থে গৃহীত হয়, অর্থাৎ শ্রোতা যদি ইচ্ছা করিয়া ঐ ঈপ্সিত অর্থকে বাঁকাইয়া বুঝেন, তাহা হইলে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

(ক) সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু, মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসবো কোন্ দুঃখে।

রবীন্দ্রনাথ।

এখানে 'অর্থ' শব্দটিকে বক্তা এক অর্থে ('তাৎপর্য' বা 'ব্যঞ্জনা') ব্যবহার করিয়াছেন, আর প্রতিবক্তা উহার ভিন্ন অর্থ (টাকাকড়ি) : রচনা করিয়া জবাব দিয়াছেন।

(খ) বক্তা। শীঘ্রই তোমার অবস্থা ফিরবে, আর পায়ে হাঁটতে হবে না।

প্রতিবক্তা। সে কি ভায়া, খোঁড়া হব নাকি?

বক্তা বলিতে চাহিয়াছিলেন, শ্রোতার সুদিন আসিবে, পায়ে না হাঁটিয়া তিনি গাড়ী চাপিয়া যাতায়াত করিতে পারিবেন ; কিন্তু শ্রোতা একটু কৌতুক সৃষ্টি করিবার জন্য 'পায়ে'-র উপর জোর না দিয়া 'হাঁটতে-'র উপর জোর দিলেন, আর অমনি অর্থটি বাঁকিয়া দাঁড়াইল : বক্তার সদিচ্ছার উপর আরোপিত হইল একটা তির্যক মনোভাব। ইহারই নাম **কাকু** বক্রোক্তি। কণ্ঠের স্বরভঙ্গীর পরিবর্তনের উপর ইহা নির্ভর করে।

[**মন্তব্য ঃ** অনেকে 'কাকু-বক্রোক্তি' নাম দিয়া একটি পৃথক অলঙ্কার খাড়া করিতে চাহেন ; এবং এক শ্রেণীর জিজ্ঞাসা-ভঙ্গিবিশিষ্ট বাক্যকে উহার দৃষ্টান্ত বলিয়া থাকেন ; যেমন—(ক) কে ছিঁড়ে পদ্মের পর্ণ? (খ) আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? (গ) মাতা আমি নহি? (ঘ) উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না?

কিন্তু এগুলির মধ্যে ইংরাজী অলঙ্কার Interrogationএর প্রতিরূপ খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও ইহারা বক্রোক্তিই নহে, কাকু-র প্রকৃত ব্যঞ্জনা এগুলির মধ্যে ফুটিবার কোন কারণ নাই। আসলে বাংলায় এগুলি কোনো অলঙ্কারই নহে।]

[পুনরুক্তবদাভাস]

মনে হইবে যেন পুনরুক্তি ঘটিয়াছে, অথচ আসলে সেরূপ ঘটে নাই, শুধু একটা পুনরুক্তির আভাস বা ভ্রান্ত ধারণা দেখা দেয়,—এইরূপ যেখানে হয়, সেখানকার অলঙ্কারকে বলা হয় পুনরুক্তবদাভাস। যথা—

(ক) **তনু দেহটি** সাজাব তব আমার আভরণে।

—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে মনে হইতে পারে, 'তনু' মানে যখন দেহ, তখন আবার 'দেহ' কেন? ইহা বুঝি পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হইল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, 'তনু' শব্দটি এখানে 'ক্ষীণ' বা 'কৃশ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে দেহ-লতার শ্রী বর্ধিত হইয়াছে।

(খ) কোথা আজি **পঞ্চশর অনঙ্গ মদন**?

শেষের তিনটি শব্দেরই অর্থ একই, 'কন্দর্প'; তাই মনে হইতে পারে, কবি বুঝি 'কন্দর্প আজ কোথায়?' শুধু এইটাই ব্যক্ত করিতে চাহেন, এবং সেক্ষেত্রে ইহা পুনরুক্তি ছাড়া আর কী? কিন্তু অর্থগ্রাহী মন একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারে, এখানে 'পঞ্চশর' ও 'অনঙ্গ' মদনের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। সেই মদন আজ কোথায় যে পঞ্চশরের অধিকারী, এবং মহাদেবের ললাটাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যে অঙ্গহীন হইয়াছে।

[ধ্বন্যুক্তি]

শব্দের উচ্চারণের মধ্যেই যদি উহার অর্থগত ধ্বনিটি ব্যঞ্জিত হয়, তবে ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

(ক) ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা।

—ভারতচন্দ্র।

আবৃত্তি মাত্রেই এখানে গঙ্গাপ্রবাহের ছল্‌ছল্‌ টল্‌টল্‌ কল্‌কল্‌ ধ্বনি কানে বাজিয়া উঠে।

(খ) চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর।
ঘর ঘর ক্ষীর সর—আপনায় নির্ভর॥

—সত্যেন্দ্রনাথ।

এখানে চরকা-চলার ঘর্ঘর ধ্বনিটি সুস্পষ্ট।

অর্থালঙ্কার

ভাষার মণ্ডন বা সুষমা যেখানে শব্দের উপর নির্ভর না করিয়া অর্থের উপরেই নির্ভর করে সেখানে হয় অর্থালঙ্কার। সাধারণত এই অলঙ্কারকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—

(১) সাদৃশ্যমূলক—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, সন্দেহ, নিশ্চয়, উল্লেখ, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, প্রতীপ ও অতিশয়োক্তি।

(২) বিরোধমূলক—বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি ও বিষম।

(৩) শৃঙ্খলামূলক—কারণমালা, একাবলী, সার ও আরোহ।

(৪) ন্যায়মূলক—অপ্রস্তুত প্রশংসা ও অর্থান্তরন্যাস।

(৫) গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক—ব্যাজস্তুতি ও স্বভাবোক্তি।

[**উপমা**]

দুইটি সমান ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন বস্তুর সাদৃশ্যকথনের দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিলে উপমা অলঙ্কার হয়।

যে বস্তুকে উপমা বা তুলনা দেওয়া হয়, তাহা উপমেয়।

যাহার সহিত উপমা বা তুলনা দেওয়া হয়, তাহা উপমান।

উপমেয় ও উপমান উভয় বস্তুতেই যে ধর্ম বা গুণ বর্তমান থাকে, তাহাকে বলে সামান্য ধর্ম। যথা,

'সম', 'ন্যায়' প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

উপমা অলঙ্কারে এই **চারিটি** জিনিষ থাকিবে—উপমেয়, উপমান, সাধারণ বা সামান্য ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

(ক) গঙ্গা সম সুনির্মল তোমার চরণ জল
পান করিনু শিশুকাল হতে।

(খ) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা! —মধুসূদন।

(গ) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত রশ্মিসম।
দাও বিঁধে দাও বাসনা-সঘন এ কালো নয়নে মম।
—রবীন্দ্রনাথ।

(ঘ) শুকাইল অশ্রুবিন্দু যথা
শিশির নীরের বিন্দু শতদলদলে
উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন। —মধুসূদন

(ঙ) বুদ্ধের করুণ আঁখি ছুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

একটি উপমেয়কে যখন অনেকগুলি উপমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন **মালোপমা** অলঙ্কার হয়। যথা—

মলিনবদনা দেবী হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্তমণি ;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে। —মধুসূদন।

[উৎপ্রেক্ষা]

উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদরূপে সংশয় ঘটিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষায় উপমেয়কে উপমানরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয় বা বিতর্ক করা হয়।

'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি বিতর্কবাচক শব্দ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে, এবং সংশয়বাচক শব্দ না থাকিলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়।

(ক) রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ। দূরে প্রবাহিণী
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি চলিছে সাগরে
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখকাহিনী। —মধুসূদন।

(খ) ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি
পাণ্ডব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি। —ঐ

(গ) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল।
যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার। —রবীন্দ্রনাথ।
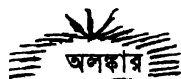
সংশয়বাচক শব্দ না থাকিলে যে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয় তাহার উদাহরণ :—

এসেছে বরষা এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা ;
দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা।
গীতময় তরুলতিকা। —রবীন্দ্রনাথ।

[রূপক]

উপমেয় ও উপমানের অভেদ-কল্পনাকে রূপক অলঙ্কার বলে।

এই অলঙ্কারে উপমানের অর্থই সাধারণতঃ প্রবল হইয়া থাকে।

(ক) মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। —রবীন্দ্রনাথ

(খ) কি কুক্ষণে
পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈমগৃহে। —মধুসূদন

(গ) অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী—
একটি স্বপ্ন-মুগ্ধ সজল নয়নে
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে
চারিদিকে চিরযামিনী। —রবীন্দ্রনাথ।

(ঘ) শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল, মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রু-বারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব। —মধুসূদন।

[ব্যতিরেক]

উপমান অপেক্ষা যেখানে উপমেয়কে বড়ো করিয়া দেখানো হয়, সেখানেই হয় ব্যতিরেক অলংকার। যথা—

(ক) দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি। —কাশীরাম দাস।

(খ) খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল। —ঐ

(গ) তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো। —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে প্রথম উদাহরণে (ক) উপমেয় হইল দ্বিজ (ছদ্মবেশী অর্জুন) আর উপমান হইল মনসিজ অর্থাৎ কন্দর্প; কবির বক্তব্য, অর্জুনের দেহ-সৌন্দর্য কন্দর্পের অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের; সুতরাং উপমেয় (অর্জুন) এখানে উপমান (মনসিজ বা কন্দর্প) অপেক্ষা বড়ো হইল। সেইরূপ দ্বিতীয় উদাহরণে (খ) উপমান (খগরাজের নাসিকা) অপেক্ষা উপমেয় (অর্জুনের নাসিকা) বড়ো হইয়াছে। তৃতীয় উদাহরণে (গ) উপমান (মেঘ) অপেক্ষা উপমেয় (দিঠি অর্থাৎ চক্ষু, ঘনকৃষ্ণতায়) আরও চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[**সমাসোক্তি**]

নির্জীব পদার্থে সজীব পদার্থের ক্রিয়া বা ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। উভয় পদার্থের সমান কার্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ হওয়া প্রয়োজন। এই অলঙ্কারে, প্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয়ের উপর অপ্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনা-বহির্ভূত উপমানের আচরণের আরোপ হয়। যথা—

(ক) নয়নে তব হে রাক্ষসপুরী
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি।
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন-মুকুট
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরী
তোমার! উঠগো শোক পরিহরি, সতি। —মধুসূদন।

(খ) হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ! —রবীন্দ্রনাথ।

(গ) বসুন্ধরা দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে। —ঐ

(ঘ) চাহিয়া ঈর্ষার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।
—যতীন্দ্রমোহন।

[সন্দেহ]

যখন কবি স্বীয় প্রতিভাবলে রচনাটিকে এমনভাবে দাঁড় করান যে উপমান-উপমেয় লইয়া একটা সন্দেহ জাগে, তখনই হয় সন্দেহ অলঙ্কার। যথা—

(ক) দুইধারে ওকি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল?
—রবীন্দ্রনাথ।

(খ) সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার?
—মোহিতলাল।

[নিশ্চয়]

উপমানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যদি উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে নিশ্চয় অলঙ্কার হয়।

(ক) অসীম নীরদ নয়,
ওই গিরি হিমালয়! —বিহারীলাল।

এখানে উপমান 'নীরদ' (মেঘ)-কে বর্জন করিয়া উপমেয় যে 'হিমালয়' তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

(খ) কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর পদভরে;—নহে ভূকম্পনে। —মধুসূদন।

এখানে উপমান 'ভূকম্পন' কে বাতিল করিয়া 'পদভরে-কম্পন'কেই নিশ্চিত করিয়া রাখা হইল।

[উল্লেখ]

বহুগুণান্বিত কোন বিষয়ের যদি বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন গুণের উল্লেখ ঘটে তবে সেখানে হয় উল্লেখ অলঙ্কার। যথা—

(ক) স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে একই নারীর (চিত্রাঙ্গদা) একবার স্নেহ, একবার বীর্যের উপর নজর পড়িয়াছে।

(খ) রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

[ভ্রান্তিমান]

ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যহেতু দুই বিভিন্ন বস্তুতে কবি-কল্পনা-জাত ভ্রম যেখানে স্থি হয়, সেখানে হয় ভ্রান্তিমান অলঙ্কার। যথা—

(ক) দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়-ভ্রমেঃ বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন !

এখানে 'অক্ষির' সহিত 'কুবলয়' (পদ্ম)-এর বিভ্রম কবি-কল্পনারই সৃষ্টি।

(খ) চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলাভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস ॥

এখানে সীতার 'বদন' (উহ্য) এর সহিত চন্দ্রকলার বিভ্রম সৃষ্টি করা হইয়াছে।

[অপহ্নুতি]

যেখানে প্রকৃত বস্তু বা ঘটনার অপহ্নব ঘটাইয়া, অর্থাৎ তাহাকে খর্বিত করিয়া কল্পিত বস্তুকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়; অথবা যেখানে উপমেয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়া উপমানকেই (এখানে নিশ্চয়-অলঙ্কারের সহিত বৈপরীত্য লক্ষণীয়) কবি-কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সেখানে হয় অপহ্নুতি অলঙ্কার। যথা—

(ক) বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা। —মধুসূদন।

এখানে প্রকৃত ঘটনা হইল 'বৃষ্টি', কিন্তু কবি কল্পনা করিতেছেন, উহা বৃষ্টি নহে, গগনের অশ্রুধারা। সুতরাং কল্পিত ঘটনাই প্রতিষ্ঠা পাইল।

(খ) চোখে চোখে কথা নয় গো, বন্ধু আগুনে
আগুনে কথা। —অন্নদাশংকর।

[প্রতিবস্তূপমা]

যেখানে উপমেয় ও উপমান পাশাপাশি দুইটি পৃথক বাক্যে থাকিয়া একই সামান্য ধর্মে গ্রথিত হয়, অথচ সেই সামান্য ধর্মটি এক অর্থে ব্যবহৃত হইলেও পৃথক ভাষায় ঠিক উপমেয় ও উপমানের উপযোগী হয়, সেখানে হয় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। যথা—

একটি মেয়ে চ'লে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে:
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজসাপের নিশ্বাসে।
—সত্যেন্দ্রনাথ।

এখানে 'মেয়ে' উপমেয়, 'মুকুল' উপমান। দুইয়ের মধ্যে সামান্য ধর্ম 'বিনষ্ট হওয়া', উপমেয় ও উপমানের উপযোগীরূপে একটু ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, 'চলে গেছে' ও 'শুকিয়ে গেছে' এই দুই প্রয়োগের মধ্যে।

[দৃষ্টান্ত]

যেখানে উপমেয় ও উপমান পাশাপাশি দুইটি পৃথক বাক্যে থাকিয়া একই সাধারণ ধর্মে গ্রথিত হয়, কিন্তু সেই সামান্য ধর্মটি দুইটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন অর্থে প্রকাশিত হয়, আর কি উপমেয়ে-উপমানে, কি তাহাদের সামান্য ধর্মে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব বিদ্যমান থাকে, সেখানে হয় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। যথা—

(ক) জীবনে যত পূজা হলো না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে উপমেয় 'জীবনের পূজা' (মহৎ প্রয়াস), আর উপমান একবার 'ফুল', আর একবার 'নদী'। উপমেয়-উপমানে যে সাধারণ ধর্ম, তাহাতে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব বিদ্যমান, এবং সেটি পৃথক পৃথক বাক্যে পৃথক ভাষায় প্রকাশিত, অথচ ব্যঞ্জনায় একটা দূরগত সাদৃশ্য আছে। একদিকে মহৎ প্রয়াস সম্পূর্ণ না হইয়াও ব্যর্থ না হওয়া, অপরদিকে ফুটিতে না পারিয়া, অথবা যাত্রাপথ সমাপ্ত করিতে না পারিয়াও ব্যর্থ না হওয়া, এইখানেই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব।

(খ) রবিকর যবে দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ;.....................
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্বজন তথা ? —মধুসূদন।

এখানে উপমেয় 'সীতাদেবী'র উপমান 'রবিকর', দুইটি পৃথক বাক্যে আশ্রিত। সীতার পদার্পণে সর্বজন সুখী হওয়া, এবং রবিকরের প্রবেশে বনস্থল আলোকিত হওয়া, এই দুইটি ঘটনার ব্যঞ্জনাগত সাম্যবোধে সাধারণ ধর্মে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব হইয়াছে।

[নিদর্শনা]

যেখানে দুইটি বস্তুর মধ্যে এমন একটা ব্যঞ্জনাগত সাদৃশ্যের বলে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাব দেখানো হয় যে, সাধারণত অসম্ভব বলিয়া ঐ সাদৃশ্যটাকে কল্পনায় দাঁড় করাইতে হয়, সেখানে হয় নিদর্শনা অলঙ্কার। যথা—

(ক) অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন। —মধুসূদন।

একদিকে অবরেণ্য ভাষাকে বরণ করা, আর একদিকে শৈবালে কেলি করা, এই দুইটির পরস্পর সম্বন্ধ অসম্ভব বা অবাস্তব, অথচ ব্যঞ্জনাগত সাদৃশ্যহেতু উভয়ের মধ্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব ফুটিয়াছে। শৈবালে কেলি করা যেমন অসম্ভব ভুল, অবরেণ্যকে বরণ করাও তেমনি অসম্ভব ভুল।

(খ) খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা?
সেই দাসীপুত্র হবে মেবারের রাজা? —যদুগোপাল।

এখানে একটি উপমেয় ও দুইটি উপমানের মধ্যে নির্দশনা অলঙ্কার হইয়াছে। উপমেয় 'দাসীপুত্র' আর উপমান 'খদ্যোত' এবং 'অজা'। খদ্যোত ও অজার উপর এক একটি অসম্ভব ধর্মের আরোপ করা হইয়াছে,—কারণ দাসীপুত্রের পক্ষে রাজা হওয়া ঐ রকমই অসম্ভব।

[প্রতীপ]

যেখানে উপমান উপমেয়রূপে কল্পিত হয়, অথবা উপমেয়ের উৎকর্ষ প্রভাবে উপমান হয় প্রত্যাখ্যাত, সেখানে প্রতীপ অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

(ক) আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তল-সম
নামিয়াছে মম দুইটি তীরে। —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে উপমানকে (বর্ষার মেঘ) উপমেয় (কুন্তল) রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সাধারণত 'মেঘ-সম কুন্তল' বলা হয়, এখানে তাহার বিপরীত (প্রতীপ) ভঙ্গিতে 'কুন্তল-সম মেঘ' বলা হইয়াছে।

(খ) প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার উপরে রডোডেনড্রেন-গুচ্ছ। —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে উপমেয়ের (রডোডেনড্রন-গুচ্ছ) উৎকর্ষের প্রভাবে উপমান (অরুণ কিরণ) হইয়াছে প্রত্যাখ্যাত।

[অতিশয়োক্তি]

যেখানে আতিশয্য প্রকাশের আবেগে উপমেয়কে গ্রাস করিয়া একা উপমানই আসর জুড়িয়া বসে, সেখানে হয় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। যথা—

(ক) নীরবিলা শশিমুখী। কহিল সরমা,—
"এখনো তৃষাতুর এ দাসী, মৈথিলি,
দেহ সুধাদান তারে।" —মধুসূদন।

এখানে সরমার 'শুনিবার আকাঙ্ক্ষা' ও সীতার 'মধুর বচন' এই দুইটি উপমেয়কে গ্রাস করিয়া তৎস্থলে 'তৃষা, ও 'সুধা' এই দুইটি উপমানই বক্তব্যের আসর জুড়িয়া বসিয়াছে; ইহার কারণ কবি ঐ 'আকাঙ্ক্ষা' ও মাধুর্যের 'আতিশয্য' প্রকাশ করিতে চাহেন।

(খ)　　　সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয় ;
　　　　চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়। —সত্যেন্দ্রনাথ।

বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক তেজ ও দৃঢ়তাই এখানকার উপমেয় ; কিন্তু তাহার কোন উল্লেখই নাই ; ঐ তেজের আতিশয্য কবির ভাষায় 'বাড়বাগ্নি' এই উপমান রূপে একাই সমগ্র প্রকাশকে অধিকার করিয়াছে।

[বিরোধাভাস]

যেখানে আপাত-বিরোধের অন্তরালে গভীর তাৎপর্য প্রবল ও স্ফুটতর হইয়া উঠে, সেখানে হয় বিরোধাভাস অলঙ্কার। যথা—

(ক)　　　ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
　　　　সব শিশুদের অন্তরে। —গোলাম মুস্তাফা

'শিশু' যে, তাহার মধ্যে আবার 'পিতা' কোথা হইতে আসিবে, এইখানেই বিরোধ। কিন্তু আসলে বিরোধ নহে, বিরোধের 'আভাস' অর্থাৎ বিভ্রম মাত্র। উহার অন্তরালে রহিয়াছে গভীর তাৎপর্য যে,—আজ যে শিশু, কালে সেই তো হইবে পূর্ণ মানব ; সেই পূর্ণতার সম্ভাবনা শিশুর মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে।

(খ)　　　অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
　　　　লভিব মুক্তির স্বাদ। —রবীন্দ্রনাথ।

বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রস্তাব তো ঘোর বিরোধাত্মক ; কিন্তু তবু উহার মূলে আছে গভীর তাৎপর্য,—সুশৃঙ্খল কর্মজীবনের আনন্দই খাঁটি মুক্তির আনন্দ।

[বিভাবনা]

যেখানে কারণ-ছাড়া কার্যোৎপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইলে চমৎকারিত্ব দেখা দেয়, সেখানে হয় বিভাবনা অলঙ্কার। যথা—

　　　বিনা মেঘে বজ্রাঘাত　　অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
　　　　বিনা বাতে নিভে গেল মঙ্গলপ্রদীপ —অমৃতলাল।

আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যুর কথা এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

[বিশেষোক্তি]

যেখানে কারণ সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি হইল না এইরূপ মনে হয়, সেখানে হয় বিশেষোক্তি অলঙ্কার। যথা—

　　　যদি করি বিষপান　　তথাপি না যায় প্রাণ······ —চণ্ডীদাস।

এখানে বিষপান রূপ কারণ থাকিতেও মৃত্যুরূপ কার্যোৎপত্তি ঘটিল না। শ্রীমতীর অন্তর কানুময় হইয়া থাকায় কী অবস্থা তাহার, সেই সম্পর্কে বিশেষোক্তি করিবার জন্যই কবির এই প্রয়াস।

[অসঙ্গতি]

যেখানে কারণ রহিল একস্থানে, আর কার্য ঘটিল অন্য স্থানে, এইরূপ হয়, সেখানে অসঙ্গতি অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

একের কপালে রহে, আরের কপালে দহে,
আগুনের কপালে আগুন। —ভারতচন্দ্র।

এখানে রতিবিলাপে দেখা যায়, যে আগুনে মদন ভস্মীভূত হয়, সেই আগুনরূপ সর্বনাশের কারণটি ছিল শিবের কপালে, কিন্তু উহার দাহ-কার্য শিবের কপালের উপর না ঘটিয়া ঘটিল রতির কপালে, যেহেতু মদন ভস্মের ফলে তাহারই কপাল পুড়িল।

[বিষম]

যেখনে বিষম অর্থাৎ বিসদৃশ বা বিপরীত দুইটি বস্তুর বর্ণনা হইতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়, সেখানে হয় বিষম অলঙ্কার। যথা—

(ক) সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে, হায় হায়, কেহ কারো নয়॥ —ঈশ্বর গুপ্ত।

(খ) পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল। —জ্ঞানদাস।

[কারণমালা]

যেখানে এক কারণের কার্য অপর কার্যের কারণ হয়, সেখানে সেই কারণ পরম্পরার মধ্যে দেখা দেয় কারণমালা অলঙ্কার। যথা—

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এখানে 'পাপ' হইল 'লোভ' এই কারণের কার্য; আবার ঐ কার্যই (পাপ) অপর কার্য 'মৃত্যু'র কারণ।

[একাবলী]

যেখানে এমনভাবে পর পর পদগুলি সাজানো হয় যাহাতে পূর্ববর্তী পদ পরবর্তী পদকে বিশেষিত করে, সেখানে হয় একাবলী অলঙ্কার। যথা—

গাছে গাছে ফুল ফুলে ফুলে অলি
সুন্দর ধরাতল। —যতীন্দ্রমোহন।

এখানে প্রথমে 'ফুল', পরে 'অলি'র প্রসঙ্গ, কিন্তু ফুল-এর দ্বারা অলি বিশেষিত হইয়াছে।

[সার]

যেখানে বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রকাশ পায়, সেখানে হয় সার অলঙ্কার। যথা—

'কালিদাসের সেরা সৃষ্টি 'শকুন্তলা', তার মধ্যে সেরা হলো চতুর্থ সর্গ,

সেখানকার সেরা হ'লো সেই চারটি শ্লোক, যা মুনির মুখ থেকে বেরিয়েছে শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার মুহূর্তে!'

[আরোহ]

যেখানে প্রকাশভঙ্গিতে ভাবাবেগের বা অর্থগুরুত্বের ক্রম-উত্থান লক্ষিত হয় সেখানে হয় আরোহ অলঙ্কার। যথা—

ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ! —স্বামী বিবেকানন্দ।

[অপ্রস্তুত প্রশংসা]

যেখানে অপ্রস্তুত বা অ-প্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনা (প্রশংসা) হইতে প্রস্তুত বা প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতীতি হয়, সেখানে অলঙ্কারটি হয় অপ্রস্তুত প্রশংসা। যথা—

চাতক যাচিলে জল হইয়া কাতর,
মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর? —উদ্ভট।

এখানে অ-প্রস্তুত 'চাতক' ও 'জলধর' এর প্রশংসা অর্থাৎ আচরণের বর্ণনা হইতে প্রস্তুত অর্থাৎ উদ্দিষ্ট যাচক ও দাতার আচরণ সম্বন্ধে—প্রতীতি জন্মাইতেছে। প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের প্রকারভেদে এই অলঙ্কার দেখা দেয় পাঁচ রকমে :—(১) সামান্য হইতে বিশেষ, (২) বিশেষ হইতে সামান্য, (৩) কার্য হইতে কারণ, (৪) কারণ হইতে কার্য, ও (৫) সদৃশ হইতে সদৃশ-এর প্রতীতি। উপরের দৃষ্টান্তটিতে কারণ হইতে কার্যের প্রতীতিমূলক অপ্রস্তুত প্রশংসা হইয়াছে। অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারটি অনেকটা ইংরাজী Allegory ধরণের। সমাসোক্তির সহিত ইহার এইখানেই পার্থক্য যে সেখানে প্রস্তুতের উপর অ-প্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হয়, সেখানে প্রস্তুত বা বর্ণনীয়েরই প্রশংসা করা হয় উপমান-এর আচরণের ছাঁচে।

[অর্থান্তরন্যাস]

যেখানে বিশেষের দ্বারা সামান্য, অথবা সামান্যের দ্বারা বিশেষ, আবার কারণের দ্বারা কার্য, অথবা কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হয়, সেখানে হয় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। যথা—

(ক) চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥ —কৃষ্ণচন্দ্র

এখানে সর্পদংশন-ঘটিত বিশেষ উক্তির দ্বারা ব্যথীর ব্যথাঘটিত সাধারণ (সামান্য) উক্তিটি সমর্থিত হইয়াছে।

(খ) হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি !— —মধুসূদন।

এখানে নীচ-সংসর্গে নীচতা দেখা দেওয়া রূপ সামান্য বা সাধারণ উক্তির দ্বারা নর-বানরের নিকৃষ্ট সংসর্গজনিত বিভীষণের বর্বরতা রূপ বিশেষ ব্যাপারটি সমর্থিত হইয়াছে

[ব্যাজস্তুতি]

যেখানে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি হয়, সেখানকার অলঙ্কারের নাম ব্যাজস্তুতি। (ব্যাজ=ছল। সুতরাং এক হইল, ব্যাজে স্তুতি, অর্থাৎ মনে হইবে নিন্দা, কিন্তু নিন্দাটি ছল বা ভান মাত্র, আসলে স্তুতি। আর এক হইল, ব্যাজ-যুক্ত স্তুতি, অর্থাৎ স্তুতির ভান করা হইয়াছে, কিন্তু আসলে উহা নিন্দা। যথা—

(ক) কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। —ভারতচন্দ্র।

শুনা মাত্রই মনে হইবে, ঘোরতর নিন্দা করা হইতেছে ; মানুষটি নির্গুণ, একেবারে পোড়াকপালে লোক। সামান্য মানুষ ঈশ্বরী পাটনীর কাছে অন্নদার এই পতি-নিন্দা লাগিতেছেও ভাল। কিন্তু ঐ নিন্দাটি ব্যাজ বা ভান মাত্র ; আসলে অন্নদা বলিতে চাহেন, তাঁহার স্বামী ত্রিগুণাতীত, এবং সর্বধ্বংসী অগ্নিকে তিনি স্বীয় ললাটে ধারণ করেন।

(খ) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ ! —মধুসূদন।

সিন্ধুর প্রতি রাবণের উক্তি। মনে হইবে বুঝি সুন্দর মালাধারী সিন্ধুর বন্দনা গাওয়া হইতেছে। কিন্তু এই স্তুতিটি ব্যাজ মাত্র, আসলে রাবণ সিন্ধুকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতেছেন যে, নিজের স্বাধীন গতিকে গাছ-পাথরের তুচ্ছ সেতুর দ্বারা ব্যাহত হইতে দিবে, এত হীন সে কিরূপে হইল।

[স্বভাবোক্তি]

যেখানে সরস ও হৃদয়গ্রাহী উক্তিতে স্বভাবের বর্ণনা হয়, সেখানে হয় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। এখানে 'স্বভাব' বলিতে নিসর্গের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এবং মানুষ অথবা মনুষ্যেতর প্রাণীর কথাও বুঝিতে হইবে। এই অলঙ্কারে বস্তু অপেক্ষা কবিমানসেরই প্রাধান্য। যথা—

তৃণাঞ্চিত তীরে
জল-কলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভংগীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে ল'য়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে। —রবীন্দ্রনাথ।

.এখানে ঘুমন্ত সারসের বিশেষ ভঙ্গিটি কবি-মানসের দরদী স্পর্শে পরম মণীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত রচনাংশগুলির অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

১। এনেছিলে সাথে করি মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। —রবীন্দ্রনাথ।

২। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।— —ঐ।

৩। এদেশে বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। —ঐ।

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত-প্রান্তর— —ঐ।

বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল। —ঐ।

আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে
মন চলে না। —ঐ।

৭। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাইবার আয়োজন আজ র্যন্ত হলো না। যেন ক'নে রইল বাপের বাড়ীর অন্তঃপুরে, শ্বশুর-বাড়ী নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে, খেয়া নৌকাটা গেল কোথায়? —ঐ।

৮। আমাদের এক বাক্সে (দিয়াশলাই) যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা ধরানো চলিত। ঐ।

৯। মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥ —মুকুন্দরাম।

১০। গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন। —ঐ।

১১। চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥ —ভারতচন্দ্র।

১২। ভুরু দেখি ফুল-ধনু ধনু ফেলাইয়া
লুকায় মাজার মাঝে অনংগ হইয়া। —ঐ।

১৩। বড়'র পিরিতি বালির বাঁধ,
খনে হাতে দড়ি, খনেকে চাঁদ। —ঐ।

১৪। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?—বঙ্কিমচন্দ্র।

১৫। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ-ধনী তদপেক্ষাও দোষী— —ঐ।

১৬। মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। —ঐ।

১৭। তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু

লয়ে, রচ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি —মধুসূদন।

১৮। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা,
হর-কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি —ঐ।
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে।

১৯। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। —ঐ।

২০। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি'। —ঐ।

২১। বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে। —সত্যেন দত্ত।

২২। মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাঁহারাই হন। —নজরুল।

২৩। তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীরে দিলে দান ধূলামাটী,
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটী।

২৪। জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তানসম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়। —ঐ।

২৫। সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে। —রবীন্দ্রনাথ।

২৬। দুর্গমতুষারগিরি অসীম নিঃশব্দে নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার। —ঐ।

২৭। কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি। —ঐ।

২৮। কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি,—
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাঁসি। —ঐ।

২৯। দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়। —হেমচন্দ্র।

৩০। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই। —রবীন্দ্রনা

দ্বিতীয় পর্ব

পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ

(প্রথম পত্রের ব্যাকরণ)

পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ

(প্রথম পত্রের ব্যাকরণ)

নবম শ্রেণী

(পদ্যাংশ)

কবিগুরু বন্দনা ঃ

১। শিরশ্চূড়ামণি, মনোহর ও কাব্যোদ্যান, সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

উঃ। শিরঃ + চূড়ামণি ; মনঃ + হর ; কাব্য + উদ্যান।

২। কৃপা প্রভু, করো অকিঞ্চনে। 'অকিঞ্চনে' কোন বিভক্তি ? কোন্ কারকে এই বিভক্তি বসিয়াছে ?

উঃ। 'অকিঞ্চনকে' এই অর্থে 'অকিঞ্চনে' বসিয়াছে। ইহা কর্মকারক। কর্মে 'এ' বিভক্তি বসিয়াছে। বলা বাহুল্য 'এ' সপ্তমী বিভক্তির সাধারণ চিহ্ন কিন্তু 'এ' সকল কারকেই ব্যবহৃত হয়।

৩। কৃত্তিবাস ও কীর্তিবাস কোন সমাস ? ব্যাসবাক্য লিখ :—

উঃ। কৃত্তি বাস যাহার কৃত্তিবাস, বহুব্রীহি।

কীর্তি হইয়াছে বাস যাহার, কীর্তিবাস, বহুব্রীহি।

দধীচির তনুত্যাগ ঃ

১। ঋষি, জীব, ধ্যান, ক্ষণ এই শব্দগুলি বিশেষণে পরিবর্তন কর।

উঃ। আর্ষ, জৈব, ধ্যেয়, ক্ষণিক।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—তপোধন, মুনীন্দ্র, শিরোরত্ন, পুষ্পাসার।

উঃ। তপঃ + ধন ; মুনি + ইন্দ্র ; শিরঃ + রত্ন ; পুষ্প + আসার।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :—সহস্রলোচন, রোমাঞ্চতনু, নিরুপম, জ্যোতিঃপূর্ণ।

উঃ। সহস্র লোচন যাহার, বহুব্রীহি। রোমাঞ্চ হইয়াছে তনু যাহার অথবা রোমাঞ্চ তনুতে যাহার, বহুব্রীহি। নাই উপমা যাহার, বহুব্রীহি। জ্যোতিঃ দ্বারা পূর্ণ, তৃতীয়া তৎপুরুষ।

মধ্যাহ্নে ঃ

১। **পদান্তর সাধন কর :**—মেঠো, জগৎ, ঘর, জল, লাজ, অলস, হৃদয়, ব্যথা।

উঃ। মাঠ, জাগতিক, ঘরোয়া, জলীয় বা জলো, লাজুক, আলস্য, হৃদ্য, ব্যথিত।

২। নদীকূল, কুলবধূ, ধরাধাম—কোন্ সমাস ? ব্যাসবাক্য লিখ।

উঃ। নদীর কূল, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। কুলের বধূ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। ধরাই ধাম, কর্মধারয়।

প্রতিনিধি ঃ

১। দৈন্য, ঐশ্বর্য, অভিলাষ ও ভিখারী—এই শব্দগুলি কি ভাবে সাধিত হইয়াছে ?

উঃ। দৈন্য—দীন+য (দীনের ভাব এই অর্থে)। ঐশ্বর্য—ঈশ্বরের ভাব অর্থে 'য' প্রত্যয়। অভিলাষ—অভি—লষ্+খ (ঘঞ্)। ভিখারী—ভিখ্+আরী। (ভিক্ষা করা জীবিকা যাহার)

২। মধ্যাহ্নস্নান, পাদপদ্ম, দ্বিপ্রহর, পুরবাসী, অনুরূপ—কোন্ সমাস ? ব্যাসবাক্য কি ?

উঃ। দিনের মধ্য, মধ্যাহ্ন, একদেশী ; মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত স্নান, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। পদ্মের মত পাদ, উপমিত কর্মধারয়। দ্বিতীয় প্রহর দ্বিপ্রহর, কর্মধারয়। পুরে বাস করে যে পুরবাসী, উপপদ তৎপুরুষ। রূপের অনুগত অনুরূপ, প্রাদি তৎপুরুষ।

প্রাচীন ভারত ঃ

১। অশ্বের ডাক, হস্তীর ডাক, নূপুরের ধ্বনি, তরবারির শব্দ, ধনুকের শব্দ—এইগুলি এক কথায় প্রকাশ কর।

উঃ। হ্রেষা, বৃংহিত (বৃংহণ), নিক্কণ, ঝঞ্ঝনা, টঙ্কার।

২। উদ্ধতললাট ও অম্বরতল কোন সমাস ?

উঃ। উদ্ধত ললাট যাহার, বহুব্রীহি। অম্বরের তল, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—উচ্ছ্বাস, উল্লাস।

উঃ। উৎ+শ্বাস ; উৎ+লাস।

৪। পদান্তরিত কর :—

উদ্ধত, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, গম্ভীর, শান্ত, সংযত, স্ফীত, স্তব্ধ, স্ফূর্ত।

উঃ। ঔদ্ধত্য, উদ্ভাসিত, উল্লসিত, গাম্ভীর্য, শান্তি, সংযম, স্ফীতি, শুদ্ধতা, স্ফূর্তি।

নন্দলাল ঃ

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ ঃ—স্বদেশ, অভাগা, ফিসন।

উঃ। স্ব অর্থাৎ নিজের দেশ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। অভাগা—নাই ভাগ্য যাহার, বহুব্রীহি। ফিসন—সনে সনে, অব্যয়ীভাব।

২। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি হইতে চারিটি তৎসম, চারিটি তদ্ভব ও চারিটি বিদেশী শব্দ বাহির কর।

নন্দ বাড়ীর হত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি
চড়িত না গাড়ী কি জানি কখন উলটায় গাড়ীখানি।
নৌকা ফিসন ডুবিছে ভীষণ রেলে কলিসন হয়।
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ী চাপাপড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল।

উঃ। তৎসম শব্দ—নন্দ, নৌকা, ভীষণ, সর্প, কুক্কুর ইত্যাদি।
তদ্ভব—ঘটে, জানি, শুয়ে, রহিল।
বিদেশী—ফিসন, রেল, কলিসন ইত্যাদি।

মা আমার ঃ

১। অনিবার ও ছোটখাট কোন সমাস ? ইহাদের ব্যাসবাক্য কি ?

উঃ। নাই নিবার যাহাতে, বহুব্রীহি। ছোটও বটে, খাটও বটে, কর্মধারয়।

২। বিষাদ, বিসর্জন ও কলঙ্ক এইগুলির বিশেষণে কি হইবে লিখ ?

উঃ। বিষণ্ণ, বিসর্জিত, কলঙ্কী বা কলঙ্কিত।

বাঙালীর মা ঃ

১। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ ঃ—

হিমাদ্রি, পদযুগ, আনন্দভুবন, পাদপদ্ম, পদ্মাসন, পাদোদকসুধা।

উঃ। হিমের অদ্রি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) বা হিম-প্রধান অদ্রি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। পদদ্বয়ের যুগ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। আনন্দের ভুবন, ৬ষ্ঠীতৎ।

পাদ পদ্মের মত, উপমিত কর্মধারয়। পদ্মচিহ্নিত আসন পদ্মাসন, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, পাদোদক রূপ সুধা, রূপক কর্মধারয়।

জন্মভূমি ঃ

১। সিদ্ধি, ভূমি, স্বর্গ, কীর্তন ও গাঁ এইগুলির বিশেষণ কি হইবে ?

উঃ। সিদ্ধ, ভৌম, স্বর্গীয়, কীর্তিত, গেঁয়ো।

ছোটোর দাবী ঃ

১। তরুবর, অট্টহাসি, অশোককানন ও কুরুক্ষেত্র ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ।

উঃ। তরুগণের মধ্যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। অট্ট যে হাসি কর্মধারয। অশোক নামে যে কানন, মধ্যপদলোপী কর্মধারয। কুরুর যে ক্ষেত্র, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

প্রার্থনা ঃ

১। ভয়শূন্য, সহস্রবিধ, মরুবালুরাশি—সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

উঃ। ভয়ের দ্বারা শূন্য, তৃতীয়া তৎপুরুষ। সহস্র প্রকার বিধি যাহার, মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি। মরুর বালু মরুবালু, তাহাদের রাশি, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

২। শতধা শব্দটির উপর ব্যাকরণগত টিকা লিখ :—

উঃ। শত + ধা। (প্রকার অর্থে) দ্বিধা, সহস্রধা, বহুধা প্রভৃতি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

৩। পৌরুষ কোন্ পদ ? ইহার অর্থ কি ?

উঃ। 'পুরুষ' এই ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য পদ হইতে 'পৌরুষ' গুণবাচক বিশেষ্য। পৌরুষ অর্থ পুরুষোচিত গুণ।

গদ্যাংশ

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা :

১। পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করিয়া নিম্নলিখিত অংশটি পুনরায় লিখ :—

মহর্ষি কহিতে লাগিলেন—অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপুরিত হইতেছে ;

কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কী দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে।

উঃ। মহর্ষি কহিতে লাগিলেন যে, সেদিন শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া তিনি বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছেন, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছেন। তিনি বনবাসী, স্নেহবশতঃ তাঁহারও এতাদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, তিনি অভিভূত হইয়া বলিতেছেন সংসারীরা তেমন অবস্থায় কী দুঃসহ ক্লেশই না ভোগ করিয়া থাকে।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর :—

প্রস্থান, পরিত্যাগ, প্রতিপালন, সন্নিহিত, লৌকিক, সমভিব্যাহার।

উঃ। প্র—স্থা + অন্; পরি—ত্যজ্ + ঘঞ্; প্রতি—পালি + অন্; সম—নি—ধা + ক্ত; লোক + ইক্ (ষ্ণিক্); সম—অভি—বি—আ + হৃ + ঘঞ্।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির বিশেষ্যকে বিশেষণ ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্তন কর :—

প্রস্থান, বৈক্লব্য, পরিত্যাগ, সমর্পণ, শয়ন, শান্ত, সন্নিহিত, স্নেহ, বিপরীত।

উঃ। প্রস্থিত (বিণ); বিক্লব (বিণ): পরিত্যক্ত (বিণ); সমর্পিত (বিণ); শায়িত (বিণ); শান্তি (বি); সন্নিধান (বি); স্নিগ্ধ (বিণ); বৈপরীত্য, বিপর্যয় (বি)।

৪। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

মহর্ষি, যথাসম্ভব, শোকাকুল, নিরানন্দ, শাখাবাহু, প্রিয়ংবদা, সহধর্মিণী, অনুক্ষণ, অপ্রতিহতপ্রভাব, সিংহাসন।

উঃ। মহান্ ঋষি মহর্ষি, কর্মধারয়। সম্ভবকে অতিক্রম না করিয়া যথাসম্ভব, অব্যয়ীভাব। শোকের দ্বারা আকুল শোকাকুল, তৃতীয়া তৎপুরুষ। নির্গত হইয়াছে আনন্দ যাহা হইতে নিরানন্দ, বহুব্রীহি। শাখারূপ বাহু শাখাবাহু, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। প্রিয় বলে যে নারী, উপপদ তৎপুরুষ। সহ বা সমান ধর্ম যাহার (স্ত্রী) সহধর্মিণী, বহুব্রীহি। ক্ষণে

ক্ষণে অনুক্ষণ, অব্যয়ীভাব। নয় প্রতিহত অপ্রতিহত, নঞ্‌তৎপুরুষ; অপ্রতিহত প্রভাব যাহার, বহুব্রীহি। সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

নিরুদ্বেগ, মহর্ষি, বহির্ভূত, পরাঙ্মুখ।

উঃ। নিঃ+উদ্বেগ; মহা+ঋষি; বহিঃ+ভূত; পরাক্‌+মুখ।

সাগরসঙ্গমে নবকুমার ঃ

১। পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করিয়া অংশ দুইটি পুনরায় লিখ :—

(ক) প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না? তিন কাল গিযে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না ত কবে করিব?"

(খ) একজন নাবিক কহিল, "আঃ তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইযাছে।"

উঃ। (ক) প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাগে কহিলেন তিনি আসিবেন না কেন? তাঁহার তিন কাল গিযা এক কালে ঠেকিয়াছে। এই সময পরকালের কর্ম করিবেন না তো কখন করিবেন?

(খ) একজন নাবিক বিরক্তির সুরে কহিল যে, নবকুমারের থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাকে শিয়ালে খাইয়াছে।

২। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

জন্মজন্মান্তর, সশঙ্কচিত্ত, কণ্ঠাগতপ্রাণ, নীলপ্রভ, উপকূল, ব্যাঘ্রভয়, উপহাসাস্পদ।

উঃ। অন্য জন্ম জন্মান্তর (নিত্যসমাস), জন্ম ও জন্মান্তর জন্মজন্মান্তর (দ্বন্দ্ব সমাস); শঙ্কার সহিত বিদ্যমান সশঙ্ক (বহুব্রীহি); সশঙ্ক চিত্ত যাহার (বহুব্রীহি); কণ্ঠে আগত কণ্ঠাগত (সপ্তমী তৎপুরুষ); কণ্ঠাগত হইয়াছে প্রাণ যাহার (বহুব্রীহি); নীল প্রভা যাহার নীলপ্রভ (বহুব্রীহি); কূলের সমীপে উপকূল (অব্যয়ীভাব); ব্যাঘ্র হইতে ভয় ব্যাঘ্রভয় (পঞ্চমী তৎপুরুষ), উপহাসের আস্পদ উপহাসাস্পদ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

৩। উপহাস, ছেদন, ক্লেশ, অনুভব, স্মৃতি, প্রতীক্ষা, নিরূপণ ও জন্ম— ইহাদের বিশেষণ পদ কি হইবে লিখ :—

উঃ। উপহসিত, ছিন্ন, ক্লিষ্ট, অনুভূত, স্মৃত, প্রতীক্ষিত, নিরূপিত, জাত।

৪। প্রাগুক্ত ও বারেক—সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

উঃ। প্রাক্+উক্ত=প্রাগুক্ত। বার+এক=বারেক। 'বারেক' খাঁটি বাংলা সন্ধি। সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধির নিয়ম অনুসারে 'বারৈক' হওয়া উচিত ছিল।

মহাত্মা রামমোহন :

১। নিম্নলিখিত অংশটি পরোক্ষ উক্তিতে পুনরায় লিখ :

জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া (রামমোহন) বলিলেন—"আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান দুঃখ আজ পাইযাছি। বিশপ মিডলটন আজ আমাদের এই বলিযা প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড হইবে। ছি, ছি, আমাকে এত ছোটো লোক মনে করে।"

উঃ। জলপান করিযা একটু সুস্থ হইযা রামমোহন বলিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান দুঃখ সেদিন পাইয়াছেন। বিশপ মিডলটন সেদিন তাঁহাকে এই বলিযা প্রলোভন দেখাইযাছেন যে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন কবিলে তাঁহার পদ আবও বড় হইবে। বিশপ যে তাঁহাকে এত ছোটো লোক মনে করিতে পারিল, ইহাতে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করিলেন।

২। প্রকৃতি-প্রত্যয নির্ণয় কর :—

পবাজয়, পরাস্ত. সামাজিক, বিঘ্ন, অভীষ্ট, বিচ্ছিন্ন, নিরস্ত, অঙ্গীভুত।

উঃ। পরা—জি+অচ্=পরাজয। পবা—অস্+ত=পরাস্ত। সমাজ +ইক্ (ষ্ণিক্)=সামাজিক। বি—হন্+অ=বিঘ্ন। অভি—ইষ্+ক্ত=অভীষ্ট। বি—ছিদ্+ক্ত=বিচ্ছিন্ন। নির—অস্+ক্ত=নিরস্ত। অঙ্গ +অভূত তদ্ভাবে চ্বি+ভূ+ক্ত=অঙ্গীভুত।

৩। মর্মাহত, অকৃতকার্য, স্বোপার্জিত, জাতিচ্যুত, গৃহতাড়িত, বজ্রমুষ্টি, পিছুপা—কোন্ সমাস? ইহাদের ব্যাসবাক্য লিখ।

উঃ। মর্মে আহত=মর্মাহত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। কৃত কার্য যাহা দ্বারা, বহুব্রীহি, ন কৃতকার্য=অকৃতকার্য, নঞ্‌তৎপুরুষ। স্ব অর্থাৎ নিজের দ্বারা উপার্জিত=স্বোপার্জিত, তৃতীযা তৎপুরুষ। জাতি হইতে চ্যুত=জাতিচ্যুত, পঞ্চমী তৎপুরুষ। গৃহ হইতে তাড়িত=গৃহতাড়িত, পঞ্চমী তৎপুরুষ। বজ্র কঠিন মুষ্টি=বজ্রমুষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। পিছু পা যাহার=পিছুপা, বহুব্রীহি।

৪। ভগ্ন, নিরস্ত, বিচিত্র, উদ্যত—ইহাদের বিশেষ্য পদ কি? এবং পরিচ্ছদ, হৃদয়, বিপ্লব, বিবরণ—ইহাদের বিশেষণ পদ কি?

উঃ। ভগ্ন = ভঙ্গ। নিরস্ত = নিরসন। বিচিত্র = বৈচিত্র্য। উদ্যত = উদ্যম। পরিচ্ছদ = পরিচ্ছন্ন। হৃদয় = হৃদ্য। বিপ্লব = বিপ্লবী, বৈপ্লবিক। বিবরণ = বিবৃত।

সমুদ্রপথে :

১। গলদ্‌ঘর্ম, কোন সমাস? ব্যাসবাক্য লিখ।

উঃ। গলত্‌ হইয়াছে ঘর্ম যাহার, বহুব্রীহি।

২। নিম্নলিখিত অংশটির উক্তি পরিবর্তন করিয়া লিখ।

মাঝি বলিল, "দত্তমহাশয় আজ বড় সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন ওখানা ভাল নয়, একটু বাদেই ঝড় উঠিবে, আপনারা আপন আপন কামরায় যান। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন, বেশী নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।"

উঃ—মাঝি দত্তমহাশয়কে ডাকিয়া বলিল যে, দিনটি বড় সুবিধার নয়। সামনে যে মেঘখানা দেখা যাইতেছে ওখানা ভাল নয়, একটু বাদেই ঝড় উঠিতে পারে। সে সকলকে আপন আপন কামরায় যাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে বলিল। মাঝি সাবধান করিয়া দিল যে, বেশী নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিতে পারে।

৩। 'খেলুড়ি' শব্দটি কোন অর্থে কি প্রত্যয় হইয়াছে? এইরূপ প্রত্যয়ান্ত আর একটি শব্দের নাম কর।

উঃ। খেলুড়ি শব্দে বৃত্তি অর্থে—"উড়ি" প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যয়ান্ত আর একটি শব্দ 'জুয়াড়ি'।

সাক্ষী :

১। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

নির্জীব, পৃথগন্ন, ধর্মপত্নী, যুক্তিযুক্ত, হতবুদ্ধি, কারারুদ্ধ।

উঃ। নাই জীব (জীবন) যাহার, বহুব্রীহি। পৃথক হইয়াছে অন্ন যাহাদের, বহুব্রীহি। ধর্মের নিমিত্ত পত্নী, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। যুক্তির সহিত যুক্ত, তৃতীয়া তৎপুরুষ। হত হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহুব্রীহি। কারায় অবরুদ্ধ, সপ্তমী তৎপুরুষ।

২। পৃথগন্ন ও স্বাক্ষর সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

উঃ। পৃথক + অন্ন = পৃথগন্ন। স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর।

৩। পরামর্শ, সংযোগ, বক্তব্য, দীর্ণ ইহাদের প্রকৃতিপ্রত্যয় লিখ।

উঃ। পরা—মৃশ্ + ঘঞ্। সং—যুজ্ + ঘঞ্। বচ্ + তব্য। দৃ + ক্ত।

৪। প্রলোভন, অভিযোগ, অপরাধ—ইহাদের বিশেষণে কি হইবে?

উঃ। প্রলুব্ধ, অভিযুক্ত, অপরাধী।

ভরত:

১। জ্যেষ্ঠ, হৃষ্ট, ইচ্ছা, অভীষ্ট—শব্দগুলি কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে?

উঃ। বৃদ্ধ + ইষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ। হৃষ্ + ক্ত = হৃষ্ট। ইষ্ + অ (স্ত্রীলিঙ্গে আ) অভি—সিচ্ + ঘঞ্।

২। শোচনীয় ও বিষণ্ণ—ইহাদের বিশেষ্য পদ কি?

উঃ। শোক, বিষাদ।

৩। আর্তনাদ, নিরপরাধ, শ্রীহীন, ওষ্ঠাগত, কৃশাঙ্গী, কৃতার্থ—কো[illegible] সমাস? ইহাদের ব্যাসবাক্য কি?

উঃ। আর্তের নাদ, ষষ্ঠীতৎপুরুস। নাই অপরাধ যাহার, বহুব্রীহি শ্রীদ্বারা হীন, তৃতীয়া তৎপুরুষ। ওষ্ঠে আগত, ৭মী তৎপুরুষ। কৃশ অ[illegible] যাহার সে (স্ত্রী), বহুব্রীহি। কৃত অর্থ যাহার, বহুব্রীহি।

লুই পাস্তুর:

১। অধ্যাপক, ঘোলাটে—প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর।

উঃ। অধ্যাপক—অধি—ই + ণিচ্ + থক্। ঘোলাটে—ঈষৎ ঘো[illegible] বা ঘোলার মতন এই অর্থে ঘোলা + টে প্রত্যয়। তুলনীয় 'তামাটে'।

২। অধ্যয়ন, নির্ণয, উৎপত্তি—এইগুলি হইতে বিশেষণ কি?

উঃ। অধীত, নির্ণীত বা নির্ণেয়, উৎপন্ন।

৩। লোকারণ্য, বিশেষজ্ঞ, জলাতঙ্ক কোন্ সমাস? ইহাদে[illegible] ব্যাসবাক্য লিখ।

উঃ। লোকারণ্য—লোকের অরণ্য, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। বিশেষজ্ঞ বিশেষ জানেন যিনি, উপপদ তৎপুরুষ। জলাতঙ্ক—জল হইতে আত[illegible] পঞ্চমী তৎপুরুষ।

ভারতবর্ষ ঃ

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অনুক্তস্থানে একটি করিয়া শব্দ বসাও ঃ—

(ক) একটি বৃদ্ধ বিপুলকায় একটি বই নিয়ে—সুরে কী পড়ত।

(খ) তাহাদের মুখের ভাব দেখে মনে হ'ত, বিষয়টি তারা—উপভোগ করছে।

(গ) এমন কত শত জিনিস—আমরা ভুলে যাচ্ছি।

(ঘ) আগে—করে গ্যাসের বাতি জ্বলত।

(ঙ) আমি—হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

উঃ। পূরণার্থ পদ ঃ—(ক) সাপ খেলানো, (খ) বিশেষভাবেই, (গ) রোজ, (ঘ) মিটমিট, (ঙ) অবাক।

২। উক্তি পরিবর্তন কর ঃ—

বৃদ্ধ বললে, তাহলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটি এখন ঐ বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি, আর এই মেয়ে-দুটি আমার নাতনী—আমার ঐ ছেলের সন্তান।

উঃ। বৃদ্ধ লেখককে বললে যে তাহলে তিনি তার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছিলেন। তার (বৃদ্ধের) ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনত। সম্মুখস্থ যুবকের দিকে লক্ষ্য ক'রে বৃদ্ধ বললে যে, ছেলেটি বড় হয়েছে। ওর বয়স লেখকের মতই হবে, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। তার আশেপাশে অবস্থিত একটি ছেলে ও দুটি মেয়েকে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললে ছেলেটি তার নাতি, আর মেয়ে দুটি তার নাতনী—তার ঐ ছেলের সন্তান।

৩। উপভোগ, বিষয়, কৌতূহল, সমুদ্র, পরিবর্তন—এই শব্দগুলি হইতে জাত বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

উঃ। গল্পটি বেশ হইয়াছে, আগাগোড়াই **উপভোগ্য**। রাধাবিলাস বাবুর **বৈষয়িক** বুদ্ধির বড়ই অভাব। সুজনবাবু বেশ **কৌতূহলী**, সন্দেহ হলেই মোটা অভিধানখানা খুলে দেখেন। কিছুদিন কলিকাতার

বাজারে **সামুদ্রিক** মৎস্য দেখা দিয়েছিল। **এই পরিবর্তিত** ব্যবস্থায় শিক্ষার মান কতখানি উন্নত হবে সে সম্বন্ধে সকলে কিন্তু একমত নয়।

রুপোকাকা ঃ

১। চণ্ডীমণ্ডপ, চৌকিদার, বিষয়সম্পত্তি, চোরাবাজার—কোন সমাস ? ইহাদের ব্যাসবাক্য কি ?

উঃ। চণ্ডীর মণ্ডপ = চণ্ডীমণ্ডপ, ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ। চৌকি দেয় যে এই অর্থে = চৌকিদার, উপপদতৎ। বিষয় ও সম্পত্তি = বিষয়সম্পত্তি, দ্বন্দ্ব। চোরাদের (অসঙ্গত মুনাফালোভীদের) বাজার = চোরাবাজার, ৬ষ্ঠী-তৎপুরুষ।

২। উক্তি পরিবর্তন কর :—

রূপো জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপতে বললে, বলোগে যাও, আমি জ্বরে উঠতে পারছি নে। এখন যেতে পারব না। জ্বরে মরছি। তা সীতেনাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে ? আর একটু এলে কি মান যেত ?

উঃ। রূপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে সীতানাথের প্রেরিত লোককে বললে, সে যেন গিয়ে বলে (সীতানাথ বাবুকে) যে, সে (রূপো) জ্বরে উঠতে পারছে না। এখন সে যেতে পারবে না। রূপো-কাকা জ্বরে মরছে জেনেও সীতানাথ যে নিজে পায়ে পায়ে যেতে পারেনি এই কথাটা রুপো প্রকাশ করলো অভিমানের সুরে। একথাও সে প্রকাশ না ক'রে পারলো না বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরে, বুঝি সীতানাথ তার বাড়ী যায়নি মান-যাওয়ার ভয়ে।

দশম শ্রেণী

(পদ্যাংশ)

কাশীরাম দাস ঃ

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :—

চন্দ্রচুড়-জটাজাল ; নরকুলধন , কবীশ ; ভাষাপথ।

উঃ। চন্দ্রচূড়ায় যাঁহার, বহুব্রীহি ; চন্দ্রচুড়ের জটা, চন্দ্রচুড়ের জটার জাল, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। নরের কুল, তাহার ধন, নরকুলধন, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

কবিগণের ঈশ, কবীশ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। ভাষারূপ পথ, ভাষাপথ, রূপক কর্মধারয়।

২। "কঠোরে গঙ্গায় পূজি"—'কঠোরে' কোন্ পদ? 'গঙ্গায়' কোন্ কারক?

উঃ। 'কঠোরে' ক্রিয়া-বিশেষণ—অর্থাৎ কঠোরভাবে।

'গঙ্গায়' কর্মকারক, 'গঙ্গাকে' এই অর্থ। ৭মী বিভক্তির চিহ্ন 'য়' বসিয়াছে।

আত্মবিলাপ ঃ

১। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

কালসিন্ধু; হীনবল; ক্ষণপ্রভা; মাৎসর্যবিষদশন; কুহকছল।

উঃ। কালরূপ সিন্ধু, কালসিন্ধু, রূপক কর্মধারয়। হীন হইয়াছে বল যাহার, হীনবল, বহুব্রীহি। ক্ষণ (ব্যাপিয়া) প্রভা যাহার, ক্ষণপ্রভা, বহুব্রীহি। বিষ দশনে যাহার, বিষদশন, বহুব্রীহি। মাৎসর্যরূপ বিষদশন, মাৎসর্যবিষদশন, রূপক কর্মধারয়। কুহকের ছল, ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা কুহক-কৃত ছল, কুহকছল, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

২। নিম্নলিখিত পদগুলির মধ্যে বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন কর।

সিন্ধু, প্রমত্ত, মন, বিষম, লোভ।

উঃ। সৈন্ধব, প্রমাদ, মানসিক, বৈষম্য, লুব্ধ বা লোভী।

আশা ঃ

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :—মনোমন্দির, অনুক্ষণ, নিরাশা, ইন্দ্রজাল, মাতৃভাষা।

উঃ। মনোরূপ মন্দির, কর্মধারয়। ক্ষণে ক্ষণে অনুক্ষণ, অব্যয়ীভাব। নাই আশা যাহার, বহুব্রাহি। ইন্দ্রের জাল ইন্দ্রজাল, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। মায়ের ভাষা মাতৃভাষা, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

২। মুগ্ধ, জীর্ণ, বিদ্ধ, নির্বাপিত প্রকৃতি প্রত্যয় লিখ :—

উঃ। মুহ্ + ক্ত; জৄ + ক্ত; বিধ্ + ক্ত; নির্—বাপি + ক্ত।

৩। স্থির ও রুগ্ন—বিশেষ্যে পরিবর্তিত কর।

উঃ। স্থৈর্য ও রোগ।

ভারততীর্থ ঃ

১। **মহামানব, ধ্যানগম্ভীর, নরদেবতা, মরুপথ; বিরামবিহীন—সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ।**

মহামানব—মহান্ মানব, কর্মধারয়। ধ্যানগম্ভীর—ধ্যানে গম্ভীর, ৭মী তৎপুরুষ। নরদেবতা—নরই দেবতা, কর্মধারয়। মরুপথ—মরুময় পথ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। বিরামবিহীন—বিরামের দ্বারা বিহীন, তৃতীয়া তৎপুরুষ।

২। **পদান্তর সাধন কর :—উদার, আহ্বান, সমুদ্র, লীন, বিচিত্র, বিভেদ, অবসান, অভিষেক।**

উঃ। ঔদার্য, আহূত, সামুদ্রিক, লয়, বৈচিত্র্য, বিভিন্ন, অবসিত, অভিষিক্ত।

ধূলামন্দির ঃ

১। ধূলামন্দির, রুদ্ধদ্বার, দেবালয়, সৃষ্টিবাঁধন, কর্মযোগ ইহাদের সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ।

উঃ। ধূলাই মন্দির, কর্মধারয়। রুদ্ধ হইয়াছে দ্বার যাহার; বহুব্রীহি দেবের আলয়, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। সৃষ্টিরূপ বাঁধন বা সৃষ্টিই বাঁধন, রূপক কর্মধারয় বা কর্মধারয়। কর্মের যোগ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

শুচি ঃ

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :—

পাদোদক, ধ্যানমগ্ন, শুকতারা।

উঃ। পাদস্পৃষ্ট উদক, পাদোদক, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

ধ্যানে মগ্ন, ধ্যানমগ্ন, সপ্তমী তৎপুরুষ।

শুকনামধারী তারা, শুকতারা, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

২। নিম্নলিখিত বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর।

পণ্ডিত, ভোজ্য, ভক্ত, দীপ্ত, মগ্ন, ব্যাপৃত, ব্যস্ত, মলিন।

উঃ। পাণ্ডিত্য, ভোজন, ভক্তি, দীপ্তি, মজ্জন, ব্যাপার, ব্যস্ততা, মালিন্য।

৩। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলিকে বিশেষণে পরিণত কর :—

প্রসাদ, নিবেদন, উপবাস, সন্ধ্যা, হৃদয়, স্পর্শ, নিমন্ত্রণ।

উঃ। প্রসন্ন, নিবেদিত, উপবাসী, সান্ধ্য, হৃদ্য, স্পৃষ্ট, নিমন্ত্রিত।

৪। নিম্নলিখিত অংশটি পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার করিয়া পুনরায় লিখ :—

গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে শুনতে পেলেন।

"সময় হয়েছে ওঠ প্রতিজ্ঞা পালন কর।"
রামানন্দ হাত জোড় করে বললেন,
"এখনো রাত্রি গভীর।
পথ অন্ধকার পাখীরা নীরব
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।"

উঃ। গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙ্গে। তিনি শুনতে পেলেন একটা নির্দেশ তাঁকে জানাচ্ছে যে সময় হয়েছে। তাঁকে প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য উঠতে বলা হল। রামানন্দ হাতযোড় করে বললেন, তখনও রাত্রি গভীর, পথ অন্ধকার, পাখীরা নীরব। তিনি প্রভাতের অপেক্ষায় আছেন।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কিভাবে সাধিত হইয়াছে দেখাও :—

ব্যস্ত, নগ্ন, সৃষ্টি, দীপ্তি, প্রবেশ, উপবাস, প্রসাদ।

উঃ। বি—অস্ + ক্ত, নচ্ + ক্ত, সৃজ্ + ক্তি, দীপ্ + ক্তি, প্র—বিশ্ + ঘঞ্, উপ—বস্ + ঘঞ্, প্র—সদ্ + ঘঞ্।

জীবনভিক্ষা ঃ

১। দরবিগলিত, মুখচম্পক, বৃন্তচ্ছিন্ন, বিষবাণ কোন সমাস? ইহাদের ব্যাসবাক্য লিখ :—

উঃ। দরদর ধারায় বিগলিত, তৃতীয়া তৎপুরুষ। চম্পকের মত মুখ, উপমিত কর্মধারয়। বৃন্ত হইতে ছিন্ন, ৩য়া তৎপুরুষ। বিষ মাখানো বাণ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

২। নিম্নলিখিত রেখাঙ্কিত পদগুলি কোন কারকে কোন বিভক্তি হইয়াছে?

(১) দুলালে আগলি বক্ষে।
(২) কোন পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন।
(৩) জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার ভবনে ভবনে উঠে হাহাকার।

উঃ। দুলালে—দুলালকে এই অর্থে কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি।
বিষবাণে—কারণে তৃতীয়া 'এ' বিভক্তি।
তনয়ে—তনয়কে কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি।
ভবনে—অধিকরণে সপ্তমীর 'এ' বিভক্তি।

আমরা :

১। কাঞ্চনশৃঙ্গমুকুট, শততরঙ্গ-ভঙ্গে, দশাননজয়ী, পঞ্চবটী—ইহাদের সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

উঃ। কাঞ্চন শৃঙ্গে যাহার, বহুব্রীহি; কাঞ্চন শৃঙ্গই মুকুট যাহার, বহুব্রীহি। শত তরঙ্গ, কর্মধারয়; শততরঙ্গের ভঙ্গ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। দশ আনন যাহার, দশানন, বহুব্রীহি; দশাননকে জয় করেন যিনি, উপপদতৎ। পঞ্চ বটের সমাহার, দ্বিগু।

২। চতুরঙ্গ ও মন্বন্তর এই দুইটি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ। মনু + অন্তর = মন্বন্তর।

হাট :

১। নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) বেচাকেনা সেরে বিকাল বেলায়।

(খ) যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়।

(গ) কারো তরে নাই আহ্বান।

উঃ। (ক) বেচাকেনা—কর্মকারক, শূন্য বিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত। 'সেরে' এই ক্রিয়ার কর্ম। বেলায়—অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি।

(খ) সবে—কর্তৃকারক 'এ' বিভক্তি যুক্ত। ঘরে—অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি।

(গ) কারো—'তরে' এই পরপদ দ্বারা সম্প্রদান কারকের অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে। সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বসিয়াছে।

তুলনীয়—'কার তরে তুই কাঁদিস্ মাসী।'

'কার তরে তুই শয্যা দাসী রচিস্ আনন্দে।'

২। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

শ্রেণীহারা, দোটানা, নির্জন, হানাহানি, শিশির-বিমল।

উঃ। শ্রেণীহারা—শ্রেণী হারাইয়াছে যে, উপপদ তৎপুরুষ। দোটানা—দুই টান যাহার, বহুব্রীহি। নির্জন—নির্ (নাই) জন যেখানে, বহুব্রীহি। হানাহানি—পরস্পর পরস্পরকে হানিতেছে অর্থাৎ আঘাত করিতেছে, ব্যতিহার বহুব্রীহি। শিশির-ধৌত হওয়ায় বিমল, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

কালবৈশাখী :

১। **নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলি বিশেষণে ও বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যে পরিণত কর :—**

রক্ত, ধীর, দেহ, ভিন্ন, ছিন্ন, বায়ু, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, হর্ষ, নিশি, আশ্বাস

উঃ। রক্ত—রাগ (বি) ; ধীর—ধৈর্য (বি) ; দেহ—দৈহিক (বিণ) ভিন্ন—ভেদ (বি) ; ছিন্ন—ছেদ (বি) ; বায়ু—বায়বীয় (বিণ) ; উচ্ছ্বাস—উচ্ছ্বসিত (বিণ) ; উল্লাস—উল্লসিত (বিণ) ; হর্ষ—হৃষ্ট (বিণ) ; নিশি—নৈশ (বিণ) ; আশ্বাস—আশ্বস্ত (বিণ)।

২। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

বনস্পতি, ধূলিধূসরিত, বেণীবন্ধন, মহাবল, অনাবৃষ্টি, নীলঅঞ্জন গিরিনিভ।

উঃ। বনের পতি বনস্পতি, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। ধূলি দ্বারা ধূসরিত, তৃতীয় তৎপুরুষ। বেণীর বন্ধন, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। মহা হইয়াছে বল যাহার, বহুব্রীহি নাই বৃষ্টি নঞ্‌ তৎপুরুষ। নীল যে অঞ্জন, কর্মধারয় ; নীল অঞ্জনের গিরি ষষ্ঠী তৎপুরুষ, তাহার নিভ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

ত্রিরত্ন ঃ

১। নিম্নলিখিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) **ভয়ে** সবে পুঁথিপত্র গুটায়, কেহ না আগায় কাছে।

(খ) **মোরে** জিনি তবে জয় গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি।

(গ) কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র **শশকে** বধে।

(ঘ) না বুঝে **অশনি** হেনেছি জীবের কুসুম কোমল প্রাণে।

উঃ। (ক) ভয়ে—ভয়হেতু, অপাদান কারক, অপাদানে 'এ' বিভক্তি।

(খ) মোরে—কর্মকারক, দ্বিতীয়া বিভক্তি পদ্যে 'রে' যুক্ত হইয়াছে।

(গ) শশকে—শশককে এই অর্থে কর্মকারক, কর্মে 'এ' বিভক্তি।

(ঘ) অশনি—কর্মকারক, শূন্য বিভক্তি, অর্থাৎ বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত।

২। চতুর্দোলা ও গোষ্পদ সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

উঃ। চতুঃ + দোলা = চতুর্দোলা। গো + পদ = গোষ্পদ।

৩। আবেশ, ক্ষয়, রোষ—এই পদগুলি বিশেষণে রূপান্তরিত কর।

উঃ। আবিষ্ট, ক্ষীণ, রুষ্ট।

৩। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—ব্রজধাম, প্রেমাবেশ, চতুর্দোলা, বিচারমল্ল, প্রতিফল, চরণাশ্রিত।

উঃ। ব্রজ নামক ধাম, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। প্রেমের আবেশ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। চতুর (চারজন) বাহিত দোলা, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। বিচারে মল্ল, সপ্তমী তৎপুরুষ। প্রতি (বিপরীত) ফল, কর্মধারয়। চরণকে আশ্রিত, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

কাণ্ডারী হুঁসিয়ার :

১। দুর্গম ও বঞ্চিত এই দুইটি বিশেষণ বিশেষ্যে পরিবর্তন কর ও পরিবর্তিত পদ দুইটির সাহায্যে দুইটি বাক্য রচনা কর।

উঃ। দুর্গম—দুর্গতি ; আমাদের দেশে মধ্যবিত্তের দুর্গতির সীমা নাই।

বঞ্চিত—বঞ্চনা ; চিরকাল যাহারা বঞ্চনা পাইয়া আসিয়াছে বিদ্রোহ করা তাহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক।

২। সন্দেহ, অধিকার, পরীক্ষা—ইহাদের প্রকৃতি-প্রত্যয় কি ? পদ তিনটির বিশেষণে কি রূপ হইবে ?

উঃ। সন্দেহ—সম—দিহ্ + অল্। বিশেষণে সন্দিগ্ধ।

অধিকার—অধি—কৃ + ঘঞ্। বিশেষণে অধিকৃত।

পরীক্ষা—পরি—ঈক্ষ্ + অ—স্ত্রীলিঙ্গে আপ। বিশেষণে পরীক্ষিত।

৩। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

পারাবার, তিমিররাত্রি, সাবধান, অসহায়, জয়গান।

উঃ। পার এবং অবার, পারাবার, দ্বন্দ্ব। তিমির ময় বা তিমির ভরা রাত্রি, তিমিররাত্রি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। অবধানের সহিত বর্তমান সাবধান, বহুব্রীহি। নাই সহায় যাহার অসহায়, বহুব্রীহি। জয়ের গান জয়গান, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

গদ্যাংশ

প্রতিভা :

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—অন্তরাত্মা, মনোহর, মনোযোগ, পুনরুদ্ধার।

উঃ। অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা। মনঃ + হর = মনোহর। মনঃ + যোগ = মনোযোগ। পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার।

২। নিম্নলিখিত বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যে পরিবর্তিত কর :—

পরিপক্ক, বিভক্ত, নিমগ্ন, বিলক্ষণ, উদ্ভাবিত, পারদর্শী, উদ্ধৃত, বিরক্ত, আকস্মিক, মোহিত, অভিহিত, অভ্যস্ত, পরিচিত।

উঃ। পরিপাক, বিভাগ, নিমজ্জন, বৈলক্ষণ্য, উদ্ভাবন, পারদর্শিতা, উদ্ধার বা উদ্ধৃতি, বিরাগ, অকস্মাৎ, মোহ, অভিধান, অভ্যাস, পরিচয় বা পরিচিতি।

৩। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলি বিশেষণে রূপান্তরিত কর :—

স্বপ্ন, প্রাধান্য, সরস্বতী, অধ্যয়ন, প্রবেশ, যোগ, বিশ্বাস, প্রসাদ, আবির্ভাব, শ্রম, ব্যুৎপত্তি।

উঃ। স্বপ্নালু, প্রধান, সারস্বত, অধীত, প্রবিষ্ট, যুক্ত, বিশ্বস্ত, প্রসন্ন, আবির্ভূত, শ্রান্ত, ব্যুৎপন্ন।

৪। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

জ্ঞানহীন, দুরাচার, শক্তিসাধ্য, সাতকাণ্ড, নিষ্প্রয়োজন।

উঃ। জ্ঞানের দ্বারা হীন (তৃতীয় তৎপুরুষ); দুষ্ট আচার যাহার (বহুব্রীহি); শক্তি দ্বারা সাধ্য (তৃতীয়া তৎপুরুষ); সাত কাণ্ড যাহার (বহুব্রীহি); নাই প্রয়োজন যাহার (বহুব্রীহি)।

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে ঃ

১। শিরোপরি শব্দটির উপর ব্যাকরণগত টিপ্পনী লিখ :—

উঃ। সংস্কৃত শিরস্ শব্দ। সুতরাং শিরঃ + উপরি = শির উপরি হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলায় শির কথাটিকে অকারান্ত ধরিয়া সন্ধি করিয়া শিরোপরি করা হইয়াছে। সন্ধির নিয়ম অনুসারে ইহা ভুল। কিন্তু বাংলায় এই জাতীয় প্রয়োগ বিরল নয়।

২। নিম্নলিখিত পদের মধ্যে বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন কর :—

প্রবাহিত, বিস্তৃত, উদিত, পার্থিব, পরিণত, লুপ্ত, উৎপত্তি, অতিক্রম, ধারক, আরোহণ, বিস্মিত, উদ্যম, বৃদ্ধি, সংক্ষুব্ধ, বহন, অবসন্ন।

উঃ। প্রবাহ (বি), বিস্তার বা বিস্তৃতি (বি), উদয় (বি), পৃথিবী (বি), পরিণাম, বা পরিণতি (বি), লোপ (বি), উৎপন্ন (বিণ), অতিক্রান্ত (বিণ), ধৃত (বিণ), আরূঢ় (বিণ), বিস্ময় (বি), উদ্যত (বিণ), বৃদ্ধ (বিণ), সংক্ষোভ (বি), বাহিত (বিণ), অবসাদ (বি)।

স্বাদেশিকতা :

১। 'মধুর' এই বিশেষণ পদটির কয়টি বিশেষ্যপদ করিতে পার লিখ :—

উঃ। মাধুর্য, মধুরতা, মধুরত্ব, মধুরিমা, মাধুরী

২। সম্বৎসর, স্বদেশ, অনুষ্ঠান, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, চক্ষু—এই বিশেষ্যগুলি হইতে বিশেষণ পদ লিখ :—

উঃ। সাম্বৎসরিক, স্বাদেশিক, অনুষ্ঠিত, অনুরক্ত, শ্রদ্ধালু, শ্রদ্ধেয়, চাক্ষুষ।

৩। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

শশব্যস্ত, রোমহর্ষণ, অপরাহ্ণ, হাস্যমধুর।

উঃ। শশ অর্থাৎ শশকের ন্যায় ব্যস্ত, উপমান, কর্মধারয়। রোমকে হৃষ্ট করে যাহা, উপপদ তৎপুরুষ। অহ্নের অপর ভাগ, একদেশী। হাস্যের দ্বারা মধুর, তৃতীয়া তৎপুরুষ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—ভূমিষ্ঠ, অহোরাত্র।

উঃ। ভূমি + স্থ ; অহঃ + রাত্র।

২। নির্দেশ, সন্দেহ, দর্প, বিস্তার—ইহাদের বিশেষণ কি ?

উঃ। নির্দিষ্ট, সন্দিগ্ধ, দৃপ্ত, বিস্তৃত।

৩। দুর্বল, গ্রস্ত, বিপরীত, ভিন্ন—ইহাদের বিশেষ্যপদ কি ?

উঃ। দৌর্বল্য, দুর্বলতা, গ্রাস, বৈপরীত্য, ভেদ।

৪। নিষ্প্রভ, ভূমিষ্ঠ, ঋণগ্রস্ত কোন্ সমাস ? ইহাদের ব্যাসবাক্য কি।

উঃ। নির্গত হইয়াছে প্রভা যাহা হইতে নিষ্প্রভ, বহুব্রীহি। ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে যে ভূমিষ্ঠ, উপপদ। ঋণের দ্বারা গ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, তৃতীয়া তৎপুরুষ।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—উন্নত, পাশ্চাত্ত্য, দুর্গম, সাদৃশ্য, অনুরাগ, পল্লী।

উঃ। অবনত, প্রাচ্য, সুগম, বৈসাদৃশ্য, বিরাগ, নগরী।

মন্ত্রশক্তি :

১। উক্তি পরিবর্তন কর :—

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করিল, 'হুজুর, লেঠেলি আমার জাত-

ব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুর্দার মত আমিও খেয়া নৌকা পারাপার করেই দুপয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা। তাই বলছি হুজুর এ আদেশ আমাকে করবেন না।

উঃ। লোকটা 'হুজুর' সম্ভাষণে সম্ভ্রম জানাইয়া অতি ধীরভাবে উত্তর করিল যে, লেঠেলি তাহার জাত-ব্যবসা নহে। বাপঠাকুর্দার মত সেও খেয়া নৌকা পারাপার করিয়াই দুপয়সা কামায়। তাহার কাজ লেঠেলি করা নহে লগি ঠেলা। তাই পুনরায় সে লেখককে হুজুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাকে যাহাতে সেই আদেশ করা না হয় এই মিনতি জানাইল।

২। লেঠেল, দিব্যি, এই শব্দ দুইটির উপর ব্যাকরণগত টীকা লিখ :—

উঃ। লাঠি + আল = লাঠিয়াল। অভিশ্রুতির প্রভাবে উচ্চারণে লেঠেল হইয়াছে।

দিব্য শব্দটির অন্ত অকার পূর্ববর্তী ইকারের প্রভাবে ইকারে উন্নীত হইয়াছে। (স্বরসঙ্গতি)

৩। লাঠিখেলা, সবসেরা, নজরবন্দী, পারাপার, বেমালুম ইহাদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :—

উঃ। লাঠিদ্বারা খেলা—লাঠিখেলা, তৃতীয়া তৎপুরুষ। সবারসেরা—সবসেরা, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। নজরে বন্দী = নজরবন্দী, সপ্তমী তৎপুরুষ। পার ও অপার = পারাপার, দ্বন্দ্ব। মালুমের অভাব = বেমালুম, অব্যয়ীভাব।

নতুনদা :

১। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :

অশ্রুতপূর্ব, অনতিকাল, অগ্নিশর্মা, স্বার্থপর, পদচারণা।

উঃ। ন শ্রুত = অশ্রুত, নঞ্ তৎপুরুষ। পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, সপ্তমী তৎপুরুষ (পূর্বপদের পরনিপাত)। নয় অতিকাল = অনতিকাল, নঞ তৎপুরুষ। অগ্নির মত শর্মা (ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ) = অগ্নিশর্মা, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। স্বার্থই পর বা একমাত্র লক্ষ্য যাহার = স্বার্থপর, বহুব্রীহি। পদদ্বয়ের চারণা = পদচারণা, ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

২। উক্তি পরিবর্তন করিয়া অংশটি পুনরায় লিখ :—

ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, "আমি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করতে পারব না।" ইন্দ্র বলিতে

গেল, "না খুলে"—হ্যাঁ দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি. আর কি? নে যা—করছিস কর।"

উঃ। ইন্দ্র তাঁহাকে একবার হালটা ধরিতে বলায় তিনি জবাব দিলেন সেই ঠাণ্ডায় দস্তানা খুলিয়া তিনি নিমোনিয়া করিতে পারবেন না। ইন্দ্র যখন না খুলিয়াই হাল ধরার প্রস্তাবটি করিতে গেল, অমনি তিনি ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, দামী দস্তানাটা তিনি মাটি করিয়া ফেলিতে পারিবেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে, ইন্দ্র যাহা করিতেছে তাহাই করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির মধ্যে বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণ-গুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর :—

অভিশাপ, দগ্ধ, আকৃষ্ট, প্রসন্ন, ক্লেশ, প্রশ্ন, উদ্রেক, বিস্তৃত, আহ্বান, অভিপ্রায়, বিরক্ত, ব্যবধান, ক্ষুব্ধ।

অভিশপ্ত (বিণ), দাহ (বি), আকর্ষণ (বি), প্রসাদ (বি), ক্লিষ্ট (বিণ), পৃষ্ট (বিণ), উদ্রিক্ত (বিণ), বিস্তার (বি), আহূত (বিণ), অভিপ্রেত (বিণ), বিরাগ (বি), ব্যবহিত (বিণ), ক্ষোভ (বি)।

কৌরব সভায় কৃষ্ণ ঃ

১। কৌরব, পাণ্ডব, মূঢ়, ক্রুদ্ধ, পৈতৃক এই শব্দগুলির প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্ণয় কর :—

উঃ। কুরুর অপত্য এই অর্থে কুরু+ষ্ণ=কৌরব। পাণ্ডুর অপত্য এই অর্থে পাণ্ডু+ষ্ণ=পাণ্ডব। মুহ্+ক্ত=মূঢ়। ক্রুধ্+ক্ত=ক্রুদ্ধ। পিতৃ+ষ্ণিক=পৈতৃক।

২। জয়, ধ্বংস, মঙ্গল, ন্যায়, বিসর্জন—এইগুলিকে বিশেষণে পরিবর্তিত কর।

উঃ। জেয়, জিত, ধ্বস্ত, মাঙ্গল্য, মাঙ্গলিক, ন্যায্য, বিসৃষ্ট, বিসর্জিত।

৩। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

কুলঘ্ন, সুহৃদ, সুলক্ষণ, মহীপাল, আজন্ম।

উঃ। কুল হনন করে যে, উপপদ তৎপুরুষ। সু অর্থাৎ শোভন হৃদয় যাহার, বহুব্রীহি। সু লক্ষণ, কর্মধারয়। মহী পালন করেন যিনি, উপপদ তৎপুরুষ। জন্ম হইতে আজন্ম, অব্যয়ীভাব।

৪। উক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় লিখ :—

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির জন্য আমাকে নিন্দা করছ। তুমি, বিদুর, পিতা, পিতামহ এবং আচার্য দ্রোণ তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন অপরাধই দেখতে পাই না।"

উঃ। দুর্যোধন কৃষ্ণকে বলিলেন যে, তিনি বিবেচনা না করিয়া কেবল পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতির জন্য তাঁহার নিন্দা করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন, কৃষ্ণ, বিদুর, তাঁহার পিতা, পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ ইঁহারা কেবল তাঁহাকেই দোষ দেন, পাণ্ডবদের দোষ দেখেন না। বিশেষ চিন্তা করিয়াও দুর্যোধন নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন অপরাধই দেখিতে পান না।

তোতা-কাহিনী ঃ

১। উক্তি পরিবর্তন করিয়া পুনরায় লিখ :—

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, এ কী কথা শুনি? ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের ; ডাকুন যারা মেরামত করে ও মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

উঃ। কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ কথা তাঁহাকে শুনিতে হয় কেন? ভাগিনা মহারাজকে সম্বোধন করিয়া উত্তর করিল যে, যদি কোন সত্য কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন তবে যেন তিনি স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের ও লিপিকরদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন। যাহারা মেরামত করে ও মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায় তাহাদের যেন ডাকিয়া পাঠান। ভাগিনার মন্তব্য হইল নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।

২। "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

অর্থ শব্দটি প্রয়োগের উপর মন্তব্য লিখ।

উঃ। 'অর্থ' শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থবোধক। অর্থের একটি অর্থ হইল 'মানে'—শব্দ উচ্চারিত হইলেই শ্রোতার মনে যে ভাব প্রকাশ করে তাহা।

কিন্তু অন্য অর্থ হইল 'টাকাকড়ি'। দ্ব্যর্থবোধক এই প্রয়োগটি চমৎকার উপভোগ্য হইয়াছে। বক্তার চরিত্র ও অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে।

ভাগ্যবিচার ঃ

১। উক্তি পরিবর্তন কর :—

মহারাণা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বললেন, "এই যে ঘটনা ঘটেছে এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না, বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে। মনে কোরোনা তোমায় আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আমি চোখ বুজলেই আস্তে আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে।"

উঃ। মহারাণা পৃথ্বীরাজকে ডেকে বললেন যে, সেই যে ঘটনাটা ঘটেছে তারজন্য পৃথ্বীরাজই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। তিনি বললেন যে, সঙ্গ কোথায় আছে কি নেই কিছুই জানা যাচ্ছে না। বেঁচে থাকলে পৃথ্বীরাজের ভয়ে সঙ্গ কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। মহারাণা পৃথ্বীরাজকে সাবধান করে দিলেন যে, সে যেন কখনও মনে না করে যে, মহারাণা তাকে আরামে বসিয়ে রাখবেন আর তিনি চোখ বুজলেই সে আস্তে আস্তে সিংহাসনে উঠে বসবে।

২। অযুক্ত স্থান পূরণ কর :—

সে অনেক দুঃখের—। বিয়ে—অবধি এর স্বামী তাকে অপমান— মারছে। ঘরের—করে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং—নির্দয়।

উক্ত পদ—কাহিনী, হয়ে, করছে, লাথি, বার, একেবারে।

৩। বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণ পদে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত কর :—তপ্ত, প্রণাম, মন, আসন, স্থিরতা, শারীরিক, বিশ্রাম।

উঃ। তাপ (বি), প্রণত (বিণ), মানসিক (বিণ), আসীন (বিণ), স্থির (বিণ), শরীর (বি), বিশ্রান্ত (বিণ)।

৪। দেউল ও গেরুয়া এই দুইটি আধুনিক শব্দ কোন শব্দ হইতে আসিয়াছে ?

উঃ। 'দেবকুল' এই শব্দ হইতে জাত তদ্ভব শব্দ দেউল। এই প্রকার 'গৈরিক' হইতে গেরুয়া।

৫। ভাগ্যবিচার, বাঘছাল, সিংহাসন, বীরাসন, রক্তপাত, ক্ষতবিক্ষত, প্রাণশূন্য, চিতোরমুখো, প্রতিজ্ঞাপত্র, নির্বোধ, অপদার্থ—কোন্ সমাস ? ইহাদের ব্যাসবাক্য লিখ :—

উঃ।—ভাগ্যের বিচার (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) বা ভাগ্য নির্ণয় করিবার জন্য বিচার (মধ্যপদলোপী)। বাঘের ছাল, বাঘছাল, ষষ্ঠীতৎপুরুষ। সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। বীরের আসন বীরাসন, ষষ্ঠীতৎপুরুষ। রক্তের পাত রক্তপাত, ষষ্ঠীতৎপুরুষ। ক্ষত ও বিক্ষত ক্ষতবিক্ষত, দ্বন্দ্ব। প্রাণ দ্বারা শূন্য প্রাণশূন্য, তৃতীয়া তৎপুরুষ। চিতোরের দিকে মুখ করিয়া আছে যে, চিতোরমুখো, বহুব্রীহি। প্রতিজ্ঞাসূচক বা প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্মধারয। নির (নাই) বোধ যাহার নির্বোধ, বহুব্রীহি। নাই পদার্থ যাহার অপদার্থ, বহুব্রীহি।

বসন্তের কোকিল ঃ

১। 'বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়'—ইহার উপর একটি ব্যাকরণগত টিপ্পনী লিখ।

উঃ। ভিজিয়া নাস্তানাবুদ হয় এই অর্থে ভিজিয়া গোবর হওয়া একটি বাংলা বিশেষ বাগ্ধারা, কিন্তু 'ভিজিয়া গোবর হয' এইভাবে 'গোবর'কে 'গোময' রূপে শুদ্ধ করিলে বাগ্ধারায় সঙ্গত প্রয়োগ হয না। 'ছেলেটি আদরে আদরে মাটি হইয়া গেল' স্থানে যদি 'মৃত্তিকা' হইয়া গেল বলা যায় তাহা হইলে এই প্রকার হয়। তবে এস্থলে কমলাকান্ত রহস্যোচ্ছল ভঙ্গীতে কথা বলিতেছেন, তাই বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়াই ভাষার এই বিপর্যয় সাধন করিযাছেন। সুতরাং এই প্রযোগ দোষ না হইয়া গুণ হইয়াছে।

২। পারাবতকাকলীসংকুল, পরান্নপ্রতিপালিত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, সর্বশব্দগ্রাহী, নীলাম্বর কোন্ সমাস ? ইহাদের ব্যাসবাক্য লিখ।

উঃ। পারাবতকাকলীসংকুল—পারাবতের কাকলী, ষষ্ঠীতৎপুরুষ তাহা দ্বারা সংকুল, তৃতীযা তৎপুরুষ। পরান্নপ্রতিপালিত—পরের অন্ন, পরান্ন, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, তাহার দ্বারা প্রতিপালিত, তৃতীযা তৎপুরুষ। স্নিগ্ধোজ্জ্বল—স্নিগ্ধও বটে উজ্জ্বলও বটে, কর্মধারয। সর্বশব্দগ্রাহী—সর্ব শব্দ কর্মধারয, সর্ব শব্দ গ্রহণ করে যে, উপপদ তৎপুরুষ। নীলাম্বর—নীল যে অম্বর, কর্মধারয।

৩। 'উপর্যুপরি'—সন্ধি বিচ্ছেদ কর। উঃ। উপরি + উপরি = উপর্যুপরি।

৪। বিশেষণে কি হইবে লিখ :—

আরম্ভ, শরীর, নিদ্রা, পুষ্প, প্রকৃতি, শ্রোতা, হ্রাস।

উঃ। আরব্ধ, শারীরিক, নিদ্রিত, নিদ্রালু, পুষ্পিত, প্রাকৃতিক, প্রাকৃত শ্রোতব্য, হ্রস্ব।

৫। বিশেষ্যে কি হইবে লিখ :—

মুখরিত, উপস্থিত, অবিশ্রান্ত, অভিভূত, বিন্যস্ত, স্নিগ্ধ, সিক্ত, শাসিত, বিস্মিত।

উঃ। মুখরতা, উপস্থিতি, অবিশ্রাম, অভিভব, বিন্যাস, স্নেহ, সেক, শাসন, বিস্ময়।

৬। উক্তি পরিবর্তন কর :—

যে সুন্দর তাকেই ডাকি ; যে ভাল তাহাকেই ডাকি। যে ডাক শুনে তাকেই ডাকি। জানিয়া ডাকি না জানিয়া ডাকি সমান কথা।

উঃ। লেখক কোকিলকে বলিতেছেন, যে সুন্দর তাকেই তিনি ডাকেন ; যে ভালো তাকেই তিনি ডাকেন। যে লেখকের ডাক শুনে তাকেই তিনি ডাকেন। লেখক বলিতেছেন যে, জানিয়া ডাকেন বা না জানিয়া ডাকেন তাহা সমান কথা।

স্বাধীনতালাভের পরে ঃ

১। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

মুক্তি-সংগ্রাম, যুধিষ্ঠির, শরদভ্রচ্ছায়া, ভেদবুদ্ধি, অম্লানবদন, বিক্ষিপ্তচিত্ত, জ্ঞানতৃষ্ণা, নিদ্রাভঙ্গ।

উঃ। মুক্তির জন্য সংগ্রাম, মুক্তিসংগ্রাম, ৪র্থী তৎপুরুষ। যুধি (যুদ্ধে) স্থির যুধিষ্ঠির, অলুক তৎপুরুষ। অভ্রের ছায়া অভ্রছায়া, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, শরৎকালীন অভ্রচ্ছায়া, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। ভেদসূচক বুদ্ধি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। ন (নয়) ম্লান, অম্লান (নঞ্ তৎপুরুষ) ; অম্লান বদন যাহার, বহুব্রীহি। বিক্ষিপ্ত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহুব্রীহি। জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণা, ৪র্থী তৎপুরুষ। নিদ্রার ভঙ্গ নিদ্রাভঙ্গ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ।

২। নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে পরিণত কর :—

উত্তর :—বাসন্ত, বাসন্তী (বিণ), মাসিক (বিণ), বিষাক্ত (বিণ), দগ্ধ (বিণ), ঔদরিক (বিণ), অবহিত (বিণ), দুরন্তপনা (বি), ধেনো (বিণ), হেটো (বিণ), বৈধ (বিণ)।

২। অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(ক) পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ। (খ) জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। (গ) তৈল তূলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে। (ঘ) মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। (ঙ) অনলসমান পোড়ে চইতের খরা।

উত্তর :—(ক) অনুপ্রাস (খ) অনুপ্রাস (গ) অনুপ্রাস (ঘ) অনুপ্রাস (ঙ) উপমা।

৩। বাক্য রচনা করিয়া সার্থক প্রয়োগ দেখাও :—অবধান, বিগ্যমান, মন্দ মন্দ, কর্মের বিপাক, সিতাসিত, দোপাটা।

বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড়

সন্ধি :—অস্তোদয়—অস্ত + উদয়। চতুর্দিক—চতুঃ + দিক। অহরহঃ—অহঃ + অহঃ। অহর্নিশ—অহঃ + নিশ। বহির্দেশে—বহিঃ + দেশে। দুর্নিবার—দুঃ + নিবার। যশোভাগী—যশঃ + ভাগী। যশোদীপ—যশঃ + দীপ। উদ্দীপ্ত—উৎ + দীপ্ত।

সমাস :—দেব-অনীকিনী—দেবের অনীকিনী, ষষ্ঠীতৎ। **চৌদিকে**—চৌ (চারি) দিকের সমাহার, দ্বিগু। **ভীষণদর্শন**—ভীষণ দর্শন যাহার, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি। **সিংহনাদ**—সিংহের নাদের তুল্য নাদ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয। **ত্রিদশ-আলয়**—ত্রি (তৃতীয) দশা (অবস্থা) যাঁহাদের, বহুব্রীহি [অর্থাৎ যাঁহাদের কেবলমাত্র তৃতীয দশা অর্থাৎ যৌবনাবস্থাই আছে, বার্ধক্য নাই] ত্রিদশের (দেবতাদের) আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। **সমরবহ্নি**—সমর রূপ বহ্নি, রূপক কর্মধারয়। **অনুক্ষণ**—ক্ষণে ক্ষণে, অব্যয়ীভাব। **বিরতি-বিশ্রাম**—বিশ্রামের বিরতি (অভাব) যেখানে, বহুব্রীহি। **অবিশ্রাম**—অ (নাই) বিশ্রাম যাহাতে, বহুব্রীহি। **সভাসীন**—সভায় আসীন, ৭মীতৎ। **চির-রণজয়ী**—রণে জয়ী, রণজয়ী, ৭মীতৎ; চির (চিরকাল ব্যাপিয়া) রণজয়ী, ২য়াতৎ। **শিবশূল**—শিবদত্ত শূল, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **শোভিত-মাণিক-গুচ্ছ**—মাণিকের গুচ্ছ, ৬ষ্ঠীতৎ ; শোভিত (শোভাযুক্ত) মাণিক গুচ্ছ যাহাতে, বহুব্রীহি। **সহর্ষচিত্তে**

—হর্ষের সহিত বর্তমান, সহর্ষ, বহুব্রীহি; সহর্ষ হইয়াছে চিত্ত যাহাতে বহুব্রীহি। **যশোধর**—যশকে ধারণ করে যে, উপপদতৎ। **ধরাধর**—ধরাকে ধরে অর্থাৎ ধারণ করে যে, উপপদতৎ। **উত্তুঙ্গ**—উৎ (উৎকটরূপে) তুঙ্গ (উচ্চ), প্রাদিসমাস।

টীকা :—বেষ্টিয়াছে—নামধাতু। **অনীকিনী**—অনীক (সৈন্যদল)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে। বিস্তৃত—বি—স্তৃ+ক্ত, কর্তৃবাচ্যে। **যোজন যোজন**—দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচনের দৃষ্টান্ত; যেমন—'জনে জনে,' 'বনে বনে,' 'ভাই ভাই' ইত্যাদি। প্রদীপ্ত—প্র—দীপ্+ক্ত, কর্তৃবাচ্যে। আচ্ছাদিয়া—নামধাতু। সন্নিহিত—সম্—নি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্তৃবাচ্যে। **উরস্বান**—উরস্+বতুপ্ (প্রশস্তার্থে)। পরিক্রম—পরি-ক্রম্+ঘঙ্। বৈজয়ন্ত—বি-জি+অন্ত। স্রোতস্বতী—স্রোতস্+বতুপ্ (অস্ত্যর্থে) স্ত্রীলিঙ্গে। **দৈবত**—দেবতা+স্বার্থে অন্ (তদ্ধিত)। **আস্ফালন**—আ-স্ফল+নিচ্+অনট, ভাববাচ্যে। সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে—'করিলা' সাধারণ বা নিত্য অতীতের উদাহরণ। **বসুন্ধরা**—বসু (ধন)-ধৃ+ণিচ্+খচ্+কর্তৃবা+আপ্। বিশেষ্য; স্ত্রীলিঙ্গ। **স্বরগ**—স্বর্গ>স্বরগ। স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ। **প্রতাপে**—প্রতাপের দ্বারা অর্থ। করণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি। **খেদাইলা**—বাং √খেদা (সংস্কৃত √খিদ্)+ইলা (অতীতকালে)। **দেববৃন্দে**—দেববৃন্দকে অর্থ (কর্মে সপ্তমী বিভক্তি)। একবচনাত্মক 'দেব' শব্দের সহিত সমষ্টিবোধক 'বৃন্দ' শব্দ যোগে বহুবচন করা হইয়াছে। আবার আসিয়া **দম্ভে**—দম্ভের সহিত (করণকারকে সপ্তমী বিভক্তি)। **কলঙ্কিলা**—নামধাতু, বিশেষ্য 'কলঙ্ক' হইতে গঠিত। **বৃংহিত**—বৃনহ্+ক্ত, ভাববাচক। বিশেষ্য; ক্লীবলিঙ্গ। **মণ্ডিবেন**—মণ্ডিত করিবেন। নামধাতুর প্রয়োগ। **আত্মজ**—আত্মন (নিজ হইতে)—জন্+ড কর্তৃবাচ্য। বিশেষ্য; পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মজা।

অতঃপরে—অতঃ (ইহা হইতে)+পর (সুপ্ সুপা)। ক্রিয়া-বিশেষণ। **কীর্তিমান**—কীর্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিশেষণ; পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গে—কীর্তিমতী। **সুরবৃন্দ**—একবচনাত্মক 'সুর' শব্দের সহিত 'বৃন্দ' যোগে বহুবচন। **কদাচিৎ**—কদা+চিৎ অনির্দিষ্ট অর্থে। অব্যয়। **শিরসে**—অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি। **নিঃশেষি**—নিঃশেষ করিয়া; নামধাতুর

উদাহরণ। **উজলিয়া**—উজ্জ্বল করিয়া। নামধাতুর উদাহরণ। **বিন্যাসিয়া**—বিন্যাস করিয়া। নামধাতুর উদাহরণ। **বেলাগর্ভে**—অধিকরণে সপ্তমী। **নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল**—ছল, বেশ ও কৌশল (কর্মে প্রথমা বিভক্তি)। **হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব-দানবে**—কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ। **এ প্রস্তাবে**—প্রস্তাবকে অর্থ (কর্মে সপ্তমী) অন্যথা—অন্য + থাচ্ প্রকারার্থে অব্যয়। অচিরাৎ—অচির – অত (গমন করা) + ক্বিপ ; অব্যয়, ক্রিয়া-বিশেষণ।

আলোচনা :—

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) — জনকের পুত্র হওয়া বৃথা
স্বনামে যদি না — হয় —
জীবনে — চিরস্মরণীয় !

(খ) — কদাচিৎ ভীরুরো অন্তরে
— হইয়া তারে করে —।

২। পদগুলির সার্থক প্রয়োগ দেখাও :—দনুজ, শ্বাপদ, জিষ্ণু, বৃংহিত, বৈজয়ন্ত, অনীকিনী, উরস্থান, ত্রিদশ, সন্দেশবহ, উত্তঙ্গ।

৩। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—শ্বাপদ, অনীকিনী, জিষ্ণু, উরস্থান, বৃংহিত, অন্যথা।

ঐকতান

সন্ধি :—দুর্গম—দুঃ + গম . নির্ঝর—নিঃ + ঝর। নিরানন্দ—নিঃ + আনন্দ।

সমাস :—অজানা—ন জানা, নঞ্ তৎপুরুষ। **ভ্রমণবৃত্তান্ত**—ভ্রমণের বৃত্তান্ত, ষষ্ঠীতৎ। **ভিক্ষালব্ধ**—ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ, ৩য়াতৎ। **দুর্গম**—**দুঃ** (দুঃখে, অতিকষ্টে) গম (গমন করা যায়) যেখানে, বহুব্রীহি। **তুষারগিরি**—তুষারমণ্ডিত গিরি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **মহাজনশূন্যতা**—জনের দ্বারা শূন্য, জনশূন্য, ৩য়াতৎ ; তাহার ভাব, জনশূন্যতা ; মহা জনশূন্যতা কর্মধারয়, তাহাতে। **অনিমেষ**—নাই নিমেষ যাহাতে, বহুব্রীহি। **প্রাণহীন**—প্রাণের দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। **নির্বাক**—নিঃ (নাই) বাক্ (প্রকাশ) যাহার, বহুব্রীহি। **নতশির**—নত হইয়াছে শির যাহাদের, বহুব্রীহি।

টীকা :—ভিক্ষালব্ধ **ধনে**—'ধনে' করণে ৭মী। **ধরিত্রী**—ধৃ (ধারণ করা)+ইত্র (কর্তৃ)+ঈ (স্ত্রীং)। **দুর্গম**—দুঃ—গম্+অ (কর্ম)। **মহাপ্লাবী**—মহা—প্ল+নিন্ (কর্তৃ)। নিখিলের সঙ্গীতের **স্বাদ**—'স্বাদ' কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি। চালাইছে **হাল**—'হাল' কর্মকারকে শূন্য (১মা) বিভক্তি। **চিরনির্বাসনে**—নির্বাসন হেতু, হেত্বর্থে ৭মী। **জীবনে** জীবন যোগ করা—'জীবনে' অর্থাৎ জীবনের সহিত, সহার্থে তৃতীয়ার 'এ' বিভক্তি। কৃত্রিম **পণ্যে**—'পণ্যে' করণে ৭মী। সে কবির **বাণী লাগি**—'লাগি' একটি অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত, আর ওরই যোগে 'বাণী' প্রথমা বিভক্তি প্রাপ্ত।

আলোচনা :

১। উপযুক্ত প্রয়োগ দেখাও :—মজদুরি, জীবনের শরিক, কৃত্রিম পণ্য, একতারা, সৌখিন।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) সব চেয়ে দুর্গম যে — আপন — তার — কোনো — পরিমাপ নাই— — —।

(খ) — জীবন — করা না হ'লে — — ব্যর্থ হয় — পসরা।

৩। বিশিষ্টার্থে প্রয়োগের নমুনা দেখাও :

জ্ঞাতি হয়ে থাকা, চোখ ভোলানো, মাটির কাছাকাছি থাকা, কাণ পেতে থাকা, জীবনযাত্রার বেড়া, সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসা।

বর্ষামঙ্গল

সন্ধি :—মনোমোহিনী—মনঃ+মোহিনী (সম্বোধনে)। স্নিগ্ধোজ্জ্বল—স্নিগ্ধ+উজ্জ্বল।

সমাস :—**শ্যামাঙ্গিনি**—শ্যাম অঙ্গ যাহার (স্ত্রীং), বহুব্রীহি। **ব্রজবধূ** ব্রজের বধূ, ৬ষ্ঠীতৎ। **সুধাপরশা**—সুধার পরশের ন্যায় পরশ যাহার (স্ত্রীং) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি। **কুন্তলজাল**—কুন্তলের জাল, ৬ষ্ঠীতৎ। **ভয়ত্রস্তা**—ভয়ের দ্বারা ত্রস্তা, বহুব্রীহি। **বাসন্ত-দুকুলা**—বাসন্ত (বসন্তের উপযোগী) দুকূলে শোভিত হইয়াছে যে (স্ত্রীং), বহুব্রীহি। **কমকণ্ঠে**—কম (কমনীয়) যে কণ্ঠ, কর্মধারয়, তাহাতে। **ঋতুকুলরাণী**—ঋতুর কুল (সমূহ),

ঋতুকুলের রাখী, ৬ষ্ঠীতৎ। **বসোরা-গোলাপ**—বসোরার গোলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ অথবা 'বসোরা' নামে পরিচিত যে গোলাপ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **আনন্দ-উল্লাসে**—আনন্দ ও উল্লাস, তাহাতে, সমার্থক দ্বন্দ্ব।

টীকা :—ম্লান **নেত্রে**—নেত্র হইতে এই অর্থে অপাদানে, পঞ্চমীর 'এ' বিভক্তি। 'উন্মাদিনী'—স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গে 'উন্মাদ'। **ঝঙ্কারিছে, প্লাবিয়াছ, রঞ্জিয়াছ**—নামধাতুর প্রযোগ। শিখিযাছ বলো কার **বরে**—বরের দ্বারা এই অর্থে করণে ৭মী। **নৃত্য** ধরেছে—'নৃত্য' কর্মে ১মা। **শিখিনী**—শিখা—ইন্ অস্ত্যর্থে=শিখী, স্ত্রীলিঙ্গে—শিখিনী। **চাতকিনী**—'চাতক' এর স্ত্রীলিঙ্গে 'চাতকী' কিন্তু বাংলায় 'চাতকিনী' পদের বহুল প্রচলন। **নীপে নীপে, অঙ্গে অঙ্গে**—দ্বিরুক্তিদ্বারা বহুবচন। **সোহাগে, আদরে, যত্নে**—প্রত্যেকটি করণে ৭মী। **ফুটন্ত**—ফুট্+অন্ত (কর্তৃ), বিশেষণ। **কুন্তলে**—অধিকরণে ৭মী। সেই **দৃশ্যে**—করণে ৭মী। **বাসন্তী শারদী** জিনি—বাসন্তী ও শারদী—কর্মকারকে ১মা। **গুল্ আনার**—বাংলায় প্রচলিত ফার্সী শব্দ। **হাস্‌নাহানায়**—বাংলায প্রচলিত জাপানী শব্দ; করণে ৭মী। কেতকীর **বাসে**—'বাসে' করণে ৭মী। **রুচির**—রুচ্ (রোচক হওয়া)—ইর, কর্তৃবাচ্যে, বিশেষণপদ।

আলোচনা :

১। বাক্যের দ্বারা সার্থক প্রযোগ দেখাও—অমিয়, মেদুর, মুকুল, নীপ, মদিরা, কোরক, কমকণ্ঠ, রুচির।

২। অলঙ্কার নির্ণয় কর :—

(ক) বিরহিণী ব্রজবধূ যেন আহা হ'য়ে উন্মাদিনী ঝঙ্কারিছে বীণা।

(খ) একি পুষ্পময চেলি ঝিলিমিলি সবুজে সবুজে !

(গ) জাগায়েছ অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ অপূর্ব পুলক !

(ঘ) কুন্তলে অশোকগুচ্ছ, কমকণ্ঠে কর্ণিকার-মালা।

৩। বিভিন্ন অর্থে প্রযোগ দেখাও :—অম্বর, সবুজ, আলাপ, বাস।

কৃষ্ণা রজনী

সমাস : প্রখর-ঝটিকামুখর—প্রখর যে ঝটিকা, কর্মধারয়, তদ্দ্বারা মুখর, ৩য়াতৎ। **গুরুগর্জন**—গুরু যে গর্জন, কর্মধারয়। **মৃতপতি-দেহ**—মৃত যে পতি, কর্মধারয়, মৃতপতির দেহ, ৬ষ্ঠীতৎ। **বারাণসীধামে**—বারাণসী

নামক গ্রাম, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, তাহাতে। **ধুলিলুণ্ঠিতা**—ধুলিতে লুণ্ঠিতা, ৭মীতৎ। **বনমর্মরে**—বনের মর্মর, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। **বনমাঝ**—বনের মাঝ, ৬ষ্ঠীতৎ। **বদনশতদল**—শতদলের ন্যায় বদন, উপমিত কর্মধারয়।

টীকা :—সজনি—'সজনী' শব্দের সম্বোধনে। বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ। সখী অর্থে 'সজনী' শব্দটি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। **শিয়রে**—অধিকরণে ৭মী। **দামিনী** দাম+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গ। বারেবার—সংস্কৃত 'বারম্বারম্ শব্দজ; অব্যয়। টলমল—অব্যয়; সংস্কৃত 'টল্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। **একাকিনী**—এক+আকিন্, অসহায়ার্থে+স্ত্রীং ঈ। **নিশিদিন**—ক্রি· বিশেষণ। **ধাঁধায়**—ক্রিয়া; ধাঁধা+আ=ধাঁধা (দৃষ্টিভ্রম জন্মানো)। **কলকল**—'কল' শব্দের প্রকারার্থে দ্বিত্ব, ধ্বনিবোধক বিশেষ্যপদ। **যুগযুগ** ধরি—'ধরি' এই অনুসর্গ যোগে ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া স্থলে প্রথমা। নিভেছে—পুরাঘটিত বর্তমান।

আলোচনা

১। ব্যাকরণগত টীকা লিখ :—সজনি, আবরি, একাকিনী, কলকল যুগযুগ।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :—(ক) মত্ত **পবনে** বরুণরাজ্য টলমল (খ) গাঙুড়ের নীরে ভাসাইয়া **ভেলা**। (গ) বন**মর্মরে** ত্রস্ত চকিত মৃগদল (ঘ) কত **সুষমার** কত চিতা মরি।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—অবিরল, মত্ত, ত্রস্ত, মলিন, কাতর, নিশি

ফরিয়াদ

সমাস :—ধুলিমাখা—ধুলির দ্বারা মাখা, ৩য়াতৎ। **অসহায়**—নাই সহায় যাহার, বহুব্রীহি। **দুখ-দীপ**—দুঃখের দীপ, ৬ষ্ঠীতৎ। **বাসে-ভরা**—বাসে ভরা হইয়াছে যাহা, অলুক বহুব্রীহি। **রবি-শশি-দীপে**—রবি ও শশী, দ্বন্দ্বসমাস; রবি-শশি রূপ দীপ, তাহাকে রূপক কর্মধারয়। **জমিদার**—জমির দার (মালিক অর্থে) ৬ষ্ঠীতৎ। **বেহায়া**—বে (নাই) হায়া যাহার, বহুব্রীহি। **রৌপ্য-চাকায়**—রৌপ্যনির্মিত চাকা, তাহাতে মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **দৈত্যমুক্ত**—দৈত্য হইতে মুক্ত, ৫মীতৎ **নিপীড়ন-চেড়ী**—নিপীড়ন রূপ চেড়ী, রূপক কর্মধারয়।

টীকা :—ফরিয়াদ—ফার্সী শব্দ। বিশেষ্য। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত বিদেশী শব্দের উদাহরণ। **মাগে প্রতিকার**—প্রতিকার (কর্মে প্রথমা বিভক্তির উদাহরণ। **সৃষ্টি ব্যাপিয়া**—সৃষ্টিকে ব্যাপিয়া অর্থ (কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি)। **সৃষ্টি শিয়রে**—সৃষ্টির শিয়রে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ)। **উৎসুক**—উৎ-সু (অনুরক্ত হওয়া)+ক্, কর্তৃবা। বিশেষণ। **মুড়েছ**—বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ 'মোড়া'র পুরাঘটিত বর্তমানের মধ্যমপুরুষের রূপ। **মরকতে**—মরকতের দ্বারা অর্থ (করণকারকে সপ্তমী বিভক্তি)। **রোদে স্নান**—রোদের দ্বারা অর্থ (করণকারকে সপ্তমী বিভক্তি)। **বীজন**—বীজ্ + অনট্ ভাববাচ্য। **আদেশ কহে**—আদেশ (কর্মে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ)। **ফরমান**—বাঙ্গালায় প্রচলিত ফার্সী শব্দ। **সৃজিলে মানবে**—মানবে (কর্মে সপ্তমী বিভক্তি)। **শ্বেতদ্বীপে**—কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। **রবি-শশি-দীপে**—দীপে—দীপকে অর্থ (কর্মে সপ্তমী বিভক্তি)। **টুঁটি টিপে**—টুঁটিকে টিপে অর্থ (কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ)। **কনিষ্ঠা**—কনিষ্ঠ + আপ্, স্ত্রীলিঙ্গ ; বিশেষণ। **শ্যামল ধরায়**—ধরাকে অর্থ (কর্মে সপ্তমী)। **টিবিতে**—অধিকরণে সপ্তমী। **গোরস্থান**—বাঙ্গালায় প্রচলিত ফার্সী শব্দ৷ গোরের স্থান (ষষ্ঠীতৎ)।

খেয়ে—খাইয়া > খেয়ে (অভিশ্রুতি)। **জনগণে**—জনগণকে অর্থ (কর্মে সপ্তমী বিভক্তি)। **জমিদার**—জমি + দার স্বামী অর্থে। বিশেষ্য ; পুংলিঙ্গ। **ধড়িবাজ**—ধড়ি + বাজ নিপুণার্থে। বিশেষণ। বিশেষ্য—ধড়িবাজী। **নীরক্ত**—নির্ (নাই) রক্ত যাহার বা যাহাতে (বহুব্রীহি) ; বিশেষণ। **'পূরে'**—পূরিয়া > পূরে (অভিশ্রুতি)। **'ঘুরে'**—ঘুরিয়া > ঘুরে (অভিশ্রুতি)। **গর্দ্দান**—বাঙ্গালায় প্রচলিত ফার্সী শব্দ। বিশেষ্য। **বন্ধন ছেদি'**—বন্ধনকে ছেদি (কর্মে প্রথমা)।

আলোচনা :

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) তব — মেয়ে — দিলে দান ধূলামাটি,
তাই — তার ছেলেদের — ধরে সে — বাটি।

(খ) জনগণে যারা — শোষে তারে — কয়,
—পালে যারা জমি তারা — নয়।

২। বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিতে প্রয়োগ দেখাও :—
টুঁটি টিপে রাখা, দুধের বাটি ধরা, কাটাকাটি করা, মাটির টিপিতে দুদিন বসা, গোরস্থান রচনা করা, জোঁকসম শোষণ, মাটিতে চরণ না ঠেকা, কসাইবৃত্তি, বেহায়া ছাতি, ডঙ্কা বাজানো, মনের শিকল ছেঁড়া।

৩। সার্থক বাক্য রচনা কর :—সোয়াস্তি, ফরমান, ফরিয়াদ, ডঙ্কা, ডাকু, গর্দ্দান, বান্দা।

(গদ্যাংশ)

ললিতগিরি

সন্ধি :—সমুদ্রাভিমুখে—সমুদ্র + অভিমুখে। মনোমোহিনী—মনঃ + মোহিনী। হরিদ্বর্ণ—হরিৎ + বর্ণ। পীতাম্বরী—পীত + অম্বরী। চীনাম্বরা —চীন + অম্বরা। প্রত্যাগত—প্রতি + আগত।

সমাস—**স্বচ্ছসলিলা**—স্বচ্ছ সলিল যাহার (স্ত্রীলিঙ্গে), বহুব্রীহি। **গিরিশিখরদ্বয়ে**—গিরির শিখরদ্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। **সর্বাঙ্গসুন্দরী**—সর্ব অঙ্গ, কর্মধারয়; তাহাতে সুন্দরী, ৭মীতৎ। বৃক্ষশূন্য—বৃক্ষের দ্বারা শূন্য, ৩য়াতৎ। **মনোমুগ্ধকর**—মনকে মুগ্ধ করে যাহা, উপপদতৎ। **হরিৎক্ষেত্র**—হরিৎ বর্ণ ক্ষেত্র, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত**—পুষ্পের মাল্য, ৬ষ্ঠীতৎ, পুষ্পমাল্যনির্মিত আভরণ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, তদ্দ্বারা ভূষিত ৩য়াতৎ। **বিকম্পিত-চেলাঞ্চলপ্রবুদ্ধসৌন্দর্য**—চেলের (চেলির) অঞ্চল, ৬ষ্ঠীতৎ; বিকম্পিত যে চেলাঞ্চল, কর্মধারয়; তদ্দ্বারা প্রবুদ্ধ, ৩য়াতৎ; বিকম্পিতচেলাঞ্চলেপ্রবুদ্ধ হইয়াছে সৌন্দর্য যাহাদের, বহুব্রীহি। **কোপপ্রেমগর্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা**—কোপ, প্রেম, গর্ব ও সৌভাগ্য, দ্বন্দ্ব; ইহাদের দ্বারা স্ফুরিত, ৩য়াতৎ; এরূপ অধর যাহাদের (স্ত্রীং), বহুব্রীহি। **পীবরযৌবনভারাবনতদেহা**—পীবর যে যৌবন, কর্মধারয়; তাহার ভার, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার দ্বারা অবনত, ৩য়াতৎ; এমন দেহ যে নারীর, বহুব্রীহি। **প্রাতঃকৃত্য**—প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) কৃত্য (কর্তব্য), সুপ্‌সুপা সমাস।

টীকা ঃ কল্লোলিনি—কল্লোল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিশেষ্য ; স্ত্রীলিঙ্গ। **ইমারতের**—বাঙ্গালায় প্রচলিত একটি 'আরবী' শব্দ। **পুতুল-গড়া**—পুতুলকে গড়া (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)। **কুমারসম্ভব** ছাড়িয়া—কুমারসম্ভবকে অর্থ (কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি)। **স্থইন্বর্ণ** পড়ি—স্থইন্বর্ণকে (তাঁহার রচিত পুস্তক) পড়ি (কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি)। **চীনের পুতুল**—কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি। **সে ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে**—কর্মকর্তৃবাচ্য। **পালিশ**—ইংরাজী 'polish' শব্দের বাঙ্গালা রূপান্তর। বাঙ্গালায় প্রচলিত ইংরাজী শব্দের নিদর্শন।

ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে ইত্যাদি—কর্ম-কর্তৃবাচ্যের উদাহরণ। **বিরূপায়**—অধিকরণে সপ্তমী। **প্রণতা**—বিশেষণ ; স্ত্রীলিঙ্গ। **ভাষায়** হইল—করণে-৭মী। **কর** দেখাইবার জন্য—কর্মে ১মা।

আলোচনা :

১। পদান্তরিত কর :—অতিশয়, শোভিত, চিরকাল, বিস্তৃত, সরল, কীর্তি, ভূষিত, গঠন, তরল, পীবর।

২। লিঙ্গান্তরিত কর :—চিত্রিত, মহীয়সী, সুকোমল, মূর্তিমান, পীতাম্বরী, চীনাম্বরা, স্ফুরিতাধরা, অঙ্গহীন।

৩। পার্থক্য নির্ণয় কর :—শিখর, শেখর ; বর্তমান, বর্ধমান ; পুতুল, প্রতুল ; প্রোথিত, প্রথিত ; পুরুষ, পৌরুষ ; সুপত্র, সপত্র ; আবরণ, আভরণ।

৪। চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :—"এই সকল স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু ?...জন্ম সার্থক করিয়াছি (পৃঃ ৩১)

বঙ্কিমচন্দ্র

সন্ধি ঃ—সূর্যোদয়—সূর্য+উদয়। মহোৎসব—মহা+উৎসব। তদনুরূপ—তৎ+অনুরূপ। উচ্ছ্বাস—উৎ+শ্বাস। দুর্ভাগ্য—দুঃ+ভাগ্য। উন্নত—উৎ+নত। বিদ্বজ্জন—বিদ্বৎ+জন।

সমাস :—সসম্মানে—সম্মানের সহিত বর্তমান, বহুব্রীহি, এরূপে। **সাহিত্যভূমিতে**—সাহিত্যরূপ ভূমি, রূপক কর্মধারয়, তাহাতে। **হৃৎপদ্ম**

হৃৎ (হৃদয়) রূপ পদ্ম রূপককর্মধারয়। **নদী-নির্ঝরিণী**—নদী ও নির্ঝরিণী দ্বন্দ্ব। **প্রভাত কলরবে**—প্রভাতকালীন কলরবে, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **অপরিমেয়**—ন পরিমেয়, নঞ্‌তৎপুরুষ। **নবযৌবনপ্রাপ্ত**—নব যৌবন, কর্মধারয়, তাহাকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। **আত্মাভিমানে**—আত্মার অভিমান, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তাহাতে। **শস্যশ্যামলা**—শস্যের দ্বারা শ্যামলা, ৩য়াতৎ। **শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ**—শিক্ষিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মী তৎপুরুষ। **বিদ্বজ্জনের**—বিদ্বান জন, কর্মধারয়, তাহাদের। **মহাসত্ত্ব**—মহান সত্ত্ব (প্রাণ) যাঁহার, বহুব্রীহি। **উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল**—উদয়কালীন রবি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়; তাহার রশ্মি, ৬ষ্ঠীতৎ; তদ্দ্বারা সমুজ্জ্বল, ৩য়াতৎ। **নির্বিকার**—নির্‌ (নাই) বিকার যাহার, বহুব্রীহি। **প্রতিভাজ্যোতির্ময়**—প্রতিভা দ্বারা জ্যোতির্ময়, ৩য়া তৎপুরুষ। **জড়ত্বশাপ**—জড়ত্বরূপ শাপ, রূপক কর্মধারয়। **মলয়জশীতলা**—মলয় (পর্বত) হইতে জাত, মলয়জ, ৫মীতৎ; মলয়জ দ্বারা শীতলা, ৩য়া তৎপুরুষ।

টীকা :—অভ্যর্থনা—অভি— √অর্থি + অনট + আপ্‌। সুপ্তি—স্বপ্‌ + ক্তি। বৈচিত্র্য—বিচিত্র + ষ্ণ্য। মুখরিত—মুখর + ইতচ্‌। হিল্লোলিত—হিল্লোল + ইতচ্‌। আলোচনা—আ— √লোচি + অনট্‌ + আপ্‌। প্রসাদে—প্র— √সদ্‌ + অল্‌ = প্রসাদ; 'প্রসাদে'—হেত্বর্থে তৃতীয়ার 'এ' বিভক্তি। **উর্বরা**—উরু (অধিক)— √ঋ (গমন করা) + অ (কর্তৃ) = উর্বর; স্ত্রীলিঙ্গে উর্বরা। সব্যসাচী—সব্য (বাম)—সচ্‌ + ণিন্‌। **প্রগল্‌ভ**—প্র (অধিক) গল্‌ভ্‌ (অহঙ্কার করা) + অ (কর্তৃ), বিশেষণ।

আলোচনা :

১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—উদয়, সৌভাগ্য, উদ্‌ঘাটিত, উৎসব, নবীন, অধিগম্য, শুষ্কতা, প্রগল্‌ভ।

২। পদান্তরিত কর :—শৈথিল্য, সংযত, প্রসাদ, শ্যামল, পরিণয়, বিচ্ছিন্ন, নৈরাশ্য, আজ্ঞা।

৩। এক কথায় লিখ :—অর্থকে অতিক্রম না করিয়া, যাহার মূলে কিছুই নাই, যাহার সহিত আর কিছু মিশিয়া নাই, যাহা অধিগত করা যায় না, যাহা নিয়ত দীপ্তি পাইতেছে, যাহার দুই হাত সমান চলে, যে বেশী কথা বলে।

শুভ উৎসব

সন্ধি :—ফলাহার—ফল + আহার। ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে—ক্রিয়াকর্ম + উপলক্ষে। মাসেক—মাস + এক। নীলাম্বরী—নীল + অম্বরী। একান্নবর্তী—এক + অন্নবর্তী। প্রত্যেক—প্রতি + এক। যজ্ঞোপবীত—যজ্ঞ + উপবীত।

সমাস :—দেনাপাওনা—দেনা ও পাওনা, দ্বন্দ্ব। **গতিবিধি**—গতি বিষয়ক বিধি, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **বিচিত্র-পাড়**—বিচিত্র পাড় যাহার বহুব্রীহি। **কার্পাসবস্ত্র**—কার্পাস নির্মিত বস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **পদপল্লব**—পদ পল্লব সদৃশ, উপমিত কর্মধারয়। **বেতনভুক্**—বেতন ভোগ করে যে, উপপদতৎপুরুষ। **গৃহপ্রবেশ**—গৃহে প্রবেশ, ৭মীতৎ। **যথাসাধ্য**—সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ীভাব। **পতিব্রতা**—পতিই ব্রত যাহার (স্ত্রীং) বহুব্রীহি।

টীকা :—বিলুপ্ত—বি—লুপ্ + ক্ত। কর্মবাচ্য; বিশেষণ। বিশেষ্য—বিলোপ। **আপিসী**—আপিস + ঈ (আপিসের ভাব অর্থে)। **হিসাবী**—হিসাব + ঈ (সম্বন্ধার্থে); বিশেষণ। **কাহাকেও বাদ দিলে চলিত না**—ভাববাচ্যের উদাহরণ। **এক-কলমের আঁচড়ে**—আঁচড়ের দ্বারা অর্থ, (করণকারকে সপ্তমী বিভক্তি)।

মাসেক—মাস + এক (অ + এ = এ) পূর্বস্বরের লোপ হইয়া পরবর্তী-স্বরের এইরূপ প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা স্বরসন্ধির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এইরূপ সন্ধির আরও উদাহরণ মুহূর্তেক, অর্ধেক, সহস্রেক ইত্যাদি। **দোকানী-পসারীরা**—দোকান + ঈ (মালিক অর্থে) = দোকানী, পসার + ঈ (আছে অর্থে) = পসারী। **শালওয়ালা**—শাল + ওয়ালা (বিক্রেতা অর্থে), বিশেষ্য। **কাশ্মীরী**—কাশ্মীর + ঈ (উৎপন্ন অর্থে); বিশেষণ। **রেশমী**—রেশম + ঈ (নির্মিতার্থে) বিশেষণ। **ব্যাপারীরা**—ব্যাপার + ইন্ (আছে অর্থে), বিশেষ্য। পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গে—ব্যাপারিণী। **পশ্চিমী**—পশ্চিম + ঈ (নিবাসার্থে); বিশেষণ। **ক্ষেত্রীরা**—ক্ষেত্র + ইন্ (আছে অর্থে)। বিশেষ্য; পুংলিঙ্গ। **বেনারসী**—বেনারস + ঈ (উৎপন্ন অর্থ); বিশেষণ। **চেলী**—চেল + ঈপ্; বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ। **ময়রা**—সং মোদক]। বিশেষ্য; স্ত্রীলিঙ্গে—ময়রাণী। **গোয়ালা**—[গোআলা] গো + আলা—(রক্ষকার্থে)। বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ।

স্ত্রী—গোয়ালিনী। **পাথরওয়ালা**—পাথর + ওয়ালা (ব্যবসায়ী অর্থে) বিশেষ্য; পুংলিঙ্গ। **কাবুলীওয়ালা**—কাবুল + ওয়ালা (নিবাসার্থে) বিশেষ্য। নব নব—শব্দদ্বৈতের সাহায্যে বহুবচন। পরিচায়ক—পরি—চি + নক্ (কর্তৃ)।

আলোচনা :

১। (ক) কাবুলীওয়ালা ও পাথরওয়ালা; (খ) আপিসী ও কাশ্মীরী। (ক) প্রশ্নে 'ওয়ালা' এবং (খ) প্রশ্নে 'ঈ' প্রত্যয় যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝাইয়া দাও।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) এই যে — — "ফাউ" — ইহাতেই বিশেষ আনন্দ। (খ) সকলেই যেন — মধ্যে, যেন একটি — — — নানা অঙ্গ। (গ) আমাদের উৎসবে এই — প্রথম —। (ঘ) এই ইচ্ছাই উৎসবের —।

৩। সার্থক বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :—আপিসী, হিসাবী, ফলাহার, বরণডালা, মালিনী, মধ্যবিন্দু, মঙ্গলঘট, শিবসুন্দর, অকৃত্রিম।

অভাগীর স্বর্গ

সন্ধি : একান্তে—এক + অন্তে। পর্যন্ত—পরি + অন্ত।
ঃ + বাদ। উজ্জ্বল—উৎ + জ্বল। নিরীক্ষণ—নিঃ + ঈক্ষণ। শোকার্ত—শোক + ঋত। ভুক্তাবশেষ—ভুক্ত + অবশেষ। সদ্যোমাতৃহীন—সদ্যঃ + মাতৃহীন।

সমাস :—কুটীর প্রাঙ্গণের—কুটীরের প্রাঙ্গণ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, তথাকার। **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া**—অন্ত্য (অন্তিমকালীন) ইষ্টি (যজ্ঞ), কর্মধারয়; অন্ত্যেষ্টিই ক্রিয়া, কর্মধারয়। **আমরণ**—মরণ পর্যন্ত, অব্যয়ীভাব। **সতীলক্ষ্মী**—যিনিই সতী, তিনিই লক্ষ্মী, কর্মধারয়। **হরিধ্বনি**—'হরি' এই ধ্বনি, কর্মধারয়। **জীবন-নাট্যের**—জীবনরূপ নাট্যের, রূপককর্মধারয়। **পলকহীন**—পলকের দ্বারা হীন, ৩য়া তৎপুরুষ।

টীকা : চাকর-বাকর—বিকৃত দ্বিত্বের উদাহরণ। এইরূপ শব্দের উত্তরাঙ্গটি পূর্বাঙ্গের বিকৃত রূপের আকারে উপস্থাপিত হয়। এইরূপ শব্দের আরও কয়েকটি উদাহরণ—খাবার-দাবার, বাসন-কোসন, ভাব-টাব

ইত্যাদি। **ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া**—ললাটকে অর্থ (কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি)। **বহুমূল্যবস্ত্রে**—বস্ত্রের দ্বারা অর্থ (করণকারকে সপ্তমী বিভক্তি)। **আঁচল**—অঞ্চল>আঁচল। তদ্ভব শব্দের উদাহরণ। **পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে**—(করণকারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ)। প্রভাত **আকাশ** আলোড়িত করিয়া—আকাশকে অর্থ (কর্মে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ)। **সঙ্গে সঙ্গে**—অবিকৃত শব্দ দ্বিত্ব দ্বারা ক্রিয়া-বিশেষণ। **সগ্যে**—স্বর্গে>সগ গে (সগ্যে)। সমীকরণের উদাহরণ।

ক'রে—করিযা>ক'রে [কোরে]। অভিশ্রুতির উদাহরণ। **ছলনায়**—ছলনার দ্বারা অর্থ (করণে সপ্তমী বিভক্তি)।

বিস্তৃতি—বিশেষ্য; বিশেষণ—বিস্তৃত। **কাঁদাকাটি**—বিকৃত দ্বিত্বের উদাহরণ। **কোব্‌রেজ**—কবিরাজ>কোবরেজ (অভিশ্রুতি)। **ছল ছল**—অনুকার শব্দ। **গাঁয়ে**—গ্রামে >গাঁয়ে (তদ্ভব শব্দের উদাহরণ)।

গোমস্তা—ফার্সী 'গুমাশতহ্‌' শব্দজ। বিশেষ্য। **জিজ্ঞেস**—জিজ্ঞাসা >জিজ্ঞেস। স্বরসংগতির উদাহরণ। পূর্ববর্তী 'ই' কারের প্রভাবে পরবর্তী 'আ'-কার 'এ'-কারে পরিণত।

আলোচনা ঃ

১। ব্যাকরণগত টীকা লিখ :—ভাগ্যিমানী, অভাগী, সগ্যে, ক্যাঁতা, ধুঁয়ো।

উ:—ভাগ্যিমানী—বিশুদ্ধপদ 'ভাগ্যবতী—ভাগ্য+বতুপ্‌ (অস্ত্যর্থে); গ্রাম্য কথাযবার্তায় ইহারই বিকৃত রূপ হইয়াছে 'ভাগ্যিমানী'; ইহাতে কেবল 'ভাগ্য' স্থলে 'ভাগ্যি' হয় নাই, 'ভাগ্যবতী' হইতে 'ভাগ্যমতী' হইয়া —'মতী' স্থলেও '—মানী' হইয়া গিয়াছে। **অভাগী**—'অভাগিন্‌' এই মূল শব্দের প্রথমার একবচনে, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। **সগ্যে**—স্বর্গ>সগ্‌গ (র্‌ এর লোপ)+৭মীর, 'এ' ধ্বনি অবিকৃত রাখিয়া ভিন্নতর বানানে 'স্বর্গে' পদটির গ্রাম্য রূপ 'সগ্যে'।

ক্যাঁতা—সং 'কন্থা'>কাঁথা>ক্যাঁতা (গ্রাম্য বিকৃত উচ্চারণে)।

ধুঁয়ো—ধূম>ধোঁয়া>ধুঁয়ো (গ্রাম্য বিকৃত উচ্চারণে)।

২। সার্থক প্রয়োগ দেখাও :—ইয়ত্তা, বর্ষীয়সী, ভুক্তাবশেষ, সতীলক্ষ্মী, ইন্দ্রজাল, মুষ্টিযোগ, খামোকা, অশনবসন।

৩। **বড়ো অক্ষরের পদগুলি কী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? উহাদের ভিন্নতর অর্থে ব্যবহার দেখাও।**

(ক) এইবার ওর একটু **গতি** করে দাও বাবা। (খ) তাহার গায়ে **হাত** তুলিল না। (গ) ওদের ওষুধে কি **কাজ** হবে? (ঘ) মা ব'লে গেছে তেনাকে **আগুন** দিতে।

অব্যক্ত জীবন

সন্ধি ঃ—পূর্বোক্ত—পূর্ব + উক্ত। পরীক্ষা—পরি + ঈক্ষা। উন্নত—উৎ + নত। বহিরাবরণ—বহিঃ + আবরণ।

সমাস :—শারীরতত্ত্ববিদ—শারীর যে তত্ত্ব, কর্মধারয; উহা জানেন যিনি, উপপদতৎ। **সজীব**—জীবের (জীবনের) সহিত বর্তমান, বহুব্রীহি। **অব্যক্ত**—ন ব্যক্ত, নঞ্‌তৎ। **দেহযন্ত্র**—দেহ রূপ যন্ত্র, রূপক কর্মধারয়। **সমাধিস্থলে**—সমাধির স্থল, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। **লিপিবদ্ধ**—লিপির দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। **নির্জীব**—নির্‌ (নাই) জীব (জীবন) যাহার, বহুব্রীহি। **ইচ্ছামৃত্যু**—ইচ্ছানুগত মৃত্যু, মধ্যপদলোপী কর্মধারয। **বায়ুরোগগ্রস্ত**—বায়ুজনিত রোগ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় তদ্দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ।

টীকা :—স্থূল—স্থূল + অচ্‌ কর্তৃবাচ্য; বিশেষণ; বিশেষ্য—স্থূলতা। বিপরীতার্থক শব্দ—সূক্ষ্ম। **অব্যক্ত**—বিশেষণ। বিপরীতার্থক শব্দ—ব্যক্ত। **সময়ে সময়ে**—ক্রিয়া-বিশেষণ। বিশেষণ পদের দ্বিত্ব। এইরূপ '**দিনে দিনে** বাড়ে কালকেতু'। **সন্দিহান**—বিশেষণ; বিশেষ্য—সন্দেহ। **অভ্রান্ত**—বিশেষণ; বিপরীতার্থক শব্দ—ভ্রান্ত। **নড়াচড়া**—যুগ্ম শব্দের উদাহরণ। দ্বিতীয় শব্দটি (চড়া) প্রথম শব্দটির (নড়া) পরিপূরকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। **সুব্যবস্থা**—প্রশংসার্থে বাংলা উপসর্গ 'সু'-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। এইরূপ—সুখবর, সুনজর ইত্যাদি। অব্যক্ত **জীবন** বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়—'জীবন'কে অর্থ। কর্মে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ। **সত্যসত্যই**—শব্দদ্বিত্ব দ্বারা ক্রিয়া-বিশেষণ গঠনের উদাহরণ। **কুহেলিকায়**—করণে ৭মী। **অপনীত**—অপ + নী + ক্ত। **আধিপত্য**—অধিপতি + যক্‌ (ভাবে)।

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত—আল্‌বেরুণী

সন্ধি ঃ—মনোভাব—মনঃ + ভাব। দুর্লভ—দুঃ + লভ। উদ্‌ঘাটিত—উৎ + ঘাটিত। গীতোক্ত—গীতা + উক্ত। জ্যোতির্বিদ্যা—জ্যোতিঃ + বিদ্যা। সংস্কারাপন্ন—সংস্কার + আপন্ন।

সমাস ঃ—**দৃষ্টিশক্তি**—দৃষ্টির শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। **শিক্ষাদীক্ষা**—শিক্ষা ও দীক্ষা, দ্বন্দ্ব। **চিরঋণী**—চির ব্যাপিয়া ঋণী, ২য়াতৎ। **নিরপেক্ষ**—নির্ (নাই) অপেক্ষা যাহার বহুব্রীহি। **বিশ্ববিখ্যাত**—বিশ্বে বিখ্যাত, ৭মীতৎ। **পক্ষপাতপূর্ণ**—পক্ষে পাত, ৭মীতৎ; পক্ষপাতের দ্বারা পূর্ণ, ৩য়াতৎ। **একদেশদর্শী**—এক দেশ, একদেশ, কর্মধারয়; একদেশ দর্শন করে যে, উপপদতৎ। **মহাপ্রাণ**—মহান্ প্রাণ যাহার, বহুব্রীহি। **আত্মবলিদান**—আত্মকে বলিদান, ২য়াতৎ।

টীকা ঃ—**বর্তমান**—বৃত্ + শানচ। **সুধীমণ্ডলী**—বহুবচনার্থে 'মণ্ডলী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। অনুরূপ প্রয়োগ যথা,—ভদ্রমণ্ডলী, নির্বাচকমণ্ডলী, গায়কমণ্ডলী, গ্রহমণ্ডলী। **প্রাণখোলাভাবে** মিলিয়া-মিশিয়া—প্রথম পদটি ক্রিয়া-বিশেষণ, 'মিলিয়া-মিশিয়া' এই সংযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ। **আভাস**—আ—ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া) + অ। **যত্রতত্র**—সংস্কৃত অব্যয়-ক্রিয়াবিশেষণ-পদের বাংলায় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। অনুরূপ দৃষ্টান্ত,—কিন্তু, বরং, অদ্যাপি, অকস্মাৎ, যৎকিঞ্চিৎ, যৎপরোনাস্তি, অন্যথা। **যুগেযুগে**—দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচনের উদাহরণ। **দোষ** লক্ষ্য করিয়াছেন—কর্মে ১মা। **উদ্ধার**—উৎ—হৃ + ঘঙ্, বিশেষ্য; বিশেষণে 'উদ্ধৃত'।

———

তৃতীয় পর্ব

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলা ভাষার উদ্ভব—চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বাঙলা ভাষায় বাঙালীর রচিত সাহিত্যের নামই বাঙলা সাহিত্য। বাঙলাদেশে বাঙালীর রচিত সংস্কৃত সাহিত্য আছে,—সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীর রচিত এই সাহিত্য একেবারে নগণ্য নয়। তারপর প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়ও বাঙলাদেশে অনেক কিছুই লিখিত হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্য বলিতে সেই আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় যে বিচিত্র বিপুল বহুমুখী চিন্তারাশি লিপিবদ্ধ হইয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সমগ্রভাবে তাহাই বুঝিব।

মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য বহু লেখকের একনিষ্ঠ সেবায় বাঙলা ভাষা বর্তমানে যে রূপ লাভ করিয়াছে তাহার পিছনে এক হাজার বৎসরের বিকাশের ইতিহাস আছে। 'সংস্কৃত'কে সাধারণভাবে বাংলা ভাষার জননী বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতই ইহার প্রত্যক্ষ উৎস নহে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বলিতে আমরা যে বৈদিক যুগের ভাষাকে বুঝি, তাহারই মধ্যে খুঁজিতে হইবে বাংলা ভাষার উৎস। ঐ বৈদিক ভাষার ছিল দুইটি রীতি, কথ্য রীতি ও লেখ্য রীতি। লেখ্য রীতিটি সংস্কারের মাধ্যমে 'সংস্কৃত' ভাষায় রূপান্তরিত হয়; আর যেটি কথ্য রীতি, তাহাই এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সহিত সংমিশ্রণে কালক্রমে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, আসামী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী মোটামুটিভাবে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির জন্মকাল। ইহাদের পূর্বে এই সব ভাষার দুইটি সুস্পষ্ট রূপের পরিচয় মিলে, একটি **প্রাকৃত** ও একটি **অপভ্রংশ**। বৈদিক ভাষার ঐ কথ্যরূপ হইতে বিভিন্ন **প্রাকৃতের** জন্ম হয়। এই প্রাকৃতগুলি কালক্রমে আরও বিকৃত ও সরলীকৃত হইয়া যে রূপ লাভ করে তাহাকে **অপভ্রংশ** বলা হয়। মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাঙলা ভাষা তাহার উচ্চারণ ও ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য লইয়া দশম শতাব্দীতে প্রথম দেখা দেয়। বাঙলা ভাষার বয়স একহাজার বৎসরের

বেশী নয়। সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন এক হাজার বৎসরের অপেক্ষা প্রাচীনতর হইতে পারে না।

চর্যাপদ

সুখের বিষয় বাঙলা ভাষার অতি প্রাচীন নিদর্শন আমরা চর্যাপদ নামক কতকগুলি সঙ্গীত ও কবিতাসমষ্টির মধ্যে পাইয়াছি। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে এই গানগুলির হাতে-লেখা পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইগুলি বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণের রচিত বলিয়া কবিতাগুলিকে বৌদ্ধগান বলা হয়। প্রতি দুই ছত্রে মিল আছে বলিয়া এইগুলিকে দোহাও বলা হইত। এই গানগুলির মধ্যে যে সাধন-সংকেত আছে সাধকগণকে সেই অনুসারে চলিতে হইত বলিয়া ইহার আর এক নাম চর্যাপদ। 'চর্যা' অর্থাৎ অনুষ্ঠান সম্পর্কে পদাবলী বা গীতাবলী। পরের যুগে আমরা যে বৈষ্ণব 'পদাবলী' বা 'শাক্তপদাবলী' রচিত হইতে দেখি, এই চর্যা-'পদাবলী'র মধ্যেই পাওয়া যায় তাহার প্রাচীনতম ছাঁচ। গানের আকারে গাহিবার জন্য ইহারা যে ছোট ছোট কবিতার রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি 'পদ', এবং তাহাদের সমষ্টিকে 'পদাবলী' বলা হইয়াছে।

চর্যাপদ ৪৭টি গানের সমষ্টি। কাহ্নপা, লুইপা, ভুসুপা প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্যগণ বিভিন্ন গানের আকারে সাধন-ভজনের গূঢ় সংকেতগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এমনভাবে কথাগুলি বলা হইয়াছে যে, বাহির হইতে কেবল শব্দের অর্থ করিয়া সঙ্গীতগুলির তাৎপর্য বোঝা যায় না। এই বিদ্যা গুরুর নিকট শিখিতে হয়। রহস্যাচ্ছন্ন ভাষায় লিখিত বলিয়া চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যা-ভাষা বলে।

ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহি
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহি
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই
পারগামি লোঅ নির্ভয় তরই।

এই চার পঙ্‌ক্তির সাধারণ অর্থ—সংসাররূপ নদী তীব্রবেগে বহিয়া যাইতেছে। দুইধারে পাঁক, মাঝখানে অথৈ জল। ধর্মলাভের জন্য চাটিল সাঁকো তৈয়ারী করিতেছে। যে পার হইতে চায় সে অনায়াসেই পার হইতে পারে।

চর্যাপদের এই কবিতাগুলির মধ্যে সহজিয়া সাধনপদ্ধতির তত্ত্ব প্রধান উপজীব্য হইলেও এই সঙ্গীতগুলি সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ প্রত্যেকটি গানের মধ্য দিয়াই কবির নিবিড় অনুভূতি রূপলাভ করিয়াছে। বাঙলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসাবে এই চর্যাপদগুলির আবিষ্কার বাঙলা ভাষার বিকাশের ইতিহাসে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। **চর্যাপদগুলির রচনাকাল ৯৫০ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ মধ্যে**। সাধনপদ্ধতির কথা হইলেও এই পদগুলিতে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী, এই তিন শত বৎসরের বাঙলাদেশের সামাজিক রীতিনীতি, এবং জীবনচিত্রের এক-আধটু বর্ণনা পাওয়া যায়। বাঙলা কাব্য-সরস্বতীর জাগরণ হইয়াছিল সিদ্ধাচার্যগণের এই প্রভাতী গানে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় একটা বিরাট শূন্যতার যুগ। প্রায় আড়াই শতাব্দীর মধ্যে কোনো সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে নাই। ইহার কারণ, তুর্কী আক্রমণে ও তুর্কী শাসকদের অত্যাচারে বাংলার সমাজ-জীবনে ও ধর্ম-জীবনে গুরুতর বিপর্যয়। অতঃপর যে উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থখানি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চৈতন্যদেবের জীবনীতে আমরা একাধিক স্থানে দেখি যে, তিনি নীলাচলে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদগুলির রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহ যে চণ্ডীদাস নামে একজন পদকর্তা কবি চৈতন্যদেবের পূর্বেই বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় **বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ** বাঁকুড়ার এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একখানা হাতে লেখা পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথির প্রথম পাতা ও শেষ পাতাটি ছিল না। সুতরাং এ গ্রন্থের নাম কি ও কবে রচনা করা হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। পদাবলীর ভণিতায় জানা যায় যে, এইগুলির লেখক **বড়ু চণ্ডীদাস**। তিনি বাশুলীর ভক্ত। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই পুঁথিখানার নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী (১৪৫০—১৫০০)। চর্যাপদে যেমন বাঙলা ভাষার আদিযুগের নিদর্শন পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেমনি বাঙলা ভাষার মধ্যযুগের উচ্চারণগত ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিষয়ক একটি বৃহৎ কাব্য। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিনজনের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া একটি প্রকাণ্ড আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এই গীতিকাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা সাধারণ নরনারীর মতই চিত্রিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের স্বভাব ও আচরণে দেবতার মহিমা ফুটিয়া ওঠে নাই। অত্যন্ত স্থূল প্রেমের বাড়াবাড়ি থাকিলেও এই কাব্যটির শেষের দিকে দেহাতীত সূক্ষ্ম প্রেমের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের চরিত্র-সৃষ্টি অপূর্ব। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চর্যাপদের ভাষার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার পার্থক্য যথেষ্ট। সাহিত্য হিসাবে ইহা অনেক অগ্রসরতার লক্ষণ বহন করে। এখানকার কবিত্ব ও প্রকাশভঙ্গি বেশ উপভোগ্য। ভাষার প্রাচীনতা সত্ত্বেও গীতিময় আবেদনে ইহা এখনও আমাদের আকৃষ্ট করে। রচনার নমুনা হিসাবে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়াযি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

[বাএ = বাজায়। কালিনী = কালিন্দী। নই = নদী। বে আকুল = ব্যাকুল। শবদেঁ = শব্দে। মো = মোর। আউলাইলোঁ = এলো-মেলো হইল। রান্ধন = রন্ধন, রান্না।]

রাধা বড়াইকে বলিতেছেন, "বড়াই, কালিন্দী-নদীর তীরে না জানি কে বাঁশী বাজাইল। শুধু নদী-তীরেই না, বড়াই, এ বাঁশী যেন গোষ্ঠ-জীবনময় সারা গোকুলেই বাজিতেছে। যে বাজাইতেছে সে না জানি কে? আমার শরীর আকুল ও মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আর, দেখ না, কী বিড়ম্বনা, বাঁশীর আওয়াজ কানে যাইতেই আমার রান্নাবান্না সব এলোমেলো হইয়া গেল!"

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যগুণ নগণ্য নহে। রস-সৃষ্টিতে কবি বেশ নিপুণ ছিলেন। কাহিনীতে ও বর্ণনায় গ্রাম্যতা দোষ থাকিলেও, পরবর্তী কালে ইহাতে মূল্যবান রূপকের আরোপ করিয়া গ্রন্থখানিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্য

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরেই মঙ্গলকাব্যের স্থান। লৌকিক-দেবদেবীর মহিমাসূচক কাব্যকে সাধারণভাবে 'মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত করা হয়। এই কাব্যগুলি মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত হইল কেন সে সম্বন্ধেও বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, 'মঙ্গল' শব্দটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। সাধারণভাবে 'মঙ্গল' বলিতে যে 'কল্যাণ' বা 'শুভ' সূচিত হয়, এই শ্রেণীর কাব্যের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে কাব্যের কাহিনী গানের আকারে আবৃত্তি করিলে অথবা সেই আবৃত্তি শ্রবণ করিলে গায়ক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সকল অকল্যাণ ও অশুভ দূর হইয়া পরিপূর্ণ মঙ্গললাভ হয়, তাহাকেই 'মঙ্গলকাব্য' অর্থাৎ মঙ্গল-বিধায়ক কাব্য বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, মঙ্গলকাব্য বলিতে সেই শ্রেণীর কাব্যকে বুঝায়, যাহাদের প্রত্যেকটির কেন্দ্রে আছেন একজন মঙ্গল-দেবতা, যিনি তাঁহার মনোনীত ভক্তজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। কী অবস্থায়, কী পরিস্থিতিতে আর্ত, বিপন্ন, শরণাগত ভক্ত সেই মঙ্গল-দেবতার মঙ্গল অর্থাৎ আশীর্বাদ বা বর লাভ করিয়াছে, তাহারই কাহিনী-মূলক কাব্যকে 'মঙ্গল-কাব্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, মঙ্গল-কাব্য পালা-গানের আকারে রচিত কাহিনী-কাব্য। গানই ইহার স্বরূপ, এবং এই গানের সংজ্ঞাই হইল 'মঙ্গল-গান'। এই ধরণের পালা-গানের বিশিষ্ট রীতি অনুযায়ী এই কাব্যের কলেবর বিভিন্ন অংশে বিন্যস্ত করিয়া গঠিত হইয়াছে। সর্বপ্রকারে 'মঙ্গল'-এর সহিত জড়িত-মিশ্রিত থাকিবার জন্য মঙ্গল-গানের পালা এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হইয়া আর এক মঙ্গলবার পর্যন্ত আট দিন ধরিয়া চলিত। এই কারণে ইহার অপর একটি প্রচলিত নাম পাওয়া যায় 'অষ্ট মঙ্গলা-গান'। এইভাবে দেখা যায়, নানা দিক দিয়া 'মঙ্গল'-এর আঁটন-বাঁধনে মঙ্গলকাব্য বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। যুগের পরিচয়ে ইহাকে মুসলমান আমল বলিতে হয়। বিধর্মী রাজশক্তির চাপে সাধারণ মানুষের জীবনে একটা পরাজয়ের ভাব ও অসহায় বোধ স্বভাবতই বদ্ধমূল হইয়া উঠে যাহার ফলে মানুষের মন হয় দৈব-নির্ভর। ওদিকে আর্য সংস্কৃতি অনুযায়ী

পুরাণ বা তন্ত্রোক্ত দেব-দেবীর উন্নত ধরণের পূজা-পদ্ধতির প্রসার এই যুগে হল ব্যাহত। কিন্তু বহু প্রাচীন কাল হইতে আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে অনার্য প্রভাব ছিল তাহা মরিয়া যায় নাই, বরং এই সময়ে তাহাকেই ভিন্ন আকারে মাথা চাঁড়া দিতে দেখা যায় দেব-দেবীর রূপান্তর-সাধনে। উচ্চবর্ণের সমাজে ধর্মপালনের পন্থা কণ্টকিত হইয়া পড়ায় লোকায়ত সমাজে যে প্রথায় ধর্মপালন চলিতেছিল সেই দিকেই উচ্চ-নীচ সকল বর্ণের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। এইভাবে যে লৌকিক দেবতাগুলির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহাদের লইয়াই গঠিত হইয়াছে মঙ্গলকাব্য। ফলে আর্য ও অনার্য ভাবের সংমিশ্রণে এখানকার কাহিনীগুলিতে গণ-জীবনের এক চমৎকার রূপ ফুটিয়াছে। বাঙালীর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যবিপর্যয় এই কাব্যের উপাদানগত কাঠামো রচনা করিয়াছে। আর অনার্য সংস্কৃতির মূল ধারা অনুযায়ী এই লৌকিক-দেবতা-সমাজে স্ত্রী-দেবতারই প্রাধান্য ঘটিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে। প্রায় প্রতি কাব্যেই চারিটি অংশ দেখা যায়। (১) বন্দনা, (২) গ্রন্থরচনার কারণ-বর্ণনা, (৩) দেবতা-খণ্ড ও (৪) মানব-খণ্ড। প্রথম অংশে কবি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা গাহিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশে প্রায়ই দেখা যায় স্বপ্নাদেশে বা দৈব-নির্দেশে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহারই বিবরণ। তৃতীয়াংশে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার সম্বন্ধ স্থাপনের কথা স্থান পাইয়াছে। চতুর্থাংশে বর্ণিত হইয়াছে আসল কাহিনী। ইহাতে মানুষেরই বাধাবিঘ্নের কথা, বারমাসের সুখদুঃখের কথা (বারমাস্যা), নায়ক-নায়িকার খুঁটিনাটি বিবরণ, সমাজ-সংসারের কথা ইত্যাদি স্থান পাইয়াছে।

এই সব বিবেচনা করিলে দেখা যায় সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও ধর্মীয় ও সামাজিক বা এক কথায়, ঐতিহাসিক মূল্যের দিক দিয়া 'মঙ্গলকাব্য' সত্যই একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে গণ-দেবতা হিসাবে **মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের** প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

মনসামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যে মূল কাহিনীটি লইয়া এই কাব্য, সেই কাহিনীটি এইরূপ :—চম্পক নগরের রাজা চন্দ্রধর ব

চাঁদসদাগর। ইনি পরম শৈব। মনসা বারবার চাহিয়াও তাঁহার [illegible] পূজা পাইলেন না। যে হাতে চাঁদসদাগর শিবের পূজা করেন, [illegible] তিনি মনসার পূজা করিবেন কি করিয়া? মনসার ভয়ে চাঁদসদাগরের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার ঘট পূজা করিতেন। চাঁদ ইহা জানিতে পারিয়া হিন্তালের লাঠি দিয়া মনসার ঘট ভাঙিয়া দিলেন। মনসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চাঁদসদাগরের সর্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। চাঁদের মহাজ্ঞান অপহৃত হইল। একে একে ছয় ছেলে মনসার কোপে নিহত হইল। ছয়টি বিধবা পুত্রবধূ ও পুত্রশোকাতুরা সনকার বিলাপে চাঁদ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কোন দুঃখেই তিনি চিত্তের দৃঢ়তা বিসর্জন দিলেন না। সপ্তডিঙা মধুকর সাজাইয়া চন্দ্রধর বাণিজ্য করিতে গেলেন। মনসার রোষে সপ্তডিঙা ডুবিয়া গেল। চাঁদসদাগরেরও প্রাণ যায়। কিন্তু চাঁদকে একেবারে মারিয়া ফেলিলে মনসার কার্য সিদ্ধ হয় না। কোনরূপে প্রাণ লইয়া নানা দুর্গতি ও লাঞ্ছনা সহিয়া চাঁদসদাগর চম্পক নগরে ফিরিলেন। একটি পুত্র আছে, লখিন্দর তাহার নাম। এই ছেলের বিবাহ দিতে হইবে। বহু অনুসন্ধান করিয়া তিনি সায় বেণের কন্যা বেহুলার সহিত লখিন্দরের বিবাহ স্থির করিলেন। চাঁদ জানিতেন যে, বিবাহের রাত্রে মনসার কোপে সর্পদংশনে লখিন্দর প্রাণ হারাইবে। পর্বতের চূড়ার উপর একটি লৌহের ঘর নির্মাণ করা হইল। সেই ঘর হইবে বিবাহ রাত্রির বাসর। ঘরের বাহিরে চাঁদসদাগর নিজে বিবাহের রাত্রে হিন্তালের লাঠি লইয়া পাহারা দিতেছিলেন। কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করা যায় না; লৌহগৃহের মধ্যে একটি অদৃশ্য ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্র-পথে সূতার আকার ধরিয়া কালনাগ প্রবেশ করিল। সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় বেহুলা লখিন্দরকে পাহারা দিতেছিল। মুহূর্তের জন্য তাহার দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল। এই ক্ষণিক তন্দ্রার সুযোগে কালনাগ লখিন্দরকে দংশন করিয়া চলিয়া গেল। চম্পক নগরে আবার হাহাকার উঠিল। কিন্তু বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ কলার ভেলায় তুলিয়া লইয়া নদীর জলে ভাসিয়া চলিল। পথে কত ভয়, বিভীষিকা ও প্রলোভন। কিন্তু কোন্ দিকে দৃষ্টি না দিয়া বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া চলিল। লখিন্দরের দেহ গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হইবে না। নেতার সাহায্যে বেহুলা স্বর্গে গেল। নৃত্যের দ্বারা

[illegible] সন্তুষ্ট করিয়া লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়া পাইল। চাঁদের ছয় পুত্রও আবার বাঁচিয়া উঠিবে, কিন্তু চাঁদসদাগরকে মনসার পূজা করিতে হইবে। [illegible] লখিন্দরকে লইয়া ফিরিল। চাঁদের অন্য ছয় পুত্রও বাঁচিয়া উঠিল। যে চাঁদ সদাগর সহস্র নির্যাতনেও অটল ছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। বাঁ হাতে তিনি মনসার ঘটে ফুল ছুঁড়িয়া দিলেন। মনসা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হইল)

মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্য দিয়া যে চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেবচরিত্রের দেবমহিমা প্রকাশ পায় নাই। মনসা-চরিত্রে আমরা যে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দেবতা যে প্রকার ষড়যন্ত্র ও কৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন তাহাতে দেব-চরিত্রের মর্যাদা ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চাঁদসদাগর মানুষ হইয়াও যে অপরাজেয় পৌরুষ দেখাইয়াছেন, বহুবিধ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্যেও যে চরিত্রের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহাতে মানুষের গৌরব দেবতার মহিমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। নিয়তি-বিড়ম্বিত পুরুষকারের এমন সমুজ্জ্বল মূর্তি—দৈবের বিরুদ্ধে নর-মানবের এমন বিদ্রোহ মধ্যযুগের সাহিত্যে আর নাই। মনসামঙ্গলের আর একটি স্মরণীয় চরিত্র বেহুলা। অদৃষ্টের বিধানকে বেহুলা মানিয়া লয় নাই। নিজের সাধনার দ্বারা সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়াছে। প্রেমের দুর্জয় শক্তি তাহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে এবং মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের এই দুশ্চর তপস্যা বাঙলার এই অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূকে পৌরাণিক সাবিত্রী-চরিত্রের মর্যাদা দিয়াছে।

মনসামঙ্গলের এই করুণ কাহিনী বাঙালার বিভিন্ন অঞ্চলে চার-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া শতাধিক কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

মনসামঙ্গলের আদি কবি কানা হরি দত্ত—'প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।' কানা হরি দত্ত সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কানা হরি দত্তের পর **নারায়ণ দেবের** নাম উল্লেখ করিতে হয়। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। এইরূপ জানা যায় যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রাঢ়ে বাস করিতেন,

কিন্তু পরে রাঢ় ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অধিবাসী হন। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এককালে এই কবির খ্যাতি পূর্ববঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া একদিকে আসাম আর একদিকে রাঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নারায়ণ দেবের পর কবি **বিজয় গুপ্তের** নাম করা যাইতে পারে। বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচনা করেন। বিজয় গুপ্ত বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত গৈলা গ্রামের অধিবাসী। সংস্কৃত পুরাণাদিতে কবির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সেইজন্য সরল হৃদয়োচ্ছ্বাসের বর্ণনা অপেক্ষা তাঁহার কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই অধিক পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্ত ছন্দোবৈচিত্র্য-সৃষ্টি ও কলাকৌশলপূর্ণ বাচনভঙ্গী দ্বারা পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গলের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ইঁহাকেও চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বলিয়াই মনে করা হয়। চৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীহট্টের **ষষ্ঠীপদ দত্ত** মনসামঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি। কিন্তু **এই যুগের শ্রেষ্ঠকবি দ্বিজ বংশীদাস**। রামায়ণ-রচয়িত্রী চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। দ্বিজ বংশীদাস ও তাঁহার কন্যার রচনা হইতে জানা যায়, দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ফুলেশ্বরী নদীর ধারে পাটোয়ারী গ্রামে বাস করিতেন। কবি দল বাঁধিয়া গ্রামে গ্রামে মনসার ভাসান গাহিয়া বেড়াইতেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবিকা। এই ব্রাহ্মণের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠের গান শুনিয়া জালিয়া হাওরের দস্যু-দলপতি কেনারাম হাতের খাঁড়া ফেলিয়া দিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিজ বংশীদাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল লেখকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি ছিলেন বর্ধমান জেলার লোক। কেতকাদাসের কাব্যের মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি ও নানাস্থানের ভৌগোলিক পরিচয় আছে।

বগুড়া জেলার জীবন মৈত্র আর একজন লেখক। মনসামঙ্গল কাহিনীর আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা বঙ্গবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। এই পালাগানগুলির শ্রোতার মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত

মুসলমানের সংখ্যা কম ছিল না। এই কাব্যের মানবীয় ভাব, কাহিনীর চমৎকারিত্ব, চন্দ্রধর ও বেহুলার আদর্শ-নিষ্ঠা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই আকর্ষণ করে।

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডী আর একটি লৌকিক দেবতা। আধুনিক সংস্কৃত পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ থাকিলেও মনে হয় চণ্ডী অনার্য জাতির দেবতা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে দুইটি কাহিনী, তাহা বহুকাল হইতেই মঙ্গলচণ্ডী পূজার ব্রতকথারূপে প্রচলিত আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর মহিমা বর্ণনা করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র উপাখ্যান আছে। একটি কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, অপরটি ধনপতি সদাগরের কাহিনী। কাহিনী দুইটি একেবারে স্বতন্ত্র। সাদৃশ্য এইটুকু যে কালকেতু ও ধনপতি উভয়েই চণ্ডীর কৃপায় দুর্গতির চরম অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া সুখ এবং ঐশ্বর্যলাভে সমর্থ হইয়াছে।

(ক) কালকেতুর কাহিনী :—

ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর শিবের অভিশাপে মর্ত্যে আসিয়া কালকেতু ব্যাধ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। নীলাম্বরের পত্নী ছায়া ফুল্লরা নাম লইয়া ব্যাধের স্ত্রী হইয়া মর্ত্যে আসিল। কালকেতুর সংসারে দুঃসহ দারিদ্র্য। বনের পশু শিকার করা কালকেতুর জীবিকা। ফুল্লরা সেই পশুর মাংস ঘরে ঘরে বিক্রয় করে। কেহ কড়ি দেয়, কেহ খুদ-কুড়া দেয়। অনেক দিন মাংস বিক্রয়ও হয় না। তখন উপবাসে তাহাদের দিন কাটে। কালকেতুর দাপটে বনের পশুরা অস্থির হইয়া চণ্ডীর কাছে গিয়া নালিশ করিল। ইহার পর কালকেতু বনে আর পশু দেখিতে পায় না। একদিন যাত্রাকালে কালকেতু পথে একটি স্বর্ণগোধিকা দেখিতে পাইল। গোধিকা বড়ই অলক্ষণ। কালকেতু ফুল্লরাকে গোধিকাটি পোড়াইয়া রাখিবার জন্য বলিল। ফুল্লরা প্রতিবেশী গৃহ হইতে খুদ ধার করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন দেখিল গোধিকাটি নাই কিন্তু সেখানে এক পরমাসুন্দরী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। রমণী বলিল, কালকেতু তাহাকে এ বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে। ফুল্লরা চক্ষে অন্ধকার দেখিল দারিদ্র্যের দুঃখ সে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু স্বামীর স্নেহে অন্য কেহ ভাগ

বসাইবে, ইহা তাহার অসহ্য হইল। ফুল্লরা ভাল কথায় তাহাকে বিদায় করিতে চাহিল, কিন্তু রমণী নড়িতে চায় না। অগত্যা ফুল্লরা কালকেতুকে ডাকিয়া আনিল। কালকেতু রমণীকে গৃহত্যাগ করিতে বলিল। কিন্তু সে কিছুতেই যাইতে চায় না। তখন বাধ্য হইয়া কালকেতু ধনুকে তীর জুড়িল। রমণী চণ্ডীর মূর্তি ধারণ করিলেন। চণ্ডীর কৃপায় কালকেতুর প্রচুর ঐশ্বর্য হইল। সে বন কাটিয়া নগর বসাইল এবং রাজ্য স্থাপন করিল। এদিকে ভাঁড় দত্ত নামে একটি ধূর্ত লোক কালকেতুর কাছে অপমানিত হইয়া কলিঙ্গ-রাজকে দিয়া কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করাইল। কালকেতু পরাজিত হইয়া বন্দী হইল। বন্দী অবস্থায় কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিলে চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিলেন কালকেতুকে ছাড়িয়া দিতে। কালকেতু মুক্তিলাভ করিয়া নিজ রাজ্যে আবার প্রতিষ্ঠিত হইল।

(খ) ধনপতি সদাগরের কাহিনী :—

ধনপতি সদাগর একজন ধনবান বণিক। ধনপতির স্ত্রী লহনার কোন সন্তান না হওয়ায় ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করিল। কিছুদিন পরে ধনপতি বাণিজ্যের জন্য সিংহল যাত্রা করে। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলের জন্য মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতেছিল। ধনপতি পা দিয়া চণ্ডীর ঘট ফেলিয়া দিল। চণ্ডী রুষ্ট হইলেন—ধনপতির দুর্দশা আরম্ভ হইল। তাহার ছয়খানি নৌকা জলে ডুবিয়া গেল। ধনপতি প্রাণ লইয়া কোনক্রমে সিংহলে উপনীত হইল। চণ্ডী ছলনা করিয়া ধনপতিকে কালীদহের জলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। একটি রমণী পদ্মের উপর বসিয়া একটি হাতী গিলিতেছে, আবার তাহা বাহির করিয়া দিতেছে। ধনপতি এই অদ্ভুত ব্যাপার সিংহলের রাজার নিকট বর্ণনা করিল এবং রাজাকে এই আশ্চর্য ব্যাপারটি দেখাইতে চাহিল। রাজা ধনপতির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কালীদহে আসিলেন, কিন্তু চণ্ডীর ছলনায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রাজা রুষ্ট হইয়া ধনপতিকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। চণ্ডীর কোপে ধনপতির দুর্দশার চরম হইল। এদিকে খুল্লনার একটি ছেলে হইয়াছে। তাহার নাম শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হইয়া পিতার সন্ধানে সিংহলে উপনীত হইল। সিংহলে যাইতে শ্রীমন্তও এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছিল। সিংহলের রাজাকে

আবারও 'কমলে-কামিনী' দেখাইবার জন্ত নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসিল। রাজা এবারও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্তকে বধের আদেশ দিলেন। এদিকে পুত্রের মঙ্গলকামনায় খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিল। দেবী প্রীত হইলেন। দেবীর সৈন্যগণ সিংহল রাজ্য আক্রমণ করিয়া সিংহলরাজকে পরাজিত করিল। ধনপতি ও শ্রীমন্ত মুক্ত হইল। শ্রীমন্ত সিংহলের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পিতার সহিত নিজ দেশে ফিরিল। চণ্ডীর জয়জয়কার হইল। এইভাবেই তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও গান চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই সমধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবনীকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

'ধর্ম কর্ম লোকসভে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।

মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি লেখক। মানিক দত্ত যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় তিনি মালদহ জেলার লোক ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন, কিন্তু দেবীর বরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন তাঁহার কবিত্ব লাভও দেবীর কৃপায়।

দ্বিজ জনার্দন আর একজন বিখ্যাত চণ্ডীর পাঁচালি-রচয়িতা। পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ইঁহার রচিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। **দ্বিজ মাধব** আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক। ইনি সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং ইঁহার চণ্ডীকাব্য 'সারদাচরিত' নামে অভিহিত। মুকুন্দরামের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। দ্বিজ মাধবের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোন চরিত্রকে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করিবার দক্ষতা অসাধারণ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম:

চণ্ডীমঙ্গল—শুধু চণ্ডীমঙ্গল কেন সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী মুকুন্দরাম। বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামে কবির জন্ম হয়। ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত মুকুন্দরাম দামুন্যা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরে আরড়া গ্রামে

আসেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কবি আরড়া গ্রামেই বসবাস করিতে থাকেন। রঘুনাথ রায় যখন রাজা হইলেন তখন মুকুন্দরাম রঘুনাথের সভাসদ হইয়া 'অভয়া-মঙ্গল'কাব্য রচনা করেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" নামে এই গ্রন্থ পরিচয় লাভ করে।

মুকুন্দরামের কাব্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের বহু তথ্য আছে। সমাজের সর্বস্তরের লোকের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের পদ্ধতিটি তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের বাঙালী-জীবনের এমন বাস্তব চিত্র আর কোন কবি আঁকেন নাই। তাঁহার বাস্তব-তার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া সমালোচক তাঁহাকে 'জীবন-রসিক মুকুন্দরাম' এই আখ্যা দিয়াছেন। কবি সে যুগের দুঃখের কথা অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহাকে নিছক দুঃখবাদী কবি বলিবার উপায় নাই। দুঃখকে সে যুগের মানুষ যে কেমন অনায়াসে জীবনে বরণ করিযা লইয়াছিল, এবং সেই দুঃখভরা জীবনের প্রতি কী গভীর মমতাবোধ তাহাদের কাতর করিত, সেই কথাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন অত্যন্ত দরদী ভাষায় ও প্রকাশ ভঙ্গিতে। 'ফুল্লরার বারমাস্যা'য় আমরা ফুল্লরার অজস্র দুঃখের কথা পাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ জীবনেরই প্রতি ফুল্লরার নিবিড় আকর্ষণের সুরটি চাপা থাকে নাই। সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-ব্যর্থতার চিত্র আলোচ্য কাব্যের দেবখণ্ডে বর্ণিত শিব-পার্বতীর কথোপ-কথনের মধ্যে কবি সার্থকভাবে ফুটাইযা তুলিয়াছেন।

শিব বলেন,—

দেশে দেশে ফিরি যত ভিক্ষা করি
ক্ষুধার অন্ন নাহি মিলে,
গৃহিণী দুর্জন ঘর হইল বন
বাস করি তরুমূলে।

গৌরীও চুপ করিয়া থাকে না,—

কি জানি তপের ফলে হর পায়্যাছি বর।
পাট পড়সী নাহি আইসে দেখি দিগম্বর।

শিব-পার্বতীর এই কলহ-চিত্রে দরিদ্র বাঙ্গালীর গৃহচিত্র যেন বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। কবিকঙ্কণের "ফুল্লরার বারমাস্যায়" আমরা আর এক দফা এই দরিদ্র বাঙালী ঘরের নিখুঁত চিত্র পাই। কবির ভাঁড় দত্ত, মুরারি শীল, দুর্বলা দাসী প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত, তেমনই নিপুণ তুলিকাপাতে অঙ্কিত।

ধর্মমঙ্গল

ধর্মঠাকুর নামে এক লৌকিক দেবতা রাঢ়অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত হয়। এই ধর্মঠাকুর আসলে বুদ্ধ না শিব, না যম, না সূর্য, না বিষ্ণু এ সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত। যাহা হউক এই ধর্ম-ঠাকুরের কাছে পূজা দেওয়া, রোগমুক্তির আশায় বা সন্তানলাভের আশায় মানৎ করা রাঢ়অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া যে মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাই ধর্মমঙ্গল নামে খ্যাত। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি এইরূপ :—

কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের অধীন একজন সামন্ত রাজা। ইছাই ঘোষ নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া কর্ণসেনের দুর্গ আক্রমণ করিলেন ও তাঁহাকে দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিলেন। দুর্দান্ত ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় গৌড়েশ্বর প্রচুর সৈন্য লইয়া ইছাই ঘোষকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল। রাণী আত্মহত্যা করিলেন এবং শোকে-দুঃখে কর্ণসেন পাগল হইয়া গেলেন। কর্ণসেনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন। কর্ণসেনকে পুনরায় সংসারী করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী মহামদ গৌড়েশ্বরের শ্যালক। একজন বৃদ্ধের সহিত তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ দেওয়ায় মহামদ ক্রুদ্ধ হইলেন। রঞ্জাবতী ধর্ম-ঠাকুরের পূজা করিয়া তাঁহার কৃপায় এক পুত্র লাভ করিলেন। পুত্রের নাম রাখা হইল লাউসেন।

মহামদ মনের ক্রোধ মনে চাপিয়া ভগ্নী, ভগ্নীপতি ও ভাগিনেয়ের অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। লাউসেন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিয়াছেন। গৌড়েশ্বরের হইয়া তিনি কামরূপ রাজ্য জয় করিতে গেলেন এবং রাজ্য জয়

করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলেন। মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিলেন। লাউসেন পরাক্রম দেখাইয়া কাংড়া নামক এক বীর নারীকে বিবাহ করিলেন। এইবার গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু লাউসেনের বিপদের অন্ত ছিল না। পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইতে হইবে;—লাউসেন এই অসাধ্য সাধন করিবার জন্য ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান হাকন্দে গিয়া কঠোর তপস্যা করিলেন। ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখাইলেন। মহামদ লাউসেনের পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিলেন—লাউসেন তখন হাকন্দে তপস্যারত। মহামদ রাণী কাংড়ার হাতে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মহামদের পাপের ফল ফলিল। তাঁহার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইল। লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে প্রধান দুইটি চরিত্র **লাউসেন** ও **মহামদ**। মনে হয় ইহারা যেন মহাভারতের কৃষ্ণ ও কংসের ছায়া লইয়া গঠিত।

ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। পরবর্তী কবি "ময়ূরভট্ট বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি" এই বলিয়া আদি কবির বন্দনা করিয়াছেন। বিশেষ প্রমাণ কিছু না পাওয়া গেলেও পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। কবি ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনেক উত্তেজনামূলক ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে কিছু কিছু সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদান আছে।

আদি কবি ময়ূরভট্ট হইলেও ধর্মমঙ্গলের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হইলেন **রূপরাম চক্রবর্তী**। বর্ধমান জেলার কায়তি শ্রীপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। যোগেশচন্দ্র রায়ের হিসাবে ১৭২৬ সাল, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৭১৯ সাল, আবার দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমানে পঞ্চদশ শতাব্দী এই রূপরামের আবির্ভাবের কাল। কবির আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায় ধর্মঠাকুর পথিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া "বারদিনের গীত" গাহিবার নির্দেশ

দেন। তদনুযায়ী কবি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গোপভূমের রাজা গণেশের পৃষ্ঠপোষকতায় গানের দল বাঁধিয়া ধর্মঠাকুরের গান গাহিয়া বেড়ান,—"সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে।" পরবর্তী কবি মাণিক গাঙ্গুলী এই রূপরামকে আদর্শ করিয়াই তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি। ইঁহার রচিত কাব্যখানি আকারে বিশাল; কাব্যের ভাষা সংস্কৃতবহুল হইলেও স্থানে স্থানে কবিত্বপূর্ণ। বর্ধমান জেলায় ইনি বাস করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইঁহার গ্রন্থ রচিত হয়। ঘনরামের কাব্যের বর্ণনাগুলি সজীব এবং চরিত্রগুলি জীবন্ত। স্ত্রীচরিত্র রচনায় ঘনরামের কৃতিত্ব অসাধারণ। ভাষাও ভাবের উপযুক্ত বাহন হইয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যেমন মুকুন্দরাম, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তেমনি ঘনরামই শ্রেষ্ঠ কবির সম্মানে ভূষিত। এই কাব্যের ঐশ্বর্যের প্রকাশ তাঁহারই হাতে ঘটিয়াছে। তিনি যেমন ছিলেন স্বভাব-কবি, তেমনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত পরবর্তী যুগের খ্যাতিমান কবি ভারতচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের বহু কবি-কৃতির পূর্বাভাস মিলে এই ঘনরামের রচনায়। অনুপ্রাসের প্রযোগ-নৈপুণ্য তাঁহার রচনাকে শ্রুতিমধুর করিয়াছে। যেমন,—

"করপুটে এ সঙ্কটে, কাতর কিঙ্কর রটে
উর ঘটে পূর অভিলাষ।"

অথবা, "গদগদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।"

যে প্রবচন-রচনার জন্য ভারতচন্দ্র বিখ্যাত, সে বিষয়ে ঘনরামই পথ-প্রদর্শক। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলিতে এই জাতীয় রচনায় কবির নিপুণতার পরিচয় মিলিবে।

(ক) "রোগ-ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় র'য়ে।"
(খ) "বিবাহ-বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়।"
(গ) "কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।"
(ঘ) "মিছা বাণী সেঁচা পানী কতক্ষণ রয়।"
(ঙ) "কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।"
(চ) "কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে।"

চরিত্রসৃষ্টিতেও ঘনরামের নৈপুণ্য অসাধারণ। পুরুষ অপেক্ষা নারী-চরিত্র তাঁহার হাতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে করুণ রসের সহিত বীরত্বের চমৎকার সমন্বয় দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্রশোক ভুলিতেছে। প্রাচীন বাংলার এইরূপ নারী-চরিত্রের আলেখ্য নির্মাণ করিয়া ঘনরাম সে যুগের সমাজকে কাব্যে এক মহিমান্বিত স্থান দিয়াছেন। সরল অথচ মর্মস্পর্শী ভাষায় সমাজের সেই পরিচয়টি পাওয়া যাইবে নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে :—

"এলা'ল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মু'খানি মুছায়ে দাসী দুর্ম্মুখা পেতায়॥
কেঁদনা সুন্দরি শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥"

সমস্ত মঙ্গলকাব্যই লৌকিক কাহিনী লইয়া গঠিত, কিন্তু ধর্মমঙ্গল কোনও সময়েই রাঢ় দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র বাংলাদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। মনসা বা চণ্ডী সমগ্র বাঙলাদেশের দেবতা, কিন্তু ধর্মঠাকুরের মহিমা ও মাহাত্ম্য কেবল রাঢ়অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। সেইজন্য মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে পরিমাণ প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা ছিল, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি স্বাভাবিক কারণেই তাহা লাভ করিতে পারে নাই।

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের এই দুইখানি অমর মহাকাব্যে ভারতের সংস্কৃতি, তাহার ধর্ম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অপরূপ প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই দুইখানি মহাকাব্যের মধ্য দিয়া ভারতীয় জীবনের একটি সর্বাঙ্গীণ পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কাব্য দুইখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে ইহাদের রসগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ইহাদের বাঙলা অনুবাদ প্রাচ্যের দুই প্রাচীন মহাকাব্যের কাহিনীকে সাধারণের মধ্যে

প্রচারিত করিয়া বাঙালীর আনন্দবর্ধন করিয়াছে, তাহার ধর্মবোধকে জাগ্রত করিয়াছে।

রামায়ণ ঃ

বাঙলা রামায়ণের আদি লেখক **কৃত্তিবাস**। কৃত্তিবাস ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিন গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

তাঁহার পিতা বনমালী ওঝা, মাতা মালিনী। এগার বছর বয়স পার হইলে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য কৃত্তিবাস গুরুগৃহে গেলেন। গুরুর নিকট নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিবার সময় কৃত্তিবাস স্থির করিলেন গৌড়েশ্বরের সহিত দেখা করিয়া যাইবেন। সাতটি শ্লোক লিখিয়া তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইলেন। গৌড়েশ্বর খুসী হইয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাসকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। সুসজ্জিত রাজসভায় বহু পাত্রমিত্র লইয়া রাজা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। কৃত্তিবাস অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সরস্বতীর কৃপায় কৃত্তিবাসের মুখে নানা ছন্দের শ্লোক নির্গত হইতে লাগিল। রাজা নিজের কণ্ঠের পুষ্পমাল্য দিয়া কবিকে সম্বর্ধনা করিলেন। তারপর রাজার অনুরোধে কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিলেন।

কৃত্তিবাস-বর্ণিত এই গৌড়েশ্বর হইলেন রাজা গণেশ। কৃত্তিবাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের কবি। তিনিই বাঙলা রামায়ণের আদি লেখক। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল যে, বাঙলা-দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃত্তিবাসের রামায়ণের বহু হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং একখানি পুঁথির সহিত আর একখানি পুঁথির এতখানি প্রভেদ দেখা যায়, এত পাঠভেদ আছে যে, কোন্ ছত্রটি আসল কৃত্তিবাসের রচনা সে সম্বন্ধে আজও জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। কৃত্তিবাস ভাগ্যবান লেখক। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন কবি ও লিপিকারগণ পুঁথি নকল করিবার সময় যুগানুযায়ী ভাষার পরিবর্তন করিয়া ও মাঝে মাঝে নূতন বিষয় সংযোজন করিয়া কৃত্তিবাসের রচনাকে আধুনিক করিয়া তুলিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তার মূল কারণ, কৃত্তিবাস বাল্মীকির মহাকাব্যটির আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া বাঙালীর মানসধর্মের অনুকূল করিয়া কাব্য সৃষ্টি ও ঘটনা সংস্থান করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ জনপ্রিয় হওয়ায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক ও গায়কগণ নিজেদের রুচি অনুসারে মাঝে মাঝে নূতন কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন এবং বহুস্থানে অংশবিশেষ পুনর্লিখিত হইয়াছে। মনে হয় কৃত্তিবাসের রচনার সহিত আরও বহু কবির রচনা মিশিয়া একাকার হইয়াছে।

বহু প্রকার প্রক্ষেপ ও মূলের বিকৃতি থাকা সত্ত্বেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙলার সাধারণ নরনারীকে ভারতীয় জীবনদর্শনের সহিত পরিচিত করিয়াছে।

পরবর্তী কালে আরও বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তা অতিক্রম করা দূরের কথা, তাঁহার কাছাকাছিও কেহ যাইতে পারেন নাই। এই রামায়ণ রচয়িতাগণের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর **অদ্ভুতাচার্য** এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মহিলা কবি **চন্দ্রাবতীর** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহাভারত

রামায়ণের কাহিনীটি বাঙালীর যেমন মানসধর্মের অনুকূল, মহাভারতের কাহিনী ঠিক তেমন নহে। রামের পিতৃভক্তি, সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের সৌভ্রাত্র,—এইগুলি বাঙালীর চিত্তকে যে পরিমাণে আকর্ষণ করে, মহাভারতের ক্ষাত্রবীর্যের আস্ফালন সাধারণ মানুষকে ততখানি আকর্ষণ করে না। এইজন্য মহাভারতের অনুবাদ রামায়ণের মত এতখানি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

মহাভারতের অনুবাদ-গায়কগণের মধ্যে **সঞ্জয়** সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সঞ্জয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। ষোড়শ শতাব্দীতে **কবীন্দ্র পরমেশ্বর** মহাভারতের অনুবাদ করেন। গৌড়ের রাজা হুশেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত হয়। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম ছিল 'পাণ্ডব বিজয়'। এই গ্রন্থে গৌড়ের রাজা ও তাঁহার সেনাপতির

প্রচুর প্রশংসা আছে। এই মহাভারতখানি পূর্ববঙ্গে সমধিক প্রচলিত ছিল। ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় **শ্রীকর নন্দী** বিস্তৃতভাবে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সংক্ষিপ্ত রচনা ছুটি খাঁকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই বলিয়া শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্বের যুদ্ধবিগ্রহগুলি বেশ জমকালো করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজয় পণ্ডিত, নিত্যানন্দ ঘোষ, ঘনশ্যাম প্রভৃতি কবির হাতে মহাভারতের কয়েকখানি অনুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই।

যিনি সর্বশেষে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব কবিগণের সমস্ত রচনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছেন, তিনি বর্ধমান জেলার **কাশীরাম দাস**। কাশীরাম দাসের দেবদ্বিজে ভক্তি, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের অলৌকিক রূপ ও শক্তির বর্ণনা চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম-প্লাবিত বঙ্গদেশকে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছে। কাশীরাম সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। মূল মহাভারতের কাহিনীর সহিত নানা পুরাণ হইতে বহু আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার মহাভারতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার ফলে মহাভারতের রস বাঙালীর নিকট তিনি নূতনভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কাশীরাম দাসের রচনা সমাপ্ত হয়।

আদি সভা বন বিরাটের কত দূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।

কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম খুল্লতাতের আশীর্বাদ ও আদেশ পাইয়া মহাভারত রচনা শেষ করেন।

জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক কালে
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে কাশীরাম দাসের মহাভারতের শেষাংশ কবির নিজের রচনা নয়—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের রচনা। কাশীরামের যেমন পাণ্ডিত্য ছিল তেমনি তাঁহার রচনায় প্রসাদগুণের অভাব ছিল না। নিম্নোক্ত ছত্রনিচয় কাশীরামের কবিত্বশক্তির পরিচয় বহন করে।

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি
পদ্মপত্র-যুগ্ম-নেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখরুচি কত শুচি ধরিয়াছে শোভা।

কাশীরাম দাসের মহাভারত কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই জনপ্রিয়তা আজিও হ্রাস পায় নাই। কাশীরামের মহাভারতের নানা প্রকার সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া এখনও প্রচলিত আছে। বিভিন্ন কবি কাশীরামের রচনার মধ্যে নিজের লিখিত অংশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কয়েকখানি মহাভারতের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনী ঃ—

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অনেকের কাছে ছিলেন প্রেমের ঠাকুর। তাঁহার জীবিতকালেই বহুলোক তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য নিজে বাঙলা ভাষায় একছত্র রচনাও লিখিয়া যান নাই। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যকে তিনি এমনভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, নিজের দিব্যজীবনের প্রভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির এমন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন যে, তাহা বিস্ময়কর। এই ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে তাঁহার লোকোত্তর জীবনের কথা কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল 'বিশ্বম্ভর'। সকলেই তাঁহাকে 'নিমাই' বলিয়া ডাকিত। দেহের বর্ণ অত্যধিক গৌর হওয়ায় তাঁহার আর এক নাম ছিল 'গৌরাঙ্গ' বা 'গোরা'। বুদ্ধি ও মেধা ছিল তাঁহার অসাধারণ। কিন্তু বাল্যকালে তাঁহার চাঞ্চল্যে ও দৌরাত্ম্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ও পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পরে এই দুরন্ত বালকই নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন। জগন্নাথ মিশ্র ইঁহার পিতার নাম। মাতা শচী দেবী। ইঁহার অগ্রজ 'বিশ্বরূপ' অল্পবয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন।

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত নিমাই-এর বিবাহ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই পত্নী বিয়োগ হইলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন

জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পর তিনি পিণ্ডদান করিবার জন্য গয়াধামে গমন করেন। বিষ্ণুপাদপদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবান্তর হইল। নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। ভগবদ্ভক্তির একটা অসাধারণ প্লাবন শ্রীগৌরাঙ্গের দেহমনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এই সময় তিনি ঈশ্বরপুরী নামক এক সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই তিনি এক নূতন মানুষে পরিণত হইলেন।

প্রবল ভক্তির বন্যায় তাঁহার ঔদ্ধত্য, অবিনয় ও পাণ্ডিত্যের গৌরব ভাসিয়া গেল। তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া হরি সংকীর্তনে মত্ত হইলেন। নিত্যানন্দ অবধূত ও যবন হরিদাস তাঁহার সঙ্গী হইলেন। নবদ্বীপের পথে পথে অনুচরগণের সহিত তিনি হরিনাম গাহিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে গৌরাঙ্গ কাটোয়ায় আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য পুরীধামে নীলাচলে গমন করেন। নীলাচল হইতে তিনি পর্যটনে বাহির হন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইলেন। রায় রামানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি ভক্ত-পণ্ডিত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। বহুস্থানে পর্যটনের ফলে বহু দার্শনিক, সাধু, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার আলোচনা ও বিচার হয়। এইভাবে তাঁহার এই প্রেমের ধর্ম ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়ে। নিজের জীবনের মধ্য দিয়া কৃষ্ণদর্শনের ব্যাকুলতা, বেদনা ও আর্তি তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রকৃত রহস্য আরও গভীরে নিহিত। তিনি আসিয়াছিলেন রাধাকৃষ্ণ-লীলারহস্যের একটি জীবন্ত ব্যাখ্যারূপে। রাধা-কৃষ্ণের যে যুগলমূর্তি বৈষ্ণবের ধ্যানের বস্তু, চৈতন্যদেব সেই যুগলেরই জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি একাধারে রাধা ও কৃষ্ণের যুগ্ম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাই তাঁহার মধ্যে ভক্ত পারিষদগণ কখনও রাধাভাব কখনও বা কৃষ্ণভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইতেন। এমনও বলা যাইতে

পারে, তিনি প্রথম জীবনে প্রধানত কৃষ্ণের ভূমিকায় প্রেমধর্মের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করেন, ও জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে স্বয়ং রাধাভাবে ভাবিত হইয়া প্রেমের পথে ভগবানকে পাওয়ার সাধনা করিয়াছেন। এইভাবে সেই ভাগবতের রাধাকৃষ্ণলীলা-রহস্য চৈতন্যের জীবনে প্রাঞ্জল হইয়া দেখা দিয়াছে। যাহারা বুদ্ধি দিয়া এই ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহারাও শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ ও শ্রদ্ধাবনত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ আঠারো বৎসর তিনি পুরীধামেই অতিবাহিত করেন। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্যের দেহাবসান হয়। কিভাবে তাঁহার তিরোভাব ঘটে এ কথা তাঁহার সমসাময়িক ভক্ত কবিগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীচৈতন্য-জীবনী সাহিত্য :—

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম চৈতন্য-পরবর্তী বাঙলা কাব্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের যে অনুবাদ হইয়াছিল এবং যে মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার উপর শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

জীবনী-কাব্য ও পদাবলী-সাহিত্য চৈতন্য-জীবনের প্রভাবের ফল। জীবনী-কাব্য রচনা করিবার রীতি আমাদের দেশে পূর্বে ছিল না। দেবদেবীর লীলা ও মাহাত্ম্য কীর্তন ছিল পূর্ববর্তী কাব্যগুলির প্রধান উপজীব্য। এবার মানুষকে লইয়া, মানুষের চরিত্র ও কীর্তি অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ হইল।

চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্র ও দিব্যলীলার এমনই শক্তিশালী প্রভাব ঘটে সমগ্র জাতি-মানসের উপর যে তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য-জীবন ও চৈতন্য-চরিত লইয়া কাব্য রচনা আরম্ভ হয়। প্রথমে দেখা দেয় কয়েকখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত জীবনী-গ্রন্থ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য **মুরারি গুপ্তের** 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' এবং **কবি কর্ণপুরের** মহাকাব্য 'চৈতন্য-চরিতামৃত' ও নাটক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ সম্ভবত চৈতন্যের জীবিতকালেই রচিত হয়, আর কবি কর্ণপুর তাঁহার গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন

চৈতন্যের তিরোধানের বছর দশেকের মধ্যে। এই দুইখানি জীবনী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে খাঁটি জীবনী-গ্রন্থে যে তথ্য-প্রাধান্য বা ঐতিহাসিকতার প্রত্যাশা থাকে, এগুলিতে সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে পাওয়া যায় চৈতন্য-চরিতের অলোকিকতার ভক্ত-সুলভ আরতি। চৈতন্যকে এখানে মানুষ অপেক্ষা অবতার-রূপেই দেখা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি চৈতন্য-জীবনী রচনার পথপ্রদর্শক হিসাবে এই সংস্কৃত-গ্রন্থ-ত্রয়ের মর্যাদা অশেষ।

বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম চৈতন্য-জীবনী-গ্রন্থের নাম **চৈতন্যভাগবত,** রচয়িতা স্বনামধন্য **বৃন্দাবন দাস**।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের নিত্যসঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিকট হইতে এই কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের ১৫ বৎসরের মধ্যেই চৈতন্য-ভাগবত রচিত হয়। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে সেই প্রসঙ্গে কবি তখনকার বাঙালী সমাজ সম্পর্কে, বিশেষতঃ নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে এই গ্রন্থে যে সুন্দর তথ্যবহুল বর্ণনা দিয়াছেন সরল ও প্রাঞ্জল পয়ার ছন্দে তাহা যেমন সুখপাঠ্য তেমনি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আমরা দেখি,—

> 'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে,
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।'

অর্থাৎ বুঝিতে হয় চৈতন্যপূর্ব সমাজে মনসাপূজা, মঙ্গলচণ্ডীপূজা প্রভৃতির বেশ প্রচলন ছিল। ইহা বৈষ্ণবপদাবলীযুগের পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের যুগপ্রভাব সূচিত করে। আবার কোথাও পাওয়া যায়, "যক্ষ পূজা করে কেহ নানা উপচারে।" ইহাতে বুঝা যায় লোকায়ত সমাজে তখন রীতিমত অনার্য প্রভাব প্রবলবৎ ছিল। শুধু মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক দেবতা নহে, অপদেবতারও আধিপত্য ছিল লোকমানসে। বৈষ্ণব-সমাজে বৃন্দাবন দাস ও তাঁহার চৈতন্যভাগবতের সমাদরের সীমা নাই। কবিকে চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর **চৈতন্যমঙ্গল** নামে দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিতে হয়, এক লোচনদাসের, আর এক জয়ানন্দের। বৈষ্ণবসমাজে বিশেষতঃ নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজে **লোচনদাসের** চৈতন্যমঙ্গলই বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যসম্পদের ও প্রামাণ্যতার অভাবে তেমন জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃত—চৈতন্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগণের পরম সমাদরের সামগ্রী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধবয়সে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন এবং একাগ্র নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল লিখিয়া এই গ্রন্থ শেষ করেন। চৈতন্য-চরিতের পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষতঃ মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতির সময়ে যে দিব্যভাব স্ফুরিত হইয়াছিল তাহার পূর্ণ পরিচয় ও ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে না পাইয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ কবিরাজ গোস্বামীকে গ্রন্থরচনার জন্য অনুরোধ করেন। কবিরাজ গোস্বামীর অগাধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল গভীর ভক্তি। শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ঝামটপুর। কবি শেষ বয়সে বৃন্দাবনে বাস করিতেন। বৃন্দাবনের রূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণ বিশেষভাবে এই গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্মের তথ্য·শ্রীচৈতন্যজীবনের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে আদেশ করেন। কৃষ্ণদাস বিস্ময়করভাবে এই কর্তব্য পালন করিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থটি গৌড়ে প্রেরিত হইবার সময় পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীরের নিযুক্ত চরেরা উহা অপহরণ করে। শুনা যায়, এই দুঃসংবাদই অতিবৃদ্ধ কবির মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। পরে অবশ্য গ্রন্থখানির উদ্ধার করা হয়।

চৈতন্য-চরিতামৃতের সাহিত্যিক ও দার্শনিক মূল্য তো উচ্চাঙ্গের বটেই কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চাঙ্গের এখানকার চৈতন্যচরিতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাগবতীয় রাধাকৃষ্ণলীলা-রহস্যের সমাধান-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ টীকাভাষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল :—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

[illegible] স্থানে কামের প্রকাশও যাহা ঘটিয়াছে তাহার মাধুর্য ও রমণীয়ত্ব প্রেমিকহৃদয়ের পবিত্র উত্তাপযোগে উপভোগ্য হইয়াছে। যেমন,—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥

'**গোবিন্দদাসের কড়চা**' নামে আর একখানি গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা চৈতন্যের ভৃত্য ও ভ্রমণসঙ্গী গোবিন্দ কর্মকারের লিখিত বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের একটি বাস্তব ও উচ্ছ্বাসবর্জিত বর্ণনা আছে। কিন্তু অনেকে এই বইখানিকে জাল বলিয়া মনে করেন।

গীতি-সাহিত্য

বৈষ্ণব পদাবলী

নদীমাতৃক এই বঙ্গদেশে মাটি ও বাতাসে এমন একটা কোমলতা ও সরসতা আছে যে, গান এইখানে হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠে। চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত গীতি-সাহিত্যের এই ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। **জয়দেব** গীতগোবিন্দ রচনা করেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলিতে বহুসংখ্যক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ-রচনা করেন,—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। **বিদ্যাপতি** ছিলেন শৈব। সুতরাং তাঁহার রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রধানত নরনারীর মিলন-বিরহেরই লীলা। চৈতন্যদেব-আরোপিত আধ্যাত্মিক ভক্তিভাব বিদ্যাপতির গানে প্রশস্তভাবে না দেখা দিলেও বিদ্যাপতি যে কবিত্ব ও মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা কেবল মিথিলা নয়, বাঙলাদেশকেও মাতাইয়া তুলে। বিদ্যাপতিকে মিথিলার লোক বলিয়া বাঙালী দূরে সরাইয়া রাখে নাই। তাহা ছাড়া রাধাকৃষ্ণের বিলাস-বর্ণন-অংশে মানবী ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও

বিদ্যাপতির বিরহ ও প্রার্থনার পদে ভক্তহৃদয়ের আর্তি ও আত্মনিবেদন অপরূপ কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যথা

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥

আবার প্রার্থনার পদে আসিয়া আমরা যেন মনেই করিতে পারি না যে এই কবি রূপোল্লাসের পদে চিত্তচমক জাগাইয়া রূপজ সৌন্দর্যের কবিহিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন।

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণি-সমাজে।
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

ইত্যাদি পদে আমরা কবি-বিদ্যাপতি ও ভক্ত-বিদ্যাপতির এক অপরূপ সমন্বয়ের মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হই।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কথা বাদ দিয়া বাংলার গীতি-সাহিত্য, বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্য আলোচনা করা অসম্ভব।

বিদ্যাপতির সঙ্গীতে ভাবের সৌন্দর্য আছে, অতুলনীয় শব্দালঙ্কার ও উপমার ঐশ্বর্য আছে। মিথিলার সভাকবি বিদগ্ধ পণ্ডিত বিদ্যাপতি শ্রুতিমধুর প্রাণস্পর্শী ও ভাবোচ্ছ্বাসময় পদাবলী রচনা করিয়া পাঠক ও শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর মাধ্যমেই বাংলা গীতি-সাহিত্যে

'ব্রজবুলি' ভাষার আমদানী হয় যাহার কোমলতায় ও মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন।

চণ্ডীদাস বাংলার অবিস্মরণীয় কবি। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির স্থান এক, আর খাঁটি বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের স্থান আর এক। কবি ও ভক্তের এমন অপূর্ব সম্মিলন বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য লক্ষিত হয় উভযের বর্ণিত রাধিকার মধ্যে। বিদ্যাপতির রাধিকা নবীনা কিশোরী তাই নবোদ্গত প্রেমবিলাসের মধ্যে অথবা তাঁহার অভিসারের মধ্যে পাওয়া যায় কবির শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয়। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম হইতেই প্রেম-প্রৌঢ়া, তাই পূর্বরাগেই তাঁহার যোগিনীরূপ :—

বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

চণ্ডীদাসের রাধার বিলাস-কলা নাই, প্রসাধন-পারিপাট্য নাই—কৃষ্ণপ্রেমে তিনি যেন সব বিলাইয়া দিযাছেন—মনে হয় রাধার আকুলতার সবখানিই যেন স্বর্গীয়। এই রাধিকার মাধ্যমে উজাড় হইযা বাহির হইয়াছে ভক্তকবি চণ্ডীদাসের অন্তরের গভীর আকুলতা ; তাই তাঁহার পদগুলি সম্বন্ধেও বলা যায—'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।' বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের পার্থক্য, বিদ্যাপতি কলা-বিলাসী, চণ্ডীদাস ভাব-বিলাসী। চণ্ডীদাস সহজ ভাব সহজ সুরের কবি। তিনি প্রাণ খুলিযা প্রাণ ঢালিয়া গাহিয়াছেন,

বঁধু, কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।

এই সহজ সুরের প্রবাহ বহাইয়া দেওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যের লিরিক শাখায় চণ্ডীদাসের নাম শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য। বহু পরবর্তী যুগে যে রোমান্টিক লিরিকের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে বিহারীলালের হাতে, প্রেম-

ভক্তিসূত্রে সেই লিরিক বুঝি প্রথম ঝঙ্কৃত হয় চণ্ডীদাসের কাব্যে। আক্ষেপানু-রাগের পদে কবি যখন গাহেন,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

তখন কবিত্বের হাত ধরিয়া ভক্ত-হৃদয়ের আক্ষেপ বাঁধভাঙা স্রোতোধারার ন্যায় বাহির হইয়া আসে। হৃদয়ের এই গভীর অথচ সহজ প্রকাশই চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য।

গৌরচন্দ্রিকা ঃ

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত মহাপ্রভুর পূর্বেও ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদ, বিদ্যাপতির পদাবলী, নরহরি সরকারের পদে তাহা পাই। কিন্তু পদাবলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মহাপ্রভু। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই আপন জীবনে দেখাইয়াছেন শ্রীরাধিকার দেবদুর্লভ প্রেম কবিকল্পনামাত্র নয়—ইহা এই জগতেরই সত্য বস্তু। সেইজন্যই পদাবলীতে **গৌরচন্দ্রিকার** আবির্ভাব। গৌরচন্দ্রিকা আসলে গৌরাঙ্গের রূপ ও ভাব-বিলাস অবলম্বনে রচিত পদাবলী ;—কখনও তিনি কৃষ্ণভাবে বিভাবিত, কখনও রাধাভাবে ভাবিত হইয়া রাধা-কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি বাস্তবভাব বর্জিত নয় বলিয়াই এইগুলির মধ্যে আমরা অনেক বাস্তব ঘটনার সন্ধান পাই। এই পদগুলির সাহায্যেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম-রহস্যের সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা—কি বৈষ্ণবসাহিত্য-রসিক, কি কীর্তন-রসিক সমাজে—এত সমাদরের বস্তু হইয়াছে।

গোবিন্দ দাস, বাসুদেব ঘোষ, রাধামোহন দাস, নরহরি, প্রেমদাস, শশিশেখর প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবকবিই গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী রচনা হইয়াছে। গৌরাঙ্গলীলা যে কৃষ্ণরূপেরই অভিনব রূপ তাহা এই সমস্ত পদে দেখানো হইয়াছে। গৌরচন্দ্রিকা পদ না গাহিয়া বৈষ্ণব লীলাকীর্তন করেন না। চৈতন্যের বন্দনা না করিয়া সাধারণতঃ কৃষ্ণলীলার কথা পরিবেশন করা হয় না।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-রচয়িতাদের মধ্যে যে দুইজন সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত তাঁহারা হইলেন **গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস**। মোটামুটি বিচারে এই কথাই বলা হয়, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস ছিলেন যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিশিষ্য। বিদ্যাপতির কবিচাতুর্যের অনুশীলনে গোবিন্দদাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন শাক্ত-বংশীয়। শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া কবি-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে একই সাধনা করিয়া চলেন। গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, ইঁহার পদাবলীতে উচ্চাঙ্গের কাব্যকলার সহিত সাধনসুলভ বিচিত্র ভাব ও তত্ত্বরাজির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। এইজন্য ইঁহার সম্বন্ধে বলা হইযাছে, "গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি"। গোবিন্দদাসের গৌরাঙ্গ বর্ণনা—

নীরদ নয়নে নীরঘন-সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।

ইত্যাদি, অথবা বর্ষাভিসারের বর্ণনা—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট,—

ইত্যাদি বাংলা গীতি-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

চণ্ডীদাসের উত্তরসাধক জ্ঞানদাসও পদকর্তা হিসাবে গোবিন্দের তুল্যানুতুল্য। ভাবের আকুলতায়, অনবদ্য প্রকাশ-ভঙ্গীতে ও সহজ অথচ ভাবগম্ভীর পদরচনায় জ্ঞানদাস বৈষ্ণবকবি-সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য। জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগ—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁন্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ রচনার সমকক্ষ। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস ছাড়া গৌরাঙ্গ-পরবর্তী যুগে আরও বহু কবি পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। ইঁহাদের মধ্যে বলরামদাস, লোচনদাস, নরোত্তমদাস, রায়শেখর, বাসুদেব ঘোষ, রাধামোহনদাস, নরহরি, প্রেমদাস, শশিশেখর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শাক্ত-পদাবলী ঃ

রাধাকৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা অবলম্বন করিয়া যেমন বৈষ্ণব গীতিকবিতা হইয়াছে, তেমনি জগজ্জননী মহামায়াকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া শাক্ত ভক্তগণ এক শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সেগুলিকে 'শাক্ত-পদাবলী' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়। আদ্যা শক্তি মহামায়া বিচিত্র। তিনি কখনও করালবদনা সংহারমূর্তিধারিণী কালী, কখনও অসুরদলনী দুর্গা, কখনও ভক্তকে বরাভয়দাত্রী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী জগদ্ধাত্রীরূপে দেখা দিয়া থাকেন। শাক্ত-ভক্তগণ এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী পরমাশক্তিকে মাতৃমূর্তিতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণের আশা ও আনন্দ, দুঃখ ও বেদনা, অনুযোগ ও অভিযোগ ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং শাক্তপদাবলী বলিতে বুঝিতে হইবে 'শক্তি' বা শক্তিদেবতাবিষয়ক পদ বা গীত-সমূহ। বৈষ্ণবপদাবলীর মত এইগুলিও বিশিষ্ট গীতিকবিতা বা লিরিকধর্মী কাব্য। 'শাক্ত' বলিতে আমরা সেই শ্রেণীর ভক্ত ও উপাসককে বুঝি যাঁহারা মূলত জগতের আদিভূতা শক্তির উপাসনা করেন, যদিও তাঁহাদের ধ্যানকল্পনায় দেবতার বিচিত্ররূপের মধ্যে কালী-মূর্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ, এই মূর্তিতে যে ভীষণ ও মধুরের সমন্বয় আছে, তাহার সহিত শক্তিসাধক বাস্তব জীবনের মিল খুঁজিয়া পাইয়াছেন। শাক্ত পদাবলীর যুগ বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শান্তিময় ছিল না। তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে দেশময় অরাজকতা, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। তাই সেই অত্যাচার ও দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতিকূলতা জয় করিবার জন্য চিন্তাশীল সাধকের মন স্বভাবতই বৈষ্ণব প্রেমের পথ ছাড়িয়া শক্তির পথ খুঁজিতে থাকে। বাউলের মত শাক্ত সাধকেরা দুঃখের কাছে নিজেকে সঁপিয়াও দেন নাই, নির্বাণও চাহেন নাই; তাঁহারা শক্তি-মাতার উপাসনায় ঐ দুঃখকে বরণ করিয়া জয় করিবার শক্তি চাহিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনসঙ্গীতে তাই ফুটিয়াছে যেমন গভীর আত্মনিবেদনের সুর তেমনই মাতৃপাদপদ্মে শরণ লইলে আর কোনো শোক-দুঃখের ভয় থাকে না—এই গভীর আশ্বাসের ও ভরসার সুর।

শাক্তপদাবলীতে যে সাধনার কথা কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে, তাহা এক কথায় মাতৃতান্ত্রিক সাধনা। ঈশ্বরকে এখানে মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের

হাতে ভজনা করিবার প্রয়াস ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যেও আছে যুগপ্রভাব। দেবতাকে আপন-জন মনে করিয়া সাধনার রীতি বৈষ্ণবযুগেই প্রবর্তিত হয় বটে, কিন্তু সেখানকার সেই প্রেমের মধুর সম্পর্ক কালক্রমে দুঃখময় সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি হারাইয়া ফেলে, অধিকন্তু প্রেমলীলার অবাধ চর্চায় সমাজ-জীবনে গ্লানিও দেখা দেয় যথেষ্ট। অথচ মানুষকে বাঁচিবার জন্য একটা শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়াইতেই হইবে। তাই একদিকে যেমন নীতি-শাসিত সমাজ গঠিত হইল, অপরদিকে সেই সমাজের মূল বাঁধন যে মাতৃকেন্দ্রিকতা সেইখানেই সাধক খুঁজিয়া লইলেন সাধনোপযোগী প্রিয়ের সন্ধান। মাতাকে দেবতা করিয়া মানুষ সমাজকেও উন্নত সুরে বাঁধিল, দেবতাকেও মাতৃরূপে প্রিয়তম করিয়া পাইবার পথটি প্রশস্ত পথ বলিয়া মনে করিল। মাতার নিকট সন্তান তাহার মনোভাব যত প্রাণ খুলিয়া ব্যক্ত করিতে পারে এমন আর কোথাও পারে না। এখানে আবদার-অভিযোগ মান-অভিমানও চলে, 'সর্বনাশী' বলিয়া গালাগালি দেওয়াও চলে, আবার "আঁচল-ছাড়া করো না" বা "সন্ধ্যা-বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো" বলিয়া আত্মসমর্পণ করাও চলে।

এই সকল কারণেই শাক্তধর্মমত যেমন সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা পায়, শাক্তপন্থী সাধনসঙ্গীতরূপে শাক্তপদাবলীও জনপ্রিয় হইয়া উঠে, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী-বিজয়ার গানগুলি রচিত হইয়াছিল। ভক্তপ্রবর **রামপ্রসাদ সেন** এই ধারার প্রবর্তক। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন একজন কালীসাধক। মাতার প্রতি সন্তানের স্নেহ, অনুরাগ, অভিমান, অভিযোগ ও আত্মসমর্পণের ভাব লইয়া রামপ্রসাদের গানগুলি রচিত হইয়াছে। এই গানগুলির মধ্যে এমন একটা আন্তরিক সহজ সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে, এমন প্রাণখোলা ভঙ্গী ও সুরে এই সঙ্গীতগুলি গাওয়া হয় যে, এইগুলি পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে সকলের হৃদয় সমভাবে মুগ্ধ করে। প্রসাদী সুরের ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া ভক্তহৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে।

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ?

অথবা,

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাহি শঙ্করী হেথা।

ইত্যাদি সাধনসঙ্গীতের মধ্যে রামপ্রসাদের সাধক ও ভক্তরূপটির আসল পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া রামপ্রসাদের সাধন-পদগুলির বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি তাঁহার ভক্তহৃদয়ের বিচিত্র ভাবানুভূতির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন লোকায়ত সমাজের অভ্যস্ত জীবনেরই নানা খুঁটিনাটির উল্লেখের মাধ্যমে। কোথাও পাশা-খেলা,—

"ভবের আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।"

কোথাও ঘুড়ি ওড়ানো,—

"শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
ভব-সংসার-বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি॥"

কোথাও ডিক্রীজারি,—

"মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন অবিচারে আমার 'পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?"

কোথায় চাকুরিয়া বা দিনমজুর রূপে বেগার-খাটা,—

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥

এইরূপ অতি-পরিচিত জীবনের অজস্র টুকরা টুকরা চিত্র-কল্পের সাহায্যে রামপ্রসাদ এমনভাবে সাধন সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন যে সমাজের সাধারণ মানুষ অতি সহজেই তাঁহার প্রাণের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়ার গানগুলিতে বাংলাদেশেরই মাতা ও কন্যার স্নেহমধুর সম্পর্ক অমর হইয়া আছে, এবং কাব্যমূল্যের দিক দিয়া ইহা জগতের শ্রেষ্ঠ লিরিক সমাজে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

শাক্ত পাদবলীর শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই তন্ত্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে; কারণ সঙ্গীতরচয়িতাগণ কেবল কবি ছিলেন না, তাঁহারা

ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই সিদ্ধপুরুষ ও সাধক ছিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন তত্ত্ব শাক্তপদাবলীর ভক্তির একান্ত সুরটিকে, হৃদয়ের একান্ত আন্তরিকতাটুকুকে আবৃত করিতে পারে নাই।

রামপ্রসাদের পর **কমলাকান্ত ভট্টাচার্য** আর একজন স্বনামধন্য সার্থক কবি। ইঁহার আগমনী ও বিজয়া গানগুলি অপূর্ব। কমলাকান্তের মধ্যে আমরা শিল্পী ও সাধকের সমন্বয় দেখিতে পাই। ইঁহার পদগুলির অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ কাব্য। জনপ্রিয় বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত :—সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী" এই কমলাকান্তেরই রচনা। তাহাছাড়া,—

"মজিল মন-ভ্রমরা কালীপদ-নীলকমলে।"

"শুকনো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।"

"জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।"

ইত্যাদি পদগুলি কমলাকান্তের সাধক ও কবি-মানসের বৈশিষ্ট্যের প্রতি মহামূল্য ইঙ্গিত বহন করে।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পরেই **গোবিন্দ চৌধুরীর** নাম উল্লেখযোগ্য। আধ্যাত্মিকতার সহিত তত্ত্বব্যাখ্যার মিলন দেখা যায় ইঁহার পদে। যেমন,

ওঙ্কার মুরতি রে মন জান না কি উহারে ?
ওই ত করেছে এই বিশ্ব-রচনা ;
নৈলে হেন দৃশ্য আঁকিতে বল কে পারে।

* * * *

আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে,
কাল দেখবে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে।
তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো—লুকায় আবার ওঙ্কারে !

এই একটি পদকেই শাক্ত কবিদের দেবতার রূপ-কল্পনা বা রূপ-সাধনার ভাষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রূপ বা উপাসনাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের যে কোনরূপ গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না, শাক্তরা যে উদার সমন্বয়পন্থী ছিলেন, গোবিন্দ চৌধুরীর এই পদটি তাহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে।

এতদ্ব্যতীত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বর্ধমানের মহারাজা মহাতপ চাঁদ, মহারাজা নন্দকুমার, নাটোরের রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেকেই শাক্তপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসু, মীর্জা হোসেন ও এণ্টনি ফিরিঙ্গী, নবাই ময়রা প্রভৃতি আরও অনেকে অজস্র শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত পাঁচালিকার দাশরথি রায়ও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শাক্তপদাবলী'র সংকলক শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় জানাইয়াছেন যে সাড়ে তিন হাজারেরও কিছু বেশী সংখ্যক শাক্ত সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, তবে উক্ত সংকলনে স্থান পাইয়াছে বাছাই করা ২৯৮টি গান। ইহাতেই বুঝা যায়, আমাদের ভাষাভাণ্ডারে এই শাক্তসঙ্গীত সম্পদের পরিমাণ কম নহে।

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলা গদ্যের অনুশীলন

ইওরোপীয় মিশনারী ও বাংলা গদ্য

সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদগুলির জন্ম হইয়াছিল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে, আর বাংলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন পর্তুগীজ পাদরী দোম্ আন্তনিও-লিখিত "ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ" বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল সপ্তদশ শতকের শেষে।

আন্তনিও অবশ্য বাঙ্গালী সন্তানই ছিলেন। বাল্যকালে তিনি দস্যুগণের দ্বারা অপহৃত হন। পরে পর্তুগীজ পাদরিগণ তাঁহাকে কিনিয়া লয়েন। পর্তুগীজ পাদরিগণের সংস্পর্শে থাকিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে ঐ ধর্মপ্রচারই তাঁহার প্রধান জীবনকর্ম হইয়া উঠে। সুতরাং একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, গদ্যসাহিত্যসৃষ্টি তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। সরল গদ্যে খ্রীষ্টধর্মনীতি লিপিবদ্ধ করিলে তাহা সহজে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে

এই বিশ্বাসেই তিনি গদ্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনার নমুনা: "নাজারে, বেলেমতে, স্তানে, কুলে, সিধা জোসেফ ঘরে, নির্মল অকুমারী জিতেন্দ্রিয় মারিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন সম্পূর্ণ দয়াময় ক্রেপাতে, পরমো আত্যাম সমেতে পরমেশ্বর।' 'কতবছর শরীরধারী হইয়াছিলেন প্রথিবীতে? কি কাজ করিলেন? কেন আসিয়াছিলেন? শেষে কোথা গেলেন? তেতিশ বছর প্রথিবীতে ছিলেন। উত্তম ক্রাজা করিয়াছিলেন।"

বাঙলা গদ্যের আদি-উৎস-নির্ণয়ে ইহার পর স্বাভাবিকভাবে যাঁহার নাম করিতে হয় তিনি একজন খাঁটি বিদেশী—নাম, **মানোএল-দা-আস-সুম্পসাম**। ইনিও ছিলেন পর্তুগীজ। ইঁহার রচিত প্রথম পুস্তকখানির নাম **'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'**; বইখানি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন সহর হইতে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। 'কৃপার শাস্ত্র' বলিতে যে খ্রীষ্টধর্মের কথা বলা হইয়াছে ইহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই পুরাতন উদ্দেশ্যই সুপ্রকাশিত—অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার।

ইঁহার রচনার আদর্শ ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ হইতে খুব বেশী ভিন্ন নয়, তবে আসসুম্পসাম ভাওয়ালের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনায় ঐ অঞ্চলের ভাষার বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—স্থানে স্থানে পর্তুগীজ রচনারীতিও প্রযুক্ত হইয়াছে।

পোর্তুগীজগণের পর আসিলেন ইংরাজ ধর্মপ্রচারকের দল। **উইলিয়াম কেরী, জন টমাস, উইলিয়াম ওয়ার্ড, যোশুয়া মার্সম্যান** প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রামরাম বসুর সহায়তায় কেরী ও টমাস **বাইবেলের অনুবাদ** করিয়া প্রকাশ করেন। বাঙলা গদ্যের বিভিন্ন রূপবন্ধের সন্ধানে কেরী হাটে-মাঠে ঘুরিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মুখের কথা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন—ইহাই কেরীর **"কথোপকথন"** নামক পুস্তক সম্বন্ধে আসল বলিবার কথা। কথোপকথনের ভাষা বেশ সহজ, একেবারে কথ্য ভাষার মত। কেরী নিজে বাংলা, সংস্কৃত ও আরও কয়েকটি ভাষা আয়ত্ত করেন। 'কথোপকথন' ছাড়া 'ইতিহাসমালা' নামে আরও একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, ইহারও ভাষা সহজ ও সরল। কিন্তু কেরীর বাইবেলের অনুবাদ আদৌ সুখপাঠ্য নহে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

কিন্তু শুধু ধর্মপ্রচার ছাড়া এই সময়ে বাঙলা গদ্যরচনার পশ্চাতে আরো একটি উদ্দেশ্যে কার্যকরী ছিল—তাহা সিভিলিয়ানদের বাঙলা শিক্ষার জন্য গদ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইলে বাঙলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন উইলিয়াম কেরী এবং বাঙলা ভাষার অন্যান্য অধ্যাপকগণের মধ্যে **রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়** প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে পুস্তক-মুদ্রণেরও প্রয়োজন হইল। চার্লস উইল্কিন্স বাঙলা হরফ প্রবর্তিত করিলেন এবং এই হরফ তৈয়ারি করিলেন শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার। এই শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্র হইতে **হ্যালহেড সাহেবের বাঙলা ব্যাকরণ** ছাপা হইয়াছিল। বাঙলা গদ্যে কিছু কিছু আইনের অনুবাদও এই সময় হইতেছিল। বাইবেলের অনুবাদ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশও এই শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া বাঙলা গদ্যের জন্মলগ্ন হইতেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগের শুরু হইয়া গেল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙলা বিভাগের কর্ণধার ছিলেন উইলিয়াম কেরী এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছিলেন আরো আট জন পণ্ডিত এবং মুন্সী। এই পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের** নাম সমধিক প্রসিদ্ধ—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনিই ছিলেন প্রধান পণ্ডিত। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী', 'বেদান্তচন্দ্রিকা', 'হিতোপদেশ', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'রাজাবলী' একটি ইতিহাস-কাহিনী, এবং ইহাই বাংলাগদ্যে রচিত প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় স্থান পায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলংকার ও স্মৃতি-শাস্ত্রের বাংলায় অনুবাদ। ইহা হইতে ইংরাজগণ ঐ ঐ সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন।

বিদ্যালঙ্কারের পরেই নাম করিতে হয় **রামরাম বসুর**। বাইবেলের অনুবাদ প্রসংগে ইঁহার নাম আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। "প্রতাপাদিত্য চরিত" এবং "লিপিমালা" ইঁহার রচিত গ্রন্থ। তাঁহার রচনায় আরবী ও

ফারসী প্রভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। রামরাম বসু ছিলেন কেরী সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। ইঁনিই কেরীকে বাংলা শিখাইতেন এবং সর্বপ্রকারের দেশীয় গ্রন্থাদি বুঝিতে সাহায্য করিতেন। এই কারণে তাঁহাকে "কেরী সাহেবের মুন্সী" বলা হইয়াছে। রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত" রচনার মূলে ছিল কেরীর উৎসাহ ও প্রেরণা। গ্রন্থখানিতে বহু তথ্যানুসন্ধান ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাঙালীর লেখা গদ্য-গ্রন্থ। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী ও ইতিহাসরূপে এবং গ্রন্থগত গদ্যভাষার প্রথম নমুনারূপে 'প্রতাপাদিত্য চরিত'; একটি বিশিষ্ট স্থান দাবী করে। ইহার ভাষায় প্রচুর ফরাসী শব্দের অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে **রাজীবলোচন শর্মার** নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্।" **চণ্ডীচরণ মুন্সী** সংস্কৃত "শুকসপ্ততি"র ফারসী ও হিন্দী অনুবাদকে আশ্রয় করিয়া 'তোতা ইতিহাস' গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতি ঠাকুরের 'পুরুষ পরীক্ষা'র বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ রায়। ইঁহাদের কাহারো ভাষাই দুর্বোধ্য ছিল না।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাংলায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত পত্রিকার নাম 'বেঙ্গল গেজেট' তবে **'সমাচার দর্পণ'ই** এই যুগের নাম-করা পত্রিকা।

রামমোহন রায়—সংবাদপত্র-প্রকাশনায় ইহার পর রাজা রামমোহন রায়ের যোগদান নিঃসন্দেহে এই নবধারার প্রগতিশীলতায় অধিকতর সাহায্যকারী হইল। মিশনারী-প্রবর্তিত **'সমাচার দর্পণ'** কাগজে প্রকাশিত হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তরদানের জন্যই রামমোহন প্রথম 'ব্রাহ্মণ-মিশনারী সংবাদ' প্রকাশ করেন। ইহা সরল গদ্য ভাষায় লিখিত হইত। রামমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় আর যে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার নাম 'সংবাদ-কৌমুদী'। ইহার ভাষাও পূর্বোক্তের অনুরূপ ছিল। রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা ছিল গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'জ্ঞানাঞ্জন' এবং 'সমাচারচন্দ্রিকা'। ইহার পর প্রকাশিত

হয় 'ভগ্নদূত'। ইহা আসলে ছিল রামমোহন ও ঠাকুরবাড়ীর যৌথ-সহযোগিতায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরল্ড' কাগজেরই বঙ্গ-সংস্করণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন একটি যুগসন্ধিক্ষণের রঙ বদলের হাওয়া লাগিয়াছে। নূতনের আধারে পুরাতনের প্রতিষ্ঠা যদি নবজাগরণের মূল কথা হয় তবে রামমোহনই তাঁহার কর্ম ও মননের দ্বারা তাহাকে প্রথম আত্মস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মন বাঙলা গদ্যসাহিত্য-রচনায় প্রথম প্রয়াসেই তাঁহাকে ভাষার মর্মস্থানে প্রবেশে সহাযতা করিযাছিল। রামমোহনকে যে অনেকে 'বঙ্গভাষার জনক' বলিয়া অভিহিত করেন তাহার মূল কারণ এইখানেই। বাঙলা ভাষার গতিপ্রকৃতি-সম্পর্কে তাঁহাব জ্ঞান যে কতদূর গভীর ছিল তাহার প্রমাণ তাঁহার "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" গ্রন্থ। বিভিন্ন ভাষার অভিজ্ঞতা তাঁহাকে তুলনামূলক বিচারে বাঙলা গদ্যভাষা-সম্পর্কে সুষ্ঠু চিন্তার অধিকারী করিযাছিল। সংস্কৃতকে তিনি গ্রহণ করিযাছিলেন কিন্তু তাঁহার গদ্য সংস্কৃতের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয় নাই। তবে রামমোহনের গদ্যরচনায় ইংরাজী বিন্যাসকৌশল অনেক স্থলে ভাষাকে যে কিছুটা বক্রগতি দান করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রামমোহনের গদ্য-সাহিত্যের সেবার যে ইতিহাস, তাহার মূলে আছে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অসীম দরদ ও একটা প্রবল জাতীয়তাবোধ। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে এই রামমোহনই আমাদের দেশে ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্তনের প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে শিক্ষামন্ত্রী-রূপে লর্ড মেকলে যখন এদেশে প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচ্য শিক্ষার বিস্তারের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন, তখন দেশের রক্ষণশীল সমাজের বিশেষ করিয়া সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের পক্ষ হইতে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়, জনমতও ছিল ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধ। কিন্তু রামমোহন তাঁহার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব লইয়া মেকলের প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে যে জাতীয়তাবোধরূপ দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত আছে তাহা বুঝিযা ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।

কিন্তু যখনই রামমোহন দেখিলেন ইংরাজী আদর্শের বন্যায় দেশীয় ভাব, ভাষা ও আদর্শ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম, তখনই ঐগুলিকে নিমজ্জন-দশা

হইতে উদ্ধার করিবার জন্য একক ভাবে রক্ষামূলক ও গঠনমূলক কার্যে ব্রতী হইলেন। সুকঠিন তাঁহার এই ব্রত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, একমাত্র মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ মানুষ কেহই আর দুর্বল ও পঙ্গু বাঙলা ভাষায় কিছুই শিক্ষা পাইবে না। আর এই চরম অবহেলায় মাতৃভাষার দুর্দশা আরও চরমে উঠিবে। তাই তিনি নিজেই বাংলা গদ্যে উপযুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রামমোহন ছিলেন বহুভাষায় সুপণ্ডিত, ভারতীয় শাস্ত্রাদিতেও তাঁহার অসামান্য দখল ছিল। আর তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মপ্রাণ দেশবাসীর চিত্ত স্পর্শ করিতে হইলে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় আলোচনাই হইবে উপযুক্ত বিষয়। তাই তাঁহার অন্যতম কাজ হইল বাংলা গদ্যে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি সর্বজনমান্য সংস্কৃত গ্রন্থের সারাংশ অনুবাদযোগে সকলের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া। 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার এই লোক-শিক্ষার অসাধ্য-সাধনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া একাধিক সংবাদপত্রের মারফতে তিনি বিধর্মীদের প্রবল ধর্মপ্রচার ও হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রবলতর সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকায় তাঁহার অনেক চিন্তামূলক দুরূহ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু-সমাজের আচার-আচরণের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সমর্থন না থাকিলেও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাই তাঁহাকে এই সমাজরক্ষার কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সমাজকে অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কু-প্রথার হাত হইতে রক্ষা করিয়া উদার দৃষ্টির বলে, জ্ঞানের পথে, কল্যাণের পথে পথ বাহিবার উপযোগী করিবার জন্যই রামমোহন লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পথ-প্রদর্শক সত্তাটির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ভারত-পথিক' আখ্যায় ভূষিত করেন।

রামমোহনের হাতে গদ্যের অনুশীলন সাহিত্য-চর্চাসূত্রে ঘটে নাই, ঘটিয়াছে সমাজসেবা, জাতিসেবা ও দেশসেবার সূত্রে। সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে রচিত 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' নামক গ্রন্থে ও বহুবিধ সাময়িক রচনায় রামমোহন তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ প্রচার করেন। সর্বত্রই রামমোহনের গদ্য-ভাষা যুক্তির ভাষা, সিদ্ধান্তের ভাষা, খাঁটি প্রবন্ধের ভাষা। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, রামমোহনের হাতেই বাংলা প্রবন্ধের প্রথম

পদযাত্রা শুরু হয়। এই ভাষায় মাধুর্যের যথেষ্ট অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু যুক্তিসিদ্ধান্তের দৃঢ়তায় ইহার বাঁধনে কোথাও শৈথিল্য ছিল না, দুরূহ হইলেও বোধগম্যতার অভাব ছিল না। সম্ভবত এই দৃঢ়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন,—"রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—রামমোহনের পরবর্তী কালে বাঙলা গদ্যের অন্যতম প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চারিত্র পূজা' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভা অপেক্ষা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং একথা সত্য যে, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও কর্মজীবন সুবিশালতায় তাঁহার সাহিত্য-জীবনকে যেন ছায়াচ্ছন্ন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বিরাট কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সাহিত্যচর্চা তিনি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিরাট শক্তির একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশমাত্রই নিয়োজিত। কিন্তু তথাপি বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশের আলোচনায় তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী'র অনুবাদ **'বেতাল পঞ্চবিংশতি'** ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। বস্তুত বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রথম সাহিত্যিক বাঙলা গদ্য জন্মলাভ করে। এতকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিল্পীর হাতে হাতে বাংলা গদ্যভাষার প্রতিমা-গড়া চলিতেছিল। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব তাহাকে বিচিত্র রঙে-রেখায় রঞ্জিত করিল—মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী হইল। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে প্রাণসঞ্চার করিলেন। রামমোহন আনিয়াছিলেন স্বচ্ছতা ও সরলতা; বিদ্যাসাগর আনিলেন সৌন্দর্য ও সজ্জা।

তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ও 'জীবনচরিত্র'; এবং ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় **'শকুন্তলা'**। 'শকুন্তলা' ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার সর্বোচ্চ কীর্তি। তাঁহার অপর সুবিখ্যাত গ্রন্থ **'সীতার বনবাসে'**-ও এই প্রতিভার স্বাক্ষর সমভাবে উজ্জ্বল। কিন্তু এইগুলি ছাড়া বিধবাবিবাহ সম্পর্কে স্বনামে ও বেনামে তিনি যে-সকল পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের ভাষার স্বচ্ছতা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা, ক্ষেত্রবিশেষে পরিহাসপটুতা এই বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকেও আমাদিগকে বিস্মিত না করিয়া পারে না।

বাংলা গদ্যের অনুশীলন-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্থান নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের 'বর্ণপরিচয়' দিয়াই শুরু করিতে হয়। 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকজাতীয় পুস্তকগুলির মধ্যে বাংলা গদ্যের যে গঠনের কাজ ও শ্রী-সম্পাদনের কাজ সিদ্ধ হইয়াছে তাহার গুরুত্ব আজ এই পরম সমৃদ্ধির যুগে বসিয়া আমাদের পক্ষে সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এইগুলিতে ভাষার সংগঠক হিসাবে তাঁহার যে মৌলিক প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে তাহা একমাত্র ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের নিকট হইতেই আশা করা যাইতে পারে। ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, অবশ্যই বিদ্যাসাগরের নিকট বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দোগান ধরা পড়িয়া থাকিবে, নচেৎ সেই আদি যুগে "জল পড়ে। পাতা নড়ে। নূতন ঘটী। পুরানো বাটী। শীতল জল।"—এইরূপ ছড়ার মত ছন্দোময় বাগ্‌বিন্যাস সম্ভব হইত না। তিনি যে গদ্যের অনন্ত সম্ভাবনাময় শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' ছাড়াও 'ভ্রান্তিবিলাস' তাঁহার অপর একটি অনুবাদ-গ্রন্থ। এটি শেক্‌স্‌পীয়রের "কমেডি অব এররস্‌" নামক নাটক অবলম্বনে রচিত। 'আখ্যানমঞ্জরী'ও তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এতদ্ভিন্ন আছে তাঁহার আত্মজীবনী ও বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত বিবিধ পুস্তিকা। এই নাতিস্বল্প রচনা-সম্ভারে বিদ্যাসাগর এক জীবনে নিজের কঠিন দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মজীবনের শত-সহস্র বাধাবিঘ্নের মধ্যেও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের যে সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহার মহিমা কোন সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের পরিসরে ব্যক্ত করিবার নহে। এই একটি লোকের হাতে সম্ভব হইয়াছে বাংলা গদ্যের গঠন, পালন ও সুষমা-সম্পাদন। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিতে'র ফার্সী-কণ্টকিত আড়ষ্ট গদ্যের পর রামমোহনের কঠিন যুক্তিভিত্তিক শুষ্ক যৎকিঞ্চিৎ রচনাই যেখানে একমাত্র নমুনা, সেখানে যে কিরূপে 'শকুন্তলা'-'সীতার বনবাসে'র মত এমন সুললিত ছন্দোময় গদ্য-ভাষার আবির্ভাব ঘটিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'অপুর পাঠশালা'য় অপুর বিস্ময় ও মন্ত্র-মুগ্ধতার মধ্যে বিভূতিভূষণ আমাদের সেই বিস্ময়কেই বুঝি প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত আবৃত্তিতে :—

"এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি, এই গিরির শিখরদেশ

আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।”

প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের ‘মাসিক পত্রিকা’ নামক পত্রিকাখানি বিদ্যাসাগরী গদ্যভাষার প্রতিবাদে কথ্যভাষায় রচনা স্বরু করিয়া দিল। এই পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিখ্যাত উপন্যাস **‘আলালের ঘরের দুলাল’** প্রকাশিত হইতে লাগিল—তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্রথম বাঙলা উপন্যাস। ‘আলালী ভাষা’-র নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

> “রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড় ঢিলে দেন, হচ্ছে হবে, খাচ্ছি খাব, বলিয়া অনেক বেলায় আহার করেন। তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন, কেহ বা তাস পেটেন, কেহ বা মাছ ধরেন, কেহ বা তবলায় চাটি দেন, কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন, কেহ বা শয়নে পদ্মলাভ ভাল বুঝেন, কেহ বা বেড়াতে যান, কেহ বহি পড়েন।”

টেকচাঁদী ভাষা প্রধানতঃ কলিকাতা ও শহরতলীর ভাষাকে আদর্শ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে প্রধানতঃ সাধুভাষার আদর্শই স্বীকৃত হইয়াছে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের মিশ্রণও দেখা যায়। যেমন—

> “টকচাচা চৌকির উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়া বলিলেন······।”

অবশ্য পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ক্ষেত্রেও ইহা নিতান্ত অপ্রতুল নয়।

যাহাই হউক, বাঙলা গদ্যভাষার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে টেকচাঁদ ঠাকুর ও তাঁহার ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এর স্থান নগণ্য নহে, আলালী ভাষা নিতান্তই দুলালী ভাষা নহে, অমর গঠনশক্তি লইয়াই ইহার আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় বাংলা সাহিত্যে সুবিদিত ‘হুতোমী ভাষা’ অথবা **‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’** নামক গ্রন্থে ব্যবহৃত **কালীপ্রসন্ন সিংহের** গদ্যভাষা। **‘আলালী’** ও **‘হুতোমী’ উভয়েরই স্বরূপ-প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য** অভিন্ন। আধুনিক কালে যে কথ্যভাষার রাজপ্রতাপ প্রতিষ্ঠা

পাইয়াছে, এবং আলালো-হুতোমী ভাষাই তাহার আদিপুরুষ। বাহ্যত ইহাকে মনে হইবে রামমোহন-বিদ্যাসাগরী সংস্কৃত-ঘেঁষা রচনারীতির প্রতিবাদ, কিন্তু আসলে উহাদের মধ্যে দেখা যায় পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধু ও চলিত ভাষার পারস্পরিক নিগূঢ় সম্পর্কটি ঠিকই ধরিতে পারিয়াছিলেন, এবং বাংলা ভাষার আদর্শ সম্পর্কে এই অভিমতই প্রকাশ করিয়া যান যে তাহাকে রূপায়িত করিতে হইবে এতদুভয়ের শক্তি সমন্বয়ের ভিত্তিতে। একটিতে তত্ত্বালোচনা, সত্যপ্রতিষ্ঠা, গম্ভীর বিশ্লেষণ; অপরটিতে প্রাকৃত জীবনের নক্‌শা, প্রাণখোলা কথা ও হাল্কা হাওয়ায় রস-সম্ভোগ; এই দুইয়ের সমবায়েই সাহিত্য শক্তিমান হইয়া উঠিতে পারে। আজ আমরা বাংলা উপন্যাসে যে উপভোগ্য গদ্যভাষায় পরিতৃপ্ত হইতেছি তাহার জন্য টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর নিকট আমরা অশেষভাবে ঋণী। গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের দাবী রাখে না সত্য, কিন্তু ইহাতেই গ্রন্থকার সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাসের নাড়ীর স্পন্দন জানাইয়াছেন। এখানকার সামাজিক নক্‌শাই পরবর্তীকালের সামাজিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। পরিবেশ-রচনা, চরিত্রের আলেখ্য নির্মাণ ও মানুষের মন-মেজাজের পরিচয়দান ইত্যাদি উপন্যাসের যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহার যে নমুনা এই গ্রন্থে ফুটিয়াছে, প্রথম প্রয়াস হিসাবে তাহার মূল্য অসামান্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙলা সাহিত্যে প্রবন্ধলেখক রূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। জ্ঞানতপস্বী অক্ষয়কুমার একটি যুক্তিনিষ্ঠ বাঙলা গদ্যভঙ্গীর আবিষ্কর্তা—যে সমস্ত বিষয় অপেক্ষাকৃত নীরস সেই সমস্ত বিষয়ে অর্থাৎ বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ইনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙলা প্রবন্ধের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইনি **তত্ত্ববোধিনী** পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; বহু জ্ঞানী ব্যক্তির অতি নিকট সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। এই পত্রিকার মধ্য দিয়া তিনি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রথমযুগে বাঙলা সাহিত্যের এই দিকের অভাব মিটাইয়াছিলেন। যে সময় বিজ্ঞানের আলোচনা কেহই করিত না, তখন অক্ষয়কুমার নিরতিশয় পরিশ্রম-সহকারে বিজ্ঞান বিষয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করিলেন।

বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও চিন্তার স্বচ্ছতা অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। হৃদয়াবেগ, উচ্ছ্বাস বা কল্পনাপ্রবণতার দিকে অক্ষয়কুমারের ঝোঁক ছিল না। নানাপ্রকার ইংরাজী গ্রন্থ অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিয়া তথা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি তিন খণ্ড 'চারুপাঠ' রচনা করিয়াছিলেন। চারুপাঠে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় কত বিভিন্ন দিকে অক্ষয়কুমারের কৌতূহল ধাবিত হইয়াছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা', প্রভৃতি গ্রন্থ অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্য ও মানবিক প্রবণতার সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। বাঙলা গদ্যে, প্রচুর পরিমাণে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা পাইলে অক্ষয়কুমারের বলিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ ষ্টাইল আবার প্রভাব বিস্তার করিবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—মূল্যবান প্রবন্ধরচনার মাধ্যমে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙলা গদ্যসাহিত্যের যে একনিষ্ঠ সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা একটি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। বঙ্কিমের যে ভাষাকে অক্ষয়ী ও আলালী ভাষার মধ্যগা বলা হইয়াছে, সেই বিশুদ্ধ সংযত অথচ সহজ গদ্যশৈলী বঙ্কিমের আগেই চর্চিত হয় ভূদেবচন্দ্রের হাতে। সত্যই ভূদেবী গদ্যের প্রসাদগুণ উপভোগ্য। সাহিত্যসেবায় ভূদেবের কৃতিত্বের অন্যতম কারণ, তাঁহার প্রবন্ধের উপজীব্য বিশেষ ধরণের। বাঙলার সামাজিক, নৈতিক ও পারিবারিক জীবনকে উন্নত করাই ছিল ভূদেব-রচনার লক্ষ্য। তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' প্রভৃতি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূদেব-রচনার প্রধানতম আকর্ষণ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। সনাতন ভারতের সনাতন জীবনাদর্শগুলি সরল অথচ যুক্তিনিষ্ঠ ভাষণ-ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিয়া দেখানোই ছিল ভূদেবের লক্ষ্য। তাঁহার সনাতনী মন গ্রন্থমধ্যে যে সনাতনী আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রভাব পাঠকমাত্রকেই অভিভূত করে। আদর্শভূয়িষ্ঠ নৈতিক জীবনকে অনাচার-বিশৃঙ্খলার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ভূদেব আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে পাশ্চাত্য নীতি-শিথিল জীবনধারার প্রভাবে ও সমসাময়িক ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িতে পারে। তাই তিনি হিন্দু-

ধর্মীয় জীবনধারার নীতি-সুন্দর শান্তমধুর কল্যাণময় আদর্শটি নানাভাবে নানাদিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। গৃহাশ্রমের পবিত্রতা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিচিত্র কর্তব্যময় সৌষ্ঠব ইত্যাদির উপর আলোকপাত করাই ভূদেবের প্রতিটি প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায় আদর্শপূত প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ, যাহার জন্য যুক্তি-তর্কগুলি পাঠকের মনকে প্রবলভাবেই অধিকার করে। এই যে ব্যক্তিত্বময় প্রবন্ধ-রচনা এ বিষযে ভূদেব এখনও অদ্বিতীয়। 'এডুকেশন গেজেট' ও 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' পত্রিকার সম্পাদনা-সূত্রেও ভূদেবচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা গদ্য-রচনার চারিটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী ছিল। একটিকে বলা হইত পণ্ডিতী বাঙলা, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার আদর্শে গঠিত সাধু শব্দ ও দীর্ঘসমাসবহুল ঝঙ্কারময় ভাষা। আর একটিকে বলা হইত মুসলমানী ভাষা। আরবী, ফারসী-জানা মুন্সীগণ ঐ ভাষা হইতে প্রচুর শব্দ লইয়া এই বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তৃতীযটির নাম খৃষ্টানী বাংলা। খৃষ্টান মিশনারীগণ ইংরেজী বাক্যরীতির আদর্শে বাঙলা বাক্য গঠন করিযা একটি অদ্ভুত গদ্যভঙ্গী গড়িয়া তুলিযাছিলেন। চতুর্থ রীতিটি ছিল চলিত রীতি অথবা আলালী ভাষা। কোন্ রীতিটি বাংলায স্থাযী হইবে ইহার জন্য আলালী বাংলা ও পণ্ডিতী বাংলা এই উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। ঠিক এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি স্বকীয প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির বলে বুঝিতে পারিলেন যে কোনো রীতিই অগ্রাহ্য বা বর্জনীয নয। পণ্ডিতী বাঙলার যে শক্তি ও গাম্ভীর্য, বাঙলা ভাষা তাহা উপেক্ষা করিলে দুর্বল হইয়া পড়িবে। আবার চলিত বাঙলার মধ্যে যে একটা গতি, স্বাভাবিকতা ও শ্রী আছে বাঙলা ভাষা তাহাও উপেক্ষা করিতে পারে না। তিনি উভয় রীতির মাঝামাঝি একটি পথ বাছিয়া লইলেন। দীর্ঘসমাস ও প্রচুর সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, আবার প্রয়োজনবোধে চলিত সরল শব্দ এমন কি গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন ভাষার সকলের চেয়ে বড় গুণ সকলের বোধগম্য হওয়া ও সাবলীল ভাবপ্রকাশের সহায়ক হওয়া।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সময়োচিত। গদ্যরীতিতে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহা আরও কত কাল চলিত কে জানে। উভয় দিকেই দুই দল উগ্রপন্থী লেখক ছিলেন। একদল বাঙলাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালিয়া ক্রমশঃ দুর্বোধ্য করিয়া তুলিতেছিলেন। আর একদল কথা ও ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারে বাঙলাকে গ্রাম্যভাবাপন্ন করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই দলাদলিতে যোগ না দিয়া নিজস্ব একটি ভাষাভঙ্গী গঠন করিয়া উভয় দলকে নিরস্ত করিতে সক্ষম হন। প্রথম প্রথম বঙ্কিমের ভাষার অনেকেই অনেক সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়েন।

একটি স্থায়ী রীতি কোন ভাষাতেই একদিনে গড়িয়া ওঠে না। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। অনেক স্তর-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া একটি বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী রূপলাভ করে। বঙ্কিমের রচনার প্রথম দিকে বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রভাব ছিল। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝিতে পারেন যে ভাষাকে সহজ ও সরস করিতে না পারিলে সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করা যাইবে না। তিনি বাংলা গদ্যের জটিলতা দূর করিলেন। উপন্যাসে, বিবিধ প্রবন্ধে এবং রসাত্মক ও শ্লেষ-ব্যঙ্গপ্রধান বহু রচনায় বাঙলা ভাষার তিনি শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার হাতে বাঙলা ভাষা মনের সমস্ত ভাব প্রকাশের উপযুক্ত হইয়া উঠিল। **কমলাকান্তের দপ্তর** প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়াবেগ ও কবিজনোচিত উচ্ছ্বাস বাঙলা গদ্যের একটি অপূর্ব রূপ প্রকাশিত করিয়াছে শুনা যায়, এই 'দপ্তর' কেই বঙ্কিম স্বয়ং তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করিতেন। মনে হয়, ইহার অন্যতম কারণ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষার এইখানেই ঘটিযাছে চরম উৎকর্ষ। প্রবন্ধের ভাষা যে এমন সরস, এমন কাব্যময়, এমন লিরিকধর্মী ও প্রাণস্পর্শী হইতে পারে ইহা এক বঙ্কিম ও তাঁহার সুযোগ্য উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। 'বসন্তের কোকিল' হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয় তখন তোমার মাজা-মাজা কালো-কালো দুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষা

কেহ নও।" প্রকাশের কী সুন্দর সাবলীলতা! শেষের বাক্যটিতে মাত্রাবোধ ও সামঞ্জস্যের সোনার ভিত্তিতে তত্ত্বের কাঠামোটি দাঁড়াইয়া আছে অনুপম ভঙ্গিতে। আবার,—

"কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাসে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়।"

এখানে যেন কয়েকটি ছোট বড় কবিতার চরণ লঘু-নৃত্যে নাচিয়া চলিযাছে, প্রথমে হ্রস্বচরণে দ্রুতলয়ে পরে ঈষদ্দীর্ঘ চরণে ধীর লয়ে। আবৃত্তি করিয়া শুনাইবার মত গদ্যের এই ছন্দ।

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং অন্যান্য নানাবিষয়ক প্রবন্ধে বঙ্কিমের একটি যুক্তিনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যায়। গদ্যরীতির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া সাহিত্যের যে সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় তিনি সাধন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অসাধারণত্ব স্বতঃই প্রমাণিত হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—রামেন্দ্রসুন্দর মূলতঃ ছিলেন বৈজ্ঞানিক। তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের নীরস বিষয়গুলি লইয়া সাধারণতঃ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এমন একটি সরস ও প্রাঞ্জল বাচনভঙ্গী আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন যে যাহাই লিখিতেন তাহাই সুখপাঠ্য হইয়া উঠিত। 'জিজ্ঞাসা', 'চরিতকথা', 'শব্দকথা', 'কর্মকথা', প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি চলিত ভাষায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা' রচনা করেন। তাঁহার চলিত ভাষাও তাঁহার সাধু ভাষার মতই সরস।

বস্তুত রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে আমরা বাংলা গদ্যের যাদুশক্তির লীলা দেখিয়াছি। সাহিত্যিক ও দার্শনিক বিষয়ে গম্ভীর চালে চলিয়াছে তাঁহার রচনা ঠিক বিষয়-গাম্ভীর্য অনুযায়ী। চরিতকথায় জীবনীকে স্মরণীয় করিবার জন্য যে ভাষা ও ভাষণভঙ্গি আবশ্যক ঠিক তাহাই ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্যও যেন লেখকের ভাষারীতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন, সাধারণ বাঙালীর মধ্যে বিদ্যাসাগর কেমন, ইহা বুঝাইবার জন্য লেখক বলিয়াছেন,—"বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড় বলিয়া

আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন। দুই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলপর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।" কিন্তু এইভাবে বলিয়াও লেখকের তৃপ্তি হইল না। মনে হইল সর্বসাধারণের জন্য আরও সহজবোধ্য ও মনোজ্ঞ করিয়া বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা দরকার। তাই আর এক স্থানে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে গুণ-সমাবেশ ও বাঙালীর মধ্যে ঐ সমাবেশ দেখা দেওয়ার বিস্ময়করতা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন,—"বঙ্গদেশে তাহার (গুণাবলীর) আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে ; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।" ভাষার এই গাম্ভীর্যের সহিত প্রাঞ্জলতা ও প্রাণস্পর্শিতা ইহা উচ্চাঙ্গের সৃজনী প্রতিভার পরিচায়ক।

আবার প্রয়োজনমত শ্লেষ-ব্যঙ্গাদি নিক্ষেপেও রামেন্দ্রসুন্দর সিদ্ধহস্ত। 'মহা-কাব্য' নামক প্রবন্ধে একালের সভ্যতার কৃত্রিমতার পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের নিরাবরণ মনুষ্যত্বের কথা বুঝাইবার সময় তিনি লিখিয়াছেন,—"অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয় বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্মের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।" এই ভাষার তেজস্বিতা ও দীপ্তি লেখকেরই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে।

কিন্তু আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই যখন এই রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে

পাই,—"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। ভাইকে খাইয়ে পরে খাবো। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।" (বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা) কী প্রাণের বহরই না ফুটিয়াছে এই রচনায়! এমন দরদ-ঢালা গীতি-ধর্মী গদ্যভাষা সত্যই দুর্লভ।

নাটক ও নাট্যশালা

পাঁচালী, কবিগান, যাত্রা—নাটক রচনার সূত্রপাত

বহু পূর্বকাল হইতে এদেশে **পাঁচালী** গান প্রচলিত ছিল। "শ্রীরাম পাঁচালী", "ভারত পাঁচালী" "শীতলার পাঁচালী" "সত্যনারায়ণের পাঁচালী" ইত্যাদির সহিত আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। "মঙ্গলকাব্য" এই পাঁচালীরই একটি বিশেষ রূপ। যাত্রার আসরের মত সভায় এইগুলি রাতের পর রাত ধরিয়া গীত হইত।

কিন্তু পরবর্তী কালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম-পূর্ব কাল পর্যন্ত পাঁচালীজাতীয় যে সকল লেখা হইতে থাকে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তর ঘটিতেছে। একদিকে যেমন গ্রামবাঙলার সাংস্কৃতিক মৃত্যু আসন্ন হইল, অপর দিকে তেমনি নবগঠিত কলিকাতার নাগরিক পরিবেশে একটি নূতন সংস্কৃতি ধীরে ধীরে জন্মলাভ করিতেছিল। এই কালান্তরের ফসল হইতেছে—**তর্জা, কবিগান, হাফ আখড়াই, খেউড়** ইত্যাদি **পাঁচালী কাব্য**। এই প্রসঙ্গে দাশরথি, হরুঠাকুর, ভোলা ময়রা, এ্যাণ্ট নি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালার নাম বিখ্যাত।

কবিগান বা তর্জার আকর্ষণ ছিল বিচিত্র। এগুলিতে যেমন ফুটিত কবিত্ব, তেমনি থাকিত বুদ্ধির চাকচিক্য, আবার তেমনি বেশ একটু নাটকীয়তা। পালাগানের আকারে মূল গান রচিত হইত। বিষয়বস্তু ছিল দেব-দেবী বিষয়ক। কিন্তু মূল বিষয় অপেক্ষা এখানকার শ্রোতাদের আকর্ষণ থাকিত ইহার আড়ম্বরের দিকে। সেখানে মানুষের কথা, দেশাচারের কথা, সমাজের

দোষত্রুটির কথা, আর সর্বোপরি দুই পক্ষের মূল-গায়কের নানা ব্যক্তিগত কথাই পাঠকের কৌতূহল মিটাইত। এই শ্রেণীর গানের আসর মাত্রই প্রতিযোগিতার আসর হইত। তাই ইহাদের পরিচিত নাম 'কবির লড়াই' বা 'তর্জার লড়াই'। প্রশ্নোত্তরে এই লড়াই চলিত গানের সুরে বাদ্যযোগে, ঈষৎ অঙ্গভঙ্গিযুক্ত একটা নৃত্যের দোলও লাগিয়া থাকিত কি গায়কে, কি বাদকে। আসর বিশেষ উপভোগ্য হইত তখন, যখন কবিওয়ালা বা তর্জা-ওয়ালা আসরে দাঁড়াইয়াই মুখে মুখে গান রচনা করিয়া চলিতেন। এইভাবে এই শ্রেণীর গানের মধ্যে যে একটা লৌকিক কাব্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা হইত তাহার সামাজিক মূল্য বুঝিয়া ধনিসমাজের অনেকেই তখন কবিগান ও তর্জা-গানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

এই সকল কবি-গানের আসর হইতেই আধুনিক **'যাত্রার'** উৎপত্তি। পূর্বে যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল বিশেষ করিয়া কৃষ্ণলীলা এবং প্রকাশের মাধ্যমটি ছিল বিশেষভাবে সঙ্গীতাশ্রয়ী ; পরবর্তী কালে ইহার মধ্যে গদ্য-সংলাপ প্রবিষ্ট করাইয়া যুগোপযোগী করা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে পৌরাণিকতা ও ভক্তিরসাত্মিকতার বদলে মানবরসের প্রকাশ ঘটায় যাত্রার বিষয়বস্তু হিসাবে লৌকিক কাহিনীও গৃহীত হইতে লাগিল। তবে যাত্রাগানের এই ক্রমমার্জিত ধারাটি হইতে যে পরবর্তী কালে **বাঙলা নাটকের** উৎপত্তি হয় নাই একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন। যাত্রাগানের আদর্শটি ছিল সম্পূর্ণরূপে বঙ্গদেশীয়, কিন্তু বাঙলা নাটক ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের মিলিত আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে **রামনারায়ণ তর্করত্নের** "কুলীন-কুলসর্বস্ব" নাটক প্রকাশিত হইলে বাঙলা নাটক-প্রহসনের জগতে একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত হইল। **"কুলীন-কুলসর্বস্ব"** নাটকটি বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক। সমাজ-সংস্কারই ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল। "কুলীন-কুলসর্বস্ব" বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক কিন্তু শিল্প হিসাবে ইহাকে খুব উচ্চ মর্যাদা দেওয়া যায় না।

মধুসূদন দত্ত :

বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক দেখিয়া মধুসূদন নাট্যরচনায় উৎসাহী হন : সকলে যখন রত্নাবলীর প্রশংসায়

মুখর, তখন মধুসূদন ইহার দীনতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন ও নিজে একখানি নাটক রচনা করিয়া বাংলা নাটকের দীনতা ঘুচাইতে মনস্থ করেন। তাঁহার এই সংকল্পের ফলেই পাওয়া যায় পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে রচিত প্রথম বাংলা নাটক **শর্মিষ্ঠা**। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই নাটক সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, "I am of opinion that Sermistha is the best drama we have in our language ;···it is at once classical, chaste, and full of genuine poetry !" 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বিসয়বস্তু মধুসূদন মহাভারত হইতে গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে মধুসূদন নিজে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যেই **'একেই কি বলে সভ্যতা'** এবং **'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'** নামক দুইখানি প্রহসন এবং পর বৎসর **'পদ্মাবতী'** নাটক রচিত হইল। এই নাটকেই কবি সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই একটিমাত্র কারণে 'পদ্মাবতী' চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গ্রীকপুরাণের গল্প অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটক রচিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসাবে মধুসূদনের সার্থক সৃষ্টি কিন্তু **'কৃষ্ণকুমারী'** নাটক। 'কৃষ্ণকুমারী' ঐতিহাসিক নাটক এবং ইহার মূলকাহিনী গৃহীত হইযাছিল সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস' নামক একটি প্রবন্ধ হইতে। শুধু প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে নয়, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি হিসাবেও 'কৃষ্ণকুমারী'র একটি স্থান আছে।

দীনবন্ধু মিত্র ঃ মধুসূদনের পরে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হইলেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক **"নীলদর্পণ"** প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। বাস্তবধর্মিতায় ইহার জুড়ি নাই। সমসাময়িক এক পত্রিকায় এই নাটকের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে লিখিত হয়,—"নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি (লেখক) যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদিয়া ও যশোহর জিলার অনেকস্থান ভ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত

হওয়াতেই তিনি নীলদর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।" 'নীলকর' বলিতে একশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায় বুঝাইত। দেশের বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করিয়া এই নীলকরেরা দেশময় নীলের চাষ চালাইবার জন্য চাষীদের উপর জুলুম করিত। ধানের চাষ ফেলিয়া নীলের চাষ কেহই করিতে চাহিত না। আর সেই কারণে এই সব অর্থলোভী ক্ষমতাগর্বী পাষণ্ডেরা গরীব চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইত। ফলে নীলকুঠির সাহেবের নামেই জাগিত আতঙ্ক।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক এই নীলকুঠির নির্মম অত্যাচারেরই করুণ কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'নীলদর্পণ, বাংলার Uncle Tom's Cabin,"টম্ কাকার কুটির"আমেরিকার কাফ্রীদের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, 'নীলদর্পণ' নীল-দাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।"

এই নাটকে নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে, দেশের গরীব চাষীদের দুঃখময় জীবন লেখকের অকৃত্রিম সহানুভূতিতে এখানে দর্পণের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে-ভাবে তাহাদের মুখের কথা তুলিয়া আনিয়া নাটকের পাত্র-পাত্রীর মুখে বসাইয়াছেন এমন আর কেহ কখনও পারে নাই। সাধারণ মানুষ বা জনগণ বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহাদের খুঁটিনাটি কথা ইহার পূর্বে এমনভাবে আর কোন নাটকে স্থান পায় নাই। তাই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' গণ-নাট্য বা গণ-সাহিত্যের অগ্রদূত রূপে অভিনন্দিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য রীতিতে ট্রাজেডির অপরাপর কলা-কৌশলও কিছু কিছু এই নাটকে প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে নাটকীয় শিল্পগত সূক্ষ্ম-বিচারে ইহাতে যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিযাছে ইহাও অনস্বীকার্য, ভদ্রেতর চরিত্র ফুটিলেও ভদ্র চরিত্রগুলির প্রতি দীনবন্ধু সুবিচার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নীলদর্পণে'র স্থান বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীন-বন্ধুর দ্বিতীয় নাটক **"নবীন তপস্বিনী"**। ইহার ভিত্তি কাল্পনিক, কিন্তু উপকাহিনীতে দীনবন্ধুর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। **'সধবার একাদশী'** দীনবন্ধুর নাট্যগুচ্ছের মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে পারে। উনিশ শতকের অতি-প্রগতিবাদী ইয়ং বেঙ্গলদের উপর কটাক্ষ করিয়া নাটকখানি রচিত, সুতরাং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা

শ্রীমধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" নাটকটির সগোত্র। **"বিয়ে পাগলা বুড়ো"** ও **"জামাই বারিক"** দীনবন্ধুর অপর দুইখানি প্রহসন। ইহাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সমাজ-সংস্কার, কিন্তু দুর্নিবার হাস্যরসের বন্যায় উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা আচ্ছন্ন রহিয়াছে—এইখানেই শিল্পের শিল্পত্ব। তাঁহার অপর দুইটি নাটক হইতেছে—'লীলাবতী' ও 'কমলে কামিনী'।

গিরিশচন্দ্র : নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলার নাট্যজগতে নবযুগের সূচনা করিল। একদিনে নাটকের ইতিহাসে প্রাচীনযুগ কাটিয়া মধ্যযুগ দেখা দিল। গিরিশচন্দ্রের সুবিধা ছিল এই যে, তিনি নিজেও ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। জনরুচি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর এবং মঞ্চের সুবিধা-অসুবিধাগুলি নাট্যরচনাকালে তিনি বিস্মৃত হন নাই। এইজন্য তাঁহার নাটকগুলি মঞ্চকলা ও লোকমনোরঞ্জনের দিক দিয়া অতুলনীয়।

'রাবণ-বধ', 'লক্ষ্মণ-বর্জন,' 'রামের বনবাস', শ্রীবৎস-চিন্তা', 'বৃষকেতু', প্রভৃতি নাটক তাঁহার প্রথম যুগের পৌরাণিক নাট্যরচনার নিদর্শন।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটকগুলি প্রধানতঃ অবতার-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিযাছে দেখিতে পাই। এই পর্যায়ের বিখ্যাত নাটকগুলি হইতেছে—"চৈতন্য লীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস,' 'প্রভাস যজ্ঞ', 'প্রহ্লাদচরিত', 'বিল্বমঙ্গল', 'রূপসনাতন' ইত্যাদি। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের অন্তরে একটি স্বাভাবিক ভক্তিরসের উৎস ছিল। নাট্যরচনার মধ্য দিয়া তিনি জাতিকে ভক্তির শিক্ষাই দিতে চাহিযাছিলেন, আর এই অর্থেই তাঁহাকে জাতীয় মহাকবির মর্যাদা দান করা হয়।

কিন্তু শুধুমাত্র ভক্তিরসাত্মক নাটক নয়, গিরিশচন্দ্র কিছু সামাজিক নাটক এবং প্রহসনও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার **'প্রফুল্ল'**, **'বলিদান'** 'হারানিধি', 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক নাটকগুলির মূল্যও নিতান্ত কম নয়। এই নাটকগুলির প্রায় অধিকাংশই বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করিবার কারণ নাই যে, করুণ রসের অত্যাধিক্যে এইজাতীয় নাটকগুলি ট্রাজেডির শোকশান্ত গম্ভীরতার পরিবর্তে শোকার্ত বিভীষিকারই সৃষ্টি করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'প্রফুল্লই' শ্রেষ্ঠ। ইহাতে নাট্যকার তদানীন্তন উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের ও যৌথ পরিবারের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়।

চারত্রাচত্রণের নৈপুণ্যে ও নাটকীয় রস-সৃষ্টিতে 'প্রফুল্ল' সত্যই বাংলা নাট্যজগতে একখানি প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি বলিয়াই গণ্য। গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া **সিরাজদ্দৌলা'** ও **'মীরকাসেম'**-এর নাম করিতে হয়। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের প্রতিফলনে এই সকল ঐতিহাসিক চরিত্র যেন দেশ-কালের উর্ধ্বে আপন উজ্জ্বল অস্তিত্বকে রক্ষা করিতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : গিরিশচন্দ্রের পরে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হইলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সুপণ্ডিত এবং কবি ছিলেন—স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়নের প্রগাঢ়তাও তাঁহার ছিল, আর ছিল তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রীতি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে এই স্বদেশপ্রেমের যে অভিব্যক্তি ফুটিয়াছে তাহা অনবদ্য ;—**'দুর্গাদাস'**, **'মেবারপতন'**, **'প্রতাপসিংহ'** প্রভৃতি নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলিতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য **'সীতা'**, **'পাষাণী'** প্রভৃতি কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক ও কয়েকটি প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুই তাঁহার রচনায় যেন অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দুইখানি ঐতিহাসিক নাটক হইতেছে **'সাজাহান'** ও **'চন্দ্রগুপ্ত'**। গিরিশচন্দ্র যেমন 'গৈরিশ ছন্দ' সৃষ্টি করিয়াছিলেন তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার নাটকের বাহন হিসাবে এক আশ্চর্য কবিত্বপূর্ণ ভাবগম্ভীর গদ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া স্বদেশী-বিদেশী সঙ্গীতশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলিতে অপূর্ব সুরযোজনা করিয়াছেন। তাঁহার দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগুলি আজিও সকলের প্রিয়। কিন্তু ভাবাতিশয্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসৃষ্টি সর্বক্ষেত্রে তাহার নাটকীয় নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়

উপন্যাস ও ছোটগল্প

উপন্যাস ঃ উপন্যাসের আদি কথার আলোচনায় আমাদের সেই রূপকথা-উপকথার যুগে চলিয়া যাইতে হয়। মানুষ চিরকালই গল্প শুনিতে ভালবাসে। এই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা সে মিটাইয়াছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রীতিতে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও চাহিদার ঘটিয়াছে অনিবার্য বিবর্তন। তাই আজ আর সেই আদিযুগের উপকথার সঙ্গে এ যুগের উপন্যাসের কোন মিল খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। শুধু তাই নয়, আজ স্পষ্টাক্ষরে জাহির করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে যে, রূপকথা ও উপন্যাস একেবারেই ভিন্ন-গোত্রীয়। যে তাগিদে রূপকথার সৃষ্টি, সেই তাগিদে উপন্যাসের সৃষ্টি নহে। আজগুবি কল্পনায় রূপক সৃষ্টি করিতে পারিলে রূপকথা মিলিতে পারে, কিন্তু উপন্যাসে চাই বাস্তবতা। অর্থাৎ এখানে রূপ লাভ করিবে নিছক কাল্পনিক কাহিনী নহে, এই কর্মময় সমস্যাময় বাস্তব জীবন। তাই উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে অনেক পরে, অনেক বেশি আধুনিককালে যখন জীবনের জটিলতা বাড়িয়া গিয়া তাহাতে সমস্যা-দ্বন্দ্ব-মূলক বিচিত্র ঔপন্যাসিক উপাদান জমিয়া উঠিতে সুরু করে। বলা বাহুল্য, এখানেও যে একটা কল্পনার প্রয়োজন হয় না, তাহা নহে, কিন্তু সে কল্পনাকে উদ্দাম ও খেয়ালী হওয়ার উপায় নাই, তাহার কাজকর্ম বাস্তবঘেঁষা হওয়া চাই, যেন যুক্তিতর্ক বা মনস্তত্ত্ব-প্রয়োগে এখানকার ঘটনার সম্ভাব্যতা স্বীকৃত বা প্রমাণিত হয়।

প্রথমদিকের উপন্যাসগুলি স্বভাবতই হইয়াছে কল্পনাপ্রধান বা রোমান্স-বহুল। একেবারে বাস্তব জীবনের কথায় উপন্যাস গড়িয়া উঠিতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে। কারণ, জীবনে ঠিক যাহা ঘটে, তাহারই তালিকা কেহ দেখিতে চাহে না। আমরা দেখিতে চাহি আমাদেরই ভালো-মন্দ বিচিত্র প্রবৃত্তির লীলা বিচিত্র পরিবেশে। ঔপন্যাসিককে এই বিচিত্রতা সৃষ্টি করিতে হয়, অথচ সেই সৃষ্টিকে যথাসম্ভব বাস্তব-ঘেঁষা রাখিতে হয়। ইহার জন্য অপরিহার্য যে বস্তুনিষ্ঠা, যুক্তিনিষ্ঠা, ও সর্বোপরি সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, এগুলি গড়িয়া উঠিতে, অর্থাৎ উপন্যাসের ন্যায় গ্রন্থে এগুলির

স্বাভাবিক স্থান রচিত হইতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে। উপযুক্ত রচয়িতার আবির্ভাব ঘটিলেও উপযুক্ত পাঠকসমাজ তৈরী হয় নাই। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের হাতে খাঁটি উপন্যাসের পরিবর্তে পাইয়াছি রোমান্স-ধর্মী রচনা। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাই প্রথমে রোমান্সে হাত পাকাইতে দেখা যায়।

ছোটগল্প: উপন্যাসে ও ছোটগল্পে পার্থক্য অনেক। উপন্যাসের গল্পাংশটুকু ছোট করিয়া বলিলেই ছোটগল্প হয় না। ইহার আর্টই স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ইতিহাস খুবই অল্পদিনের। রবীন্দ্রনাথের হাতেই ইহার জন্ম, যদিও সেই অসামান্য প্রতিভাধর স্রষ্টার হাতে প্রথম সৃষ্টিই হইল চরম উৎকর্ষে মণ্ডিত। ইংরাজীতে আমাদের বহুপূর্বেই ছোট-গল্পের উন্নত ধরণের অনুশীলন ঘটে। সম্ভবত সেই টেকনিকের আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হইয়া থাকিবেন।

উপন্যাসে যেমন একটা গোটা জীবন, গোটা সমাজ বা গোটা যুগের চিত্র তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা হয়, ছোটগল্পে সেরূপ নহে। এখানে ঐ জীবনেরই ঘটনাবিশেষ বা মুহূর্তবিশেষকে স্মরণীয় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা। এখানকার আর্ট ছোটকে বড় করিয়া দেখাইবার, সামান্যকে অসামান্য করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার আর্ট। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হৃদয়ের যে গভীর আবেগানুভূতির আবর্ত খেলিয়া যায়, লেখককে সেই আবর্তের সংকেত বাহী একটি মনোজ্ঞ পরিবেশ ও অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি চরিত্র রচনা করিতে হয়। এখানে কি ঘটনা, কি চরিত্র, কি বিশ্লেষণ, কোনো কিছুরই বাহুল্যের স্থান নাই। উপন্যাসের মত এখানে ইনাইয়া-বিনাইয়া কথা বলিবার অবসর নাই। রীতিমত একটা নাটকীয়তা ও সংকেতিকতার আশ্রয়ে বর্ণনীয় ঘটনাটুকু এখানে পর্যাপ্ত সংযম ও পরিমিতি রক্ষা করি চলিতে থাকে, এবং এই চলার ছন্দ ধীর লয়ে নহে, দ্রুত লয়ে। ইহার ফলশ্রুতি খানিকটা সনেটধর্মী কবিতা, খানিকটা নাটিকার মত। বলা বাহুল্য ছোটগল্পের এই সমস্ত লক্ষণেরই পূর্ণবিকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে বর্তমানে তাঁহার উত্তরসাধকগণের হাতে চলিয়াছে উঁহাদেরই সার্থক অনুশীলন।

প্রথম বাঙলা উপন্যাসের আলোচনায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবু' ও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থদ্বয়ের নাম করিয়াছেন। দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ প্রথমটির মার্জিতস্বরূপ এবং ছদ্মনামের আড়ালে আসল লেখক ছিলেন বোধ হয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহার অনেক কাল পরে ১৮৫৮ সালে 'মাসিক পত্রিকা' কাগজে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্র-এর 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পদক্ষেপ স্পষ্টই ধ্বনিত হইল। উপন্যাসটি বিশেষভাবে ব্যঙ্গাত্মক ছিল বলিয়া স্থানবিশেষে সত্যের অতিরঞ্জিত প্রকাশও দেখিতে পাওয়া যায়। তবু একথা বলিতেই হইবে যে, এস্থানে সৃষ্ট চরিত্রগুলি type বা শ্রেণীপ্রতীক হইয়া দেখা দেয় নাই।

✓**বঙ্কিমচন্দ্র:** প্যারীচাঁদ মিত্রের পর বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই খাঁটি বাংলা উপন্যাসের পত্তন হইতে দেখা যায়। বাংলা উপন্যাস যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের আসন লাভ করিতে পারে, ইহা বঙ্কিমই সর্বপ্রথম আমাদের দেখাইলেন তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির সাহায্যে। এইখানে আমরা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম 'নভেলে'র পাশ্চাত্যব্যঞ্জনা ও আমাদের ভারতীয় নীতিসুন্দর জীবনাদর্শ হাতে হাত মিলাইয়া এক অনুপম সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টি করিল। মিটিল আমাদের সাহিত্যগত আনন্দ ও সৌন্দর্যসম্ভোগের আকুতি, আবার সেই সঙ্গেই যোগান রহিল ন্যায়-নীতিমূলক উন্নত আদর্শ-মণ্ডিত জীবনপথের নির্দেশ। ইহা যেন শুধু সাহিত্যসেবা নহে, আদর্শ সমাজসেবাও বটে। বস্তুত উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমকে যেন দেখা যায় সমাজ-সেবক-রূপে। সর্বত্রই তিনি একটা অবসর রচনা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন যাহাতে উপন্যাসের কাহিনীর ফাঁকে উপযুক্ত প্রচ্ছদপটে তাঁহার সমাজস্থ মানুষকে তাহার ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিয়া নীতিসুন্দর আনন্দময় জীবনের চিত্র তাহার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারেন। অথচ এই নীতিশিক্ষার দিকে লক্ষ্য দিতে গিয়া যে তাঁহার উপন্যাস নীতিপুস্তকে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহা নহে। সেখানে প্রেম-সৌন্দর্যের লীলাময় জগতে বিচিত্র নর-নারীর বিচিত্র হৃদয়-সংবেদন, তাহাদের হাসি-কান্না, ভালো-মন্দের খুঁটিনাটি বিবরণ ও সেই সমস্ত কিছুর পশ্চাদ্বর্তী সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ অতি নিপুণভাবেই স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাষার দিক

দিয়াও বঙ্কিমের উপন্যাস এক বিশিষ্ট আকর্ষণের বস্তু রূপে দেখা দেয়। এককথায় ইহাকে কবিভাষাই বলা চলে, যদিও তাহাতেও আমাদের তৃপ্তি পূর্ণ হয় না। কারণ, কাব্যময় ভাষাতেই বঙ্কিম যোগাইয়াছেন নাট্যরস, কৌতুকরস ও চিত্ররস। তাই ইহাতে কাব্যধর্মিতার পাশাপাশি নাট্যধর্মিতা ও চিত্রধর্মিতা লক্ষ্য করিয়া আমরা মুগ্ধ হই। মনে হয়, এই সমস্ত কারণেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, বঙ্কিমের সাহিত্যসেবায় "বঙ্গভাষা সহসা শৈশব হইতে যৌবনে উপনীত হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তাঁহার প্রথম উপন্যাসখানি ইংরাজীতেই লিখিয়াছিলেন—গ্রন্থখানির নাম "Rajmohan's Wife।" তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একরূপ গণনার বাহিরে।

দুর্গেশনন্দিনী—১৮৬৫ সালে বঙ্কিমের প্রথম বাঙলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী" বাহির হইলে দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল। 'দুর্গেশনন্দিনী' ঐতিহাসিব রোমান্স; ইহার উপর Scott-এর Ivanhoe'র ছায়াপাত ঘটিতে দেখা যায় ইতিহাসকে উপন্যাসের বিষয়ীভূত করা হইলেও, আসলে এখানে ইতিহাসে সামান্য একটি পটভূমিকায় লেখক প্রেমের লীলাই দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে যুক্তি বা বাস্তবতার অপেক্ষা না রাখিয়া প্রচুর কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়াছেন। এই কারণে গ্রন্থখানি খাঁটি উপন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রোম্যান্স হিসাবে আদৃত হইয়াছে, এবং রোম্যান্সের আধার এখানে অতীতের কাহিনী হওয়ায় ঘটনার চমকপ্রদ অংশগুলি লইয়া বর্তমানের যুক্তিবাদী বা বাস্তববাদী মন বিব্রত হইতে চাহে না। অধিকন্তু লেখকের রচনার যাদুবলে প্রধান চরিত্রগুলি বেশ জীবন্তই হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে 'জগৎসিংহ', আর একদিকে 'ওসমান'; একদিকে 'তিলোত্তমা', আর এক দিকে 'আয়েষা'; মাঝখানে যোগসূত্র হইল অকৃত্রিম প্রেমের আকর্ষণ। তিলোত্তমা নায়িকা হইলেও প্রেমের খাতিরে আত্মবিলোপের জন্য আয়েষা চরিত্রহিসাবে উজ্জ্বলতর হইয়া উপন্যাসের মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী রচনা। "কপালকুণ্ডলা" বাঙলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী এক বিজন প্রদেশে কাপালিক-পালিতা 'কপালকুণ্ডলার' সহিত কবিপ্রাণ ধীরোদাত্ত-চরিত্র 'নবকুমারে'র সাক্ষাৎ ও তাহার ফলে উভয়ের জীবনের পরিণতির কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের যে একটি উচ্চাঙ্গের

কবি-মানস ছিল তাহারই প্রমাণ পাই আমরা এই রচনায়—ইহার কাহিনী-কল্পনায় এবং বর্ণনাসুষমায়। কাব্যধর্মী উপন্যাস হিসাবে কপালকুণ্ডলার স্থান আজও নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীতে। ইতিহাসের প্রসঙ্গটি এখানে যদিও বাহুল্যের মধ্যেই গণ্য করা চলে যেহেতু মূল কাহিনীর সহিত ইহার সংযোগ খুবই ক্ষীণ, তথাপি অতিলৌকিকের পাশাপাশি একটা বাস্তবের গাঁথুনি থাকায় মনে হয় সমগ্রভাবে উপন্যাসের মুল্য বা আকর্ষণ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। 'মতিবিবি'র মধ্যে লেখক নারীচরিত্রের যে বিশ্লেষণ দেখাইয়াছেন তাহা উপন্যাস-রসিকের নিকট অবশ্যই আদরের বস্তু।

মৃণালিনী—বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস "মৃণালিনী"-ও এই ধারার বহির্ভূত নহে, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত। মৃণালিনীতে লক্ষ্মণসেন-আমলের বাঙলার পটভূমিকাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। আসলে রাজনৈতিক পটভূমিকায় এখানে দুইটি প্রেমের কাহিনী স্থান পাইয়াছে, একটিতে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী অপরটিতে পশুপতি-মনোরমা নায়ক-নায়িকারূপে চিত্রিত। কিন্তু কোনটিই বেশ চিত্তাকর্ষক রূপে ফুটিয়া উঠে নাই। বুঝা যায়, বঙ্কিম এখানে পরবর্তী উৎকর্ষের জন্য হাত পাকাইতেছেন।

চন্দ্রশেখর—"ইন্দিরা", "রাধারাণী", "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "রজনী" নামে চারিটি ক্ষুদ্র রচনার কথা ছাড়িয়া দিলে বঙ্কিমের পরবর্তী রচনা "চন্দ্রশেখর"। এই উপন্যাসে একটি নারীর জীবনে দুই পুরুষের প্রভাব-সম্পর্কিত যে কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্কিম আধুনিকগণের সমগোত্রীয় ; যদিও এই সমস্যার সমাধানের যে ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন তাহা তাঁহাদের মনোমত নাও হইতে পারে। এখানেও আছে রীতিমত একটা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা। এখানেও চলিতে দেখা যায় পাশাপাশি দুইটি কাহিনী, একটি চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর, আর একটি মীরকাশেম-দলনীর। তবে কপালকুণ্ডলার মত ইতিহাস এখানে অবান্তর হইয়া পড়ে নাই। দুইটি কাহিনীকে বেশ সঙ্গত কারণেই গ্রথিত করিয়াছে ঐতিহাসিক ঘূর্ণ্যাবর্ত। 'শৈবলিনীর'র মধ্যে লেখক যে ব্যক্তিচেতনার স্ফুরণ দেখাইয়াছেন তাহা এযুগেও প্রশংসনীয়, আর সে যুগের পক্ষে তো প্রচণ্ড বিস্ময়কর। এক-কথায় 'চন্দ্রশেখর' বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতির পথে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে।

রাজসিংহ—"রাজসিংহ" বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রঙ্গলালের সময় হইতেই রাজপুতগণের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনার প্রয়াস লক্ষিত হইতেছিল কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার এই প্রথম। এই উপন্যাসে বঙ্কিম যেভাবে ইতিহাস ও উপন্যাসকে সমভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের রস-সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছেন এমন আর কোথাও নহে। বস্তুত "রাজসিংহে"র রচনা-শিল্প সম্পূর্ণ ভিন্নতন্ত্রীয়। তাই রবীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান সমালোচনায় ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। রাজসিংহ ও আওরঙ্গজেব উভয়েই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ; তাহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য হিসাবে এখানে আসিয়াছে মবারক-দরিযার কাহিনী, আসিয়াছে রাজসিংহের পাশে চঞ্চলকুমারী ও মাণিকলালের পাশে নির্মলকুমারীর কাহিনী; কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুহিতা জেব-উন্নিসা যে ভাবে এই সমস্ত চরিত্রকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কঠিন আবর্তের মধ্য হইতে কারুণ্যের মূর্তিরূপে সকলের পুরোভাগে আসিয়া অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে, তাহাতেই 'রাজসিংহ' উপন্যাস হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

আনন্দমঠ—ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে অবলম্বন করিয়া মহাকবিসুলভ কল্পনার আলোকসম্পাতে বঙ্কিমচন্দ্র এস্থানে 'সন্তান'-ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছবি আঁকিয়াছেন। আনন্দমঠেই ধ্বনিত হয় "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র। এই উপন্যাসখানি বহু বিপ্লবীকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিল এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণে ইহাই যোগাইয়াছে এক অমর প্রেরণা।

আদর্শ-প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য। এই পর্যায়ে আনন্দমঠের পাশাপাশি আমরা **"দেবী চৌধুরাণী"** ও **সীতারাম** উপন্যাসের নাম করিতে পারি। তিনখানিতেই অল্পবিস্তর পাওয়া যায় বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা। তবে 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্লর মধ্যে যে খাঁটি বাঙালী নারী-হৃদয়ের কামনা-বাসনা এবং গ্রন্থমধ্যে তদানীন্তন বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের যে চিত্র ফুটিয়াছে তাহাতে গ্রন্থখানির উপন্যাস-মূল্যও অবশ্য স্বীকার্য।

বঙ্কিমের প্রথম বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'; আর ইহার কয়েক বৎসর পরে প্রকাশিত হয় **'কৃষ্ণকান্তের উইল'**। মাঝে আরও দুইখানি

সামাজিক উপন্যাস রচিত হইয়াছিল 'রাধারাণী' ও 'রজনী' নামে। কিন্তু এই দুইটি রচনাকে উপন্যাস না বলিয়া বড় গল্প বলাই বোধ হয় ঠিক।

"বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসদ্বয়ের কাহিনীগত মিল সুস্পষ্ট। বিবাহিত ব্যক্তির বিধবা নারীর প্রতি আকর্ষণ ইহাদের মূল কথা। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল আধুনিক উপন্যাসের অগ্রদূত। কুন্দ, কমল, ভ্রমর, সূর্যমুখীর চরিত্র-সৃষ্টি বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। কুন্দের অনভিজ্ঞ কমনীয়তা, কমলের গৃহিণীপণা, ভ্রমর ও সূর্যমুখীর একটি প্রেমপরায়ণতার ছবি উচ্চশ্রেণীর পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করিবে।

বস্তুত এই দুইখানিতেই বঙ্কিম-প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ। বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা ও জীবন-তত্ত্বের বিচারে ইহারা গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ। যে অসামাজিক বা অবৈধ প্রেম পরবর্তীকালীন উপন্যাস-সৃষ্টির বিরাট উৎস হইয়া দাঁড়ায়, এই দুইখানি গ্রন্থে বঙ্কিম সেই উৎস-মুখেরই পাষাণ-ফলক অবারিত করিয়া দেন। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী বালবিধবা; তাহাদের প্রেম-সম্ভোগ-স্পৃহা স্বাভাবিক বলিয়া সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে। অথচ আমাদের মত নীতিশাসিত সমাজে এই প্রেমের কী পরিণতি হইতে পারে, এই সম্পর্কেই বঙ্কিম আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ে আমাদের চিন্তাজগতকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন। নীতিসুন্দর সমাজের পক্ষপাতী বঙ্কিম ঐ প্রেমের যে পরিণতির চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে সকলের পূর্ণ সমর্থন না থাকিতে পারে, কিন্তু উহারই ভিত্তিতে যে আমাদের পরবর্তীকালীন উপন্যাস অশেষ বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রমেশচন্দ্র :

বঙ্কিম-পরবর্তী উপন্যাসিক হিসাবে আমরা রমেশচন্দ্র দত্তের নাম করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রমেশচন্দ্রও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম রচনা **'বঙ্গবিজেতা'** ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের কালপরিসর সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল। রাজা টোডরমল্লকে এই যুগের কেন্দ্রস্থ পুরুষ বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। 'বঙ্গবিজেতা' রমেশচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মতই ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয় উপন্যাস **‘মাধবী কঙ্কণ’** সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। পরিবেশ-বর্ণনায় “মাধবী কঙ্কণ” উপন্যাসে তিনি বাস্তবিকই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

রমেশচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস দুইখানি রাজপুত ও মারাঠাদের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে **‘মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত’** ও **‘রাজপুত জীবনসন্ধ্যা’**। উপন্যাসে বিরাট ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানবজীবনেরই ছবি আঁকা হইযা থাকে। ইতিহাসের যে মূল পরিচালক শক্তি মারাঠাজাতির অভ্যুত্থান এবং রাজপুত জাতির পতন ঘটাইয়াছিল তাহার বর্ণোজ্জ্বল চিত্ররচনা এক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে। আবার দুইটিতেই বহিয়া চলিয়াছে দুইটি প্রেমকাহিনী এমনই ক্ষীণস্রোতে যাহাতে ইতিহাস সেই প্রেমাবেগে না পঙ্গু হইযা পড়ে। ‘জীবন-প্রভাতে’ সৈনিক ‘রঘুনাথ’ ও ‘সরযূ’র প্রেমকাহিনী ইতিহাসানুগ হইয়াও উপভোগ্য; চরিত্রদ্বয়ও বেশ জীবন্ত। ‘জীবন সন্ধ্যা’য অপেক্ষাকৃত ইতিহাসের প্রাধান্য ঘটিতে দেখা যায়, এবং ইহার কারণ, লেখক এখানে ইতিহাসের একটি দীর্ঘ যুগকে উপন্যাসের আওতায় আনিতে প্রযাসী হন। একদিকে রাণা প্রতাপ ও তেজসিংহ, আর একদিকে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙ্গজীব এই চারিজন মোগল শাসকের কাহিনী আসিয়া এখানে ভিড় জমাইযা ফেলিযাছে। ফলে তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর প্রেমকাহিনী এখানে স্বাভাবিক সুষমাবিস্তারের প্রশস্ত অবসর পায নাই।

‘সমাজ’ ও **‘সংসার’** নামে রমেশচন্দ্র দুইখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা করিযাছিলেন। দুইটিতেই বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ, এই সমাজ-সমস্যা স্থান পাইয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমের মত এখানে ঐ সমস্যাকে ভয়ঙ্কররূপে দেখাইবার চেষ্টা হয় নাই। পক্ষান্তরে লেখক এখানে উভয়বিধ সমস্যারই সহজ সমাধানের পথ দেখাইয়াছেন, ঐ দুটির সমর্থন জানাইয়া। ‘সংসারে’ তাই বিন্দুর বিধবা ভগ্নী সুধার সহিত উচ্চশিক্ষিত যুবক শরৎচন্দ্রের প্রেম বিবাহে পরিণতি লাভ করিল, আর ‘সমাজে’ লেখক আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া অসবর্ণ বিবাহে সমর্থন জানাইলেন।

‘সমাজ’ ও ‘সংসার’ সত্যই দুইখানি মধুর সামাজিক উপন্যাস। এখানকার

জীবনপ্রবাহে কোন উগ্রতা বা উত্তাপের জ্বালা নাই। এমন শান্ত, মধুর শরৎচন্দ্র সত্যই দুর্লভ।

প্রভাতকুমার :

রবীন্দ্রযুগে ছোট গল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার ইংরাজী ও সংস্কৃত রস-সাহিত্যের অভিজ্ঞ পাঠক ছিলেন এবং নব্য-সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ধারার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। আধুনিককালের উপন্যাস এবং ছোট গল্পের মর্মকথা তিনি ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমারের উপন্যাস-গুলির মধ্যে **নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ, সিন্দুর কৌটা, মনের মানুষ** প্রভৃতি বিখ্যাত। প্রভাতকুমারের রচনায় আমরা যে পরিহাসোজ্জ্বল, লঘুস্বচ্ছ ভাবের প্রকাশ দেখি তাহা অনবদ্য। কোনো জীবন-মরণ-সমস্যার বর্ণনায় ও বিন্যাসে তিনি তাঁহার সাহিত্যচিন্তাকে ভারাক্রান্ত করিতে চাহেন নাই। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে নিত্য নূতন ভুলভ্রান্তি ও 'অলীক আশা ও কল্পনা'-র জালবোনা চলিয়াছে তাহাকেই উপজীব্য করিয়া তিনি উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেই তাঁহার হাত খুলিয়াছে বেশী। 'গহনার বাক্স', 'বলবান জামাতা' 'বউচুরি', 'রসময়ীর রসিকতা' প্রভৃতি তাঁহার হাস্যরসদীপ্ত ছোট গল্পগুলি সকলেরই প্রিয়। প্রভাতকুমার বাঙলাদেশের জাত হাস্যরসিক।

শরৎচন্দ্র :

ইহার পর উপন্যাস ও গল্পের আলোচনায় আমাদিগকে অবশ্যই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করিতে হয়। বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা"-র সময় হইতে গার্হস্থ্য উপন্যাসের যে ক্ষীণ ধারাটি প্রবাহিত হইতে সুরু করিল তাহা শরৎচন্দ্রের রচনায় কূলপ্লাবী কল্লোলিনী মূর্তি ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। বাঙলাদেশের পারিবারিক জীবনের এমন বস্তুনিষ্ঠ অথচ সহানুভূতি-স্নিগ্ধ প্রকাশ আমরা ইহার পূর্বে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাস ছাড়া আর কোথাও পাই নাই।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান কিছুকাল আগেও ছিল সুনির্দিষ্ট; অর্থাৎ সেরা উৎকর্ষের মালিকরূপে তিনিই ছিলেন এক ও অদ্বিতীয়। অতঃপর রাশি রাশি উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়া যুগের বিচারে শরৎচন্দ্রকে যে এক যুগ পিছনের মানুষ রূপে দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাহাতেই ঐ স্থান সম্পর্কে নানা কথা উঠিবার অবসর দেখা দিয়াছে, অর্থাৎ কাহারও মতে শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাসের প্রভূত উন্নতি বা অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে; কেহ বলেন, আঙ্গিক বা কলা-কৌশলের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে সত্য, খাঁটি ঔপন্যাসিক আর্ট উন্নত হয় নাই; আবার কাহারও মতে শরৎচন্দ্রেই ঘটিয়া গিয়াছে বাংলা উপন্যাসের চরম উৎকর্ষ, আধুনিকযুগে পূর্বের রোমন্থন চলিতেছে মাত্র। যাহা হউক, এই তর্কের সমাধান আমাদের লক্ষ্য নহে, আমাদের কথা হইল, শরৎচন্দ্রের হাতে যে বাংলা উপন্যাসের সোনার ফসল ফলিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসাধক রূপে। তিনি 'রোহিণী'কেও (কৃষ্ণকান্তের উইল) দেখিয়াছেন, 'বিনোদিনী'কেও (চোখের বালি) দেখিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার হাতে আমরা 'অচলাকে'ও (গৃহদাহ) পাইয়াছি, আবার 'কিরণময়ী'কেও (চরিত্রহীন) পাইয়াছি। মধ্যে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে, 'সাবিত্রী' (চরিত্রহীন)-'রমা' (পল্লীসমাজ)-'রাজলক্ষ্মী' (শ্রীকান্ত)-র দল। এই যে নারী-চরিত্রসৃষ্টির অভিনবত্ব ইহার কোন তুলনা নাই। বঙ্কিমের আদর্শবাদ শরৎচন্দ্রের কোথাও নাই, একথা বলা চলে না, উহা প্রচ্ছন্নভাবে মধুরতর হইয়া ফুটিয়াছে, 'দেবদাসে'র 'পার্বতী' 'দেনা পাওনা'র 'ষোড়শী' প্রমুখ নানা ছোটো বড়ো চরিত্রের মধ্যে, ফুটিয়াছে তাঁহার প্রতিটি গৃহাশ্রম-কেন্দ্রিক প্লট-রচনায়। যে সূক্ষ্মতর মনোবিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, শরৎচন্দ্র তাহাকে অতি সাধারণ নর-নারীর ক্ষেত্রে আরও সহজ আরও মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে প্রযোগ করিয়া বাংলা উপন্যাসকে জনসাধারণের প্রাণপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। অধিকন্তু বাস্তবতা-বিধানে শরৎচন্দ্র যেন যুগান্তর আনিয়াছেন বাংলা উপন্যাসে। তাঁহার হাতেই আমরা সর্বপ্রথম পাই বাংলাদেশের খাঁটি মধ্যবিত্ত কখনও বা নিম্নবিত্ত সমাজের অকৃত্রিম জীবন-কথা। কী অপরিসীম মানবদরদের ফলে যে এমন বিশ্বস্ত সমাজচিত্র-অঙ্কন সম্ভব হইতে পারে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে কি পুরুষ, কি নারী, প্রত্যেকেই যেন জীবন্ত হইয়া দেখা

দিয়াছে। তবে সকলের উপরে যে বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ভাস্বর হইয়া ফুটিয়াছে তাহা হইল শাশ্বতী নারীর প্রতিষ্ঠা, এবং বাংলার সমাজে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ধৃতিরূপিণী নারীর সহায়তায় পুরুষের গৌরবময় জীবনগঠনের আদর্শের প্রতি বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। এই ভাবে সাহিত্য-সেবায় সমাজসেবার দিক দিয়া উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের স্থান এক কথায় অনন্য।

শরৎচন্দ্রের রচনাগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম ধারায় পারিবারিক জীবনের কতকগুলি সাধারণ সমস্যা অথবা স্নেহ-প্রেমের চিত্র। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা **মন্দির** হইতে সুরু করিয়া **কাশীনাথ, বড়দিদি, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, মেজদিদি, বৈকুণ্ঠের উইল, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, বিরাজবৌ** প্রভৃতি রচনা এই জাতীয়। দ্বিতীয় স্তরে আমরা পাইতেছি **গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, দেনাপাওনা,** প্রভৃতি উপন্যাসগুলি। এই স্তরে আসিয়া শরৎচন্দ্র নরনারীর প্রেম ও তাহার চিরন্তন সমস্যাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তৃতীয় স্তরের রচনার মধ্যে **শেষপ্রশ্ন** ও **শেষের পরিচয়**-এর নাম করিতে পারা যায়। এই তৃতীয় ধারাটি আসলে দ্বিতীয় ধারারই ক্রমবিকশিত রূপ। পূর্বে যাহার প্রকাশ ছিল অনেকটা আবেগময়, এখন তাহা বুদ্ধি-নির্ভর আধুনিক বিতর্কমূলক-রচনারীতিকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে মাত্র। শরৎচন্দ্রের **অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ** প্রভৃতি উপন্যাসগুলি প্রথম ধারারই অন্তর্গত, তবে এই সকল ক্ষেত্রে তিনি গ্রাম্য-সমাজের কতকগুলি বিশেষ সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া পতিতাগণের জীবন-সমস্যারও প্রকাশ ঘটিয়াছে তাঁহার উপন্যাসে। অপরিসীম সহানুভূতি ও দরদ দিয়া তিনি মানব সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনায় আন্তরিকতা এত সুগভীর।

পারিবারিক উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পরিবারগত সংহতির মূল কারণ ও সাংসারিক ভাঙনের ছবি আঁকিয়াছেন। একান্নবর্তী পারিবারের বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী ; ইহাদের সকলকে মানাইয়া চলিতে হইলে সংসারের মূল কর্ণধার যিনি, তাঁহাকে উদারহৃদয় ও ক্ষমাসুন্দর হইতে হয়। **বিন্দুর ছেলে** গল্পের 'যাদব', **নিষ্কৃতি**-র 'গিরিশ' ও **বৈকুণ্ঠের উইল**-এর 'গোকুল' এই জাতীয় শিবস্বভাব চরিত্র।

কিন্তু শরৎ সাহিত্যের আসল মূল্যায়ণ করিতে হইলে তাঁহার **গৃহদাহ, চরিত্রহীন** ও **শ্রীকান্ত** উপন্যাসের আলোচনা প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে নরনারীর প্রেম ও তাহার চিরন্তন সমস্যাগুলিকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। "চরিত্রহীন" উপন্যাসে সমাজগর্হিত প্রেমও যে ত্যাগের ও সংযমের মহিমায় কত সুন্দর, কত উচ্চাঙ্গের হইতে পারে তাহাই দেখানো হইয়াছে।

"গৃহদাহ" উপন্যাস শিল্পাদর্শের দিক হইতে সুউচ্চ স্থানের অধিকারী এবং এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মননকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছেন "অচলা" চরিত্রের দোলাচল-চিত্তের বর্ণনায় এবং স্বভাবত মহৎ ও উদার-চরিত্র সুরেশের পতনোত্তর আত্মগ্লানির মধ্যে।

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সম্ভবতঃ **শ্রীকান্ত**। ইহা চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। "শ্রীকান্ত" আসলে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস এবং ঘটনাবৈচিত্র্যে, চরিত্রসৃষ্টির বিপুলতায়, জীবনদর্শনের গভীরতায় ইহা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে বিবেচিত হইতে পারে। এখানে নায়ক-নায়িকা উভয়কেই দেখা যায় প্রৌঢ়-প্রেমের উপাসক রূপে, এবং সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায় মৃদু-মধুর হিল্লোলে হিল্লোলিত এক মিলন-হীন মহামিলন। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, অভয়া ও কমললতা-চরিত্রগুলি "শ্রীকান্ত"-এর অন্যান্য বহু চরিত্রের ভিড়ে আপন বিশেষত্বে উজ্জ্বল। "অভয়া" চরিত্রটিকে সমালোচকগণ শরৎচন্দ্রের একমাত্র সমাজবিদ্রোহী নারীচরিত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কাব্য-কবিতা

মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩)

উনবিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সে যুগের অন্যান্য উচ্চশিক্ষার্থী যুবকের মত মধুসূদনও হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। ইউরোপীয় কাব্যদর্শনের আস্বাদলাভে এবং ডিরোজিও প্রভৃতি অধ্যাপকের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে মধুসূদন প্রায় মনে-প্রাণে সাহেব হইয়া গিয়াছিলেন এবং এই সময় তিনি খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন সর্বদা স্বপ্ন দেখিতেন ইংরাজীতে কাব্য লিখিয়া মহাকবি হইবার। যৌবনে তিনি 'Captive Lady,' ও 'Visions of the Past' নামে দুইখানি কাব্যও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে কবি আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া বাঙলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁহার এই মারাত্মক ভুলটি অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট 'বঙ্গভাষা' যেখানে আমরা কবিকে গাহিতে শুনি :—

> "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
> তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি,
> পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

আসলে মধুসূদন ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙ্গালী। উনবিংশ শতাব্দীর সেই "ইয়ং বেঙ্গল" সুলভ উত্তেজনা-উন্মাদনার বশে তাঁহার স্বচ্ছ-চিন্তা কিছুকালের জন্য বিভ্রান্ত হইয়াছিল মাত্র। কালক্রমে এই বিভ্রান্তি ঘুচিয়া যাওয়ায় উগ্র সাহেব ব্যারিস্টার মাইকেল পরবর্তী জীবনে কবি শ্রীমধুসূদন হইয়াছিলেন।

বাঙালী এবং ভারতীয় কবি হইলেও মধুসূদনের কবি-মানস গড়িয়া উঠিয়াছে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত ও ইউরোপীয় মহাকাব্যের মিশ্র ভাবসংঘাতে। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ চর্চা সত্ত্বেও এই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত জীবনদর্শন মাইকেলের সাহিত্যে নাই। দুইশত বৎসরের জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান-সাধনা ও স্বাধীন মননশীলতা যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব আহরণ করিয়াছে, মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে অভিনব ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে, সে সমস্তই যে মাইকেলের কাব্যে কেন্দ্রীভূত সংহত হইয়া এক নূতন জীবনবেদের ভিত্তি রচনা করিয়াছে এমন কথা আমরা

বলিতে পারি না। তাঁহার সংশয়ক্লিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তি, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি মোহ অথচ নূতনের জন্য আকূতি, সর্বোপরি তাঁহার বহুবিচিত্র বিভ্রান্তকারী অভিজ্ঞতার সামান্যমাত্রই তাঁহার কাব্যানুভূতি ও কাব্যসৃষ্টির মধ্যে ধরা দিয়াছে। তাঁহার কবি-মানসের অপূর্ণতার জন্য তাঁহার প্রতিভার পরিণতি অর্ধপথেই সমাপ্ত হইয়াছে। গৌড়জন চিরকাল সুখে পান করিবে, এমন একটি মধুচক্র রচনা করিবার ইচ্ছা কবিকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে, কবি সেই ইচ্ছার উর্ধ্বে আর কিছুতেই উঠিতে পারিলেন না। যদি পারিতেন, তবে তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' আধুনিকতার জীবনবেদরূপে অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইত, যেমন হইয়াছে গ্যেটের 'ফাউষ্ট'। বাংলাকাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার সুর-প্রতিষ্ঠার জন্যই মধুসূদন বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কবি-মানসের মধ্যে জীবনের অপরিমেয় রহস্যের উপলব্ধি নাই বলিয়া সেই প্রভাব পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী হইল না। প্রজ্ঞাময় দৃষ্টির অভাবেই মধুসূদনের প্রতিভা কোনো সার্বভৌম আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

তবে এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠার অক্ষমতা হইল কবি-মানসের একদিকের পরিচয় মাত্র। ইহার যে বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক লক্ষণীয়, তাহার মূলে আছে এক বিরাট যুগ-প্রভাব বা যুগ-প্রবৃত্তি। যে যুগে মধুসূদনের আবির্ভাব, তাহাকে এক কথায় বাংলার নব-জাগৃতির (Renaissance) যুগ, বাঙালীর জাতীয় জীবনের এক যুগ-সন্ধি বলিতে হয়। একদিকে যেমন প্রাচীন সংস্কারের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ সেই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীজীবনে এক উৎকট রক্ষণশীল মনোভাবের সংবর্ধনা চলিতেছে, অপরদিকে সমুদ্র-পারের পাশ্চাত্ত্য হাওয়া হু হু শব্দে আসিয়া সমাজের প্রগতিশীল অংশকে মুক্তিপাগল করিয়া তুলিতেছে। আমাদের সমাজের বদ্ধ ঘরে জীবনরস তখন অবসিতপ্রায়। তাই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষিগণ মৃতপ্রায় সমাজের স্বাস্থ্য ফিরাইবার জন্য হাওয়া পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে 'ইংরাজী সাহিত্যের মারফতে এক মুক্ত স্বাধীন বলিষ্ঠ জীবনযাত্রা ও আত্মপ্রত্যয়শালী মানবসমাজের পরিচয়' এমন শ্রদ্ধা লাভ করিতে থাকে যে, শিক্ষিত বাঙালী তরুণ সম্প্রদায় একেবারেই বিপ্লবী সাজিয়া বসে, জেহাদ ঘোষণা করে আপন জীর্ণ সমাজের বিরুদ্ধে।

এই বিপ্লব কেবল ধর্মে ও সমাজে নহে, সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতে শুরু করে।

মধুসূদন ছিলেন এই নবযুগের মানস-সন্তান; মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এক রুদ্র সাধক। কবি আপন ভাব-সাধনায় বিদেশীয় চিন্তাধারার উৎকর্ষ রূপায়িত করিবার—বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর বিবেক ও যুক্তিকে, নীতিবাদ ও আদর্শবাদের উপর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার—দুরূহ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যের অবিসম্বাদিত নায়ক রাবণের মধ্যে পাওয়া যায় এক দুর্বার স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিলীলার মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, আর মেঘনাদের মধ্যে পাওয়া যায় সে যুগের সেই নবজাগ্রত দেশাত্ম-বোধের স্বর্ণচুড় তুঙ্গ মহিমা।

সমগ্র মধুসূদনকে চিনিবার পক্ষে আরও যে একটি কথা মনে রাখা প্রযোজন তাহা হইল কবির সৃষ্টি-পাগল রূপ। কবিকৃতির সম্যক পরিচয় দেওয়ার তাঁহার যেন কোনো অবসর নাই। কেবলই নূতন ঢঙে, নূতন ছন্দে, নূতন ভাষায় ও নূতন সুরে কাব্যরচনার দুর্নিবার তাগিদেই চলিয়াছে কবির কাব্য-সাধনা। অভিনব কিছুর জন্য মধুসূদনের কবি-মানসটি ছিল প্রতিনিয়ত আন্দোলিত। তিনি যে সৃষ্টি-পাগল, সে হইল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, অভিনবত্বের সৃষ্টি। তাই Epic-এর আদর্শে সৃষ্টি হইয়াছে 'মেঘনাদবধ কাব্য'; Heroic Epistles-এর আদর্শে 'বীরাঙ্গনা-কাব্য'; Ode, Lyric এবং Ottava Rima'র আদর্শে 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'; Tragedy'র আদর্শে 'কৃষ্ণ-কুমারী' ইত্যাদি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশপদী কবিতা, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, প্রহসন, প্রতিক্ষেত্রেই মধুসূদন প্রথম স্রষ্টা, মধুসূদন পথ-প্রদর্শক।

* * *

১৮৬০ সালে মধুসূদনের প্রথম কাব্য "তিলোত্তমাসম্ভব" প্রকাশিত হয়। কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াই মধুসূদন অনুভব করিয়াছিলেন যে, ছন্দের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে বাংলা কবিতার উন্নতি অসম্ভব। শেক্‌সপীয়ার, মিলটনের কাব্য-নাটকে Blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ও শক্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রেও এই ছন্দ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি প্রেরণা অনুভব

করিলেন। মধুসূদন বাঙলা কবিতায় যে নূতনত্বের স্বাদ আনিয়াছিলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত "তিলোত্তমাসম্ভব" হইতেই তাহার সূত্রপাত। এই নূতন ছন্দের প্রবর্তন সম্পর্কে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের তর্ক হয়, এবং কবি একরকম বাজি রাখিয়াই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দেন। চারিটি বর্গে রচিত এই কাব্যটি মধুসূদনের সৃজনী প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর বহন করে। ভারতীয় পুরাণের কাঠামের উপর ক্লাসিক্যাল গ্রীক কবিগণের কল্প-সৌন্দর্যের আলোকপাত তাঁহার অভিনব সৃষ্টি। ইহা বাঙলা কবিতার প্রায়ান্ধকার প্রাগূষায় প্রথম উষাবিকাশের বর্ণোজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটা বিকীর্ণ করিল।

"তিলোত্তমাসম্ভব"-এর পর মধুসূদন দুই-খণ্ডে **মেঘনাদবধ কাব্য** প্রকাশ করিলেন (১৮৬১)। যে কবিপ্রতিভা তিলোত্তমায় ফুটিতে পারে নাই, তাহারই মহনীয় বিকাশ ঘটিযাছে কবির এই শ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। "মেঘনাদবধ" রাবণের জীবনের ট্রাজেডি। রাবণকে মধুসূদন দেখিযাছেন প্রাচীন যুগের এক বীর নরপতিরূপে। একটি মহান্ বীরপুরুষ আপনার অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায আপনার সর্বনাশ ডাকিযা আনিল। সে তাহার পতনের কারণ বুঝিতে পারে না, শুধু নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিযা উঠিযা বারংবার বিরূপ ভাগ্যকে জয় করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে—নিয়তির অলক্ষ্য দেবতা শুধু তাহার দিকে কটাক্ষে চাহিযা হাস্য করেন মাত্র। ট্রাজিক চরিত্রের পরিকল্পনা হিসাবে রাবণ-চরিত্র পরিপূর্ণ মাত্রায় সার্থক। মেঘনাদের হত্যা কাব্যের কেন্দ্রীয কাহিনী এবং রাবণ-চরিত্রের ট্রাজেডি রচনায ইহা ছিল অত্যাবশ্যক।

মধুসূদনের কাব্যগুরু ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, তাসসো এবং মিলটন-প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কবিগণ। তাই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য এই 'মেঘনাদবধে' অল্পবিস্তর এই সব দেশী-বিদেশী কবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে সকলের বিচিত্র প্রভাব সত্ত্বেও 'মেঘনাদবধ' মধুসূদনের একান্ত মৌলিক প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

এই কাব্যেই স্থান পাইয়াছে কবির বিখ্যাত সংকল্প—"গাইব, মা বীর রসে ভাসি মহাগীত"—আর তাঁহার আয়োজন ও প্রস্তুতির সমারোহ দেখিয়

মনে হইয়াছে সত্যই বুঝি এইবার একখানা আস্ত 'ইলিয়াড' (regular Iliad) বাংলা ভাষায় রূপলাভ করিল। কিন্তু পরম কৌতূহলের বিষয়, কবির সেই সদম্ভ ঘোষণা সত্ত্বেও কবি করুণরস-প্রধান খাঁটি ভারতীয় রীতির পরিচর্যাতেই বিভোর হইয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য, এইখানেই কবির মৌলিকতার পরিচয়। হোমরের অনুকরণে বাংলায় ইলিয়াড রচিত হইলে আমরা কখনই এইভাবে কবি-প্রতিভার জয়গান গাহিতাম না।

গীতি-কবিতার নিভৃত গুঞ্জনটি ইহার পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-রচনায়, এমন আশ্চর্য স্বচ্ছ-গভীর আধুনিক প্রকাশের মাধুর্য বিস্তার করিতে পারে নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের পর মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়। আমরা পূর্বে যে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার কথা বলিয়াছি "ব্রজাঙ্গনা" সেই ধারা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও উনবিংশ শতাব্দীর সেই বিশিষ্ট ভাবচেতনা—নবমানবতাবাদ বা "humanism"-এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রজাঙ্গনার' জন্ম-মূলে আমরা বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় মধুসূদনের কোন ভক্তিবাদ বা অধ্যাত্মবাদ খুঁজিলে ভুল করিব। আসলে ইহার মূলে আছে শুধুই অভিনব কাব্যসৃষ্টির ব্যাকুলতা—কবির সৃষ্টি-বৈচিত্র্য-শক্তির একটি কুতূহলী পরীক্ষা ;—পশ্চিমী ঢঙের Ode বা গীতিকবিতা-রচনার পরীক্ষা, ও-দেশের মত এদেশেও Bard জাতীয় কবি কোনো উপযুক্ত বিষয়বস্তু লইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা, তাহারই পরীক্ষা। বস্তুত যে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক ও তাহার গৌরবময় প্রতিষ্ঠার অধিকারী, তিনি যে কেন মিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনায় মাতিলেন ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। কেবল আর এক দফা বাঙালীস্পর্শ লাভ করিয়া মুগ্ধ হওয়াই এখানকার কবি-কৃতির সম্যক পরিচয় লওয়া নহে। মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে বুঝা যায়, তিনি এই "ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি" রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা ছন্দের সংমিশ্রণে) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় ব্রজাঙ্গনা-কাব্য ফাঁদিয়াছিলেন। "I have made up my mind to do something in rhyme ; don't fancy, I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a

romantic tale in it," তাই কবি এখানে রোমান্টিক 'পোয়ের গাননী' গাহিয়াছেন নূতন ধরণের ছন্দ-স্তবক রচনার আকর্ষণে।

মধুসূদনের পরবর্তী কাব্য **বীরাঙ্গনা**। ইহার রচনাদর্শ গৃহীত হইয়াছিল লাতিন কবি ওবিদ-এর কাব্য হইতে। এই কাব্যটি কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ পত্রগুচ্ছের সমাহার। "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী", "পুরুরবার প্রতি উর্বশী", "দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী", "সোমের প্রতি তারা", "নীলধ্বজের প্রতি জনা" প্রভৃতি এগারোটি পত্রসংখ্যায় কাব্যটি বিভক্ত হইয়াছে।

কাব্য-পরিচয়ে ইহাকে বলিতে হয় পত্র-কাব্য; ওভিদের Heroic Epistlesএর আদর্শে রচিত। 'বীরাঙ্গনা' নামটিও ঐ ইংরাজী নামের প্রভাবে দেখা দিয়াছে। নচেৎ প্রকৃত বীরাঙ্গনা বলিতে এখানে এক 'জনা' ও আংশিকভাবে 'কৈকেয়ী' ছাড়া আর কাহাকেও দেখা যায় না। আর আর সকলেই নায়িকা, এবং বিবিধ প্রেম-সম্পর্কই তাহাদের পত্ররচনার মূল উৎস। মধুসূদনের কবি-কৃতির যে পরিণতরূপ এই কাব্যে ফুটিয়াছে তাহা আর কোথাও দেখা যায় না, 'মেঘনাদবধে'ও না। প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে কবি কি কৌশলে এখানে নায়িকাদের পত্র-প্রেরণের অবসর রচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ভাষা ও ছন্দের এমন চমৎকারিত্ব, এমন কলাকুশলী মনস্তত্ত্বসম্মত চরিত্র-চিত্রণ, এমন মধুর লিরিক আবেদন, আর এই গুলির সহিত একযোগে এমন নিখুঁত নাটকীযতা (ইংরাজীকে যাহাতে বলে dramatic monologue), আমরা মধুসূদনের পরেও এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারও নিকটে পাই নাই।

সনেট বা **চতুর্দশপদী কবিতা** বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের নামের সহিত চিরকালের মত জড়িত হইয়া গিয়াছে। 'সনেট' (Sonnet) কাব্যের আদর্শ সম্পূর্ণ ইউরোপীয়। ইহা কবির মনকে আকৃষ্ট করে তাঁহার কাব্যসৃষ্টির আদিযুগেই, কিন্তু "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচিত হয় একেবারে তাঁহার কবি জীবনের অন্ত্য-লীলায়। কবি তখন প্রবাসী। ফ্রান্সের "ভর্‌সেলস্"-এ (Versailles) তাঁহার দিন কাটিতেছে। সনেটে হাত পাকাইতে হইবে, তাই চলিয়াছে উৎকৃষ্ট সনেটের কলা-কৌশল আয়ত্ত করার সাধনা একেবারে সনেটের কবিগুরুর নিকট হইতে: "I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some sonnets

after his manner." আর, দেখিতে দেখিতে বাহির হইয়া আসিল "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"। কলাকৌশল আয়ত্ত হওয়ামাত্র বিষয়বস্তুর জন্ত কবিকে ভাবিতে হইল না। বিদেশে বসিয়া তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল স্বদেশেরই বিচিত্র স্মৃতিসম্ভার। বাংলার মানুষ, বাংলার মাটি-জল-হাওয়া, বাংলার ভাঙামন্দির-পূজা-পার্বণ-উৎসব, সর্বোপরি দেশের যত প্রাচীন কাব্য-কাহিনী ভিড় জমাইয়া ফেলিল কবি-মানসে, আর কবি নিপুণ মালাকারের স্তায় সেগুলি দিয়া আর্টসম্মত পদ্ধতিতে একটির পর একটি করিয়া ১০২টি সনেটের মালা গাঁথিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রথম বাংলা সনেটের জন্ম বিদেশে হয় নাই, স্বদেশের মাটিতেই তাহার উদ্ভব, এবং কবির সকল সৃষ্টির মতই কোনো একান্ত তপস্যায় নহে, নানা সৃষ্টির ভিড়ের মধ্যে; 'মেঘনাদবধ' চলিতেছে, সবে মাত্র তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন, চলিতেছে হয়ত আরও কিছুর মহড়া, তাহারই মধ্যে জন্ম লইল একটি সনেট, কারণ, "I want to introduce the Sonnet into our language."—সংকল্পটি জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হইল, "and some morning ago made the following"—অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তির আগেই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেটি হইল "কবি-মাতৃভাষা" যাহাকে আমরা পরবর্তী কালে "বঙ্গভাষা" নামক সনেটে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে পাইয়াছি।

শিল্পকলার দিক দিয়া এই সনেট কবির এক অপূর্ব সৃষ্টি। রূপে ও ভাবে এই অভিনব কবিতাদর্শ মাইকেলের হাতে যে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রথম প্রবর্তকের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর। মধুসূদনের মত প্রচণ্ড আবেগধর্মী কবি-মানস যে কী সংযমের বলে কী কঠিন তপস্যায় সনেটের মত রূপগত ও ও ভাবগত সংযম-সংহতি-সাপেক্ষ কাব্যসৃষ্টিতে ব্রতী হইয়াছিল তাহা ভাবিলে সেই অমিত-প্রতিভাধর কবির প্রতি অন্তর শ্রদ্ধানত হইয়া আসে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

মধুসূদনের পরবর্তী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদনের মত হেমচন্দ্রও বিদেশী কাব্যসাহিত্যের রসগ্রাহী ভক্ত ছিলেন এবং কাব্যরচনায় ছিলেন আধুনিক ধারারই সমর্থক। হেমচন্দ্র মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া স্পষ্টতঃ তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা

হইতেই দেখা যায় যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সমর্থক হইলেও তিনি ঠিক ইহার তাৎপর্য বা Spirit বুঝিতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্রের প্রথম কবিতাপুস্তক **চিন্তাতরঙ্গিণী**। কবির বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ-এর আত্মহত্যার কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া "চিন্তাতরঙ্গিণী" কাব্য লিখিত হয়। "চিন্তাতরঙ্গিণী" কাব্যের পর হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য **বীরবাহুকাব্য** প্রকাশিত হয়। বীরবাহু কাব্য আখ্যায়িকামূলক; এবং আখ্যায়িকার মাধ্যমে জাতির মনে স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া দেওয়াই ছিল কবির লক্ষ্য। ইহার পর প্রকাশিত হয় **কবিতাবলী**। কবিতাবলী আসলে একটি খণ্ডকাব্যের সঙ্কলনগ্রন্থ। "যমুনাতটে", "জীবনসঙ্গীত", "ভারতবিলাপ", "লজ্জাবতী লতা" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতা এই সঙ্কলন গ্রন্থের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে এই খণ্ডকবিতাতেই হেমচন্দ্রের আসল কবিরূপটি দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার কালে মহাকাব্য সৃষ্টির একটা নেশা কবি-প্রতিভাবিশিষ্ট প্রায় প্রতি মানুষকেই পাইয়া বসিত। তাই আমরা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে যথাক্রমে 'বৃত্রসংহার' ও 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' রচনা করিতে দেখি। কিন্তু এই বিষয়ে নবীনচন্দ্রের কিছুটা দাবী থাকিলেও হেমচন্দ্রের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। অথচ কবি হিসাবে হেমচন্দ্র সামান্য ছিলেন না, এবং তাঁহার এই অসামান্যতার পরিচয় 'বৃত্রসংহারে' নহে, এই 'কবিতাবলী'তে। তাঁহার 'ভারতসঙ্গীত' "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" এই ধুয়া তুলিয়া তখনকার দেশের মন মাতাইয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার বহু ব্যঙ্গ কবিতাতেও কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর মিলে।

হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা **বৃত্রসংহার** চব্বিশটি সর্গে বিভক্ত হইয়া দুইখণ্ডে (১৮৭৫—১৮৭৭ সালে) প্রকাশিত হয়। বৃত্রসংহার বাহির হইবার পর প্রথম প্রথম দেশে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং অনেকেই মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কে অপেক্ষাকৃত হীন প্রতিপন্ন করিয়া 'বৃত্রসংহার'-কে মহাকাব্যের সম্মানদানের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের বিচারে তাঁহাদের সে দাবী টিকিতে পারে নাই।

"বৃত্রসংহার" কাব্য-রচনায় একদিক দিয়া হেমচন্দ্র মধুসূদনকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন—তাহা বিষয়বস্তু-চয়ন। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশন ও প্রকৃত শিল্পচেতনার অভাবে কাহিনীর এই বিশালতাসত্ত্বেও বৃত্রসংহার মহৎ কাব্যের গৌরবলাভ করিতে পারে নাই। "বৃত্রসংহার" কাব্যের উপর মধুসূদনের

প্রভাব প্রত্যক্ষ। যদিও শেষ পর্যন্ত হেমচন্দ্র দেবপক্ষকেই সমর্থন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার দেবচরিত্রগুলি বৃত্র, রুদ্রপীড় প্রভৃতির তুলনায় অনুজ্জ্বল—ইহা "মেঘনাদ বধ" কাব্যের ভাবাদর্শ প্রভাবেই হইয়াছে মনে হয়। রুদ্রপীড়-চরিত্রটি ইন্দ্রজিত-চরিত্রের কথা মনে করাইয়া দেয়। 'মেঘনাদবধ'-এর সীতা ও সরমা বৃত্রসংহারের শচী ও চপলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাষার ক্ষেত্রেও হেমচন্দ্রের পক্ষে মধুসূদনের ঋণকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নাই। এখানে কবি আরও এক মারাত্মক ভুল করেন। তাহার মনে হইয়াছিল একটানা একই ছন্দে লিখিলে বৈচিত্র্যের অভাবে কাব্য নীরস হইয়া পড়িবে, তাই তিনি অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষরের ভেজাল চালাইয়া দেন, ফলে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার অমিত্রাক্ষরও এখানে অমিল পয়ারে পর্যবসিত হইয়াছে।

"বৃত্রসংহার"-এর পর প্রকাশিত "দশমহাবিদ্যা"-ও হেমচন্দ্রের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য সৃষ্টি।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রকে সাধারণত বলা হইয়া থাকে মধুসূদন-প্রবর্তিত নূতন কাব্যশক্তি, কাব্য-চেতনা ও কাব্য-রীতির ধারক, বাহক ও পোষক। হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও যেমন, নবীনচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তেমনি, মধুসূদনের পাশে রাখিয়া তাঁহাদের মহাকাব্য-রচয়িতা হিসাবে মূল্যায়ণ করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। কারণ ইঁহারা কেহই মধুসূদনের মত মহাকাব্য রচনার সংকল্প ঘোষণা করিয়া নামেন নাই। নিছক আকার-সাদৃশ্যে কাব্যের আসরে ইঁহাদের বৃহদায়তন গ্রন্থগুলির মহাকাব্য হিসাবে বিচার চলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইঁহাদের কাব্যপ্রয়াস মধুসূদনের অপেক্ষা বহুলাংশে ভিন্নতর। মধুসূদনের আবির্ভাবের ফলে বাংলা কাব্যে যে একটি নানামুখী ভাব-আলোড়ন জাগিয়াছিল তাহারই উত্তরাধিকার আত্মস্থ করিয়া এই দুই কবি স্ব স্ব কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও কল্পনার স্বকীয়তা যোগ করিয়া এক মিশ্র ধরণের কাব্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। তবে কবিমানসের গঠনের দিক দিয়া মধুসূদনের সহিত নবীনচন্দ্রেরই খানিকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়, হেমচন্দ্রের গঠন স্বতন্ত্র। মাইকেলের মতই নবীনচন্দ্রের কবিমানস ছিল

আবেগধর্মী। তাঁহার ভাবপ্রকাশের আতিশয্য ও উচ্ছলতায় যেন একটা পাগল্য-ঝোরার ভাব পাওয়া যায়। এই মানস-প্রবণতা নবীনচন্দ্রের রচনার কলেবর বৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে দায়ী। তিনিও যে হেমচন্দ্রের ন্যায় প্রথমে গীতিকাব্য রচনায় উৎসাহিত হন, ইহা ঐ আবেগধর্মী মনেরই পরিচায়ক।

নবীনচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কাব্য-সঙ্কলন হইতেছে **অবকাশরঞ্জিনী**। ইহার অনেক কবিতায় হেমচন্দ্রের ন্যায় স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার 'ভারত উচ্ছ্বাস' হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত'এর সহিত তুলনায় নিকৃষ্ট। 'পিতৃহীন যুবক' যদিও কবির আত্মজীবনের করুণ কাহিনীর কাব্যরূপ, তথাপি অপরিমিত দৈর্ঘ্যে ও ভাব-প্রকাশের আড়ষ্টতায় কাব্যরস উপভোগ্য হয় নাই।

কিন্তু নবীনচন্দ্র খ্যাতিমান হইয়াছিলেন তাঁহার **পলাশীর যুদ্ধ** কাব্য প্রকাশ করিয়া। কাব্যটি পাঁচ সর্গে বিভক্ত। যদিও ইহা নিকট-অতীতের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া লিখিত, তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে কল্পনা সংযুক্ত করিয়াছেন। অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনাও ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রত্যক্ষ নয়। সিরাজ-চরিত্রের বর্ণনায় নবীনচন্দ্র পূর্বপ্রচলিত ধারণার বশেই চলিয়াছেন।—"পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে সিরাজ এক দুশ্চরিত্র মাতাল যুবক মাত্র; তবে মোহনলাল চরিত্রটি কবিকল্পনায় মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে মোহনলালই এ কাব্যের নায়ক। নবীনচন্দ্র কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজবিদ্বেষ প্রচার না করিয়াও মোহনলালের মুখ দিয়া দেশের পরাধীনতার জন্য যে খেদোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এমনও বলা যাইতে পারে—নবীনচন্দ্রের নিজেরই অন্তরাত্মা মোহনলালের রূপ ধরিয়াছে।

"পলাশীর যুদ্ধ"-এর পর "ক্লিওপেট্রা"; তাহার পর "রঙ্গমতী" প্রকাশিত হয়। 'রঙ্গমতী'তে কবিকে বহুলাংশে মধুসূদনের কাব্যরীতি ও প্রভাব আত্মস্থ করিতে দেখা যায়। প্রধানত করুণরসের কাব্য হইলেও স্থানে স্থানে বীররস-সঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছে। ছন্দটি অমিশ্র অমিত্রাক্ষর, শব্দগঠন ও বাচনভঙ্গিও মধুসূদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের খাঁটি প্রাণস্পন্দন জাগানো কবির পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

নবীনচন্দ্রের পরবর্তী কাব্যত্রয়ী (trilogy) **রৈবতক, কুরুক্ষেত্র** ও **প্রভাস**। ইহা কৃষ্ণ-কথার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। প্রথমখণ্ডে কৃষ্ণে

জন্ম ও কৈশোর বর্ণিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় খণ্ডে মথুরার রাজা কৃষ্ণের বৃত্তান্ত ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ; এবং তৃতীয় খণ্ডে কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ও যদুবংশ-ধ্বংস আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শুধুমাত্র মহাভারত ও ভাগবতের এক নূতনতর কাহিনী-সংকলন নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। নবীনচন্দ্র আসলে ভারতবর্ষের এক নূতন কাব্য-ইতিহাস রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। আর্য-অনার্যের ভেদকলুষিত ভারতবর্ষকে তিনি চাহিয়াছিলেন নিষ্কামধর্মের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করিতে। এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রথমদিকে নবীনচন্দ্রকে "উনবিংশ শতকের মহাভারতকার" এই আখ্যায় সম্মানিত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের সমালোচনায় তাঁহার রচনার ও ভাব-সংহতির অনেক ত্রুটি বা শৈথিল্য ধরা পড়ায় উক্ত ত্রয়ীর আর মহাকাব্যিক মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় না। তবে ইহার মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের যে এক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা বা ভাষ্যরচনার চেষ্টা হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারে নবীনচন্দ্র যে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণ-চরিত্রের' দ্বারা প্রভাবিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। বিশুদ্ধ কাব্য-মহিমার জন্য না হইলেও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদির যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, কল্পনার বহর ও মননশক্তির জন্য নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' বাংলা কাব্যজগতে বিশিষ্ট স্থান পাইবার অধিকারী। নবীনচন্দ্রের পরবর্তী কাব্যসৃষ্টি হিসাবে **খ্রীষ্ট, অমিতাভ** ও **অমৃতাভ**-এর নাম করা যাইতে পারে। যীশুর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া 'খ্রীষ্ট কাব্য' রচিত হইয়াছিল। "অমিতাভ" বুদ্ধজীবনী কাব্য। "অমৃতাভ" তাঁহার শেষজীবনের অসম্পূর্ণ কাব্য এবং ইহা চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইতেছিল। নবীনচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল ভক্তি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—১৮৯৪) —

বিহারীলাল চক্রবর্তীর সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক বাঙলা গীতিকাব্যের জন্ম হইল। ইহার পূর্বে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদনের মধ্যে গীতিকাব্য-প্রবণতা দেখা গেলেও সার্থক গীতিকাব্যের জনক হিসাবে আমরা বিহারীলালকেই স্মরণ করিব। বাংলা গীতিকাব্যের আদিযুগের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে "ভোরের পাখী"-র সহিত তুলনা করিয়াছেন :

"বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন 'অবোধবন্ধু'কে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে। সে প্রত্যুষে

অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাঁহার নিজের।" গীতি-কবিতার প্রাণের কথাই কবির এই 'নিজের সুর।' বিহারীলাল সর্বপ্রথম "নিভৃতে বসিয়া নিজের মনের কথা বলিলেন।" ইহার পূর্বে মাইকেলের সনেটে কবির একান্ত আত্মগত মনোভাব কখন কখন প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু সনেটের কঠিন বাঁধনে স্বতঃস্ফূর্ত গীতোচ্ছ্বাসের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সম্ভব নহে। অপরাপর কবির গীতিকাব্য ফুটিয়াছে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বজায় রাখিয়া নিতান্ত আনুষঙ্গিকভাবে, বিহারীলালই সর্বপ্রথম কেবল নিজের মনের মতো করিয়া মনের কথা গাহিয়া উঠেন। এখানে কবির সম্মুখে পাঠক নাই, শ্রোতা নাই, নাই কোন তত্ত্ব-ব্যাখ্যা বা পুরাণের যুগপোযোগী ব্যাখ্যার তাড়া; ঠিক এই কারণেই এই কবির রচনায় কলা-শিল্পের সৌকর্ষ-সুষমা উপেক্ষিত দেখা যায়। বিশ্ব-প্রকৃতির ঐকান্তিক সাহচর্যলাভের জন্য কবির মন যে 'হু হু' করিত, কাব্যেও সেই হুহু করিয়া মনের প্রকাশ ঘটিয়াছে :—

"কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার;—
গিয়ে তার তীরতরুতলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শবসম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।"

কখনও কবি চাহিয়াছেন, পল্লীগ্রামে চাষীদের মাঝে গিয়া চাষীদের মত হইয়া থাকিবেন, 'বাঁশের বাঁশরী' বাজাইয়া 'সাদা সোজা গ্রাম্য গান' ধরিয়া 'সরল চাষার সনে প্রমোদ প্রফুল্ল মনে' আনন্দে শর্বরী কাটাইবেন। 'নড়বোড়ে পাতার কুটীরে স্বচ্ছন্দে রাজার মত ভূমে নিদ্রাগত' থাকিয়া 'প্রাতে উঠি দেখিব মিহিরে';—এই স্বপ্নে কবিমন ভরিয়া উঠিত।

-(৩য় পর্ব)

বিহারীলালের কবিতার উৎসার-ভূমি তাঁহার ধ্যানলোক। বিহারীলাল ছিলেন যোগিস্বভাব কবি। সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া যেন এক বিচিত্র সৌন্দর্য-শক্তির লীলা চলিয়াছে। এই সৌন্দর্যশক্তির সহিত সত্য ও মঙ্গল মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহাই কবিজীবনের উপলব্ধ সত্য। সারদামঙ্গল কাব্যে এই সৌন্দর্যশক্তিকেই "সারদা" বলা হইয়াছে। অবোধ বন্ধু পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিহারীলালের কবিতা প্রকাশিত হইত। বিহারী-লালের যে সৌন্দর্যদর্শনের কথা বলা হইল, রবীন্দ্রনাথের অনুভব তাহা হইতে খুব বেশী দূরে নয়। বিহারীলাল যাহাকে 'সারদা' বলিয়াছেন—তিনি 'কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনও কন্যা'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সারা জীবনের কাব্যসাধনায় এই শক্তিরই জয়গান গাহিয়াছেন :

> "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

বলাবাহুল্য, 'সারদা'-কল্পনা এই 'বিচিত্ররূপিণী-র কল্পনা হইতে আলাদা নয়। প্রভেদ থাকিলেও তাহা ভাবগত নয়—প্রকাশগত।

বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ **সঙ্গীত-শতক** (১৮৬২)। ইহার পর প্রকাশিত হয় **বঙ্গসুন্দরী নিসর্গ-সন্দর্শন**, **বন্ধুবিয়োগ**, ও **প্রেমবাহিনী** (১৮৭০)। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় কবির শ্রেষ্ঠ-কাব্য 'সারদামঙ্গল'। বিহারীলালের অপরাপর কাব্যের মধ্যে বিখ্যাত হইল **সাধের আসন**।

বিহারীলাল বিশেষভাবে যোগী-স্বভাব ছিলেন বলিয়া কাব্যের কারু-কলার প্রতি সবসময়ে দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র ত্রুটির কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যায় বিহারীলাল নূতন যুগের নূতন কাব্যের প্রথম ঋষি।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)

সর্বতোমুখী প্রতিভার জয়যাত্রায় জীবন যাঁহার মহিমান্বিত সেই রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য-কৃতির কণামাত্রও পরিচয় দেওয়া যায় না এরূপ স্বল্পপরিসর আলোচনায়। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, প্রবন্ধকার, সমালোচক, নাট্যকার, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, গীত-শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী, চিত্রশিল্পী, সমাজ-বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক ও সর্বোপরি এক ঋষিতুল্য চরিত্রের

অধিকারী। তিনি শুধু স্বদেশেই 'গুরুদেব' ছিলেন না। বিদেশেও তিনি বহুস্থানে পাইয়াছেন গুরু-বরণ।

১৮৬১ সালের ৭ই মে, বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ শে বৈশাখ কালকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে তাঁহার জন্ম হয়, এবং এই ঠাকুরবাড়ীরই পুণ্য পৈতৃকভূমিতে ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট, বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ তিনি দেহরক্ষা করেন। এই সুদীর্ঘ আশী বৎসরের মধ্যে ষাট বৎসরেরও অধিককাল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সরস্বতীর সেবা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা, 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায়, এবং জীবিতকালের শেষকাব্য 'জন্মদিনে' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইলে অন্তত উহাকে চারিভাগে ভাগ করিতে হয়,—(১) **কাব্য** (২) **নাটক** (৩) **উপন্যাস ও ছোটগল্প** এবং (৪) **প্রবন্ধ-নিবন্ধ**।

কাব্য—বিহারীলালকে যে রবীন্দ্রনাথ গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে অনেকের ধরণা হইতে পারে তিনি বুঝি শুধু রোম্যান্টিক কাব্য-রচনাতেই দক্ষতা অর্জন করেন; কিন্তু অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ কেবল রোমান্টিক কাব্যেরই চর্চা করেন নাই, সম্ভাব্য সকল প্রকার কাব্যেরই তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক। তাঁহার কাব্যের বিষয় ছিল সমগ্র বিশ্ব, তাই তিনি হ'ন বিশ্বকবি। বাল্যকাল হইতেই তিনি এই বিশ্বকে ভালবাসিতে শিখেন, এবং তাঁহার অসংখ্য কাব্যের মধ্যে এই বহুবিচিত্র বিশ্বেরই পাওয়া যায় বিচিত্র চিত্রণ, বিচিত্র জীবনস্পন্দন। একজীবনে এত অধিক কাব্যগ্রন্থ পৃথিবীর আর কোনো কবি রচনা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্য **প্রভাত সঙ্গীত** (১৮৮৩), যদিও কবি নিজে বলিয়াছেন, "'সন্ধ্যাসংগীতে'ই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।" কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার জন্য 'প্রভাত সঙ্গীত'এর জন্ম রহস্য না বুঝিলেই চলে না। সত্যই কোনো এক পুণ্য প্রভাতে উদীয়মান রবির কর-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-গুহা হইতে কবির জাগরণ হয়। একুশ বছরের তরুণ কবি চমকিত হইয়া গাহিয়া উঠেন :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর ;
কেমন পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান,
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ

ইহা খালি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নহে, কবি-হৃদয়ের স্বপ্নভঙ্গ। সত্যই তিনি জানেন না, তিনি ব্যক্ত করিতে অক্ষম, কি করিয়া এই হৃদয়ের দরজা খুলিয়া গেল। তাই আবার বলিলেন,—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—"

এই সুরু হইল কবির জগতের সহিত প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক আস্বাদন করা, আর ইহা হইতেই তাঁহার অজস্র কাব্যসৃষ্টি।

অতঃপর **মানসী** (১৮৯০) ও **সোনার তরীতে** (১৮৯৪) তাঁহার কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য বিকশিত হইতে দেখা যায়। এই বিকাশের পূর্ণতার পরিচয় মিলে **চিত্রা** কাব্যে (১৮৯৬)। এই কাব্যে তিনি প্রকৃতি, বিশ্বজীবন সৌন্দর্য, প্রেম এবং জীবনদেবতাকে আত্মার গভীরে উপলব্ধি করেন। '**চিত্রা**' আরও একটি বিশেষ কারণে আমাদের স্মরণীয়। রবীন্দ্রসৃষ্টির যে অজস্র বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে,—শুধু তাই নয়,—সেই সৃষ্টিগুলির মধ্যে ভাব-সঙ্গতি খুঁজিতে গিয়া আমরা যে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি, সেই বৈচিত্র্য ও বিভ্রান্তির রহস্যটি এই চিত্রা কাব্যেই মিলিবে। এখানকার 'জীবনদেবতা' নামক বিখ্যাত কবিতায় কবি জানাইয়া দিয়াছেন তাঁহার আসল কবি-প্রকৃতি, তাঁহার কবি-জীবনের লক্ষ্য, যাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, জীবনের কোন স্তরে আসিয়াই কবি থামিতে চাহেন না। সিদ্ধি নহে, সাধনাই তাঁহার কাম্য। তাই জীবনদেবতার নিকট তাঁহার প্রার্থনা, তিনি যেন ক্রমাগত নবতর, মহত্তর সৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। এই কবিতায় কবি প্রথমে জীবনদেবতাকে :

"মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম ?"

বলিয়া আত্মনিবেদনাতে স্মরিয়া পরে বলিয়াছেন, যায় যাহা আছে;

"ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।"

এই যে বারে বারে নূতন করিয়া চিরপুরাতনের সঙ্গলাভ, নব নব রূপে জগৎ ও জীবনকে আস্বাদন, ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈচিত্র্য, এই মূল সূত্রেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কেন 'গীতাঞ্জলি'র মত অধ্যাত্মসুরের কাব্যসৃষ্টির পরেও 'বলাকা'য় অমন একটা সংগ্রামীসুর ফুটিতে পারিল।

মধ্যে 'নৈবেদ্য' 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা', 'স্মরণ', 'শিশু', 'খেয়া' প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়া কবি আসিয়া উত্তীর্ণ হন **গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির** যুগে। ইহা হইল কবির একটা দীর্ঘস্থায়ী অধ্যাত্ম-চেতনা ও ভাগবত-সাধনার যুগ। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ (Song-offerings) করিয়াই কবি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। অতঃপর **বলাকায়** আবার কবির বিস্ময়কর নবযাত্রা। সমসাময়িক সমাজ-জীবনের উপযোগী যৌবনের নূতন বোধন—ও গতিতত্ত্বের মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় 'বলাকা'-কাব্য মুখরিত। বলাকার পরেও আমরা পাইয়াছি 'পলাতক', 'শিশু ভোলানাথ', 'লিপিকা' **পূরবী, মহুয়া** ইত্যাদি, এবং সর্বশেষ অধ্যায়েও দেখা যায় রচনার এক বিপুল বৈচিত্র্য,—'পরিশেষ', 'বিচিত্রিতা', **বীথিকা, পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুটশ্যামলী**, 'প্রান্তিক', 'আকাশপ্রদীপ', **সেঁজুতি', জন্মদিন** ইত্যাদির মহামূল্য ও চিত্তাকর্ষক সমাবেশ। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই শেষের দিকের লিপিকা','পুনশ্চ','শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' এই কাব্যগ্রন্থগুলি **গদ্যকাব্য** হিসাবে এক বিশেষ সৃষ্টির মহিমায় মণ্ডিত। বাঁধাধরা ছন্দ বর্জন করিয়া এগুলি একরূপ গদ্যেই রচিত, যদিও রচনা এখানে গদ্য হইয়াও কবিতা বলিয়াই গণ্য। এইগুলির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ পদ্য বা কবিতার পরিধি অসামান্যরূপে বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুর—মর্ত্যসৌন্দর্যের প্রতি আর্টিষ্টসুলভ আকর্ষণ, জগতের বৃহৎ সত্তার উপলব্ধি, অধ্যাত্মচেতনার নিবিড় আসঙ্গ। তাঁহার কাব্যের রূপকল্প, বাঙ্‌নির্মিতি, মণ্ডনকলা, উপলব্ধির তীব্রতা ও

গভীরতার অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনো একজন কবির মধ্যে এত বিপুল বৈচিত্র্যের সমাবেশ আর কখনও ঘটে নাই, কখনও ঘটিবে বলিয়াও মনে হয় না।

গান—রবীন্দ্রসৃষ্টির একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ হইল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। এত এত অধিক সংখ্যক গান জগতে আর কেহ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। এগুলি যেমন উচ্চাঙ্গের কাব্য, তেমনি সঙ্গীতের আসল ধর্ম যে প্রাণধর্ম, তাহাতে ভরপুর। অধিকাংশ রবীন্দ্র-সংগীতই উৎকৃষ্ট জীবনচর্যায় সমৃদ্ধ। ইহাদের পবিত্র-মধুর আবেদন জীবনকে পবিত্র ও আনন্দময় রাখিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বর্তমান ধর্মীয় গ্লানির দিনে এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে দৈনিক আবৃত্তির বিষয় করিলে জাতি অবশ্যই উপকৃত হইবে।

নাটক—রবীন্দ্রনাথের হাতে কাব্যের মত নাট্যসৃষ্টিরও প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ে কয়েকখানি **নাট্যকাব্যের** নাম করিতে হয়, যথা—'প্রকৃতির পরিশোধ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'কাহিনী', ইত্যাদি। এগুলি মূলত গীতিকবিতার মহিমামণ্ডিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করিতে হয়,—'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি যেগুলি কবির খাঁটি নাট্য-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করেন। তৃতীয় পর্যায়ে **প্রহসন ও রঙ্গনাট্যগুলি** লওয়া যাইতে পারে, যেমন,—'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', ইত্যাদি। **গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য** লইয়া চতুর্থ পর্যায় রচিত হইতে পারে, যাহার অন্তর্ভুক্ত কবির 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' প্রভৃতি রচনা। পঞ্চম পর্যায়ে ধরা পড়ে, **রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক-গুলি**। যথা—'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' ইত্যাদি। সূক্ষ্মবিচারে এই শেষোক্ত শ্রেণীর নাটক-গুলিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি এবং ইহাদের মধ্যেই তাঁহার মৌলিক নাট্য-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়াছে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প—সৃষ্টির অপ্রাচুর্য কোথাও নাই, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই আমরা পাই, প্রথমদিকের 'বউঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', **চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা** এবং পরের দিকে **'ঘরে বাইরে'**,

'চতুরঙ্গ', 'চার অধ্যায়', যোগাযোগ', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' ও শেষের কবিতা। এগুলির মধ্যে একহিসাবে 'চোখের বালি'-ই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি, যেহেতু ইহাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস, যাহাতে মনোবিকলন, সমাজসমস্যা-বিশ্লেষণ এবং চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশের বাস্তব রূপায়ণের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'ই আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে।' সত্যই জহুরী জহর চেনে; তাই খাঁটি ঔপন্যাসিকের হাতেই ঘটিয়াছে সার্থক উপন্যাসের মূল্যায়ন। যে অসামাজিক প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীতে লাভ করিয়াছে মূঢ়তাগ্রস্ত উদ্ভ্রান্ত নায়কের নিষ্ঠুর পিস্তলের গুলি, সেই প্রেমই রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীতে যে কিরূপে অকলঙ্ক বিহারীর শ্রদ্ধা আদায় করিল তাহা লক্ষ্য করিয়াই শরৎচন্দ্রের চোখ খুলিয়া যায়, আর তাহাতেই বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ-পন্থা বহু পরিমাণে প্রশস্ত হইয়া দেখা দেয়। তবে 'গোরা'ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যেহেতু উহা মহাকাব্য-গুণান্বিত অথবা Epic Novel বলিয়া বিবেচিত। ইহার বিপুল বহরে একটা গোটা জাতির একটা গোটা যুগের কথা স্থান পাইয়াছে। সমাজ-সমস্যা, ধর্মসমস্যা, দেশের পরাধীনতার সমস্যা সবই আখ্যায়িকার মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে। অথচ ইহার ফলে রচনাটি ইতিহাস হইয়া পড়ে নাই। উপন্যাস-রস প্রচুর পরিমাণে বজায় রহিয়াছে। কিছু আদর্শের প্রাধান্য থাকিলেও চরিত্রগুলি সবই জীবন্ত। আর রচনা কাব্যধর্মী হওয়ায় বর্ণনা বা বিশ্লেষণ অনেকক্ষেত্রেই আদরের বস্তু হইয়াছে।

ছোটগল্প—বস্তুটি যে কী, তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলায় সুস্পষ্ট হইতে পারে নাই। একহিসাবে বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই খাঁটি ছোটগল্পের জন্মদাতা। তাঁহার **গল্পগুচ্ছ** বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্প-সমাজে সমাদৃত হইবার যোগ্য। আমাদের অনেক সময় এমনও মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছুই না লিখিতেন, তবে এক গল্পগুচ্ছই তাঁহাকে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী করিত। কবি রবীন্দ্রনাথ, মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-হিতৈষী রবীন্দ্রনাথ, হাস্যরসিক ও নাট্যরসিক রবীন্দ্রনাথ,—এই সমস্ত কিছুর অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় এক গল্পগুচ্ছে। তাঁহার 'কাবুলিওয়ালা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'ছুটি', 'ঠাকুর্দা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' প্রভৃতি এমন অনেক গল্প আছে যেগুলি ছোটগল্প হিসাবে সত্যই অতুলনীয়।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ—সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, ডায়েরি—এমন কোনো বিষয় নাই যাহা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। **প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্য,** 'লোক সাহিত্য', **আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্যের পথে** প্রভৃতি হইল খাঁটি সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক গ্রন্থ। আবার 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজা-প্রজা', 'স্বদেশ', 'শিক্ষা', 'কালান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির রাজনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তাধারা, তাঁহার স্বাদেশিকতা ও শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কিত বক্তব্য। ইহা ছাড়া, 'শান্তিনিকেতন', 'ধর্ম', 'মানুষের ধর্ম, **পঞ্চভূত, বিচিত্রপ্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি,** 'ছেলেবেলা', **রাশিয়ার চিঠি, ছিন্নপত্র** প্রভৃতি প্রাবন্ধিক ও রচনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অমর কীর্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

কবি হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত হওয়ায়, অনেকেরই হয়ত ধারণা, গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু ইহা ভুল। রচনার পরিমাণ সম্ভবত পদ্য অপেক্ষা গদ্যেরই বেশী। আর সেগুলির মূল্য সম্পর্কে এই কথাই বলিতে হয়, কাব্য যতই উঁচুদরের হউক, তাহার আবেদন সীমাবদ্ধ, পক্ষান্তরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সহজেই তাঁহার গদ্যসৃষ্টির শক্তি ও মহিমার আস্বাদনে উপকৃত হইয়াছে। মননসমৃদ্ধ ও রসাঢ্য প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশের চিন্তাশীল মানুষমাত্রকেই যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, যত বিচিত্র বিষয়ে চিন্তার খোরাক যোগাইয়াছেন, আদর্শের যোগান দিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই বলিতে পারা যায় কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে আসনের যোগ্য, গদ্য রচয়িতা হিসাবে ঠিক সেই একই আসনের অধিকারী।

———

চতুর্থ পর্ব

প্রবন্ধ-রচনা

(ক) ছাত্রজীবন-প্রসঙ্গ

১। বর্তমান ছাত্রসমাজ ও শৃঙ্খলাবোধ
২। ছাত্রসমাজের শিক্ষা ও চরিত্রগত মানের অবনতি ও ইহার প্রতিকার
৩। স্কুল ম্যাগাজিন
৪। ছাত্রজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব
৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মঘট
৬। ছাত্রজীবন ও সমাজসেবা
৭। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-
৮। পরীক্ষার পূর্বরাত্রি
৯। পরীক্ষাগৃহের দৃশ্য
১০। পরীক্ষা
১১। গ্রীষ্মের ছুটি কিভাবে কাটাইতে চাও?
১২। ছাত্র ও রাজনীতি
১৩। ছাত্র-জীবনের স্মরণীয় দিন

সংকেত সূত্র

১। তোমার স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা
২। ছাত্রজীবনে নাগরিক শিক্ষা
৩। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব
৪। ছাত্রজীবনের সুখদুঃখ
৫। তোমার প্রথম ছাত্রজীবনের স্মৃতি

বর্তমান ছাত্রসমাজ ও শৃঙ্খলাবোধ

সংকেত ঃ—১। ভূমিকা—প্রকৃতির রাজ্যে ও মানুষের রাজ্যে শৃঙ্খলা-রক্ষা। ২। শৃঙ্খলা বলিতে কী বুঝায়? ৩। ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব ৪। শৃঙ্খলারক্ষা—সেকাল ও একালের ছাত্রসমাজ ৫। বর্তমান ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলাহীনতার কারণ ৬। বর্তমান ছাত্রসংঘ ও শৃঙ্খলাবোধ—সমাজের কর্তব্য।

যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে রাজ্য নিয়ম-শৃঙ্খলার রাজ্য। এখানকার প্রতিটি গতিবিধি, উত্থান-পতন, উদয়-বিলয় নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিয়মিতভাবে দেখা দেয় আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, সংঘটিত হয় ঋতু-চক্রের আবর্তন, জন্ম-মৃত্যুর খেলা—কি জীবজগতে কি জড়জগতে, এমন কি মানুষ বা মনুষ্যেতর জীবের জীবনযাত্রায় যে অজস্র বৈচিত্র্যময় ঘাত-প্রতিঘাত, তাহাও নিয়ন্ত্রিত হয় সূক্ষ্ম নিয়ম-শৃঙ্খলায়। কিন্তু এমন যে একটি নিয়মের রাজ্য, সেখানে মানুষ বলিয়া যে জীবকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে আধিপত্য বিস্তারের সনদ দিয়া তাহার মধ্যে আছে শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রবণতা। যেখানে এই প্রবণতা নাই সেই জড়রাজ্যে শৃঙ্খলাবোধের কোনো গুরুত্ব নাই, সেখানে কিছুই শিখিতে হয় না, উচিত অনুচিত বলিয়া সেখানে কিছু নাই, সমস্তই স্বভাবের নিয়মে হইয়া থাকে। বীজ হইতে গাছ, গাছ হইতে ফুল-ফল, ফল হইতে পুনরায় বীজ ও ইহার আনুষঙ্গিক ক্ষয়-বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই স্বভাবনিয়ন্ত্রিত। যেহেতু মানুষের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে শৃঙ্খলা-বোধের পাশাপাশি শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রবণতা, এবং যেহেতু তাহার জীবনের ভাঙা-গড়ার অনেকখানি দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহার নিজেরই উপর, সেইহেতু শৃঙ্খলাবোধের স্বরূপ ও মূল্যনিরূপণ মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য।

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সৌষ্ঠব-সৌকর্য ও সাফল্য একান্তভাবে নির্ভর করে শৃঙ্খলাবোধের উপর। শৃঙ্খলা বলিতে শুধু একটা রীতি বা কলা-কৌশল বুঝায় না, বুঝায় একটা যথাযথ যথাপরিমিত সময়নিষ্ঠ নিয়মনিষ্ঠ আচরণ বা কর্মধারা। আমাদের চারিদিকেই আছে একটা নিয়মশৃঙ্খলার রাজ্য। যেটি যখন যেভাবে করা উচিত সেটিকে ঠিক তখনই সেইভাবে করিতে পারিলেই শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। অর্থাৎ মোটামুটি বিচারে, "যখন"

"যে-ভাবে", এই দুইটি মূল শাখায় বিষয়টির বিচার করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে প্রথমটিতে ধরা পড়ে সময়নিষ্ঠা ও ক্ষেত্রনিষ্ঠা, অর্থাৎ যে-সময়ে ও যে-ক্ষেত্রে যেটি বিধেয়, সেই সময়ে ও সেই ক্ষেত্রে সেটির বিধান করা; আর দ্বিতীয়টিতে, অর্থাৎ "যে-ভাবে" এই পর্যায়ের মধ্যে আছে বাকী সমস্ত কথা যাহা নিঃশেষে বর্ণিত করা সম্ভব নহে,—বিনীতভাবে কি সংযতভাবে, সত্বর কি মন্থর, মনোযোগী হইয়া বা উদাসীন হইয়া, হাল্কা ভাবে কি গম্ভীর ভাবে—ইত্যাদি বহুবিধ আচরণভঙ্গীর কথা এইখানে আসিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইবে, শৃঙ্খলাবোধ এমনই একটা জিনিষ যাহা জীবনের শুধু কোনো একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ প্রত্যেক বয়সের মানুষেরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে, আচরণের একটা বিধি-বিধান আছে; কোন্‌টি কখন, কোথায়, কিভাবে করিতে হয়, তাহার একটা রীতি আছে, ইহা মানিয়া চলাতেই কৃতিত্ব ও সাফল্য।

কিন্তু এই শৃঙ্খলাবোধের বুঝি ছাত্রজীবনে যত মূল্য, এত আর কোনো সময়ে নয়। কারণ ছাত্রজীবন হইল সর্বাত্মক গঠনের জীবন। ভবিষ্যতের মানুষটি এই সময়েই গঠিত হয়। এই সময়ে যে জাতীয় অভ্যাস রচিত হইবে, তাহাই হইবে ভবিষ্যজ্জীবনের নিয়ামক। ছাত্রজীবনেই ঘটিয়া থাকে জীবনের বহু-বিচিত্র উন্মেষ, এবং এই উন্মেষকালেই শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। বোধোদয় যখন ঘটে, তখনই মানুষকে সতর্ক হইতে হয়, এবং সেই সতর্কতার প্রধান উপায়, নিয়মশৃঙ্খলার পথে থাকিয়া বোধোদয় লাভ করা। উচ্ছৃঙ্খলতা সকল অনর্থের মূল। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জীবনের বিকাশ ঘটিবে, ইহাই ছাত্রজীবনের লক্ষ্য। কিন্তু শৃঙ্খলাহীন যে ছাত্রজীবন, তাহাতে এই বিকাশ সহজেই বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। এই জীবনের অন্যতম লক্ষ্য বিশ্বপরিচয়ের সাথে সাথে আত্মপরিচয় লাভ বা আপন শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি। এখানেও সুশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল পরিচয় বা উপলব্ধির কথা আসে, এবং এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ। একটিতে গড়ে মানুষ, আর একটিতে গড়ে অমানুষ।

একদিন ছিল যখন ছাত্রজীবন বলিতেই বুঝাইত শৃঙ্খলার জীবন। তখন বিশেষধরণের ছাত্রজীবন যাপনের ফলে শৃঙ্খলাবোধ ছাত্রদের ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের মত অবশ্য পালনীয় ও অনায়াসসিদ্ধ। ব্রহ্মচর্যাদি পালনের মধ্যে

যে আশ্রমিক জীবন যাপন করিতে হইত তাহার শিরায় শিরায় ছিল শৃঙ্খলাবোধ। এই 'বোধ'-বর্জিত হইয়া তখন ছাত্র হওয়ার উপায় ছিল না, তৎপূর্বেই তাহার ছাত্রত্ব খারিজ হইয়া যাইত।

কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। এযুগের ছাত্রকে পৃথকভাবে শৃঙ্খলা-বোধ শিখিতে ও শিখাইতে হয়। যে জীবনধারার অনুসরণে সেকালের ছাত্র শৃঙ্খলাবোধ শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজে আয়ত্ত করিত, সেই জীবনধারা এখন অন্তর্হিত। তাই বর্তমান ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলাবোধের উপযোগিতা পৃথক একটি আলোচনার বিষয় হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। কারণ ছাত্র চিরকালই ছাত্র; সেকালেও যেমন, একালেও তেমনি, ছাত্রজীবন শিক্ষার জীবন, গঠনের জীবন, বিকাশের জীবন, ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির জীবন। শৃঙ্খলাবোধ ব্যতীত যে এই শিক্ষা, গঠন, বিকাশ ও প্রস্তুতি সুন্দর ও সুষ্ঠু হইতে পারে না, ইহা অবিসম্বাদিত। কিন্তু অবস্থার গতিকে বর্তমান ছাত্র-সমাজে ঐ শৃঙ্খলাবোধের দেখা দিযাছে শোচনীয় অভাব।

প্রথমত, কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশে যে গৃহাশ্রম ছিল, এখন আর তাহা নাই; এখন গৃহ আছে, আশ্রম নাই; নাই সেই আশ্রমোচিত গৃহশিক্ষা যাহার ফলে শৃঙ্খলাবোধ ছাত্রদের রক্তের মধ্যে গাঁথিয়া থাকিত। দ্বিতীয়ত, বর্তমান যুগ এত বেশী সমস্যাবিড়ম্বিত যে অভিভাবকশ্রেণীর যাঁহারা, তাঁহারা প্রায়ই ছেলেমেয়েদের আচার-আচরণের ঠিকমত তদারক করিতে পারেন না। তৃতীয়ত, ব্যক্তিচেতনা ক্রমশই উগ্র হইয়া দেখা দিতেছে। তাহার ফলে শাসন-সংশোধনের গণ্ডী হইতেছে সঙ্কুচিত। অপ্রাপ্তবয়স্করাও পাইতেছে স্বাধীন গতিবিধির অবাধ অধিকার কিছু বেশি মাত্রায়। ফলে অধিকারের নামে তাহারা লাভ করিতেছে অন্যায় প্রশ্রয়। শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকে আজ তাই ছাত্রেরা অনেকসময়ই ব্যাখ্যা করে আত্মসম্মানের অন্তরায়রূপে, আর সে ব্যাখ্যায় উৎসাহ পাওয়াও দুর্লভ নয়। সর্বোপরি, আজ ছাত্রসমাজে প্রবেশ করিয়াছে রাজনীতির প্রভাব, যাহা শৃঙ্খলাবোধের প্রতিষ্ঠার পথে ঘোরতর অন্তরায়।

এই সকল কারণে বর্তমান ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলাবোধের ব্যাপক অভাব লক্ষিত হয়। ইহার উপর আছে সংঘ-গঠনের প্রতিক্রিয়া। সংঘের শক্তি কল্যাণকর হওয়াই কাম্য। কিন্তু অবস্থা-বৈগুণ্যে বর্তমান যুগে প্রায়ই দেখা

যায়, ছাত্রসংঘের কার্যকলাপে শৃঙ্খলা-ভঙ্গেরই উন্মাদনা। এবং এই উন্মাদনা সংক্রামক রোগের মত ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছে শহর হইতে মফঃস্বলে। অথচ ছাত্রগণ যদি প্রথম হইতেই শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে শিখে, তবে সেই ভাবে সুশিক্ষিত ছাত্রদের লইয়া গঠিত যে ছাত্রসংঘ, তাহা দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। সুতরাং কেবলমাত্র সংঘ বা সংসদের নেশায় না মাতিয়া ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ছাত্রের প্রথমে শৃঙ্খলাবোধ অর্জন করা, আয়ত্ত করা, অভ্যাস করা কর্তব্য। এই অমূল্য বোধ-শক্তির অভাবে আজ যে দিকে দিকে ছাত্র-আন্দোলনের নামে উচ্ছৃঙ্খল জনতার উন্মত্ততাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহা ছাত্রসমাজের নিদারুণ কলঙ্কের বিষয়, এবং শুধু ছাত্রসমাজ নহে, সমগ্র জাতির এই অধঃপতন সম্পর্কে সমাজস্থ সকলেরই অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

ছাত্রসমাজের শিক্ষা ও চরিত্রগত মানের অবনতি ও ইহার প্রতিকার

সংকেত ঃ—১। ভূমিকা ২। পঁচিশ বছর আগের ও এখনকার শিক্ষা ৩। মান-অবনমনের কারণ বিশ্লেষণ—বিদ্যালয়ে এখন আর কোনো কড়াকড়ি থাকিবার উপায় নাই—'মুখস্থ' অভ্যাস নিন্দিত—ব্যাকরণের বাঁধন নাই—পাঠ্যতালিকার স্ফীতি—পঠন-পাঠনের ত্রুটি—শিক্ষক-ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব ৪। গুরুতর কারণ দুইটি, অযোগ্যকে প্রমোশান দিয়া তোলা ও ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবজনিত নিদারুণ অমনোযোগ-অবহেলা—না-পড়িয়া-পাশ-করিবার দূষিত মনোভাব ৫। চারিত্রিক পতনের কারণ ৬। প্রতিকার—শৃঙ্খলাবোধের পুনরুদ্বোধন—অভিভাবক ও শিক্ষকের সহযোগিতা।

যে-কোনো সমাজ-সমালোচকের মুখে আজ এই কথা যে, ছাত্রসমাজের শিক্ষা ও চরিত্রগত মানের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। সে-যুগের একজন শিক্ষিত ছাত্রের সহিত এ-যুগের ছাত্রের কোনো তুলনাই হয় না। জ্ঞানের দিক দিয়া ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়া একালের ছাত্র বহুলাংশে অধঃপতিত। এই যুগ-বিভাগ বা কাল-বিভাগের জন্য কোনো মেহনতের প্রয়োজন নাই; যতই অতীতের দিকে যাওয়া যায় ততই উন্নতি, আর যতই আধুনিক কালের

খবর নেওয়া যায়, ততই অধোগতির সন্ধান মিলে—ইহাই হইল প্রস্তাবটির মোটামুটি চেহারা। তবে অতি সাম্প্রতিক কালে এই অধোগতি দ্রুততর হইয়া রীতিমত এক সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে।

সেই বঙ্কিমের যুগের কথা ছাড়িয়া দিলাম; পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার একজন প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র যে শিক্ষা লাভ করিত, আজ একজন গ্র্যাজুয়েটের নিকট হইতেও আর তাহা আশা করা যায় না। আবার, সেই সময়কার একজন সাধারণ গ্র্যাজুয়েট যাহা শিখিত, আজ কোনো এম্, এ, পাশ-করা ছাত্র সেটুকুরও পরিচয় দিতে না পারিয়া অবশেষে ডক্টরেট্ ডিগ্রীতে আত্ম-গোপন করিয়া বাঁচেন, কারণ এখন আর ডক্টরেট্ পাইবার জন্য বিদ্বান হওয়ার দরকার করে না, কলাকৌশল জানিলেই হয়। শিক্ষার এই অধোগতি ক্রমশ এক সর্বনাশা আকার ধারণ করিতেছে।

কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের পরিবর্তে বিদেশীভাষায় শিক্ষাদানের ফলে লোকে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করে না। কথাটি একটি চিরন্তন সত্য, এবং অন্যান্য বিষয়ে কোনো গলদ না থাকিলে এই সত্যই ফলিয়া উঠা উচিত। কিন্তু বর্তমানে আমরা কী দেখিতেছি? এখন তো মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বহুল প্রচলন হইয়াছে, তবে কেন শিক্ষার মান ক্রমাবনতির পথ বাহিয়া চলিয়াছে? পূর্বেকার শিক্ষার অতিপ্রাথমিক স্তরের গুরুমহাশয় ও তাঁহার বেত্রদণ্ডকে নিন্দিত করিবার জন্য এ যুগের অনেকে অনেক বিদ্রূপাত্মক ভাষাচিত্র রচনা করিয়া শিশু-দরদী লেখকের ও চিন্তা-নায়কের খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ঐ বেত্রদণ্ডকে সোনা দিয় বাঁধাইবার কথা কখনই উঠিতে পারে না, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, বর্তমানে তো 'কিণ্ডারগার্টেন'-'মণ্টেসারি' প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর প্রথায় আরামে-বিরামে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে,—অন্তত পক্ষে স্কুল হইতে কোনোরূপ দৈহিক শাস্তির পাট তুলিয়া দিয়া সেখানকার আবহাওয়াও বেশ খেলা-ধূলা-রেডিও-রঙ্গরসে রসালো করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে কেন সেই গোড়ার শিক্ষাতেই এত গলদ থাকিয়া যাইতেছে? শিক্ষা-নীতি বা শিক্ষাগত মনস্তত্ত্বের সহিত না মিলিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই, সেই উৎকট বেত্রদণ্ডের যুগে এবং স্কুলে সেই কড়া শাসনের যুগে ছাত্রেরা যাহা শিখিয়াছে, বড়ই পরিহাসের বিষয়, আজ আবার তাহারই অভাবের জন্য দীর্ঘশ্বাস

পড়িতেছে। সেযুগে মুখস্থ বিদ্যার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। পরের যুগে তাহাকে নিন্দিত করা হইল তীব্রতম ভাষায়; ঠিক হইল তোতাপাখীর মত বুলি আওড়ানাতে (parrotting) কোনো কৃতিত্ব স্বীকার করা হইবে না, ছাত্রের পক্ষে পাশ নম্বর পাওয়াই ভার সূক্ষ্মদর্শী বিচারকের কাছে। যুক্তি-স্বরূপ বলা হইল, 'আমরা যতই বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।*** ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি।' কিন্তু, হায় গুরুদেব, তুমি যতই আমাদের আলোকে লইয়া যাইতে চেষ্টা কর না কেন, আমরা যে আরামের সন্ধান পাইলেই নাচিয়া উঠি; তুমি বিশ্বভারতীতে কী বিকল্প শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়াছ তাহা কে দেখিতেছে? তুমি কোন্ সুরে, কী উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্থ-করণ নিন্দিত করিয়াছ, তাহা কে ভাবিতেছে? মুখস্থ করিতে হইবে না—এই আরামের কথায় সকলেই নাচিয়া উঠিল। ফলে মুখস্থ করা অভ্যাসের দরুণ যাহাকিছু আয়ত্ত হইত তাহাও হইল না। আজ একজন ভাল পাশ-করা শিক্ষককে কখনও শোনা যাইবে না যে তিনি ইংরাজী বা বাংলা—সংস্কৃত তো দূরের কথা—কিছু ভালো রচনার নমুনা ছাত্রদের আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন।

ব্যাকরণ বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শুধু ভাষাজ্ঞান—রচনাশক্তি—লিখিবার বলিবার ক্ষমতা হইলেই হইবে। কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যাকরণের সহায়তা ব্যতীত কিরূপে সম্ভব, সে কথা তোলা রহিল। পূর্বে এরূপ ছিল না। ব্যাকরণের ভিত্তিগঠনের উপর জোর দেওয়া হইত, হয়ত সেই জোরের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত বেশি ছিল, কিন্তু মনোযোগী শিক্ষার্থী মাত্রেরই ঐ ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষাজ্ঞান তথা স্বাধীনভাবে লিখিবার ক্ষমতা সহজেই গড়িয়া উঠিত। বর্তমানে যে উঁচু ক্লাশের ছাত্রেরাও স্বাধীনভাবে দুই ছত্র নির্ভুল লিখিতে পারে না তাহার কারণ কি ঐ ব্যাকরণগত শৈথিল্য নহে?

পূর্বেকার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক দিয়া যথেষ্ট ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ছিল অল্প; বর্তমানে ঐ সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যতই শিক্ষার মান নামিতেছে, ততই পাঠ্যতালিকায় পুস্তক ও বিষয়-বৈচিত্র্যের ভীড় জমিতেছে। যদি বলা যায়, এই পাঠ্য-

তালিকার স্ফীতিই শিক্ষা-মানের অবনতির অন্যতম কারণ, তবে বোধহয় খুব অসমীচীন হইবে না।

আমাদের ছাত্রসমাজের শিক্ষার মানের অবনতির কারণ সম্যক বিশ্লেষণ এইরূপ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত কারণগুলি হয়তো কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান; উহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য হইল, পঠন-পাঠনের ত্রুটি, অতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যাজনিত প্রতিকূল আবহাওয়া, শিক্ষক-ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব, পরীক্ষা-পদ্ধতির গলদ প্রভৃতি আরও অনেক কিছু। কিন্তু দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এখনও আলোচনার বাহিরে রহিয়াছে। একটি হইল, অযোগ্য ছাত্রকে প্রমোশন দিয়া উপরের ক্লাশে তোলা। শুনিতে বিষয়টি তুচ্ছ, কিন্তু আসলে খুবই মারাত্মক। আজকাল খুবই দেখা যায়, দুই চারিটি স্কুল বাদে প্রায় স্কুলেই প্রচুর ছাত্র, সেই অনুপাতে শিক্ষক, সেই অনুপাতে স্কুলের আসবাব ও আড়ম্বর। এই আসবাব-আড়ম্বর, শিক্ষক সংখ্যা ও সবকিছু মিলিয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্তৃপক্ষকে আর্থিক বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকিতে হয় এবং স্কুলের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে ছাত্র-সংখ্যার উপর। এই ছাত্রসংখ্যা বজায় করার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রধানত প্রমোশানের তালিকা নির্মিত হয়। ফলে বহু অযোগ্য ছাত্রই অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে প্রমোশন পাইয়া থাকে। এইভাবে অবস্থাটি দাঁড়ায় এই যে, বিরাট একদল ছাত্র সেই গোড়া হইতেই অযোগ্যতা সত্ত্বেও প্রমোশন পাইতে পাইতে উপরে উঠিতে থাকে, মধ্যবর্তী কোনো স্তরেই তাহাদের আর গোড়ার গলদ সংশোধন করা ঘটিয়া উঠে না। অবশেষে যখন কোনো 'ফাইনাল' পরীক্ষায় খাঁটি পরিচয় দিতে হয়, তখন কিরূপে সে পরিচয় সম্মান-যোগ্য হইতে পারে? অথচ সেই 'ফাইনাল' পরীক্ষাতেও কর্তৃপক্ষকে দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া ঐ অযোগ্যদের অনেককেই তরাইয়া দিতে হয়, এবং যেই একটি সার্টিফিকেটের ছাপ পড়িল, অমনি তাহাই হইল শিক্ষার ও যোগ্যতার নির্ণায়ক। শুধু কি তাই? হয়তো ইহাদের মধ্যেই অনেকে পাইল শিক্ষকতা। অলমতিবিস্তরেণ। আরম্ভ হইল দুষিত চক্রের আবর্তন।

দ্বিতীয় কথা, বর্তমান ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলাবোধের অভাব। এই ত্রুটি একাই একশ'। ইহা হইতেই আসে অমনোযোগ, ঔদাসীন্য, পাঠের প্রতি

বীতরাগ, শিক্ষকের ও তাঁহার অধ্যাপনার প্রতি অশ্রদ্ধা, আলস্য, গোষ্ঠীপ্রিয়তা, বহুবিচিত্র অনাচার ও আরও অনেক কিছু। না-পড়িয়া পাশ করার যে দূষিত মনোভাব বর্তমান ছাত্রসমাজকে পাইয়া বসিয়াছে, এই শৃঙ্খলাবোধের অভাবই তাহার মূল উৎস। আর, ইহাই মনে হয় শিক্ষা-মানের অবনতির সর্বপ্রধান কারণ।

এই প্রসঙ্গেই আসে ছাত্রদের চরিত্রগত মানের কথা। যেখানে শৃঙ্খলা-বোধ নাই, সেখানে চারিত্রিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সূক্ষ্মবিচারে শৃঙ্খলা বলিতে বুঝায় একটা যথাযথ যথাপরিমিত সময়নিষ্ঠ নিয়মনিষ্ঠ আচরণ বা কর্মধারা। শৃঙ্খলারক্ষার প্রতি নিষ্ঠার অভাবে এ যুগের ছাত্রদের আচরণ কদাচিৎ যথাযথ যথাপরিমিত হইতে দেখা যায়। তাহাদের না আছে বিনয়, না আছে সংযম, না আছে মনঃসংযোগ, না আছে দায়িত্ববোধ বা কর্তব্যনিষ্ঠা। সর্ববিষয়েই তাহারা হয় হাল্কা চালে চলিতে অভ্যস্ত। ইহার উপর আবার আছে সংঘ-গত শক্তির প্রশ্রয়। অর্থাৎ এই সমস্ত চারিত্রিক পতন লইয়াই ছাত্রেরা যখন সংঘবদ্ধ হয়, তখন আর তাহাদের সেই পাতিত্য হইতে মুক্তির কোনো পথই খোলা থাকে না।

প্রতিকারের কথায় বলিতে হয়, শিক্ষাগত ও চরিত্রগত, এই যে দুইজাতীয় মানের অবনতির কথা আলোচিত হইল, দুইয়েরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকার-পন্থা নির্দেশ করা যাইতে পারে; কিন্তু যেহেতু শিক্ষা ও চরিত্র, মানুষের জীবনে এই দুইটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেই হেতু এমন একটি পন্থার নির্দেশ দেওয়া অসম্ভব নহে যাহাতে একই সঙ্গে দুইটির বলিষ্ঠ প্রতিকার মিলিতে পারে। ইহা আর কিছু নহে, ঐ বহু-আলোচিত শৃঙ্খলাবোধের পুনরুদ্বোধন। যথাযোগ্য আচরণ ও কর্মধারা অভ্যাস করিতে শিখিলে শুধু চরিত্রই উন্নত হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মানও উন্নত হইবে। কারণ ঐ শৃঙ্খলাবোধই ছাত্রকে শিখাইবে শিক্ষাজগতে তাহার কর্তব্যপথ। কিন্তু সমস্যা হইল এই শৃঙ্খলাবোধের উদ্বোধন কিভাবে হইতে পারে। ইহার কোন সোজা সড়ক কেহই দেখাইয়া দিতে পারে না। ইহার জন্য চাই ছাত্রের গার্হস্থ্যজীবন ও বিদ্যালয়-জীবন উভয় ক্ষেত্রেই সচেতনতা। পূর্বে ইহার জন্য আমাদের সমাজের বিশেষ দুর্ভাবনা ছিল না, তাহার কারণ তখন সমাজে ছিল গৃহাশ্রমের মঙ্গলশাসন। আজ নানা কারণে সেই আশ্রম ভাঙিয়া গিয়াছে।

গৃহ আছে, আশ্রম নাই। তাই শিশুর যে প্রাথমিক গঠন সেইখানেই ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে। সে আদর পাইতেছে, আদর্শ পাইতেছে না। অভিভাবকেরা নামেই অভিভাবক, অভিভাবনা কিছুই করিতেছেন না, শত অজুহাতের মধ্যে আত্ম-সমর্থন খুঁজিতেছেন। কিন্তু অজুহাতের অভাব শিক্ষকদেরও তো কিছু কম নাই; বরং শিক্ষকদের অনেক কথাই যুক্তিপূর্ণ। বাড়ীর বাঁধন যদি কিছুই না থাকে, তবে স্কুলের মাপাজোঁকা দমবন্ধ করা জীবনের মধ্যে শিক্ষক কী চরিত্রগত আদর্শ ফলাইতে পারেন? অতএব শিক্ষক ও অভিভাবক যদি কোনোদিন এই চরিত্রগঠন ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সহযোগী হইতে পারেন, তবেই নির্ভরযোগ্য প্রতিকার মিলিতে পারে; এবং ছাত্রের চরিত্র গঠিত হইলেই শিক্ষাব্যবস্থায় শতত্রুটি সত্ত্বেও শিক্ষাগত মানের উন্নয়ন দুরাশা নহে।

স্কুল ম্যাগাজিন

সংকেত :—১। অন্যান্য পত্রিকা ও স্কুল-ম্যাগাজিন। ২। ইহার মূল্য-নির্ণয়। ৩। ইহার খাঁটি স্বরূপ---সৃষ্টিরহস্য—বিভিন্ন-বিভাগের কথা—ব্যবহারিক জীবনে ইহার অবদান। ৪। স্কুল ম্যাগাজিনের ত্রুটি ও প্রতিকারের কথা।

স্কুল ম্যাগাজিনের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু এই পরিচয় অনেকের কাছে নিতান্তই মামুলী ধরণের, ম্যাগাজিনের আন্তর পরিচয়টি পরিচ্ছন্ন না হলে এর স্বরূপ নিঃশেষে ধরা পড়ে না। বাস্তবিক স্কুল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ, এর জন্য আমাদের জানতে হবে ম্যাগাজিনের মর্মকথা। বর্তমান যুগে অসংখ্য ধরণের পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনমনের চাহিদা মেটাতে। স্কুল-ম্যাগাজিন কিন্তু সেই ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার বস্তু নয়। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যে সে সম্পূর্ণ অন্য জগতের।

স্কুলে ছাত্রজীবনের শুরু, আর স্কুল-ম্যাগাজিনেই ছাত্র সর্বপ্রথম লেখনীর মাধ্যমে তার স্বাধীন মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পায়। বিকাশোন্মুখ ফুল-কলি যেমন বারিধারাস্পর্শে দল মেলে ফোটে, তেমনি ম্যাগাজিনের

সহায়তায় ছাত্রের স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে। পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর বাইরে ছাত্রের নিজস্ব চিন্তাধারা বিকশিত করতে স্কুল-ম্যাগাজিনের মূল্য অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতের কবি, গল্পলেখক এবং প্রবন্ধকার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম সাহিত্যিক চর্চার সুযোগ পায়। স্কুল-ম্যাগাজিনে ছাত্র-মানসের প্রতিফলন ঘটে, তাই ছাত্রজীবনের এ একটা অপরিহার্য অঙ্গ ; ছাত্রমনের চিন্তাধারার ধারক ও বাহকরূপে স্কুল-ম্যাগাজিনের পবিত্রতাও চিত্তস্পর্শী।

স্কুল-ম্যাগাজিনের প্রকৃত পরিচয় নিতে গেলে আগে দেখতে হবে কি করে ম্যাগাজিনের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টি-রহস্যের মূলে আছে সৃজনধর্মী কিশোর-মানসের কতই না নাম-না-জানা ভাবের বুদ্‌বুদ্ ; তার সঙ্গে সংযুক্ত হয় কোনো প্রবীণ শিক্ষক-হৃদয়ের সস্নেহ উদ্যোগের মধুর উত্তাপ। নির্বাচিত হয় ছাত্রদের মধ্য থেকেই ম্যাগাজিন-সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলী। সম্পাদক একজনই হোক বা একাধিক হোক, এদের গুরু-দায়িত্ব চিন্তার বিষয়। যদিও ম্যাগাজিনের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন, তথাপি প্রাথমিক সম্পাদনার পবিত্র দায়িত্ব থাকে সম্পাদকের উপরই ন্যস্ত, ম্যাগাজিনই দিয়েছে তাকে একটা সম্পাদনার অধিকার জীবনের কিশোর বেলায়। তা ছাড়া বিভিন্ন-শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে ম্যাগাজিনই জোগায় লেখার প্রেরণা ; লেখা যাতে ম্যাগাজিনের পাতায় প্রকাশিত হয় সেই উদ্দেশ্যে ছাত্ররা যথাসাধ্য সুন্দর করে লিখতে চেষ্টা করে, যার ফলে তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে আর প্রকাশভঙ্গীও হয় সাবলীল। ছাত্রদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ হতে থাকে শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ চিন্তামূলক প্রবন্ধে ম্যাগাজিন সমৃদ্ধ করেন ; প্রধান শিক্ষক মহাশয় হয়তো কিছু উপদেশবাণী দান করেন ; ক্রীড়া-সম্পাদক স্কুলের ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি বার্ষিক খেলাধুলার খবর পাঠায় ; ছাত্রেরা কেউ হাতে আঁকা ছবি, কেউ ক্যামেরায় তোলা ফটো ম্যাগাজিনের পাতায় ছাপাতে চায় ; এইভাবে গঠিত হয় ম্যাগাজিনের কলেবর। এর পর ছাপার পালা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সম্পাদকগণ কোনো সুবিধাজনক প্রেস নির্বাচিত করেন সম্পাদকগণ প্রুফ্ দেখার কাজে হাতে খড়ি পায়। ম্যাগাজিন প্রকাশের আশায় ছাত্ররা ব্যাকুল প্রতীক্ষাভরে দিন কাটায়। যেসব ছাত্র ম্যাগাজিনের জন্য লিখেছে তাদের কৌতূহল, ঔৎসুক্য ও উদ্বেগের মাত্রা কে ঠিক করবে

সকলের লেখা অবশ্যই ছাপা হতে পারে না, কেউ কেউ আবার একাধিক বিষয়ে লেখা পাঠিয়েছে। স্কুলের সব ছাত্রই আশা করে তাদের ম্যাগাজিন অন্য স্কুলের ম্যাগাজিনের থেকে উন্নততর হোক। এইভাবে স্কুল-ম্যাগাজিন সৃষ্টি করে একটা কল্যাণী প্রতিযোগিতার মধুর আবহাওয়া। ম্যাগাজিন প্রকাশিত হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে সেগুলি সুষ্ঠু বিতরণের দায়িত্বও নগণ্য নয়। এইভাবে দেখা যায়, স্কুল-ম্যাগাজিন ছাত্রগণকে পত্রিকা-সম্পাদনার ব্যাপারে বেশ একটা প্রাথমিক শিক্ষা দান করে। স্কুল ম্যাগাজিন পুরোপুরি ছাত্রদের পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্ররা যে সম্পাদনা, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশনা, প্রেসের প্রুফ্ সংশোধন, পত্রিকার কপিগুলির সুষ্ঠু বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনের একটা বনিয়াদ রচনা করার সুযোগ পায়, ছাত্রজীবনে তার মূল্য অসাধারণ।

অধিকাংশ স্কুল-ম্যাগাজিনে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। মাত্র কয়েকটি বাছাই ছাত্রের লেখা ম্যাগাজিনে ছাপা হয়, অন্যদের লেখা হয় পরিত্যক্ত। আবার অধিকাংশ ছাত্র লেখনীধারণে পরাঙ্মুখ হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকগণের লেখাতেই ম্যাগাজিনের পাতা ভরে ওঠে। ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের লেখা বেশী হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়, ছাত্রমানসের বিকাশ তবে অসম্ভব হয়ে উঠবে, পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। সর্বদাই ম্যাগাজিনের প্রচেষ্টা হবে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে লেখার প্রেরণা দান করা, সম্পাদকদের উচিত হবে পক্ষপাতশূন্যভাবে উৎকৃষ্ট রচনাকে পত্রিকায় স্থান দেওয়া। অনেক স্কুলে ম্যাগাজিনের জন্য যখন ছাত্রদের কাছে লেখা চাওয়া হয়, তখন ওদিকে চলতে থাকে আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব যার ফলে ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে ম্যাগাজিনের জন্য লিখতে পারে না। সারা বছর যদি ছাত্ররা কিছু কিছু লিখে যেতে থাকে, তবে এই অসুবিধা এড়ানো যেতে পারে।

স্কুল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে একটা স্কুলের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আমরা পেতে পারি। ছাত্রজীবনের প্রতিভূস্বরূপ এই স্কুল ম্যাগাজিনের উত্তরোত্তর উন্নতি সকলেরই পরম কাম্য।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব

সংকেত :—১। ছাত্রজীবনের স্বরূপ ২। ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ—অপরাপর কর্তব্য ৩। বর্তমান সমস্যা-কণ্টকিত জীবন ও ছাত্র-কর্তব্য পালন ৪। ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা—আত্মগঠনের ও সমাজসেবার দায়িত্ব। অন্যায়ের প্রতিকারে যুবশক্তি যোগানের দায়িত্ব।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে বসিযা প্রথমেই মনে আসে, ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষ আপনার সম্বন্ধে যাহা আশা করে তাহা করায়ত্ত করিবার প্রস্তুতিকালই হইল ছাত্রজীবন। বিচিত্র মানুষ, তাই তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষাও বিচিত্র। কেহ চায় সরকারী বা সওদাগরী অফিসে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করিতে, কেহ চায় সে বড়ো হইয়া ডাক্তার, ইঞ্জিনিযার বা অধ্যাপক হইবে, আবার কাহারও অভিলাষ উপযুক্ত শিক্ষাবসানে সে রাষ্ট্রনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইযা জাতির কল্যাণ সাধনায় আত্মনিযোগ করিবে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই যে শিক্ষার প্রযোজন আছে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এ-শিক্ষা প্রধানত স্কুল-কলেজের শিক্ষা। অতএব সংক্ষেপে বলা যায় বিদ্যালয়ে অধ্যযনকালই ছাত্রজীবন।

ছাত্রজীবনের কর্তব্যসম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের আর্য ঋষিগণ অধ্যয়নকেই একমাত্র তপস্যারূপে গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিযাছেন। এ যুগের অনেকেই এই কর্তব্যসূত্রটি ধরিয়া নানা টিপ্পনী কাটিয়া থাকেন। যথা, ইহা সত্যযুগীয়, ইহা প্রগতিবিরোধী, 'বোপদেব' বা 'বুনো রামনাথে'র প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, ইহাই তো মানুষকে করে গ্রন্থকীট—ইত্যাদি আরও কতো কী! কিন্তু যে সত্য শাশ্বত, কোনো টিপ্পনীতেই তাহা ক্ষুণ্ণ হইবার নয়। 'ছাত্রাণা-মধ্যয়নং তপঃ' ইহাই ছাত্রজীবনের প্রধানতম কর্তব্য—সর্বদেশে সর্বকালের সর্বযুগের। 'তপঃ' বা তপস্যা কথাটিতেই যাঁহারা আঁৎকাইয়া উঠেন তাঁহারা ইহার ব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। তপোধর্মী ভারতবর্ষ তাহার আদর্শের কথা তপস্যার দৃষ্টান্তেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে। তপস্যার মধ্যে যে গভীর মনঃসংযোগ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সংকল্প প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণের কথা নিহিত, অধ্যয়নকে সফল করিতে হইলে যে সেইগুলিরই প্রয়োজন, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? সুতরাং প্রাচীন ঋষি-

বাক্যটির ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ, এক, ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই প্রধানতম কর্তব্য, আর, সেই অধ্যয়নকে দেখিতে হইবে হাল্কা চোখে নহে, তপস্যার চোখে, তবেই অধ্যয়নের পরিপূর্ণ সাফল্য হইবে করায়ত্ত। আজ যখন নানা কারণে শিক্ষার্থী-দের জীবনে বিভ্রান্তির) ঝড় বহিতেছে, তখনই কি আরও বেশি করিয়া সেই চিরন্তন সত্যটির আশ্রয়ে পথ খুঁজিয়া পাইবার ও জীবনের মূল্য বুঝিয়া লইবার কথা নহে? আজিকার ছাত্রসমাজ আগামী দিনের দেশনায়ক, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ-সংস্কারক। অতএব ছাত্রাবস্থায়ই তাহাদের চরিত্র-গঠন করিতে হইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাস-যোগ সম্বন্ধে অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়াও একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, অভ্যাসের দ্বারা, সংযম, শৃঙ্খলা, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ আয়ত্ত করিতে পারিলে মানুষ কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারে। বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে মানুষের মন থাকে পেলব ও নমনীয়। তাই এই ছাত্রজীবনই সকলপ্রকার শিক্ষার উপযুক্ত সময়। ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত তাই এই বিদ্যার্থীজীবনেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিসমূহের অনুশীলন করিয়া জীবনে বড় হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া লইতে হয়।

আজকাল প্রায় সকলের মুখেই একটা অভিযোগ শুনা যায় যে, একালের ছাত্রগণের বিদ্যার্জনে আর তেমন নিষ্ঠা নাই। কোনমতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটা ছাপ লাগাইয়া অর্থাগমের কিছু সুযোগ করিযা লইতে পারিলেই তাহারা খুশি। যদি অভিযোগটি সত্য বলিয়াও স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তথাপি ইহার জন্য ছাত্রমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। একমাত্র অধ্যয়নই যে-যুগে ছাত্রদের তপস্যা ছিল সে-যুগে আর ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সেই নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা আজ ইতিহাসের বস্তু হইয়াছে। আজিকার মানুষ শত-সমস্যায় জর্জরিত। সহস্র জটিলতার কুটিল বন্ধন জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে পদে পদে ব্যাহত করিয়া চলিয়াছে। এই প্রতিকূল পরিবেশে ছাত্রদের বিদ্যানুশীলন সহজভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। অভীষ্ট বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য যে-পরিমাণ মনসংযোগ, একাগ্র চেষ্টা ও নিশ্চিন্ত সুযোগ প্রয়োজন, প্রধানত অর্থাভাবে তাহা অধিকাংশ ছাত্রের ভাগ্যেই সম্ভব হইয়া উঠে না। নিরলস অধ্যয়নের পথে এই যে অন্তরায় ইহার সবটুকু দায়িত্বই সমাজ

বা রাষ্ট্রের। কিন্তু পরিস্থিতির এই সংকটের দোহাই দিয়া আজ যে বহু ছাত্র সজ্ঞানে আপন কর্তব্য অবহেলা করিয়া চলিয়াছে ইহাও সত্য। ছাত্রসমাজকে মনে রাখিতে হইবে, পরিস্থিতিকে জয় করাই তাহাদের কাজ। অর্থ নৈতিক সমস্যার আওতায় আলস্যের সংবর্ধনা করা শুধু অকর্তব্য নয়, পাপ। এই পাপটির আছে সর্বনাশা মাদকতা, অতি ক্রূর ছলনার মোহজাল বিস্তার করিয়া ইহা সমাজে আধিপত্য চালাইয়া থাকে। ধীরে অথচ দৃঢ়ভিত্তিতে ইহা তরুণ-তরুণীদের দীক্ষিত করে আত্মপ্রবঞ্চনার দূষিত মন্ত্রে। অর্থাভাবে পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই অভাব-জনিত সমস্যার সমাধানে অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন ব্যাপৃত আছেন, তখন আমি এই অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই যথাসাধ্য পড়াশুনা করিতেছি কি, এই জিজ্ঞাসা না তুলিয়া যদি ছাত্রগণ শুধু ঐ সমস্যার জিগীর তুলিয়া বেড়ায় তবে ইহা অপেক্ষা আত্মপ্রবঞ্চনা আর কী হইতে পারে? সমাজের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব অদূর ভবিষ্যতে যাহাদের মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ যাহাদের মুখ চাহিয়া আছে, দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যাহারা বাঁচাইয়া রাখিবে সেই ছাত্র-সমাজের শুধু সমস্যাজনিত আন্দোলনের আগুন পোয়ানোর সময় কোথায়?

ভবিষ্যতের দায়িত্ববোধই ছাত্রজীবনের প্রধান দায়িত্ব। জীবনের গুরু-দায়িত্ব যাহাদের বহন করিতে হইবে তাহাদের এই গঠনের জীবনেই হওয়া উচিত দায়িত্ব-সচেতন। নিজেকে গঠন করা ছাড়াও সমাজের প্রতি কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করিতে হয় এই ছাত্রজীবনেই যেহেতু ছাত্র হইলেও তাহারা সমাজেরই অঙ্গ। সাধারণ মানব-সমাজে ছাত্রদের স্থান, ঠিক যেমন, কাজের মধ্যে সঙ্গীত, বনের মধ্যে কুসুম, মরুর মধ্যে মরূদ্যান। কিন্তু এই সঙ্গীতের মত বাজিয়া উঠা, কুসুমের ন্যায় শোভা-সৌরভে বিকশিত হওয়া, মরূদ্যানের ন্যায় তৃপ্তিদায়ক হওয়া যে কত বড়ো দায়িত্ব তাহা বর্ণনাতীত।

অনেকের মতে ছাত্রসমাজের আর এক দায়িত্ব প্রয়োজনমত শক্তির যোগান দেওয়া, অন্যায়ের প্রতিকারে তাহাদের যুবশক্তির বিনিয়োগ। কিন্তু এই দায়িত্বপালন বড়ই বিপজ্জনক। অহেতুক বিক্ষোভ কিংবা উচ্ছৃঙ্খল মত্ততা সর্বথা নিন্দার্হ। ইহা নিঃসন্দেহে আত্মধ্বংসী। বর্ণাশ্রম যুগের ছাত্রজীবনের আদর্শ এ যুগের ছাত্রদের মাথায় জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া চলে

না সত্য। রাজনৈতিক আন্দোলন বা রাষ্ট্র-বিপ্লবের ঢেউ যখন সমগ্র দেশকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে তখন এই দেশেরই প্রাণকেন্দ্র ছাত্রসমাজ উহাকে এড়াইয়া চলিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সামান্য কারণে বা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া হুজুগে মাতিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে মারাত্মক ভ্রম, তাহাদের আদর্শের পরিপন্থী। বিক্ষোভ বা উত্তেজনার যত বড় কারণই ঘটুক না কেন তাহাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে মত্ততা কিংবা উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলনের পথ তাহাদের নয়, অপ্রমত্ত সংযত ও সুশৃঙ্খল শিষ্ট আন্দোলনের পথেই তাহাদের চলিতে হইবে। গৌরবময় অতীত তাহাদের প্রেরণা দিবে, পবিত্র আদর্শ দিবে শক্তি ও সাহস আর ভাবীকালের উজ্জ্বল সুখীসমাজের স্বপ্ন তাহাদের মনের দ্বারে রক্তিম আশার অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মঘট

সংকেত :—১। ধর্মঘটের উদ্ভবের কারণ ২। ধর্মঘট ও রাজনীতি ৩। ধর্মঘট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪। ধর্মঘটসূত্রে রচিত রাজনীতির ঘূর্ণ্যাবর্ত ছাত্রজীবনের পক্ষে ভয়াবহ ৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পরিতাপের ও লজ্জার বিষয় ৬। উপসংহার।

ধর্মঘট ব্যাপারটা ধনতন্ত্রবাদের সৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের প্রাণান্তকর মেহনতের বিনিময়ে যে-ঐশ্বর্যের সৃষ্টি, তাহার উপর শ্রমিকের দাবিও কম নয়। অথচ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকানা স্বত্বের দাবিতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিগণ সে-ঐশ্বর্যের অতি সামান্য অংশই উৎপাদনকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকেন। ফলে দুঃখদারিদ্র্যের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া শ্রমিকদল শিল্পপতিগণের এই নির্বিচার শোষণ ও অতিসঞ্চয়-নীতির প্রতিবাদে তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা ও কর্মবিরতি ঘোষণা করে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার কিংবা অন্য পশুশক্তির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য ধর্মঘট ব্যতীত অন্য কোন হাতিয়ার দুর্বলের হাতে নাই। রাষ্ট্রশাসন বা শিল্প-চালনার ক্ষেত্রে নায়কদল এ-সত্য আজ উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই অধিকাংশ সময়েই তাহারা জনসাধারণ

শ্রমিকসঙ্ঘের সহিত সর্ববিষয়ে আপোষ-মীমাংসার পথে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে একশ্রেণীর লোক অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে সংখ্যা-গরিষ্ঠ জন-সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ লাভ করিবে, ততক্ষণ জন-সাধারণের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির অবসান ঘটিবে না। অতএব নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এই অবিচারের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য জনগণ ব্যাপকভাবে ধর্মঘট চালাইয়া যাইবে ইহা একরূপ নির্ধারিত সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তাই আমরা আজ আর্থিক জীবনের সমস্যা উত্তরোত্তর ঘোরালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটের সংখ্যাও বর্ধিত হইতে দেখি। কিন্তু একটা গুরুতর সমস্যা এই যে, ধর্মঘটের সাফল্যের জন্য যে সংঘবদ্ধ যুবশক্তির আবশ্যক তাহাতেই দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মঘটের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানমাত্রই যুবশক্তির কেন্দ্র। সুতরাং ধর্মঘটের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই কৌশলী নেতৃবৃন্দ নানা ছন্দে ঐ যুবশক্তির কেন্দ্রগুলিতে শক্তিভিক্ষার তান ধরিয়া দেন, আর স্বভাবদরদী যৌবনও ঐ তানের মোহে স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া শক্তির দানসত্র খুলিয়া দেয়। এ কথা উভয়পক্ষের কেহই ভাবে না, ছোট বড় যে-কোন ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া এই ধর্মঘট যদি সংক্রামক দুষ্ট ব্যাধির মত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ছড়াইয়া পড়ে, তবে জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা ঘোর অকল্যাণ বহন করিয়া আনিবে। অবশ্য ছাত্রমহলে তাহাদের নিজস্ব কল্যাণার্থে বিক্ষোভের কারণ যে একেবারেই ঘটে না এমন কথাও বলা যায় না। সাধারণভাবে নিত্যব্যবহার্য জিনিষ-পত্রের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজের গ্রন্থের মূল্যও অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি সহজ ও শিক্ষা-প্রসারের পথে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। খুব বেশীদিনের কথা নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন যে ধর্মঘট ঘোষণা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-সম্প্রদায়ের সেই আপোষহীন সংগ্রামের মুখে সেদিন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তুচ্ছ কারণে ধর্মঘট করিয়া অধ্যয়নে বিরত থাকিবার স্বপক্ষেও কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

সমাজ-চেতনা ও রাষ্ট্রচেতনা আজ জনসাধারণের মধ্যে যে-স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতী সম্প্রদায়ও তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে সমাজে বাস করিতে পারে না। তথাপি সকল অবস্থাতেই শিক্ষার্থীদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিদ্যানুশীলন তথা জ্ঞান-সাধনাকে বিসর্জন দিয়া রাজনীতির ঘূর্ণ্যাবর্তে জড়াইয়া পড়িলে তাহারা নিজেদের ও দেশের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। যদিও কোন রাজনৈতির দলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া পড়া আর ধর্মঘটে যোগদান করা হুবহু এক বস্তু নয়, তথাপি আজকাল বিভিন্ন ছাত্রসংসদ-পরিচালিত প্রায় প্রত্যেক ধর্মঘটই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট একথাও অনস্বীকার্য। ধর্মঘটের ব্যাপারে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা এই কারণেই ছাত্রগণের অবশ্য কর্তব্য।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘটের কারণ যাহাতে না ঘটিতে পারে কর্তৃপক্ষেরও তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির সৌরভ দেশদেশান্তরে যাহারা বহন করিয়া লইয়া যায়, দেশের একমাত্র ভরসার স্থল সেই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ গঠন করিবার পবিত্র দায়িত্ব শিক্ষকবৃন্দের উপর ন্যস্ত। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে দেশ ও জাতির সংগঠক এই শিক্ষাগুরুর আসন আজও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া যাঁহাদের দাবি সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল তাঁহাদের যদি সামান্য দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য শাসকের মত্ত শক্তির সিংহদ্বারে ধূলিশয্যা গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা গুরুতর লজ্জা ও শংকার কারণ আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে দেশের লোকের তাই আজ অনেক প্রত্যাশা। কোন জাতি বা রাষ্ট্রকে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার জন্য নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি, কঠোর সংকল্প, স্বার্থত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজন। জনগণের সহযোগিতায় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া সংস্কার ও সংগঠনমূলক কার্যে অগ্রসর হইলে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনা ত্বরান্বিত হইবে, ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। আত্মকলহমুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশভূমি দেবতার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করুক, জ্ঞান-সাধনার পবিত্র মন্দির দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সকল

বাধা-বিঘ্ন মুক্ত হইয়া বিদ্যার্থিগণের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলে পরিণত হউ: দেশের ছাত্র-সমাজের পক্ষ হইতে কায়মনোবাক্যে ইহাই একমাত্র কামনা।

ছাত্রজীবন ও সমাজসেবা

সংকেত ঃ—১। ছাত্র ও সমাজ,—সামাজিক জীব মানুষের বিচিত্র সমস্যা ও অপরের সহায়তার আশা—সেবাধর্মের জন্ম ২। প্রাচীন ও বর্তমান সমাজজীবন—ছাত্রের নিকট সমাজের প্রত্যাশা ৩। ছাত্র কর্তৃক সমাজসেবার বিভিন্ন পন্থা :—(ক) শিক্ষা (খ) স্বাস্থ্য, (গ) পথ-ঘাট-পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা—পল্লীকেন্দ্রিক সেবাকায (ঘ) বন্যা-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপদকালীন আর্তত্রাণ।

ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। 'ছাত্র' বলিতে যে ব্যক্তিকে বুঝায়, সেও সমাজেরই একজন। সুতরাং ছাত্রকে সমাজ-জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে অনবহিত থাকিবার উপায় নাই। তাহাকে জানিতে হয়, মানুষ সামাজিক জীব, একা থাকিবার কথা সে কল্পনা করিতে পারে না। জীবন ধারণের জন্য তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে ; সে-সংগ্রাম কঠোর ও অবিরাম। আজও তাহা শেষ হয় নাই, ভবিষ্যতেও তাহার অবসান কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দৃশ্য ও অদৃশ্য অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বার্থান্ধ মানুষের হিংস্র কুটিল আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—সংগ্রামের যেন শেষ নাই। ইহার উপর আছে পায়ে পায়ে বাধা—জীবনজোড়া অভাব-অভিযোগ আর দুঃখকষ্ট। ইহারই মধ্যে জীবনকে যতখানি সম্ভব নিরুদ্বেগ করিয়া তুলিবার জন্য মানুষের নিরলস কর্মের অনুষ্ঠান। মানুষের হাতে গড়া রাষ্ট্র তাই মানুষের সুখসমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুগধর্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আইন-কানুন রচনা করিয়া চলে। তথাপি আইনের দোহাই দিয়া সকল প্রয়োজন মিটান যায় না। দুঃখের দিনে মানুষ চায় স্নেহের স্পর্শ, প্রতিবেশীর সহযোগিতা, একবিন্দু সমবেদনার অশ্রু। অপরের প্রয়োজনে অযাচিত সাহায্য করিবার, অপরের দুঃখে অংশ গ্রহণ করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা হইতেই সেবাধর্ম জন্মলাভ করিয়াছে। প্রথমে আপন পরিবারে, তারপর স্বগৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এই সেবাবৃত্তি সমাজের মধ্যে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। প্রসারিত হয় সত্য কিন্তু অপরের সেবা করিবার সুযোগ সকলের ভাগ্যে আসে না।

প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবন-যাত্রা অন্যরূপ ছিল। লঘুগতিতে অতিক্রান্ত হইত মানুষের দিনগুলি। তখন গৃহে অন্ন ছিল, পরিধানে বস্ত্র ছিল, নিশ্চিন্ত আরামে মানুষ বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইতে পারিত। আজ জীবনে বহুবিধ সমস্যা, নিশ্চিন্ত অবকাশ মানুষের জীবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে! কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই মানুষ রুদ্ধশ্বাসে রাত্রি-দিন ছুটিয়া চলিয়াছে। অপরের অশ্রু মুছাইবার অবসর তাহার কোথায়? তথাপি ইহারই মধ্যে ছাত্রজীবন কতকপরিমাণে দায়মুক্ত একথা যুক্তিহীন নহে। দারিদ্র্য যত বড়ই হউক অভিভাবকগণ সন্তানের ছাত্রজীবনকে যথাশক্তি নিষ্কণ্টক ও নির্বিঘ্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং অধ্যয়ন, খেলাধুলা ও সময়োচিত গৃহকর্মের অবকাশেও ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সেবাব্রতে দীক্ষা লইতে পারে। রাষ্ট্রের অধীন সমাজ-ব্যবস্থা যতই উদার হউক মানুষের অফুরন্ত প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। এই যে দেশজোড়া নিরক্ষরতা এবং অশিক্ষাজনিত সহস্র প্রতিবন্ধক ইহার আংশিক প্রতিকার ছাত্রদের দ্বারা সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে।

স্কুল কলেজে অধ্যয়নের অবকাশে সঙ্ঘবদ্ধ ছাত্রদল স্বদেশবাসীর নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্যোগী হইলে ছোট ছোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। যদি একটি শিক্ষিত যুবক একবছরের চেষ্টায় একটি লোকেরও নিরক্ষরতা দূর করিতে পারে তাহা হইলে পাঁচবছর পরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে দেশের একটি লোকও নিরক্ষর নাই। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু গাণিতিক হিসাবে ইহা অভ্রান্ত। অথচ কোন ছাত্রকেই ইহার জন্য দৈনিক এক ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। অবশ্য উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে না, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতম মানে পৌঁছিতে হইলেও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এতবড় একটা দেশ হইতে এত সহজে অনাড়ম্বর কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যদি নিরক্ষরতা দূর করা যায়, তাহার কৃতিত্বও বড় কম নয়। এ গেল শিক্ষার দিক।

অতঃপর দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষায়, স্বাস্থ্যের উন্নতিমূলক কার্যে ও পীড়িতের সেবায়ও কিশোর ও তরুণ ছাত্রদল যে অল্পায়াসেই কেমন করিয়া অনেকখানি উপযোগী হইয়া উঠিতে পারে, একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সহরে বা নগরে কর্পোরেশন, সহরতলীতে মিউনিসিপালিটি এবং

মফঃস্বল, সহরে জেলাবোর্ড ও লোকালবোর্ড রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কারের এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী এই সংস্থাগুলি সকল সময়ে সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পরে না। এই না-পারিবার কারণ যাহাই হউক তাহা এই প্রবন্ধের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ এ ব্যাপারে কতখানি সহযোগিতা করিতে পারে তাহাই আলোচ্য।

যে-সকল ছাত্র নগরে বা সহরতলীতে বাস করে তাহাদের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব থাকিলেও তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে; কারণ কর্পোরেশন ও মিউনিসিপাল বোর্ডগুলি পথঘাট নির্মাণ, উহার সংস্কারসাধন ও উহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যাপারে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। তথাপি কলিকাতার মত মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথে চলিতে গিয়া এমন অনেক আবর্জনার স্তূপ চোখে পড়ে যাহা পথচারীদের অথবা পথপার্শ্বে অবস্থিত গৃহবাসীদের দায়িত্বহীনতার ও অপরিচ্ছন্নতার পরিচয় দেয়। এদিক দিয়া যাহারা মহানগরীর অথবা নগরীর উপকণ্ঠে সর্বত্র ছড়াইয়া আছে সেই অগণিত ছাত্র-ছাত্রী অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। তাহারা নিজ নিজ গৃহে ব্যক্তিগতভাবে এবং নিজ নিজ এলাকায় দলগতভাবে আলাপ-আলোচনা কিংবা প্রয়োজন হইলে আঞ্চলিক সভাসমিতির মধ্য দিয়া অনাচারী, দায়িত্ববোধহীন মানুষগুলিকে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে। আমি, তুমি এবং আর পাঁচজন মিলিয়াই তো সমাজ; সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণকর প্রচেষ্টাই যে সমষ্টির কল্যাণে পরিণত হইতে পারে, ইহা সর্বথা যুক্তিগ্রাহ্য।

পল্লী অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ছাত্রগণ সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পল্লীকে বহুবিধ আবর্জনা হইতে মুক্ত করিতে পারে। অন্ততপক্ষে অবাঞ্ছিত গাছপালা কাটিয়া, নালা-ডোবাগুলি ভরাট করিয়া এবং পানীয় জলের পুষ্করিণী-গুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে।

আরও একটি মহৎ কল্যাণকর কার্যে ছাত্রদের অগ্রসর হইয়া আসা কর্তব্য। বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্যোগের কবলে পড়িয়া যখন হতভাগ্য নরনারী অসহায় আর্তনাদ করিতে থাকে, তখন ছাত্রগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আর্তের পরিত্রাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। দুর্গত দেশবাসীর সাহায্যকল্পে

অর্থ সংগ্রহের আবেদন জানাইলে উদারহৃদয় সেবাব্রতী তরুণ ছাত্রদলকে দেশ কখনও বিমুখ করিবে না। দেশের ছাত্রদল দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভরসার স্থল, আগামীদিনের রাষ্ট্রনায়ক ও জাতির প্রাণকেন্দ্র। ইহাদের অপরাজেয় শক্তি যে-কর্মযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার মাথায় তুলিয়া লইবে, তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব

সংকেত :—১। প্রতিষ্ঠাদিবসের গুরুত্ব ২। উৎসবের পূর্বেকার আয়োজন—অবশেষে নির্দিষ্ট দিন আগত—সকাল হইতে কার্যকলাপের বর্ণনা ও একটি প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান ৩। সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা ৪। সান্ধ্য অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ।

রণজিৎপুর গ্রামের একমাত্র বিদ্যালয় "যোগীন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়"; এরই প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসব সেদিন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হ'ল। মানুষের জীবনে যেমন জন্মদিবস, বিদ্যালয়ের জীবনে তেমনি তার প্রতিষ্ঠা-দিবস একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। মানুষকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত ক'রে তুলবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যালয়ের জন্ম; তাই তার সেই জন্মদিবস শুধু বিদ্যালয়ের নহে, সেই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর নিকট এক পুণ্যদিবস। এই দিবস পালনের পুণ্য দায়িত্ব তাই শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকের সম্মিলিত জীবনের উপর। যাঁরা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে জ্ঞানী-গুণী হয়ে এখন সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আজ তাঁদের সেই জ্ঞানের ধাত্রী-মাতার নিকট বাৎসরিক অর্ঘ্যনিবেদনের দিন। এই দিনে তাঁরই পাদপীঠতলে সমবেত হয়ে সকলেই আন্তরিকভাবে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেন, প্রার্থনা করেন তার অব্যাহত অগ্রগতি এবং দীর্ঘায়ু।

প্রতিষ্ঠা-দিবস আসবার পক্ষকাল পূর্বেই প্রধান শিক্ষক মহাশয় এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যালয়ের সকলকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী তোড়-জোড় হ'তে হ'তে অবশেষে প্রতিষ্ঠা-দিবস এসে গেল। শিক্ষক এবং ছাত্রদল প্রত্যূষে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হল। ছাত্রদের পরনে বিদ্যালয়ের পোষাক সাদা হাফ সার্ট আর কালো হাফ প্যান্ট, জামার বুক-পকেটে

বিদ্যালয়ের ব্যাজ্। শিক্ষকদেরও জামার বুকপকেটে স্কুলের ব্যাজ্ লাগানো ছিল। সকলে উপস্থিত হওয়ার পর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি-সহযোগে প্রধান শিক্ষক মহাশয় জাতীয় পতাকা উড্ডীন ক'রলেন, N. C. C. দল ব্যাণ্ডে ঝঙ্কার তুললো, উপস্থিত সকলে পতাকা অভিবাদন ক'রলেন। এরপর সবাই চলল বিদ্যালয়ের প্রশস্ত সভা-কক্ষে। সেখানে প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ সারগর্ভ বক্তৃতার সাহায্যে বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কর্তব্য ব্যাখ্যা ক'রলেন। সংস্কৃত-পণ্ডিত হেমশাস্ত্রী বললেন "আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এ বিদ্যালয়ের জন্ম। আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে জমিদার ৺যোগীন্দ্রনারায়ণের নিজের হাতে বিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের দৃশ্য। আজ এই শুভদিনে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।" ছাত্রদের মধ্যে-ও কেউ কেউ বিদ্যালয়ের শুভকামনা ক'রে দু'চার কথা ব'লল। এরপর আমাদের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান শেষ হ'ল।

সন্ধ্যাবেলায় আবার বড়ো ক'রে অনুষ্ঠানের আয়োজন; তখন বক্তৃতা, আবৃত্তি, সংগীত ও নাটিকার আয়োজন ছিল। সহকারী প্রধান শিক্ষক রথীনবাবু সোৎসাহে ছেলেদের আবৃত্তি ও সংগীত শিক্ষা দিয়েছিলেন। অক্লান্ত-কর্মী ক্রীড়াশিক্ষক সঞ্জীববাবু 'ডাকঘর' নাটিকার মহড়া দিয়ে অভিনেতাদের ষ্টেজে তুলবার অপেক্ষায় ছিলেন। এইসব তোড়-জোড়ের কথা বলা হয়ে গেল এক নিশ্বাসে, কিন্তু এদেরই মধ্যে জেগে উঠেছিল যে এক বিরাট প্রাণের সাড়া, যে এক অনির্বাচ্য ভাব-জীবনের স্পন্দন, তার পরিমাপ কোনো মাপকাঠিতেই সম্ভব নয়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক বন্ধনকে শিথিল করে উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি এসে যে এক মধুময় সম্পর্ক, একটা স্নেহ-ভক্তি-মমতার আতপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো, তার খবর দেওয়া এই বিবৃতির সাধ্য নয়। কলকাতার স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীকে আমরা সভাপতি মনোনীত করেছিলাম।

গোধূলিলগ্নে বিদ্যালয়ে সকলে সমবেত হ'ল। আলোকমালায় ও পুষ্প-মাল্যে সজ্জিত বিদ্যালয়ের সে কি অপরূপ রূপ! পর্যাপ্ত-পত্রপুষ্পাদি-সজ্জিত ও তিনটি বৃহৎ গৈরিক স্বস্তিকা-চিহ্ন-মণ্ডিত তোরণটিও দর্শনীয় হ'য়েছিল। যথাসময়ে সভাপতি মোটরযোগে এসে পৌঁছুলেন, প্রধান শিক্ষক মহাশয় গাড়ী থেকেই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সভাগৃহে আনয়ন ক'রলেন।

N. C. C. বালকেরা তাঁকে সসম্মানে অভিবাদন জ্ঞাপন করল। সভাপতি আসন গ্রহণ ক'রলে দুটি ছোট ছেলে তাঁকে মাল্যভূষিত ক'রে বরণ ক'রল। তারপর বিদ্যালয়ের ত্রিংশৎবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে তিরিশটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হ'ল। শঙ্খধ্বনি-সহযোগে প্রথম প্রদীপটি সভাপতি নিজের হাতে প্রজ্বালিত ক'রলেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত বিশী সভার ব্যবস্থাপনার প্রশংসা এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি-কামনা করে, এই জাতীয় উৎসব পালনের সার্থকতা ও সাধারণভাবে শিক্ষার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন, তা যেমনি শ্রুতিসুখকর তেমনি সারগর্ভ। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে এক বিবৃতি দিলেন। এরপর একে একে আবৃত্তি, সংগীত ও নাটিকা অনুষ্ঠিত হ'ল।

কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান বেশ সন্তোষজনক হয়েছিলো। শুধু সঞ্জীব বাবুর 'ডাকঘরে'র ডাক দূরের লোক ভালো করে শুনতে পায়নি বলে আক্ষেপ করেছে, কারণ, তাঁর সুনির্বাচিত 'অমল' সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এবং অসুখটা ছিল কণ্ঠ-নালীর। কিন্তু ক্রীড়াশিক্ষক দমে যাওয়ার পাত্র নন, তিনি জবাবে বলেছিলেন, ডাক শুনতে পাওয়া অত সহজ নয়, যার কান আছে, সে অমলের গলার আওয়াজ যাই হোক, ঠিক শুনতে পায়। সবশেষে সমবেতকণ্ঠে 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে' জাতীয়-সংগীত গীত হ'ল, ধীরে ধীরে মঞ্চের যবনিকা নেমে এল, উৎসব সাঙ্গ হোল।

পরীক্ষার পূর্বরাত্রি

সংকেত :—১। সব রকম পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতি এক রকম নয়, সুতরাং মনের প্রতিক্রিয়াও সকলের একরকম হয় না। ২। যারা একদম পড়াশুনা করে নি, তাদের অবস্থা ৩। যারা নিয়মিত পড়াশুনা করেছে তাদের অবস্থা ৪। দুই সীমার মধ্যবর্তী ছাত্রছাত্রীর অবস্থা ৫। একটা ত্রাস, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা ৬। প্রশ্ন সম্পর্কে নানা গুজব, শেষ মুহূর্তে এইজন্য সময় নষ্ট ৭। উপসংহার।

পরীক্ষার আগের রাত্রি ছাত্রদের কাছে বিচিত্র মূর্তিতে দেখা দেয়। এক শ্রেণীর ছাত্র সারা বছর ফাঁকি দিয়ে কাটায়—'শিয়রে শমন' না দেখা দিলে

তারা পড়াশুনার উৎসাহ পায় না। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে তাঁদের পড়াশোনার মাত্রা চরমে ওঠে। এই রাত্রে তাদের চোখে ঘুম থাকে না— সারা রাত জাগবার সংকল্প নিয়ে তারা পড়তে বসে। মাঝ রাত্রে যখন আর পড়া এগোতে চায় না, একসঙ্গে গাদা-করা জিনিসের ভারে মস্তিষ্ক যখন অসাড় হয়ে আসে, তখন ঘন ঘন হাই ওঠে—কিন্তু তখন একটু ঘুমিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

এদেরই বিপরীত প্রান্তে থাকে সেই সব ছাত্র, যারা ফাঁকি না দিয়ে নিয়মিতভাবে পড়ে এসেছে। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে তারা এক রাতে সব পড়ে ফেলে অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করে না। যে সব পড়া অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে, সেগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই তারা যথেষ্ট হ'ল বলে মনে করে। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে এদের একমাত্র কাম্য হল সুনিদ্রা—যাতে তারা সারা রাত ধরে ভালো করে ঘুমিয়ে সকালে তাজা মস্তিষ্ক নিয়ে জাগতে পারে।

এই দুই প্রান্তের মাঝখানে আছে সাধারণ ছাত্ররা—যারা সারা বছর একেবারে ফাঁকি দেয়নি, কিন্তু যা পড়েছে তাও ভাল করে তৈরি করে উঠতে পারেনি। একরাত্রে সব পড়ে ভেল্‌কি লাগিয়ে দেবার আশা এরা করে না— কিন্তু পড়া-তৈরি-হওয়া ভালো ছেলেদের মতো নিশ্চিন্ততা এদের নেই। এরা প্রতিদিন যেমন পড়ে, পরীক্ষার আগের দিন রাত্রেও সেই রকমই পড়ে—পড়ার মাত্রা আর মনোযোগ একটু বেড়ে যায় এইমাত্র।

অবশ্য পরীক্ষার আগের দিন মনে কিছুটা-না-কিছুটা উৎকণ্ঠা থাকে সকলেরই। ফেল-করা ছেলে যেমন কোনো রকমে পাশ-করার মতো নম্বর পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তেমনই ভালো ছেলেরা বেশি নম্বর পাবার জন্য সচেষ্ট। আবার এই উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সকলে মনে মনে যে, আশাবাদী হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে পরীক্ষার আগের ক'দিনের পড়ুয়া, সে প্রশ্ন বেছে বেছে সেগুলো পরীক্ষায় আসবে এই আশা করে উত্তর তৈরি করে। যারা মাঝারি রকমের ছাত্র তারা পছন্দসই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভালো করে তৈরি করে। যারা ভালো ছেলে সম্ভাব্য সবরকম প্রশ্ন তাদের দৃষ্টি এড়ায় না বটে, কিন্তু তারাও পছন্দমত কিছু কিছু প্রশ্নের দিকেই বেশি করে মনোযোগ দেয়।

পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় উত্তেজনার আর একটি উপাদান সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে নানাধরণের গুজব। কিছুদিন হ'লো এই উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সন্ধানে একদল ছাত্র থাকে। কোনো না কোনো সূত্রে প্রশ্নের সন্ধান পেলে তারা ছুটে আসে কিছুটা-তৈরি আর একজন সহপাঠীর কাছে। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ-পাওয়া প্রশ্নের দিকে তাদের মনোযোগ এতটা আকৃষ্ট হয় যে, যে সব জিনিস পড়বে বলে তারা আগে থেকে ঠিক করেছিল সেগুলোর দিকে অনেক সময়ই নজর দেওয়া শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে না। শেষ মুহূর্তে-পাওয়া প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে করতেই তাদের সময় শেষ হয়ে যায়। সেই প্রশ্ন পরীক্ষায় না এলে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি তো হয়ই, পরীক্ষায় এলেও সেই একটা প্রশ্নের জন্য তাদের অনেকটা সময় নষ্ট করতে হয়।

আগে থেকে ভালো করে পড়াশোনা তৈরি করে পরীক্ষার আগের রাত্রে মন শান্ত করে তৈরি পড়াগুলো দেখাই উচিত—কিন্তু যা করা উচিত তা করতে পারে ক'জন! আমাদের দেশে পরীক্ষার ওপর এতটা জোর দেওয়া হয় যে, সারা বছর পড়াশোনা করা হোক আর নাই হোক—পরীক্ষার আগে কিছু দিন ছাত্রমহলে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। আর সেই প্রস্তুতির শেষ মহড়া হয় পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে। সারা বছরের নিষ্ক্রিয়তা যেন এক দিনের চরম উত্তেজনায় শোধ নিতে চায়।

পরীক্ষাগৃহের দৃশ্য

সংকেত ঃ—পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বাইরের ঘটনা—ঘণ্টা বাজে, পরীক্ষার্থী ঘরে যায়—অজানা ভয় ও উত্তেজনার মুহূর্ত—প্রশ্নপত্র বিলি—চোখে মুখে নানারকম ভাব—সময় চলে, লেখা এগোয়—শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা।

পরীক্ষা আরম্ভ হবার ঘণ্টা বাজে বাজে। বাইরে উঠানে ছাত্ররা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। অনেকেরই হাতে বই কিংবা খাতা, কিন্তু খুলে দেখবার অবকাশ আর হয়নি। হাতে বই থাকলে কিছু প্রেরণা পাওয়া যায় কি?—অবশ্য দুই একটি সাবধানী ছাত্র ঘণ্টা বাজার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বইয়ের পাতা ওলটায়—এদের এই প্রয়াস যেন মরণাপন্ন রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা।

যথাসময়ে পরীক্ষাগৃহে প্রবেশের ঘণ্টা বাজল। সকলেরই 'বক্ষ দুরু দুরু'। পরীক্ষাগৃহে ঢুকে সকলেই নিজের নিজের আসনে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলে বসছে বা খাতা পাচ্ছে ততক্ষণ গোলমাল থামে না। খাতা পেয়ে ছাত্ররা নামধাম লিখতে আরম্ভ করে। কোনো কোনো ছাত্র পরীক্ষায় বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাবে ভেবে খাতার প্রথম পাতার মাথার উপর মঙ্গলাচরণ করে—'God is good', 'সরস্বত্যৈ নমো নমঃ' বা অপ কোনো শ্লোকের অংশ লিখে।

প্রশ্নপত্র পাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছাত্ররা সকলেই উৎকণ্ঠিত। যখ একদিকে প্রশ্নপত্র দেওয়া হচ্ছে তখন অপর দিকের ছাত্ররা যে কী ভাবে ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করে তা বর্ণনা করা যায় না। প্রশ্নপত্র দেবার সময় যা একটু সামান্য গোলমাল থাকে তাও প্রশ্নপত্র বিলি হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। এখনও কেউ লিখতে আরম্ভ করেনি—সকলেই সাগ্রহে প্রশ্নপত্রের দিকে চেয়ে আছে—চারিদিকে একেবারে নিস্তব্ধ। কেবল দুই একজন ছাত্র দেরীতে আসার জন্য একটু আধটু শব্দ শোনা যায়।

প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মুখে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা লক্ষ্য করবার মতো।—যারা ভালো ছাত্র তারা প্রশ্নটা আদ্যন্ত একবার পড়ে নিয়ে যেটা সুবিধাজনক মনে হয় সেই প্রশ্নটার উত্তর লিখতে সুরু করে দেয়। তাদের মনে কোনো উদ্বেগ নেই। অন্য ছাত্রদের মুখে আশা-নিরাশার আলো-ছায়া। প্রশ্নপত্র পেয়েই হাল ছেড়ে দিয়ে শূন্য খাতা দিয়ে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের সংখ্যা বিরল হলেও শূন্য নয়। কিছু লেখবার চেষ্টা করে শোচনীয় ফল করার চেয়ে এইভাবে নিজেদের ব্যর্থতা জাহির করাকে এরা যেন বীরোচিত কাজ বলে মনে করে।

পরীক্ষা শুরু হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকলে উত্তর লিখতে মনোযোগী হয়। তখন চারিদিক চুপচাপ। কেবল কাগজের উপর লেখনী-নৃত্যের মৃদু খস্‌খস্ শব্দ শোনা যায়। আর পরিদর্শকরা পায়চারি করলে তাঁদের জুতোর শব্দ একটু আধটু শোনা যায়। পরীক্ষার জন্য যে যে-ভাবেই তৈরি হোক না কেন পরীক্ষা আরম্ভ হবার সময় থেকে ঘণ্টা দেড়েক সকলেই একমনে লেখবার চেষ্টা করে।

প্রথম ঘণ্টা একরকম যায় লেখার তোড়ে। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বার কিছু আগে থেকেই লেখায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায়। বেশীর ভাগ ছাত্রের পুঁজি

এই সময়ই শেষ হয়ে আসে। পাশের পরীক্ষার্থীর খাতা দেখা বা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে উত্তরের সন্ধান করার দিকে ঝোঁক এই সময়েই দেখা যায়। যারা টুকরো কাগজে উত্তর চুরি করে নিয়ে আসে, তারাও এই সময় সক্রিয়। কিন্তু অভিজ্ঞ পরিদর্শকরাও এই সময়েই সবচেয়ে সজাগ থাকেন। তাঁরা প্রয়োজনবোধে পরীক্ষাগৃহের কোনো কোনো অংশে ছাত্রদের সাবধান করে দেন, কোনো ছাত্র নকল করতে করতে ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। আবার কোনো কোনো সহানুভূতিশীল পরিদর্শক উৎসাহের কথা বলে পরীক্ষার্থীদের অবসন্ন মনে আশার সঞ্চার করতেও অগ্রসর হন।

দ্বিতীয় ঘণ্টার সংকেতধ্বনি বেশীরভাগ পরীক্ষার্থীর কাছেই হতাশার সংকেত। দুঘণ্টা হয়ে গেল, এখনও এত-নম্বরের উত্তর করা হয় নি—এই ভাবটা সকলের মনেই জাগে। বিশেষ করে প্রশ্নপত্র লম্বা হলে অনেকে যেন কী যে করবে ভেবেই কূল-কিনারা পায় না।

শেষ ঘণ্টার পনেরো মিনিট আগে যে সংকেতধ্বনি হয় তাতে বেশির ভাগ ছাত্রই যেন নূতন উদ্দীপনা পেয়ে আবার লিখতে সুরু করে। এই সময় অনেকে খাতা দিয়ে পরীক্ষাগৃহ ছেড়ে যায়, কেউ কেউ উত্তরগুলো আবার পড়ে, আবার কেউ কেউ ডুবন্ত লোক যে রকম করে কুটো ধরে ভাসতে চায়, সেইভাবে যা মনে আসে তাই লিখতে চেষ্টা করে।

শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে পরীক্ষার্থীরা খাতা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কোনো কোনো শেষ মুহূর্তের লেখকের কাছ থেকে পরিদর্শককে খাতা কেড়ে নিতে হয়। তারপর বাইরে এসে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তর সম্পর্কে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলে—তারপর পরের দিনের পরীক্ষার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরার পালা।

পরীক্ষা

সংকেত :—১। ভালো হউক মন্দ হউক পরীক্ষাকে সকলেই মানিয়া লইয়াছে। ২। পরীক্ষার পাশ-ফেল সব সময় অভ্রান্ত বিচারক নয়। ৩। পরীক্ষা ও বিদ্যাচর্চা—পরীক্ষা একটা ভাগ্য-পরীক্ষামাত্র। ৪। পরীক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি উভয়েরই সংস্কার প্রয়োজন।

পরীক্ষা বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহার প্রতি

ছাত্রদের মনোভাব বিচিত্র। কোন কোন ছাত্র পরীক্ষাকে নিতান্তই ভয়ের চোখে দেখে কিন্তু এমন ছাত্রেরও অভাব নাই পরীক্ষা যাহাদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, যে সকল ছাত্র নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস করে তাহারা পরীক্ষার মধ্য দিয়া আত্মপরীক্ষাই করে—নিজের শিক্ষা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাদের আগ্রহ জাগে। কিন্তু যেসব ছাত্র পিছাইয়া পড়িয়া আছে পরীক্ষা তাহাদের পক্ষে বিভীষিকামাত্র।

ছাত্র কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রম গ্রহণ করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্যই পরীক্ষা-পদ্ধতিকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় কে কতখানি উৎকর্ষের পরিচয় দিল তাহা গৌণ ব্যাপার। ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হয় তাহারা নির্দিষ্ট শিক্ষা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তাহারা ঐ নির্দিষ্ট শিক্ষালাভ করে নাই বলিয়া বিবেচিত হয়।

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে পরীক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রের শিক্ষার মান কতকটা যাচাই করা যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক যুগের শিক্ষাবিদ্‌রা পরীক্ষা-পদ্ধতিকে শিক্ষার পক্ষে অনাবশ্যক ভার ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন। বিশেষ করিয়া বর্তমানে যে পরীক্ষা-প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে ছাত্রদের জ্ঞানলাভের স্পৃহা নিগৃহীত হয় বলিয়া তাঁহারা ইহার তীব্র বিরোধিতা করেন।

পরীক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহাদের মূল অভিযোগ এই যে, পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকায় ছাত্ররা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শিক্ষকমণ্ডলী যখন শিক্ষা দান করেন তখনও পরীক্ষার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে। ছাত্ররাও যখন শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন বিদ্যা অর্জন করিবার পরিবর্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথাই বেশী করিয়া ভাবে।

ইহাতে শিক্ষার মুল উদ্দেশ্যই নষ্ট হইয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ছাত্ররা শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ভালোরকম জ্ঞান অর্জন না করিয়া কেবল মুখস্থ করিয়া পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং অনেক সময়ই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয়। প্রকৃত বোধের অভাবে জ্ঞান পরিপক্ক হইতে পারে না! ফলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইবার পরই অধীত বিষয় স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে বিদ্যার সার অংশটুকুই বাদ পড়িয়া গিয়া পরীক্ষা-পাশের গৌরবটুকুই থাকে। পরীক্ষার প্রয়োজনে সমগ্র পুস্তক না পড়িয়া বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ায় বিদ্যার ক্ষেত্র সংকুচিত হইয়া আসে। প্রচুর পরিমাণে মুখস্থ করার ফলে ছাত্রের চিন্তাশক্তি উপযুক্ত পরিমাণে বিকশিত হইতে পারে না।

পরীক্ষায় ছাত্রের যে শক্তির অপব্যয় হয় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস ছুটিতে কাটে। আরও তিন চার মাস কাটে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে। সুতরাং শিক্ষার জন্য মাত্র অর্ধেক সময় অবশিষ্ট থাকে। ছাত্ররা পরীক্ষার দিকেই শক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য হয় এবং পরীক্ষার জন্য শক্তি অপব্যয় করায় তাহাদের বিদ্যার প্রতি আগ্রহশীল হইবার শক্তি কমিয়া আসে।

পরীক্ষা দ্বারা উৎকর্ষের বিচারও যে সব সময় যথার্থভাবে হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না। পরীক্ষায় একটা মোটামুটি বিচার হইলেও পরীক্ষার্থীর কাছে ইহা একটা ভাগ্যের খেলা বলা যাইতে পারে। ছাত্র যথার্থই জ্ঞানলাভ করিল কি না, সে বিচার প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে হয় না—যে প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে সেই ভালো বলিয়া বিবেচিত হয়। ভাগ্যক্রমে প্রস্তুত বিষয় পরীক্ষায় আসিয়া গেলে সাধারণ ছাত্রও ভালো ফল করিতে পারে। আবার যথার্থ মেধাবী ছাত্রও দৈবক্রমে পরীক্ষায় খারাপ ফল দেখাইতে পারে।

জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া বন্দিত, তাঁহাদেরই মধ্যে অনেকেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে পরীক্ষা-নিরপেক্ষভাবে। কেহ বা কোনোরূপ প্রচলিত পরীক্ষারই সম্মান লাভ করেন নাই, যথা, রবীন্দ্রনাথ। পরীক্ষার ফল অকিঞ্চিৎকর হওয়া সত্ত্বেও দেশপূজ্য হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। সুতরাং পরীক্ষাকে উৎকর্ষ-বিচারের উপযুক্ত কষ্টিপাথর বলা চলে না।

পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর মারাত্মক ত্রুটিরই অন্যতম নিদর্শন। বর্তমানে জনগণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যেমন একটা কলে ছাঁটা আদর্শে শিক্ষা বিতরণ করা হইতেছে, তেমনই জ্ঞান আহরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়া পরীক্ষার প্রতি ছাত্রসমাজের সমগ্র শক্তিতে কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। এই শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার হইলে এই মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা-পদ্ধতিরও অবসান হইবে।

অবশ্য পরীক্ষামাত্রই বা পরীক্ষার প্রথাটাই দূষণীয়, এ প্রস্তাব অসমীচীন। যে প্রণালী বা পদ্ধতিতে বর্তমানে পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে তাহাতে যথেষ্ট ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু কোনো না কোনো পরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে এ কথা অনস্বীকার্য। মনে রাখিতে হইবে, সকলেই রবীন্দ্রনাথ নহে। সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর জীবনে পরীক্ষা হইল শিক্ষালাভ-প্রেরণার এক বলিষ্ঠ উৎস।

গ্রীষ্মের ছুটি কিভাবে কাটাইতে চাও?

সংকেত ঃ ১। প্রথম কয়দিন নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা ২। আমোদ-প্রমোদ ৩। ভ্রমণ ৪। সমাজসেবা ৫। খেলাধূলা ৬। সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন।

ছুটির আগে পরীক্ষা মিটে গেলে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি কি করে যে কাটাব সেটা একটা সমস্যা হযে ওঠে। প্রতিদিনকার পড়াশোনার চাপে অন্য দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারি না। অনেক কাজই করব করব বলে মনে করি, সময়ের অভাবে আব হযেই ওঠে না। অবশ্য যদি সে রকম আগ্রহ থাকত, তাহলে কোনো কাজই আটকে থাকত না।

যাই হোক ছুটির প্রথম ক'টা দিন কিছু করব না—স্রেফ আড্ডা দিয়ে আব গল্পের বই পড়ে কাটাব। কযেকজন বন্ধু আছে, তারা তাসে বিশেষ উৎসাহী—তাদের সঙ্গে মন্দ কাটবে না। আর বিকেল বেলা ফুটবল তো আছেই। নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাবার এই তো অবসর। পড়াশোনার চাপে তো সারা বছরই কেটে যায—এখন ক'টা দিন একটু আরামে কাটাব না তো কি করব?

অনেক জায়গায বেড়াতে যাব বলে তো মনে করেছি কিন্তু এই দুর্দান্ত গরমে কি আর তা হযে উঠবে? এখন কোথাও রোদে রোদে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে দুপুরে খেযে দেযে ঠাণ্ডা মেঝেয শুযে পড়লে অনেক আরাম হবে। দিবানিদ্রাটি গ্রীষ্মের ছুটির নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত না করলে চলবে না।

অবশ্য নিশ্চিন্ত আরামে কাটাতে বেশী দিন ভালো লাগবে না—হপ্তা খানেক পরেই কি করি কি করি মনে করে প্রাণ হাঁপিযে উঠবে। একটা কিছু বড়ো কাজ করবার চেষ্টা করতে হবে।

পাড়ার সংঘটা কর্মীর অভাবে যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে, ওটাকে নিয়ে

পড়লে মন্দ হয় না। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী থেকে সুরু করে সব মনীষীরাই তো ছুটিতে আমাদের সমাজ-সেবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ পালন করবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সংঘের স্বাস্থ্যবিভাগের খেলাধূলার দিকে অবশ্য আমাকে দৃষ্টি দিতে হবে না। ফুটবল যখন পড়েছে তখন ছেলেরা বিকেলে মাঠে যাবেই।

সংস্কৃতি-বিভাগের দিকেই বেশি করে মন দিতে হবে। গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা বহু দিন বাড়ে নি। চাঁদা থেকে যা পাওয়া যায় তাতে বই-বাঁধাই আর সাময়িক পত্রিকার খরচ মিটিয়ে অতি সামান্যই থাকে। পাড়ার কয়েকজন সহানুভূতিশীল ভদ্রলোককে ধরে কিছু মোটা রকম দান আদায় করতে হবে। টাকা তোলার আরও দুটো উপায় আছে। একটা হচ্ছে চ্যারিটি লটারি করা, আর একটা সিনেমা শো বা ভ্যারাইটি শো'র ব্যবস্থা করা—শেষেরটাই ভালো। কিছু কিছু বাইরের শিল্পী আনিয়ে যদি একটা জলসার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে টাকা মন্দ উঠবে না। একখানা মাঝারি ধরণের নাটক ধরে যদি অভিনয় করা যায় তাহলেও বেশ হয়। পাড়ার ছেলেরা এতে বেশ উৎসাহই পাবে।

এ ছাড়া সাপ্তাহিক সংস্কৃতি-সম্মেলন করতে হবে। শনিবারের পাঠচক্র তো অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে—সেটা আবার চালাতে হবে। শুদ্ধমাত্র আলোচনা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না, সেইজন্য মাসে অন্তত পক্ষে একদিন গানবাজনার আয়োজন করতে হবে।

সমাজ-সেবা বিভাগের কাজ করা শক্ত—এতে সকলের আগ্রহ আর সহায়তা চাই। সন্ধ্যাবেলার পাঠশালাটা তো কোনো রকমে চলছে—অবৈতনিক হলেও এতে ছাত্র জোটা ভার। দ্বিজুদা নিত্য সন্ধ্যাবেলা এদের নিয়ে বসেন তাই কোনো রকমে এটা টিকে আছে। গ্রীষ্মের ছুটিটায় দুপুর বেলা যদি গরীব ছাত্রদের জন্য একটা কোচিং ক্লাসের মত খোলা যায় তাহলে অনেকের পক্ষে সুবিধেই হয়।—প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষার ক্লাস তো আজকাল আর হয়ই না—ওষুধপত্রও কতটা আছে জানি না। ওটাও রবিবার খুলতে হবে।

গ্রীষ্মের ছুটিটা কী করে কাটাব সে সম্পর্কে অনেক কিছুই জল্পনা-কল্পনা করছি তো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতটা যে হয়ে উঠবে তা বলা মুস্কিল। সবই

হয়তো দিবাস্বপ্নে পরিণত হবে—যা করব ভাবছি তার গোড়াপত্তন করতে করতেই হয়তো ছুটিটা পার হয়ে যাবে। হয়তো বা ছুটি পড়বার ক'দিনের মধ্যেই কোথাও বেড়াতে চলে গিয়ে ছুটিটা সেখানে কাটিয়ে আসব। যাই হোক ভালো কাজ দু'চারটে করব বলে আশা করতে তো কোনো ক্ষতি নেই।

ছাত্র ও রাজনীতি

সংকেত ঃ ১। দুই পক্ষের দুই মত ২। নূতন যুগের দাবী ৩। স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্তিত অবস্থা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ৪। রাজনীতি ক্ষতিকর নয় কিন্তু দলাদলিতে না থাকাই ভাল।

ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত কি না এ বিষয়ে আলোচনা বহুকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো চরম মীমাংসাই হয় নাই। দুই পক্ষেই যুক্তির অভাব নাই এবং কোনো পক্ষের যুক্তিই দুর্বল নয়।

যাঁহারা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের প্রথম কথা এই যে, 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ'—অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যা অর্জন করিতে অগ্রসর না হইলে বিদ্যালাভ করা যাইবে না। রাজনীতিতে যোগদান করিলেই ছাত্রদের মনোযোগ অন্যত্র আকৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর হইতে পারিবে না। জ্ঞানের সাধনা একেই দুরূহ, তাহার উপর যদি ছাত্রদের চিত্ত অন্যত্র আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞানসাধনা ব্যাহত হইবে। রাজনীতির আকর্ষণে বহু মেধাবী ছাত্র জ্ঞানতপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

অপর পক্ষ বলেন, যে-যুগে অধ্যয়নকে তপস্যারূপে গণনা করা হইত সে যুগ বহুকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন যাঁহারা জ্ঞানার্জন করিতেন তাঁহারা জ্ঞানের সাধনাতেই জীবন যাপন করিতেন—বাহির বিশ্বের দিকে তাকাইবার প্রয়োজন তাঁহাদের প্রায়ই হইত না। কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র অধ্যয়ন লইয়া থাকিলে ছাত্রদের চলে না। জীবনের দাবী এখন প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ছাত্রদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কেও সজাগ হইতে হইবে এবং তাহাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণও করিতে হইবে।

যাঁহারা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের বিরোধী, তাঁহারা বলেন যে, দেশ সম্পর্কে ছাত্ররা সচেতন থাকিলে ক্ষতি নাই। বর্তমানে জ্ঞানের পরিধিও অনেক বাড়িয়া গিযাছে—দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও বর্তমানে অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হইযাছে। বিশেষতঃ সংবাদপত্রের প্রচারের ফলে ছাত্ররা দেশের অবস্থা সম্পর্কে অনায়াসেই অবহিত থাকিতে পারে। সেজন্য তাহাদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিবাব কোনো প্রয়োজন নাই।

প্রতিপক্ষ বলেন যে, রাজনীতিতে যোগদান যে দেশের সেবা তাহা ভুলিযা যাওয়া উচিত নয। দেশের অবস্থা সম্পর্কে পুঁথিগত জ্ঞান থাকিলেই চলে না—ছাত্রদের হাতে কলমে স্বদেশের সেবা করিবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য ছাত্রদের সক্রিযভাবে রাজনীতিতে যোগদান করা কর্তব্য।

ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের বিরোধীরা বলেন যে, রাজনীতি ছেলেখেলা নয়। অনেক প্রবীণ যেখানে হিম্‌সিম্‌ খাইযা যায, সেখানে অনভিজ্ঞ ছাত্ররা কীই বা করিতে পারে। যাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয নাই তাহারা রাজনীতির মত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষযে অংশ গ্রহণ করিযা বৃথা গোলযোগের সৃষ্টি করে কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য মাত্র প্রযোগ না করিযা নেতাদের নির্দেশে ওঠে বসে। অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনে বিদ্যালয়ের ছোটো ছোটো ছেলেমেযেরা যোগ দেয়—কিন্তু তাহারা কি আন্দোলন সম্পর্কে সত্যই সজাগ থাকে? একটা হুজুগ পাইযা তাহারা মাতিয়া উঠে এই পর্যন্ত। ইহার ফলে একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা যায।

যাঁহারা ছাত্রের রাজনীতিতে যোগদানের পক্ষপাতী তাঁহারা এই অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা হটিয়া যান না। তাঁহারা বলেন,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার অভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিলেও ছাত্ররা বহুকাল ধরিযা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিযাছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অপর পক্ষ বলেন, সামযিকভাবে ছাত্ররা রাজনীতিতে যোগদান করিতে পারে বটে কিন্তু সে সময় তাহাদের ছাত্রত্ব খর্ব হয়। যুদ্ধ বাধিলে অনেক দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। তখন

তাহাদের ছাত্র বলার কোনো অর্থ হয় না। ছাত্ররা যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তখন তাহারা যে ছাত্র তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের নেতার নির্দেশ অনুযায়ী চালিত হয়। তবে মুক্তি-সংগ্রামের মতো ব্যাপারে অধ্যয়নরত তরুণরা অংশ গ্রহণ করিলেও সাধারণ অবস্থায় ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নয়। এইজন্যই ভারতবর্ষের যে সব নেতা এক সময় ছাত্রদের লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা ক্ষতিকর বলিতেছেন। বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলাদলি আছে, তাহা ছাত্রদের মানসিক গঠনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

প্রতিপক্ষের জবাব হইল, সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা শেষ করিয়া অবসর বিনোদনের জন্য রাজনীতি করিব—রাজনীতি সে বিষয় নয়। রাজনীতির সাধনা কঠিন বলিয়াই ছাত্র অবস্থা হইতেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দেশ-সেবার ব্রতে কৈশোর হইতেই দীক্ষিত না হইলে চলিবে কেন?

বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলিবার আছে। উভয় পক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি ও কুটতর্ক উত্থাপনের সুযোগ আছে। ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের গঠনমূলক দিক ও ধ্বংসাত্মক দিক, দুইয়েরই নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে ছাত্রদের সকলেই কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে না এবং ছাত্রসমাজের কিছু অংশ সকল হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া রাজনীতিতে মাতিয়া যায়। সকল ছাত্রই রাজনীতি করিবে এইরূপ ধারণাও যেমন অবাস্তব, আবার ছাত্র অবস্থায় রাজনীতির ত্রিসীমানায় যাওয়া অনুচিত এরূপ সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মনে হয়, এইরূপ অভিমতই সর্বজনগ্রাহ্য যে, রাজনীতির স্বরূপটি ছাত্রেরা যত্নের সহিত জানিতে ও চিনিতে চেষ্টা করিবে, আলোচনা করিবে দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কিন্তু নিজেরাই রাজনৈতিক ধুরন্ধর সাজিবে না—"Students should be students of politics and not politicians."

ছাত্র-জীবনের স্মরণীয় দিন

মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন কতগুলি ঘটনা ঘটিয়া যায় যাহাদের স্মৃতি কোনদিন ম্লান হয় না। সেই বিচিত্র দিনগুলি সারাজীবন আনন্দ অথবা বেদনার অনুভূতি বহন করিয়া চলে। ঠিক এমনি কয়েকটি দিন ও বিশেষভাবে একটি দিন আমার ছাত্র-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া আমার স্মৃতিভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া আছে।

মনে পড়ে গৃহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রথম যেদিন ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম সে দিন বিদ্যালয়-ভবনের বিশালতা, পরিচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে মণ্ডিত শিক্ষকবৃন্দ ও অসংখ্য কিশোর ছাত্রের সমাবেশ—সবকিছু মিলাইয়া ইহার বিচিত্র উজ্জ্বল পরিবেশ আমাকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর কখন কেমন করিয়া অপরিচয়ের বাধা অতিক্রম করিয়া সকলের অলক্ষ্যেই সকলের আত্মীয় হইয়া উঠিলাম তাহা ভুলিয়া গিয়াছি; কিন্তু যে-শিক্ষকগণের পদপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞান-সাধনার সুযোগ লাভ করিয়াছি, যে সতীর্থমণ্ডলীর উদার স্নেহের আশ্রয়ে কৈশোরের স্বপ্নময় দিনগুলি লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত স্বচ্ছন্দগতিতে অতিক্রান্ত হইয়াছে, আজ পরীক্ষা-কণ্টকিত জীবনের বিরল অবকাশে তাহাদের মধুর চিত্র অপূর্ব স্নিগ্ধতায় অভিসিঞ্চিত হইয়া নিরালা মুহূর্তগুলিকে আনন্দ-চঞ্চল করিয়া তোলে।

আমার বিদ্যালয়-জীবনের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ নয়; তবু সেই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু আমার জীবনেতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থাগারের একপ্রান্তে নিরালায় বসিয়া আমরা কতিপয় বন্ধু নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করিতাম। ইহা ছিল আমাদের নিত্যকার অভ্যাস। লেখাপড়ায় কোনদিন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারি নাই। বিদ্যানুশীলনে আমার মনোযোগ, নিষ্ঠা বা যত্নের অভাব ছিল না, আর শিষ্টাচারের অভাবও আমার ব্যবহারে কোনদিন ফুটিয়া উঠে নাই। বোধকরি শুধু এই জন্যই আমি সকল শিক্ষকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু শিক্ষককে ভালোবাসারও যে একটা বিপদ আছে, এ ভালোবাসাও যে মানুষকে কাঁদাইতে পারে, তাহা তখন বুঝি নাই। শিক্ষকের সহিত ছাত্রের সম্পর্ক প্রধানত শ্রদ্ধার, আর তাহার সহিত মেশানো থাকে একটা ভয় ও বিস্ময়ের

কুয়াসা। দূর হইতে ভালোবাসা যায় অতি সন্তর্পণে। এ হেন সম্পর্কে গভীরতা কোথায়? কিন্তু কি ভাবে কি হইল জানি না, এমন একটি অতি বিস্ময়কর আকর্ষণের ফলে আমার ছাত্র-জীবনের একটি দিন স্মৃতির মণি-কোঠায় অক্ষয় হইয়া আছে।

আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, বিদ্যালযের ছাত্রাবাসে থাকি। আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন ছাত্রাবাসেব তত্ত্বাবধাযক। ছাত্রাবাসেবই দ্বিতলের একটি কক্ষে তিনি থাকিতেন। শুনিযাছিলাম তিনি আবাল্য ব্রহ্মচারী, স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত শিষ্য। গৈরিকবস্ত্র-পবিহিত এই প্রৌঢ় শিক্ষকটিকে সকলেই সমীহ করিযা চলিত। বস্তুতপক্ষে তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল ছাত্র-শিক্ষক-নির্বিশেষে সকলের মনেই একটা ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব জাগাইযা তুলিত। কাহাবও সহিত তাঁহাব কোন বিবোধ ছিল না অথচ কোনদিন কোন প্রসঙ্গেই তাঁহাকে প্রগল্‌ভ হইতে দেখি নাই। স্বল্পভাষী এই মানুষটি সর্বদাই যেন কি এক রহস্যেব অন্তরালে আপনাকে লুকাইযা রাখিতেন। ক্লাশের পডা হইতে শুরু কবিযা খেলার মাঠ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহাকে সমান উৎসাহেব সহিত বিচবণ করিতে দেখিতাম। একবাব পূজাবকাশের পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রদেব প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষ্য করিযা 'রামদাস' নাটকের অভিনয হইবে স্থিব হইল। সহকারী প্রধান-শিক্ষক মহাশয স্বযং 'রামদাস'-এর ভূমিকায অবতীর্ণ হইযাছেন। অভিনয় জমিয়া উঠিযাছে। রামদাস স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাব জন্য তাঁহাব প্রিয শিষ্য শিবাজীকে উত্তেজিত করিতেছেন। 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে একসূত্রে গ্রথিত করিযা এক বিশাল হিন্দুরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠ ফুলিয়া ফুঁসিযা গর্জন করিযা উঠিতেছে। নির্বাক নিস্তব্ধ শ্রোতার দল অভিভূত হইযা তাঁহার অপূর্ব অভিনয উপভোগ করিতেছে। সহসা সেই বিশাল নিস্তরঙ্গ জনসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাহিযা দেখিলাম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মুখে ভীতি ও উদ্বেগের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। তারপর ভাল করিয়া কিছু বুঝিবার আগেই কয়েকখানি সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই গাড়ী নিঃশব্দে আসিযা বিদ্যালযের সম্মুখস্থ রাজপথে দাঁড়াইল। স্বদেশবৎসল বীর সন্ন্যাসী রামদাম স্বামী রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার হইলেন। কোথা হইতে কেমন করিয়া কি ঘটিয়া গেল বুঝিলাম না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিপদবার্তা জ্ঞাপন করিয়া

অভিনয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। কোনো অবাঞ্ছিত অরসিক ব্যক্তি যেন উৎসব কক্ষের সমস্ত বাতি একটি ফুৎকারে নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

তখন রাজনীতি বুঝিবার বয়স নহে, তথাপি স্বদেশকে ভালবাসিবার অপরাধে ঐ যে নির্ভীক সন্ন্যাসী কারাবরণ করিলেন ইহা যেন কিছুতেই নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আমাদের বীর মন্ত্রের দীক্ষাগুরুকে লইয়া যে পথে অদৃশ্য হইয়া গেল, সেই পথের বাঁকে বাঁকে একটি বিক্ষুব্ধ কিশোর বালকের জলে-আগুনে-ভরা দুইটি অসহায় বিভ্রান্ত চক্ষু বহুদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। পরে জানিয়াছিলাম, তিনি শুধু রঙ্গমঞ্চের গুরু রামদাস নহেন, বাংলার তথা সমগ্র ভারতের বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা। রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে তাঁহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে আজ কৈশোর-স্মৃতির দ্বার উন্মোচন করিতে বসিয়া সেই নির্ভীক স্বদেশানুরাগী শিক্ষাগুরুর কথাই বার বার মনে পড়ে। সে সোনার দিনগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কোথায় সে বন্ধুর দল, কোথায় আমার সে কৈশোর-স্বপ্ন। কিন্তু আনন্দ-বেদনায় মাখানো সেই মহালয়ার দিনটি আমার দেবতুল্য শিক্ষক 'গুরু রামদাসের' সোনার মূর্তি বুকে আঁটিয়া আমার স্মৃতিলোকে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

সংকেত সূত্র

তোমার স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা

১। বাড়ীর পড়া শেষ করে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া—আনন্দের চেয়ে ভয় বেশি—সব মিলিয়ে একটা পরম বিস্ময়।

২। নিবিড়তর পরিচয়—স্কুলের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ—খেলাধুলায় অংশ-গ্রহণ—অঙ্কের শিক্ষকের সহিত চির-বিবাদ।

৩। সর্বপ্রথম স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে শ্রেষ্ঠ আবৃত্তি-কারীর পুরস্কার ও সম্মান-লাভ—ছাত্র-সংসদের সভ্যপদ প্রাপ্তি।

৪। প্রধান শিক্ষকের পিতৃসুলভ আচরণ, স্নেহময় অথচ শাসনে কঠোর—

পরবর্তী যুগে ঐরূপ নমুনা দুর্লভ। দশম শ্রেণীতে পাঠকালে প্রধান শিক্ষকের বিদায়সম্বর্ধনা।

৫। বিচিত্র স্বভাবের ছাত্রবন্ধুর সহিত পরিচয়। কতিপয় শিক্ষক-স্মৃতি।

৬। আজ সেই নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধনই মধুময় মনে হয়, কারণ এক তো বাঁধন কাটিয়া পাওয়া গিয়াছে—সুখের বদলে দায়িত্বপালনের কাঠিন্য, তাহা ছাড়া যে চরিত্রের গঠন পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, তাহার জন্য মন সেই স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলার কাছেই কৃতজ্ঞতায় নুইয়া পড়ে।

ছাত্রজীবনে নাগরিক শিক্ষা

১। নাগরিক শিক্ষা কী? সু-নাগরিক ও কু-নাগরিক। শিক্ষার দ্বারা কু-নাগরিক সু-নাগরিক হইতে পারে।

২। আজিকার ছাত্রই ভবিষ্যতের নাগরিক। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সে শুধু একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হইতে পারে, সু-নাগরিক হইতে পারে না।

৩। নাগরিক শিক্ষার উপরে নির্ভর করে আদর্শ জাতিগঠন ও জাতীয়তাবোধ। তাই অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলির ন্যায় নাগরিক শিক্ষাও পাওয়া উচিত ছাত্রজীবনেই যাহা সর্বপ্রকার গঠনের একমাত্র উপযোগী সময়।

৪। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের দৃষ্টান্তে আমাদেরও অগ্রসর হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব

১। পূর্বপ্রস্তুতি—আবৃত্তি, নাটিকাভিনয় প্রভৃতির মহড়া—একপক্ষকাল ধরিয়া স্কুলের হাল্কা হাওয়া।

২। সভায় জনসমাবেশ—পৃথক পৃথক অঞ্চলে শ্রেণীবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট আসন—সাধারণ ছাত্র ও পুরস্কার-প্রাপক ছাত্র।

৩। সভাপতির উপস্থিতি, আবাহন, সম্বর্ধনা।

৪। সভার কার্যক্রম—উদ্বোধন সঙ্গীত "জন-গণ-মন—" মাল্যদানাদি দ্বারা সভাপতিবরণ—সেক্রেটারীর ও প্রধান শিক্ষকের বিবরণী পাঠ—বিচিত্রানুষ্ঠান—পুরস্কার বিতরণ—উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর বক্তৃতা—সভাপতির ভাষণ—ধন্যবাদ জ্ঞাপন—বিদায় সঙ্গীত।

৫। তোমার মনের উপর উৎসবের প্রভাব।

ছাত্র-জীবনের সুখদুঃখ

১। গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ছাত্র-জীবনের পার্থক্য। এ এক নূতন জগৎ—সকলের সহিত এক নূতন সম্পর্ক। লাভ-লোকসান বা স্বার্থের খতিয়ান এ জীবনে ঘেঁষিতে পারে না।

২। জ্ঞানলাভের ও মানসিক উন্নয়নের সুখ যাহা সূক্ষ্ম অনুভূতিসাপেক্ষ। প্রীতি ও শ্রদ্ধার চর্চাজনিত সুখ যাহা সারাজীবনের খোরাক হইয়া থাকে।

৩। সাফল্য ও কৃতিত্ব লাভের সুখ—খেলাধূলার সুখ—গোষ্ঠীজীবনের সুখ।

৪। বিদ্যার্জনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়। এ জীবনে আরামের স্থান নাই—ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ, সুতরাং তপস্যার ক্লেশ অবশ্য স্বীকার্য।

৫। অর্থাভাবজনিত দুঃখ। দারিদ্র্যের অভিশাপ মর্মে মর্মে বুঝিতে হয়।

৬। মেধাহীন ও অনুরাগহীন ছাত্রের দুঃখের আর পার নাই। অসাফল্য লাঞ্ছনা, শাস্তিভোগ। নিয়মশৃঙ্খলার অসহ্য নিগড়। ছাত্র-জীবন অনেকের কাছেই বন্দী-জীবন।

তোমার প্রথম ছাত্র-জীবনের স্মৃতি

১। আবছা আবছা মনে পড়ে—গাঁয়ের এক ইউ. পি. স্কুল—তার পরিবেশ।

২। পড়া সুরু দ্বিতীয় শ্রেণীতে—তার আগে বাড়ীতে গুরুমশায়ের কাছে হাতেখড়ি—দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-শ্রেণী—ইউ. পি. স্কুল শেষ করে হাই স্কুল।

৩। অদ্ভুত এর স্মৃতি, কেননা এতে খুঁজে পাই এক অদ্ভুত সমন্বয় কলরবের মধ্যে পড়া—মনের চেয়ে গলায় জোর বেশি—মাঝে মাঝে গুরু মশায়ের হুঙ্কার—বেত্রদণ্ডের মহিমা—ভালো ছেলেরও নিস্তার নেই—রকমারি শাস্তি—ছুটির আগে স্কুলের উঠানে বকুলতলায় সমস্বরে নামতা-পড়া।

৪। পাততাড়ি ছেড়ে শ্লেট-পেন্‌সিল্‌, শ্লেট-পেন্‌সিল্‌ ছেড়ে খাতা-কলম,—তবে ছাত্র মানেই যেন "হাতে কালি মুখে কালি ছাতা পড়া দাঁত।"

৫। সমস্ত জীবনটাই খালি ভয় ও শাসনের জীবন।

(খ) ব্যায়াম-ক্রীড়া-প্রমোদ প্রসঙ্গ

১। ব্যায়াম শিক্ষার উপযোগিতা
২। ছাত্রজীবন ও খেলাধূলা
৩। কোন্ খেলা তোমার প্রিয়তম
৪। আমোদ-প্রমোদ
৫। নৌকা-ভ্রমণ
৬। বন-ভোজন
৭। অবসর-বিনোদন
৮। শখ (Hobby)
৯। স্কুলে নাট্যাভিনয়
১০। একটি খেলার বর্ণনা
১১। ঘরোয়া খেলা—কোন্‌টি তোমার প্রিয়তম ?

সংকেত সূত্র

১। ছুটি
২। রেলভ্রমণ
৩। ছায়া-ছবিতে কোনো এক সন্ধ্যা অতিবাহন
৪। মেলায় ভ্রমণ

ব্যায়াম শিক্ষার উপযোগিতা

সংকেত ঃ—১। শরীর ও মন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। ২। কেবল মানসিক চর্চা অসুস্থতার কারণ। ৩। অনিয়মিত ও অপরিমিত ব্যায়ামের অনিষ্টকারিতা। ৪। ব্যায়াম একটি শিক্ষণীয় বিষয় ৫। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যায়াম। ৬। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যায়ামের স্থান। ৭। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় ব্যায়াম শিক্ষা অপরিহার্য।

শরীর ও মন একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। উভয়ের মধ্যে যে আত্মীয়তা আছে তদপেক্ষা নিবিড়তর আত্মীয়তা আর কল্পনা করা যায় না। মনকে সুস্থ-সবল রাখিতে হইলে শরীরকেও সুস্থ-সবল রাখা আবশ্যক। অসুস্থ শরীরে কেহই মানসিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, সুখীও হইতে পারে না। স্বাস্থ্যই সম্পদ।

অনেকেই ভুল করিয়া কেবল লেখাপড়ায় মাতিয়া থাকেন। অথচ ইহা অবিসম্বাদিত যে, মানসিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শারীর চর্চা না থাকিলে শরীর ও মন দুই অসুস্থ হইয়া পড়ে। মানসিক শক্তির উৎকর্ষ নিঃসন্দেহে দৈহিক উৎকর্ষ-সাপেক্ষ। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় প্রচুর মানসিক চর্চা হইতে থাকিলেও দেহচর্চা অবহেলিত থাকিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ ব্যায়ামের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন নহেন।

আবার ইহাও দেখা যায়, অনেকে ব্যায়াম করিতে গিয়া কোন মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে না, অথবা সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন মনে করে না। তাহারা ব্যায়ামের নামে অযথা শক্তিক্ষয় করিয়া থাকে। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম যেমন হিতকর, অনিয়মিত ও অপরিমিত ব্যায়াম তেমনি অনিষ্টকর। আদৌ ব্যায়াম না করায় যে ক্ষতি হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষতি হয় অতিরিক্ত ব্যায়ামে।

এই সকল কারণে ব্যায়াম একটি শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরিগণিত। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যায়ামশিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইবার জন্য অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাস্তবিকই উপযুক্ত ব্যায়াম-শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যায়াম তাহা অশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে যুগপৎ শরীর ও মন আদর্শ গঠনে গঠিত হইয়া উঠে।

ব্যায়ামে আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানের মাংসপেশীগুলি সবল হয়, স্নায়ু-শক্তি বৃদ্ধি পায়, অস্থি পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু খামখেয়ালী ব্যায়ামে অনেক

ক্ষেত্রে এই পেশী, স্নায়ু ও অস্থির বিকৃতি ঘটায় মানুষকে বিপন্ন হইতে হয়। উপযুক্ত ব্যায়াম-শিক্ষক শরীর-সংস্থান-বিদ্যার বলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনা ব্যাপারে নির্ভুল নির্দেশ দিতে পারেন। এই বিদ্যা যাহার আয়ত্ত নাই তাহার পক্ষে আনাড়ীর মত কসরৎ দেখাইতে যাওয়া বিপজ্জনক মাত্র। পক্ষান্তরে উচ্চাঙ্গের ব্যায়ামবিদ্ শুধু যে হিতকর অঙ্গচর্চারই নির্দেশ দেন; তাহা নহে, অনেক সময় কোনো কোনো যান্ত্রিক ব্যাধিও দূর করিতে সক্ষম হন। প্রখ্যাত ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীবিষ্ণু ঘোষের এই শ্রেণীর কৃতিত্বের কথা সর্বজনবিদিত।

সর্বদেশে সর্বকালে এই ব্যায়াম শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল দেশেই ব্যায়াম-শিক্ষার স্থান নির্দিষ্ট আছে। ইহার উদ্দেশ্য, এক তো লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চা হইতে থাকিলে লেখাপড়ার কাজ যাহাতে আরও সুন্দর হয় সেই ব্যবস্থা করা, তাহা ছাড়া, বাল্যে একবার এই ব্যায়ামের অভ্যাস গঠিত হইলে পরিণত জীবনেও উহা বজায় রাখিয়া মানুষ যাহাতে স্বাস্থ্য-সুখ উপভোগ করিতে ও স্বাস্থ্যের বলে জীবনসংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা করা।

শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না যদি দেহটি থাকে অবহেলিত। দেহের চর্চা ও মনের চর্চা উভয়ের সমন্বয়েই গঠিত হইতে পারে প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ। একটির অভাবে শিক্ষা অপূর্ণ থাকিতে বাধ্য। অতএব, শুধু স্বাস্থ্য-সুখলাভের জন্য নহে, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভের জন্যও ব্যায়ামশিক্ষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

ছাত্রজীবন ও খেলাধুলা

সংকেত ঃ—১। ছাত্রজীবন প্রধানত অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞানসঞ্চয়ের জীবন। ২। খেলাধুলা বাদ দিয়ে ছাত্রজীবনের যে গঠন তা অসম্পূর্ণ। ৩। গ্রন্থকীট হওয়া কাম্য নয়—খেলা ও পড়ার সামঞ্জস্যই কাম্য। ৪। খেলোয়াড়ী মনোভাব ও জীবনে তার প্রভাব। ৫। উপসংহার।

ছাত্রজীবন বলতে আমরা বুঝি স্কুল-কলেজের জীবন, যেটা প্রধানত হলো শিক্ষার জীবন, সঞ্চয়ের জীবন, প্রস্তুতির জীবন। শিক্ষা বলতে কিন্তু শুধু পাঠ-শিক্ষা নয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি চরিত্রগঠনের

প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাই বোঝায়। কিশোর ও তরুণ ছাত্রসমাজের প্রথম ও প্রধানতম কাজ জ্ঞানসঞ্চয়। প্রাচীনতম যুগ থেকে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য বিহিত হয়েছে "ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ"—এই আর্য-নির্দেশে। ছাত্রদের অধ্যয়ন একমাত্র তপস্যা; অর্থাৎ অনন্যমনা হয়ে ছাত্রকে অধ্যয়ন করতে হবে। ছাত্রমানসের অজস্র জিজ্ঞাসা এবং অপরিমিত জ্ঞানপিপাসা একমাত্র অধ্যয়নেই পরিতৃপ্ত হতে পারে। অধ্যয়নের মাধ্যমেই ছাত্র পাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শিক্ষা। ছাত্রকে তাই নিয়মিত এবং যথাসাধ্য অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণে একাগ্রমনে ব্রতী হতে হবে।

ছাত্রজীবনে অধ্যয়নকে অবহেলা ক'রলে তার ফল যে বিষময় হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কিছুই ছাত্রজীবনে করা চলবে না, এ ধারণাও একেবারেই ভ্রান্ত। একথা কখনও ভোলা যায় না যে, ছাত্রজীবন একটা বিরাট গঠনের জীবন। এই গঠনের পূর্ণতা কেবল অধ্যয়নে সম্ভব নহে। কেবল ধী-শক্তির চর্চায় এই গঠন অপূর্ণ থাকতে বাধ্য। ঐ সঙ্গেই চাই প্রচুর খেলাধুলা যা শরীর ও মনকে রাখবে সুস্থ, জীবন্ত ও আনন্দময়।

খেলাধুলা থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে কেবল গ্রন্থস্তূপে নিমজ্জিত থাকলে তরুণ ছাত্রদের প্রাণশক্তি যায় কমে, শারীরিক উন্নতি হয় ব্যাহত, মন হয়ে ওঠে পঙ্গু। পুস্তকলব্ধ জ্ঞান অতিরিক্ত সঞ্চয়ের প্রচেষ্টায় অনেক ছাত্রকেই চিরতরে স্বাস্থ্য হারাতে দেখা যায়। 'পড়ুয়া' ছেলের সুনাম অবশ্যই কাম্য, কিন্তু গ্রন্থকীট হওয়া কাম্য নয়। তাই আধুনিক মত হ'ল 'Play while you play, read while you read'; যখন অধ্যয়ন করবার কথা তখন একমনে অধ্যয়ন ক'রতে হবে, আবার খেলবার সময় অধ্যয়ন-চিন্তায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করা চলবে না, তখন মনকে ছেড়ে দিতে হবে মুক্ত বিহঙ্গের মত জীবনীশক্তির আহরণে। এইভাবে খেলায় ও পড়ায় একটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে, দুয়ের সুসমঞ্জস মিলনেই জীবন হয়ে উঠবে সুস্থ, সুন্দর ও সার্থক। ছাত্রজীবনে চাঞ্চল্য এবং প্রাণোন্মাদনা থাকে সব থেকে বেশী। তাই যেখানে এই সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে কড়া-পাহারার অভাব, সেখানে অধিকাংশ ছাত্রই পড়াশুনো একেবারে বাদ দিয়ে সব সময়ই খেলাধুলা করে কাটাতে চায়। কিন্তু যেমন

"All work and no play makes Jack a dull boy', তেমনি অতিরিক্ত মাত্রায় খেলাধুলায় মত্ত হলে সর্বনাশের পথই প্রস্তুত হতে থাকে।"

খেলাধুলায় যে কেবল শরীরচর্চা হয়, তা নয় ; এতে মনের স্ফূর্তি বাড়ে, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা হয়, আর জাগে এক দলগত ঐক্যানুভূতি। 'খেলাতে জয়পরাজয় বিনা দ্বিধায় মেনে নেবার যে খেলোয়াড়ী মনোভাব গঠিত হয়, জীবনযুদ্ধে তারই বলে মানুষ অনমনীয় হয়ে উঠে। প্রকৃত খেলোয়াড় যেমন ক্রীড়াঙ্গনে বিজয়োল্লাসেও মত্ত হয় না, পরাজয়েও মুষড়ে পড়ে না, তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখকেও সে সমভাবে গ্রহণ করতে পারে। খেলার মাধ্যমে এ যে কত বড়ো শিক্ষা তা বলা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়ন ও খেলাধূলা দুই-ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের মধ্যে বিরোধ নেই, আছে মৈত্রী। ছাত্রজীবনে দুইয়ের সমান প্রয়োজন। জীবন-বিকাশের আকাশে বিকাশকামী ছাত্র-বিহঙ্গ যে দুইটি পক্ষ বিস্তারে বিচরণ করবে, তারই একটি পড়াশুনা, অপরটি খেলাধুলা। অনেক ছাত্রের কাছে অধ্যয়ন নিতান্ত নীরস মনে হয় ; খেলাধূলার সহযোগে এই নীরস বস্তুই সরস হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ তাই খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের (Playway in Education) উপদেশ দেন।

ছাত্রদের জ্ঞানরূপ বর-লাভের জন্য অধ্যয়নরূপ তপস্যা করতে হবে। কিন্তু দুর্বল কি করে তপস্যা করবে? কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে তপস্বীকে শক্তিশালী হতে হবে। ছাত্রদের তাই আগে চাই সুস্থ-সবল দেহ, আর, তা পেতে গেলে আসতে হবে খেলার মাঠে। নিয়মিত ও পরিমিত খেলাধুলায় স্বাস্থ্যসম্পদ অর্জিত হবে, মন প্রফুল্ল হয়ে উঠবে, পাঠে উৎসাহ আসবে। অধ্যয়নে মনোযোগ যেন খেলার উৎসাহে না বিঘ্নিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বৈকি। খেলা ও পড়ার মাঝে একটা কাল্পনিক সীমারেখা থাকবে, তা অতিক্রম করে পড়াও খেলার দিকে যাবে না, খেলাও পড়ার দিকে আসবে না। এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'লে তবেই শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে জ্ঞান-গরিমায় ও চারিত্রিক মহত্ত্বে ছাত্রজীবন সার্থক হয়ে উঠবে।

কোন্ খেলা তোমার প্রিয়তম

সংকেতঃ—১। ভূমিকা ২। দেশী ও বিদেশী খেলা—উহাদের আকর্ষণ ৩। ফুটবল-হকি-ক্রিকেট-টেনিস-ভলি-বাস্কেট বল ৪। প্রিয়তম খেলা 'ব্যাডমিণ্টন্'—উহার কারণ।

'খেলা' কথাটির সঙ্গে আনন্দ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। খেলায় অংশগ্রহণ করিতেও আনন্দ, দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেও আনন্দ। খেলা বলিতে অবশ্য এখানে ঘরোয়া খেলা নয়, মাঠের খেলাই আমাদের আলোচ্য।

খেলাকে দেশী এবং বিদেশী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে দেখা যায় বিদেশী খেলাই এদেশে অধিক প্রচলিত। দেশী খেলার মধ্যে-হা-ডু-ডু, কপাটি, কিৎকিৎ খেলা উল্লেখযোগ্য। এইসকল খেলার মাধ্যমে উত্তমরূপে শরীরচর্চা সম্ভব। শুধু তাহাই নহে, এই খেলাগুলির জন্য কোনরূপ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং খেলার আনন্দ উপভোগ করিতে কিছুমাত্র অর্থব্যয় করিতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে দেশী খেলার ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদেশী খেলায় খরচা আছে, কিন্তু তথাপি উহার প্রবল আকর্ষণে দেশী খেলা আমাদের দেশে ক্রম-বিলীয়মান। আজ একমাত্র সুদূর পল্লীগ্রাম ব্যতীত সর্বত্রই বিদেশী খেলার প্রচলন ও সমাদর।

বিদেশী খেলার মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করিতে হয় ফুটবল খেলার। এ খেলা আমাদের দেশে এতই প্রচলিত যে, বিশ্বাস করিতে পারা যায় না বিদেশে এ খেলার জন্ম। যেখানে এতটুকু ফাঁকা জায়গা সেখানেই ফুটবল চর্চা চলিতে দেখা যায়। লেকে-ময়দানে বৈকালিক ভ্রমণকালে ফুটবল আসিযা গায়ে লাগিবেই। পাড়ায়-পাড়ায় ফুটবল প্রতিযোগিতা; ট্রফি, লীগ, শীল্ডের লড়াই লাগিয়াই আছে। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উন্মাদনায় মাতিয়া উঠে। জীবনপণ করিয়া লোকে টিকিট সংগ্রহ করে, এমন কি খেলায় হার-জিতের ঘোর অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য রকমের বাজী রাখিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপে অজস্র ফুটবল অনুরাগী ফুটবলের মধ্যেই যেন অনুভব করে নিজেদের জীবনস্পন্দন। ফুটবলই আজ ভারতের প্রধানতম খেলা।

ফুটবলের পরে খানিকটা সমজাতীয় হকিখেলার স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। যদিও পৃথিবীর মধ্যে হকি খেলায়

ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, তথাপি এ খেলার প্রচলন, এবং সমাদর ফুটবলের তুলনায় নগণ্য। হকি খেলাতে পাঞ্জাবীরা বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাঙালী হকি-খেলোয়াড় বিরল।

ফুটবলের মত ক্রিকেটেরও জন্মদাতা ইংলণ্ড। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে। ক্রিকেট ক্রীড়াজগতে অতুলনীয় আভিজাত্য লইয়া বিরাজমান। টেষ্ট খেলোয়াড়দের মর্যাদাও অসাধারণ। ক্রিকেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উহা দীর্ঘমেয়াদী দ্বি-প্রহরের খেলা, তাই শীতকালেই ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে আগত কয়েকটি দলের টেষ্টম্যাচ দেখিয়া এবং বেতারে ধারা বিবরণী শ্রবণ করিয়া গত কয়েক বৎসরে ভারতে ক্রিকেট খেলায় প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে।

টেনিস বেশ ব্যয়সাধ্য অভিজাত খেলা। এর প্রচলনও বেশী নয় এবং অনুরাগীর সংখ্যাও নগণ্য। ভারতে মাদ্রাজীরা টেনিস খেলায় অগ্রণী। এর পর আসে ভলিবল আর বাস্কেটবল, দুইটিই প্রচলিত সমমাত্রায়। বিভিন্ন ক্লাবে এবং পার্কে ভলিবল-বাস্কেটবল খেলিবার সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। এই দুইটি খেলাতেই দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই ফুটবল-হকি-ক্রিকেট-টেনিস-বাস্কেট-ভলির কোনটিকেই 'প্রিয়তম' আখ্যা দিতে পারি না। তবে আমার প্রিয়তম খেলা কি? ইহার উত্তরে সবিনয়ে বলি 'ব্যাডমিণ্টন'। ক্রীড়াজগতে ইহার বিশেষ প্রাধান্য নাই কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? ফুটবল-ক্রিকেট খেলিয়া অপরে যে আনন্দ লাভ করে ব্যাডমিণ্টন খেলিয়া আমি তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম আনন্দ পাই না। শীতকালীন অপরাহ্নে ব্যাডমিণ্টনই সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য খেলা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ খেলায় বিস্তৃত পরিসরের প্রয়োজন নাই, একফালি মাঠ হইলেই যথেষ্ট। তাহা ছাড়া প্রধান কথা হইল বাডমিণ্টনে অতিরিক্ত দৌড়-ঝাঁপ, যাহা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহার প্রয়োজন হয় না। একক প্রতি-যোগিতায় দ্বৈতপ্রতিযোগিতা অপেক্ষা শারীরিক কসরৎ বেশী হয় বটে, কিন্তু ফুটবল-ক্রিকেটের তুলনায় তাহা নগণ্য। শীতের দিনে ব্যাডমিণ্টন শরীরকে ঠিক প্রয়োজনমত উত্তপ্ত করিয়া তুলে যাহাতে খেলার শেষে শীতের সন্ধ্যা পরম উপভোগ্য হইয়া উঠে। তাই বাডমিণ্টনই আমার প্রিয়তম খেলা।

আমোদ-প্রমোদ

সংকেত ঃ—১। কাজও যেমন প্রয়োজন, আনন্দও তেমনি দরকার ২। বহুপ্রকার আমোদ-প্রমোদ ৩। ব্যসন বা রুচিবিগর্হিত আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করা উচিত।

মানুষ যেমন একদিকে কাজ করে, অপরদিকে তাহাকে আনন্দের সন্ধান করিতে হয়। মানুষ যন্ত্র নয়, আনন্দের অবকাশটুকু না থাকিলে সে হাঁপাইয়া মরিত। কাজের মাঝে মাঝে মনকে আনন্দ দিবার অবকাশ পায় বলিয়াই জীবনটা তাহার কাছে নীরস বলিয়া মনে হয় না। প্রাত্যহিক জীবনের কঠোরতাকে লাঘব করিবার জন্য মানুষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়াছে।

আমোদ-প্রমোদের প্রকারের সীমা নাই। অনেকের কাছে খেলাধূলা একটা বড়ো রকম আমোদের বিষয়। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন ভলিবল, টেনিস্কোট প্রভৃতি খেলা অনেকের কাছে আনন্দের বিষয়। যাহারা খেলে তাহারা তো আনন্দ পায়ই, যাহারা খেলা দেখে তাহারাও কম আনন্দ উপভোগ করে না। ফুটবল খেলা ও কুস্তি বা বক্সিং প্রতিযোগিতায় দর্শকদের উত্তেজনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেহ কেহ ঘরে বসিয়াই ক্রীড়ার আমোদ পাইতে চাহেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে লুডো বা গোলোকধাম জাতীয় খেলাগুলি চিত্তাকর্ষক। ক্যারাম খেলা ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। তাস-খেলার নেশা যাহাদের আছে তাহারা ইহাতে মাতিয়া থাকে। দাবাখেলার তো কথাই নাই। পাকা দাবাখেলোয়াড়রা দাবার ছকের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে কসুর করে না। ঘরের খেলার মধ্যে বিলিয়ার্ড একটু রাজসিক ধরণের খেলা—ইহাতে ধৈর্য ও অভ্যাস দুইয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। টেবিলটেনিস অল্পবয়স্কদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া যে সকল আমোদ-প্রমোদ গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির মধ্যে পূর্বযুগের পাঁচালী যাত্রাগান আর এযুগের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত সুলভ চলচ্চিত্র বর্তমানে প্রমোদের একটা বিশেষ বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। শহরে থাকিয়া মাঝে মাঝে চলচ্চিত্র দেখিতে যায় না এরূপ লোকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়।

অভিনয়ও কলাবিদ্যার অন্তর্গত, কিন্তু সঙ্গীত-কলার বিভিন্ন অংশে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। কণ্ঠসংগীতের বিভিন্ন বিভাগ আছে—সকলেই কোনো না

কোনো বিভাগে আনন্দ পায়। যন্ত্রসংগীতেও অনেককে আনন্দ দেয়। নৃত্যের কলাগত দিকটা সকলে বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহার এমন একটা সুষম ছন্দ আছে যাহা অনভিজ্ঞেরও মনোহরণ করিতে পারে।

ইহা ছাড়া, নৌকা-বিহার, চড়ুইভাতি বা দল বাঁধিয়া কোন জায়গায় যাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। এইগুলিকেও আমোদ-প্রমোদের অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে।

মানুষের শ্রান্ত মনকে আনন্দ দিবার জন্য আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবিয়া থাকা নিতান্ত অসংগত। কর্মরত মানুষের জীবনকে সুসমঞ্জস করিবার জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়—ইহাকে জীবনের প্রধান বিষয় করিয়া তুলিলে চলে না। তখন উহা বিকৃত হইয়া মানুষের শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিতে থাকে। তাহা ছাড়া ঘোড়-দৌড়, জুয়াখেলা প্রভৃতি এমন কয়েকটি আমোদ-প্রমোদ আছে যাহা নানা দিক দিয়া ক্ষতিকর। কুৎসিত রুচির ছায়াছবি, থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতি জাতীয় রুচিকে বিকৃত করিয়া তুলিতে পারে। আমোদ-প্রমোদকে নেশার মত উপভোগ করিতে চাহিলে তাহা রুগ্ন বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়। জীবন যাহাতে কর্ম ও আনন্দ উভয়ের সামঞ্জস্যের ফলে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে সেই দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে।

নৌকা-ভ্রমণ

সংকেতঃ—১। ভ্রমণ-বিলাস স্বাভাবিক মানবধর্ম ২। বিচিত্র ধরণের ভ্রমণ—তন্মধ্যে নৌকা-ভ্রমণের স্থান ৩। নৌকা-ভ্রমণে উপভোগ্য বস্তুর বর্ণনা ৪। ইহার বৈশিষ্ট্য ৫। ইহার সঙ্কট ৬। মনের উপর নৌকাভ্রমণের প্রভাব।

ভ্রমণলিপ্সা মানবমনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম, জন্মসূত্রে মানুষ এই লিপ্সার অধিকারী। অজানাকে জানবার অদেখাকে দেখবার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা মানব-মনকে করছে ভ্রমণবিলাসী। প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে, তার রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শ অনুভব ক'রতে মানুষের ভ্রমণ-পিপাসার জন্ম। ভ্রমণের আনন্দ মানুষকে চিরকাল ঘরছাড়া করেছে, দিয়েছে অজানা পথের সন্ধান।

ভ্রমণ বিচিত্র ধরণের; তন্মধ্যে পদব্রজে ভ্রমণ সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনতম কালে ভ্রমণকারীদের পদব্রজে ভ্রমণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর মত ভ্রমণকারিগণ পদব্রজেই দেশভ্রমণ করতেন। পল্লী অঞ্চলে গো-যানে ভ্রমণ উপভোগ্য বলেই গণ্য। পাল্কীযোগে ভ্রমণ বর্তমানে আর প্রচলিত নেই, কিছুকাল আগে পর্যন্ত এর বহুল প্রচলন ছিল। পাল্কী সাধারণতঃ স্ত্রীলোক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে রেলপথে দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটে ভ্রমণ যেমন সুসাধ্য তেমনি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। গো-যান, পাল্কী, রেলগাড়ী—এইগুলি সবই স্থলপথের যান। জলপথেও বিভিন্ন পন্থায় ভ্রমণ করা যায়। নৌকা, জাহাজ এবং ষ্টীমার আমাদের পরিচিত জলযান। জাহাজ এবং ষ্টীমার বাষ্পচালিত এবং দ্রুতগামী; কিন্তু নৌকা মনুষ্যচালিত এবং ধীরগামী—এইখানেই জলযান হিসাবে নৌকার বৈশিষ্ট্য। দাঁড় বেয়ে নৌকা চলে শান্ত গতিবেগে, আরোহী প্রাণভ'রে উপভোগ করে নদীবক্ষের শোভা আর দুই তীরের দৃশ্য। মাটি, জল আর আকাশ—এককথায় সমগ্র প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের যে প্রশস্ত সুযোগ নৌকাভ্রমণে পাওয়া যায় তা অন্যত্র দুর্লভ।

নদীবক্ষে ভাসমান নৌকা থেকে নদীর দুই তটের শোভা অপরূপ মনে হয়। ভ্রমণকারী অজস্র দর্শনীয় বস্তুরাজি উপভোগ করতে থাকেন। নৌকা-ভ্রমণকালে সাধারণতঃ যে সকল দৃশ্য আরোহীর চোখে পড়ে, তার একটি নিখুঁত বর্ণনা আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'। "নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে।...জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে। কৃষক লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে......। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরা কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচামাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্করা শিবপূজা করিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল

দিতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক ডুব মারিতেছে। আর পাখী কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে।”

নৌকা-ভ্রমণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ভ্রমণকারীর অবাধ স্বাধীনতা, যা রেল বা ষ্টীমার-জাহাজ ভ্রমণে থাকে না যেখানে খুসি মাঝিকে বলা যায় ‘ভিড়াও তরণী’। চলতে চলতে কখন নেমে এসেছে সূর্য পশ্চিম আকাশ বেয়ে; সোনা ঢেলে দিয়েছে তরল নদীবক্ষে; স্নিগ্ধ কমনীয় হয়েছে তপনদেবের রশ্মিজাল যেন এক বিদায়ের কারুণ্য মাখানো ধরণীর স্নেহধারারূপ নদীর জলধারায়। ‘ভিড়াও তরণী তীরে, মাঝি ভাই,’ নচেৎ প্রাণ ভরে দেখা হয় না এই মায়ার খেলা। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, প্রকৃতির যে বিচিত্র লীলা বিচিত্র রূপে-রঙে লীলায়িত হয় নদীবক্ষে বা নদীতীরে, নৌকাভ্রমণে তা যথেচ্ছ উপভোগ করতে পারে মানুষ যেমন, তেমন আর কোন উপায়েই সম্ভব হয় না। তাই বোধ হয়, জীবনসন্ধানী কবি রবীন্দ্রনাথ এমন নৌকাবিলাসী ছিলেন। তাঁর অজস্র মহামূল্য কবিতা রচিত হয় নৌকাবিহার-কালে।

শান্ত আবহাওয়ায় নৌকাভ্রমণ যেমন আনন্দদায়ক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তেমনি ভয়াবহ। সহসা বাতাস যায় বন্ধ হয়ে। চারিদিকে যেন একটা থমথমা ভাব; কী যেন একটা প্রচ্ছন্ন ভ্রূকুটি। যারা এর অর্থ বোঝে, তাড়াতাড়ি পাল নামিয়ে ফেলে, তীরে নিয়ে যেতে থাকে তরী ত্রস্ত-বহিত্র-চালনায়। হয়তো তার আগেই আকাশে ঝড় ওঠে, নদীর কালো জল উত্তাল হয়ে ওঠে, নৌকা অস্থির হয়ে এ-পাশ ও-পাশ দুলতে থাকে। তখন আরোহীর অবস্থা রীতিমত সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়ায়। কর্ণধার আপ্রাণ চেষ্টা করে নৌকার নিমজ্জন রোধ ক'রে তীরে ভেড়াতে, আর ভীতি-বিহ্বল রোমাঞ্চিত আরোহী একাগ্রমনে তারই সাফল্য কামনা করে। আবার নদীবক্ষের চড়ায় নৌকা আটকে যাওয়ায় অনেকক্ষেত্রে আরোহীকে বিপন্ন হতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুশলী কর্ণধারের কৃপায় নৌকারোহী সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাধা-বিপত্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পায়।

বিচিত্র ধরণের ভ্রমণ মনের উপর বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করে, প্রত্যেকেরই আবেদন বিভিন্ন। নৌকাভ্রমণে মন শান্ত এবং প্রফুল্ল হয়ে উঠে, এ ভ্রমণ আনন্দদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর। নৌকাভ্রমণে স্থলের অধিবাসী জলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠে, তার অভিজ্ঞতার পরিধি প্রসারিত হয়। এই ভ্রমণের মহালাভ; এতে পাওয়া যায় এক সমন্বয়ের আস্বাদ। জল ও স্থলের সঙ্গমসুখ মনে যেমন এনে দেয় একটা সমতার প্রশান্তি, তেমনি প্রকৃতির স্নিগ্ধ-ভীষণ মূর্তিবাহিনী নদীতেই ভ্রমণকারী পায় এই জীবন-নদী-প্রবাহেরই 'যেন একটা কোমল-কঠোর প্রতিরূপ। সহজ হয়ে ওঠে জীবনের প্রবাহ নদীর প্রবাহ দেখে দেখে। দুইয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এক নিবিড় আত্মীয়তা। সহজেই বলতে পারা যায়,

"আমার জীবন-নদীর ওপারে
এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে ॥"

বন-ভোজন

সংকেত ঃ—১। বন-ভোজন একটা আমোদ—এই আমোদের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ২। বনভোজন আমাদের জীবনে ঘটায় একটা উপভোগ্য আন্দোলন ৩। বন-ভোজনের প্রথম পর্ব, খসড়া-রচনা সমগ্র পালাটির সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অধ্যায় ৪। দ্বিতীয় পর্ব, জিনিষপত্র যোগাড় করিয়া যাত্রা—দলপতির বাহাদুরী ৫। তৃতীয়পর্ব, আসল ভোজনোৎসব ৬। শেষপর্ব—প্রত্যাবর্তন ও পর্যালোচনা।

কাজের ঠাসবুনানির মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে কিছু আমোদ-প্রমোদের জন্য। ভালো লাগে না একটানা নিয়মের বাঁধাবাঁধন, একই রুটিনের একঘেঁয়ে অনুসরণ। একটু এলোমেলো, একটু শিথিল হতে ইচ্ছা করে। আমোদ বলতে ঠিক যে বস্তুটাকে বোঝায়, তার জন্য দরকার কিছু নিয়মভঙ্গের, কিছু শৈথিল্যের। জীবনের শুষ্কতা, যান্ত্রিকতা, একঘেঁয়েমি ঘুচিয়ে তাকে আস্বাদ্য, উপভোগ্য করে তুলবার পক্ষে মাঝে মাঝে আমোদের বিশেষ দরকার। আমোদ যেন সাময়িকভাবে নিয়ে যায় আমাদের এক নূতন জগতে—দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে দূরে বহু দূরে। বন-ভোজন বা 'চড়িভাতি' যে একটা বিশিষ্ট আমোদ, তার পরিচয় অনেকটা এর নামেতেই রয়েছে।

ভোজনে মেটে প্রয়োজন—যার আয়োজন নিত্য আমাদের বাড়ীতে, আর আমোদের জন্য দরকার হলো বনে গিয়ে অর্থাৎ বাড়ী থেকে দূরে কোথাও গিয়ে ভোজন। শুধু বাড়ী থেকে নয়, বাড়ীর পরিচিত পরিবেশ ও অভ্যস্ত রীতি থেকে সম্পূর্ণ অদলবদল ঘটিয়ে যে ভোজন, তাই হল বন-ভোজন। অর্থাৎ ঠাকুরে রাঁধবে না, অথবা মা-দিদিমার পাকা হাতে পাকা রান্না হবে না, এ রান্না হবে আনাড়ীদের ওস্তাদিতে। শুধু রান্না নয, সমস্ত আয়োজনটাই হবে এইরকম।

বন-ভোজন বেশ বড় রকমের একটা আন্দোলন জাগায় যার প্রতিটি ঢেউ উপভোগ্য। প্রস্তাবটি হয় প্রায়ই আকস্মিকভাবে, বন্ধুদের কোন আকস্মিক সম্মিলনে। অবশ্য স্কুল থেকেও অনেক সময বন-ভোজন আয়োজিত হয়ে থাকে, সেখানে এই আকস্মিকতার শিহরণটা তেমন থাকে না, সে যেন খানিকটা রুটিন-মাফিক হয়ে থাকে। সেখানে যোগদানকারীর সংখ্যাধিক্য, অপরিহার্য কলরব, শিক্ষকদের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি মিলিয়ে জিনিসটা যেন ঠিক প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে না। বন-ভোজনের সর্বপ্রথম আকর্ষণই হলো বল্গা-ছেঁড়া স্বাধীন রুচির অনুসরণ। শুধু অনুরূপ মনের বশবর্তী সঙ্গীদের সঙ্গে মন মিলিয়ে চলা ছাড়া আর কোন কিছুরই বাঁধন এতে থাকবে না।

প্রথমেই একটা পরিকল্পনা-রচনা। এই সময়ে চাই দলের সকলের উপস্থিতি। এ কি আর একদিনের উদ্যোগে একটা চূড়ান্তরূপ নিতে পারে? আজ স্কুলের ছুটির পর, কাল টিফিনের সময়, পরশু রথের ছুটিতে সৌমেনদের বৈঠকখানায় বসে, খাতায়-পেন্সিলে তর্কে-বিতর্কে পঞ্চাশ রকম প্রস্তাবের সমর্থনে-সংশোধনে, বিশেষ ঠেকায় পড়লে সৌমেনের বৌদির অভিজ্ঞ মতামতের সাহায্যে—তবে তো একটা খসড়া তৈরী হবে। বন-ভোজনের এই খসড়া রচনাই বোধ হয় সমগ্র পালাটির সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অধ্যায়,—যেটা হবে, তারই ছবি আঁকার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকা; এবং এ আনন্দ থাকবে সব সময়ে একটা চড়া ডিগ্রীতে, যার চোটে খসড়া আর কিছুতেই সম্পূর্ণ বা নিখুঁত হবে না। খুঁতই যদি না রইলো, শেষপর্যন্ত যোগাড়-পর্বের মধ্যে যদি একটা অপরিহার্য জিনিসই বাদ না পড়ে গেল তবে আর বন-ভোজন কি হলো? কোথায় যাওয়া হবে, কিভাবে যাওয়া হবে, একি আর একটা সহজ সিদ্ধান্তের ব্যাপার? কত যায়গার প্রস্তাব, কত রকমেরই বা যানবাহনের কথা, সব মিলিয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে যেন একটা

স্বপ্নলোক। শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করতে হয় বৈকি! নেতৃত্ব এমন একজনকে দেওয়া হয়, যার আছে সবদিকে কিছু মাথা-খেলাবার ক্ষমতা, আর সর্বোপরি বেশ একখানা অটুট জঠর শরীর। বন-ভোজন-পার্টির দলপতির মর্যাদা সত্যই লোভনীয়।

অতঃপর নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা। এই পর্বে আছে যানবাহনের আয়োজন, খাদ্য ও তৈজসাদির সংগ্রহ, সেগুলির পরিবহণ, বিভিন্ন ব্যক্তির উপব বিভিন্ন জিনিসের দায়িত্ব দেওয়া,—রীতিমত একটা শ্রমবিভাগমূলক ক্রিয়াকাণ্ড। কে কোন্ জিনিষ কত সুন্দরভাবে কত কৌশলে যোগাতে পারলো তা নিযে চলবে একটা রেষারেষি, আর সমবেতভাবে সকলেই পাবে একটা সংগঠন-শিক্ষা। দলপতির নেতৃত্বের এইখানেই চরম পরীক্ষা, তাঁর ব্যবস্থাপনার দৌড়ের উপব নির্ভর করে সমস্ত জিনিসটার সাফল্য।

এইবার আসল ভোজন। পাকা-রান্না খাওযা বাড়ীর নিত্যকার কাজ। এটা তো নিত্যকর্ম নয়, নৈমিত্তিক;—উদ্দেশ্য—শক্তিসঞ্চয, স্বাস্থ্যরক্ষা স্বাদমাধুর্য, এদের কোনটাই নয, এখানকার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল আমোদ। রান্না যদি সব ঠিক ঠাক হ'ল তবে আর আমোদ হ'ল কোথায়? ঠিক ঠাক হওযারই বা উপায় কি? এখানে যে কাঁচা হাতের ওস্তাদি; তা' ছাডা পদে পদে বে-যোগাড়ের মধ্যে রন্ধন-শিল্পীদের চলতে হয়েছে বেপরোয়া হযে। ফলে রন্ধন-সমাপ্তির ঘোষণার পর আহার্য ব'লে যে বস্তু পরিবেশিত হ'ল তা' হয়ত কোনো ভদ্রসমাজের পাতে দেওযার মত নয়, কিন্তু পার্টির প্রত্যেকটি রসনায়, অমৃততুল্য। মনে পড়ে এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য,—"প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইযা থাকি, তাহাকে আমরা আমোদ বলি না। কিন্তু যেদিন 'চড়িভাতি' করা যায, সেদিন নিয়ম ভঙ্গ করিযা কষ্ট স্বীকার করিযা অসময়ে সম্ভবত অখাদ্য আহার করি, তবু তাহাকে বলি আমোদ।" বাস্তবিকই একমাত্র এই আমোদই হ'ল 'চড়িভাতি' বা বন-ভোজনের লক্ষ্য।

শেষ পর্বটি হ'ল প্রত্যাবর্তন। পুনরায গোছগাছ, জিনিষ-পত্র যথাস্থানে নিরাপদে এনে পৌঁছে দেওযা। সহজেই আসে গাফিলতি বা শৈথিল্য। কিন্তু তা' হওযার উপায নেই, আছে দলপতির কড়াশাসন, আছে কিশোর-কিশোরীর দায়িত্ববোধের পরীক্ষা। ক্লেশের অনুভূতি আসতে পারে,

কিন্তু তাকে ভুলবার উপকরণের অভাব নেই। এই ফেরার পথেই তো চলবে সমালোচনা,—কে কি করেছে, সাফল্য বা অসাফল্যের কার কতটুকু অংশ, এই অভিযানের কোন্ অংশটি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়—ইত্যাদির উচ্ছ্বসিত আলোচনায় কেটে যাবে সময়, সহসা দেখা যাবে সবাই এসে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে যাত্রা হয়েছিল সুরু।

বন-ভোজন তাদের জন্য নয় যারা শুধুই চায় সব ঠিকঠাক, সব যথাযথ, যথানিয়মিত, বাহুল্য বা ত্রুটি-বর্জিত। হিসাবনিকাশী মন যাদের, তারা এই আমোদ-রস থেকে বঞ্চিত, যার অফুরন্ত উৎস এই বন-ভোজন।

অবসর-বিনোদন

সংকেত ঃ— ১। কাজ ও অবসর ২। অবসরের মূল্য ৩। হেলায় অবসর কাটানো ফাঁকি-পড়ার সামিল ৪। অবসর-বিনোদনের বিচিত্র উপায় ৫। অবসর-খেয়াল—মানসিক হীনতা ৬। বিভিন্নশ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন অবসর-বিনোদন ৭। ছাত্রের অবসর-বিনোদন।

মানুষ সাধারণতঃ কাজকে লইয়াই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কাজের ফাঁকে যে অবসর আসে, তাহাকে লইয়া কোন পৃথক ভাবনার প্রয়োজন বোধ করে না। অবসরের যে একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে, ইহা কদাচিৎ স্বীকৃত হয়। ফলে আমাদের জীবনে যথেষ্ট অবসরের আনাগোনা ঘটিলেও উহার কোন সদ্ব্যবহার হওয়ার পরিবর্তে, কাজের কায়ার পাশে ছায়ার মতই উহা যেন অদৃশ্য থাকিয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবসরের মূল্য কাজের চেয়ে কিছু কম নয়। প্রথমতঃ, অবসরবিহীন যে কাজের জীবন তাহা একান্তই যান্ত্রিক ও নিরর্থক। প্রতিনিয়ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পিছনে ঘোরার ফলে জীবন হইয়া উঠে মরুময় ও দুর্বহ। বৈষয়িক ভিড়ের চাপে হাঁপাইয়া উঠে আমাদের প্রাণ। বাহিরে বহিয়া যায় বিচিত্র আনন্দের মেলা, কিন্তু অবসরের অভাবে হতভাগ্য কাজের মানুষ ঐ আনন্দের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া, চিন্তা স্বপ্ন ধ্যান প্রভৃতি যে সব মানসক্রিয়ায় ফুটিয়া উঠে মানুষের চিত্তকুসুম, যাহারই

সৌরভপ্রসাদে ধন্য হয়.এই জীবন ও জগৎ, তাহাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন পর্যাপ্ত অবসরের। আবার, কাজে ক্ষয়িত হয় যে জীবনীশক্তি, সদ্‌ভাবে যাপিত অবসরে ঘটে তাহারই নূতন যোগান। কাজে যাহা অর্জিত, অবসরে তাহাই হয় স্থিত, বিধৃত, প্রতিষ্ঠিত। অর্জনে যাহা এলোমেলো, অবসরে চলে তাহারই ঝাড়াই-বাছাই। তাই মানবজীবনে অবসরের মূল্য অনস্বীকার্য।

এ হেন যে অবসর, তাহাকে হেলায় কাটাইয়া দেওয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ নহে। জীবনের ছন্দ বজায় রাখিবার জন্য অবসর বিনোদনের প্রতি একটু সজাগ থাকা আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায় এই বিনোদনের ক্ষেত্রে মানুষ হয় অতিমাত্রায় হাল্কা। কাজের ভারে ক্লান্ত যে তাহার পক্ষে অবসর-ক্ষণে হাল্কা হওয়াই প্রথম কাম্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই হাল্কামিরও রীতি আছে, ছন্দ আছে, শ্রেণী আছে। মনকে হাল্কা করিয়াও যদি লাভবান হওয়া যায়, তবে কেন শুধুই একটা এলোমেলো নেশায় মানুষ ফাঁকি পড়িবে?

বহু বিচিত্র উপায়ে আমরা অবসর বিনোদন করিয়া থাকি। খেলাধুলায়, গল্পগুজবে, হাসিঠাট্টায় যেমন অবসর কাটে তেমনি কাটে পরনিন্দা-পরচর্চার প্রচণ্ড উৎসাহে, নিরেট বাজেকথার ঘূর্ণিপাকে, জঘন্য আলোচনার পৈশাচিক নেশায়। ইহা ছাড়া আছে, বেড়াইতে যাওয়া, সিনেমায় যাওয়া, মাছ ধরিতে যাওয়া, আরও কত কী।

অবসর হয়তো খেয়ালেরই ক্ষেত্র, কিন্তু তাই বলিয়া বদখেয়ালের তো নয়? এ-সময়ে মেজাজকে পরখ করা যাইতে পারে, কিন্তু বদ মেজাজকেও ছাড়পত্র দেওয়া যায় কি? আসল কথা একটু দৃষ্টি রাখা। শ্রেণীবিশেষের জীবনে অবসর পর্যাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এই কর্মময় সংসার জীবনে অবসর খুব সুপ্রচুর নহে। তাই যেভাবে অবসর বিনোদন করিলে মন ও চরিত্রে তথা সমগ্র-জীবনের ছন্দে কোন হীনতা স্পর্শ না করে, সেইভাবেই অবসর যাপিত হওয়া পরম কাম্য। সহজ কথায় যাহাতে কিছু বিশুদ্ধ আনন্দ মেলে, তাহাই অবসর যাপনের জন্য নির্বাচিত হওয়া উচিত।

বিভিন্নশ্রেণীর মানুষের অবসর-বিনোদনের ধারাও স্বভাবতঃই হইবে বিভিন্ন। ধ্যানী যাঁরা, ভাবুক যাঁরা, তাঁহাদের অবসর যেভাবে যাপিত হয়, তাহাই কখনো নির্দেশ করা যায় না সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে। কবি যে তাঁহার সময় কাটান আকাশের পানে 'চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে,' কোন সংসারী

মানুষ ইহার অর্থ খুঁজিয়া না পাইতে পারে, কিন্তু কবির কাছে বুঝি ঐ চেয়ে-থাকাতেই আনন্দ। আবার প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে অবশ্যই থাকিবে অবসর যাপন-প্রণালীর প্রভূত পার্থক্য। একের পক্ষে যাহা শুভ, অপরের পক্ষে তাহাই হয়তো অশুভ। তাই প্রবীণের অবসর-বিনোদন-পন্থায় নবীনের আকৃষ্ট হওয়া উচিত হইবে না। উভয়ের মনের ও জীবনের চাহিদা বিভিন্ন। প্রায়ই দেখা যায় এই বিভেদ বজায় করিতে না পারিয়া ছেলেরা বুড়োর দলে বা বুড়োরা ছেলের দলে মিশিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর না হইলেও এই উন্মার্গগমন কোনপক্ষেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

ছাত্রদের অবসর বিনোদনের বিচিত্র পথই খোলা আছে। খেলাধুলা, হাল্কা ধরণের বই পড়া, গানবাজনা প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত বিশেষ প্রবণতার চর্চা করা, গল্প-শোনা, গল্প-বলা, গল্প-লেখা, কবিতায় হাত পাকানো, কাগজপড়া, ছোটখাটো সমালোচনায় বিজ্ঞ সাজা,—সমস্তই হিতকর; কিন্তু বিষবৎ বর্জনীয়,—জড়তার সম্বর্ধনা, হীন চপলতার অধীন হওয়া, দূষিত আলাপচক্রের আবর্তে ঘুরিয়া মরা।

শখ (Hobby)

সংকেতঃ—১। কত বিভিন্ন লোকের অদ্ভুত রকম খেয়াল বা শখ দেখা যায় —২। বাঁধাধরা কাজের মধ্যে যাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয় না, তাদের উদ্বৃত্ত শক্তি নানারূপ খেয়ালে বা শখে মেতে ওঠে ৩।—পাশ্চাত্ত্য দেশে শখ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী—৪। শখ প্রত্যেকেরই থাকা ভাল কিন্তু দেখা দরকার তা যেন অপরের পক্ষে বিরক্তিকর না হয়।

প্রতি রবিবার সকাল আটটা-নটা থেকে বিকাল দুটো-তিনটে পর্যন্ত যে-কোনো সময়ে চৌধুরীদের পুকুরে গেলে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ পাড়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রোদের তাপ তুচ্ছ করে বসে আছেন। ধ্যানমগ্ন মুনি-ঋষিদের মতোই তাঁর মন একাগ্র—তবে তিনি একটি ঐহিক জিনিসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন,—সেটি ছিপের একটি ফাৎনা।—রাজেন দত্তকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে—তিনি সারা সপ্তাহ ধরে সদাগরী প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার পর এই একদিনের ছুটিটা মাছ ধরতে বসেন। প্রায় সারাদিন ছিপ নিয়ে তিনি পুকুরধারে বসে থাকেন—কখন্ মাছে টোপ গিলবে সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি

ঠায় বসে থাকেন। (ছোটো-খাটো মাছ ধরে তিনি বদনাম নিতে চান না— দৈবাৎ ছিপে একসেরের নিচের মাছ উঠলে তিনি ছেড়ে দেন। চার করা, টোপ জোগাড়—সব কাজেই তিনি এতটা অভিজ্ঞ যে, কোনো রবিবারেই তাঁকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয় না,) কিন্তু এতক্ষণ বসে একটি কি দুটি মাছ নিয়ে গেলে কি পোষায় ?

পোষানোর কথা নয়—এটি রাজেনবাবুর শখ। এমনি শখ আরো অনেকেরই আছে—মানুষের খেয়ালের তো আর অন্ত নেই। কেউ কেউ ডাক-টিকিট জমান—দেশবিদেশের বিচিত্র ডাকটিকিটে তাঁদের সংগ্রহের পরিমাণ বিস্ময়কর। ছোটো বয়সে অনেকেই হরেক রকম দেশলাইয়ের ছবি খাতায় সেঁটে রাখে। কেউ কেউ রবিবার দিনটা বাইরে কোথাও ঘুরে আসবার জন্য সাইকেল নিয়ে লম্বা পাড়ি দেয়। নানা কাজের মধ্যেও একটু আধটু অবসর পেলে অনেকে ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে, ফুলবাগান করে, কাঠের টুকিটাকি জিনিসপত্র তৈরি করে, এমন কি মৌমাছির চাষ পর্যন্ত করে।

মানুষ কেবল নিয়মবাঁধা কাজ নিয়ে থাকতে পারে না। তার মধ্যে এমন একটা বাড়তি শক্তি আছে যা বাঁধাকাজ ছাড়া আরও একটা কিছু করতে চায় —সেই বাড়তি কাজ করাতেই তার আনন্দ। সেই উদ্বৃত্ত শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র মানুষের শিল্প-সাহিত্য। মানুষ যে সব কাজ নিছক শখের বশে, খেয়ালের বশে করে থাকে, সেও এই উদ্বৃত্ত শক্তির চাহিদা মেটাবার জন্য। অবসরের মুহূর্তগুলোয় খেয়ালের খেলা খেলে মানুষের মনটা তৃপ্তি পায়—উদ্বৃত্ত শক্তিকে প্রকাশ করবার অবসর দিয়েই মানুষ সবচেয়ে বড়ো আনন্দ পায়।

অনেক শখ কেবলমাত্র একটা উদ্ভট খেয়ালই—তার বিশেষ কোনো মূল্য নেই—যেমন মাছ ধরা কিম্বা শিকারে যাওয়া। কতকগুলো শখের একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে, যেমন বাগান করা, পুতুল গড়া বা শৌখিন জিনিস তৈয়ারী করা। আবার কোনো কোনো শখ শিল্পের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে— সেগুলোকে সৃষ্টি বলা যায়—যেমন ছবি আঁকা, সঙ্গীত চর্চা, এমন কি সাহিত্য-চর্চাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। নিছক শখের বশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ছোটদের জন্য আজগুবি কাহিনী লেখেন বা জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অবসর সময়ে বেহালা বাজান।

আমাদের দেশের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোতে এই সব শখের ক্ষেত্রটা

প্রশস্ত—শখের দাবি মেটাতে লোকেরা অগ্রসরও বটে। (ওদেশে লোকে নানা বিষয়ে গবেষণা করে, সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের চর্চা করে নিতান্ত শখের বশে—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।) সেজন্য দেখা যায় ওদেশে শিক্ষা, সভ্যতা আর সংস্কৃতি বিশেষ একটা গণ্ডি বা বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই—তা সর্বত্র প্রসারিত। (কিন্তু এদেশে আমাদের ঐ রকমের কোনো শখ বড়ো একটা দেখা যায় না। কাজের মধ্যে একটু অবসর পেলে আমরা সাধারণতঃ আড্ডা দিই—গল্পগুজব করে সময় কাটাই। যারা ওরই মধ্যে একটু উৎসাহী, তারা হয়তো তাস-দাবা-পাশায় সময় কাটায়।) শখের বশে—মনের চাহিদা মেটাবার জন্য অবশ্য কেউ কেউ খেলাধূলা, গানবাজনা বা সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকেন—কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম। (বাস্তবিকপক্ষে আমাদের দেশে সর্বত্রই এমন একটা নিস্তেজ ভাব দেখা যায় যে, উদ্বৃত্ত শক্তিকে কোনো একটা বিশেষ দিকে বহিয়ে দেবার কথা কেউই যেন ভাবতে পারে না। সহজ আরামে দিনগুলোকে কোনো গতিকে কাটিয়ে দিতে পারলেই যেন সব মিটে গেল। জড়তায়, আলস্যে এদেশের মানুষের অন্তরের শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।)

ছেলেমেয়েরা যদি ছাত্রজীবন থেকেই একটা শখ, একটা খেয়াল নিয়ে থাকে তা হলে এই জড়তার অবসান হতে পারে। অবশ্য শখের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও একটু সতর্ক হওয়া দরকার। শখটা যেন নিছক ব্যসনে পরিণত না হয়। যে সব শখের একটা মূল্য আছে সেগুলোর দিকে ঝোঁক হওয়া ভালো। তা ছাড়া শখটা আর্থিক সাধ্যের মধ্যে পড়ে কি না তা দেখা উচিত। ছোটো বাগান করে তা থেকে আর্থিক সংগতি করা দুষ্কর নয়—কিন্তু ফোটো তোলার শখ থাকলে তার খরচ চালানো কঠিন। অবশ্য এসব শখ বিশেষ শিক্ষার ফলে অর্থকরীও হতে পারে।—তবে মনের বিশেষ প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যার ছবি আঁকার শখ তাকে কাঠের কাজ করতে বললে তার ভালো লাগবে কেন?

শখ সম্পর্কে আর একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। শখ আমার পক্ষে রুচিকর হলেও অপরের পক্ষে বিরক্তিকর যেন না হয়। ধরা যাক, আমি অনেক পরিশ্রম করে দেশী-বিদেশী ফুলের চাষ করেছি—কিন্তু সেই ফুলবাগানের লম্বা ইতিহাস যদি আর একজনকে শোনাতে যাই তা হলে তার কাছে সেটা খারাপই

লাগবে। সবাইকার কাছে স্কুলের ইতিহাস বললে হয়তো আমাকে সকলে আড়ালে 'স্কুল-বাবু' বলে ডাকতে পারে। পাশের বাড়ির একটি ছেলের হঠাৎ গানের শখ হয়েছে—সে যদি রাত চারটের সময় উঠে তারস্বরে সা-রে-গা-মা করে তা হলে আমি তাতে অতিষ্ঠ হতে পারি।—সুতরাং শখ বা খেয়াল থাকলে অপরের সুবিধা-অসুবিধার কথাও একটু ভাবা দরকার।

স্কুলে নাট্যাভিনয়

সংকেত ঃ—১। আগেকার ও আধুনিক কালের চোখে এই জাতীয় অভিনয় ২। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের কারণ ৩। বর্তমানেও দুই বিরোধী মতবাদ—তাহাদের পরিচয় দান ৪। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রস্তাব ও একটা অভিমত।

অল্প কিছুকাল পূর্বেও স্কুলে নাট্যাভিনয়ের প্রস্তাব অশুচি বলিয়া গণ্য হইত। কোথাও বা এইরূপ প্রস্তাব আতঙ্কের সৃষ্টি করিত। চারিদিকের প্রচণ্ড বিরোধিতায় অচল হইয়া পড়িত যে-কোনো উদ্যোগ-আয়োজন। কিন্তু এখন আর ঠিক সেদিন নাই। এখন এরূপ প্রস্তাব সর্বত্র পূর্ণ সমর্থন না পাইলেও, আতঙ্ক বা চমকের সৃষ্টি করে না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রগতিসূচক বলিয়া অভিনন্দিত হয়।

মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন আসিয়াছে যুগধর্মের বলে। আধুনিক প্রগতিধর্মী যুগের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি যে, এখন ছাত্র-ছাত্রীদের মানস-প্রবণতা সম্পর্কে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়াই যেন আদর্শ হইতে চলিয়াছে। পদে পদে উচিত-অনুচিতের অনুশাসনকে শিথিল করিয়া দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের আরও বড়ো কারণ রহিয়াছে অন্যত্র। শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদের মধ্যে অধুনা ধরা পড়িয়াছে একটা গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা। কেবলমাত্র পুস্তকনিবদ্ধ শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ঘুচাইবার জন্য এখন পাঠ্যক্রমের গণ্ডীবহির্ভূত বিবিধ ক্রিয়াকলাপে ছাত্রদের আকৃষ্ট করা সমীচীন বলিয়াই বিবেচিত। নাট্যাভিনয়কে এই শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপেরই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যতই হউক, স্কুলে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে মনে হয় দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত পাওয়া যাইবে। সমর্থকগণ বলিবেন, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতির ন্যায় অভিনয়ও সাংস্কৃতিক চর্চার অঙ্গ হইবার যোগ্য, ইহাও একটি নির্দোষ চিত্তবিনোদক ও শিক্ষাসহায়ক। অভিনয়ের মধ্যে ছাত্রদের কতিপয় বিশেষ গুণের চর্চা হইতে পারে। নাটক, গল্প বা উপন্যাসের অংশবিশেষ যখন পাঠ্য হইতে পারে, তখন অনুরূপ বিষয়ে রচিত নাটক যদি নিজেরা অভিনয় করে তবে উহাতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হইবে, উপলব্ধিও হইবে বলিষ্ঠ। অভিনয় দেখায় যদি আপত্তি না থাকে, তবে অভিনয় করায় আপত্তি হইবে কেন? তাহা ছাড়া স্কুলে নাট্যাভিনয় হইলে কোনো-না-কোনো শিক্ষকের তত্ত্বাবধান থাকিবেই। সুতরাং অভিনয়ের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সম্ভাবনা অন্যত্র অবজ্ঞাত থাকে, স্কুলে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটিতে পারে। যেমন আবৃত্তি, সঙ্গীত, খেলা, বিতর্ক, ম্যাগাজিন প্রভৃতির মাধ্যমে খুঁজিয়া পাওয়া যায় ভবিষ্যতের খ্যাতিমান আবৃত্তিকারক, গায়ক, খেলোয়াড, বক্তা, ও লেখক, তেমনি অভিনয়ের মধ্যেও পাওয়া যাইতে পারে ভবিষ্যৎ অভিনেতার সন্ধান, এবং এইভাবে আমাদের জাতির বিচিত্র প্রতিভার উন্মেষ-সাধনে স্কুলের সাংস্কৃতিক বিভাগ সহায়ক হইতে পারে।

বিরোধী পক্ষের নিকট হইতে শুনা যাইবে,—আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতির সহিত নাট্যাভিনয় সমশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। অভিনয় দেখা-বা-শোনা, আর অভিনয় করা এক জিনিস নহে। অভিনয়ের মধ্যে একটা মত্ততা বা উন্মাদনা আছে যাহা স্কুলের অপরাপর প্রচলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাই। বিদ্যাভ্যাস ও স্কুলজীবন-যাপনের মধ্যে যে একটা সুন্দর সুদৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যাবশ্যক, স্কুলে নাট্যাভিনয় সহজেই একটা শিথিল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া উহার প্রতিবন্ধক হইয়া দেখা দিবেই। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানও সর্বদা আশানুরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ফলে অভিনয়ের বিষয় বা ভঙ্গিমার বাছ-বিচার শেষ পর্যন্ত অপরিণতবুদ্ধি কিশোর-কিশোরীর খেয়ালেই পর্যবসিত হয়। এমনিতেই যাহারা পদে পদে মাত্রাজ্ঞানশূন্যতার পরিচয় দেয়, অভিনয়ের বেলাতেও যে তাহারা মাত্রা হারাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহা ছাড়া, কোনো নাট্যাভিনয়ের অর্থ হইল, বহুদিনের পড়াশোনার পাট ভুলিয়া দেওয়া,—শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নহে, তাহাদের বহুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধবীদেরও।

উভয় পক্ষের এই বিভিন্ন মতবাদের গুরুত্ব বুঝি তুল্যাহুতুল্য। সম্যক পর্যালোচনার পর এই কথা বলা যাইতে পারে যে স্কুলে নাট্যাভিনয়ের নামেই আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া নিতান্তই গোঁড়ামির পরিচয়। অতিরিক্ত রক্ষণশীল যাঁহারা তাঁহারা হয়তো নাট্যাভিনয়কে স্কুলের ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে দিবেন না। আমাদের মনে হয়, বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ উদার দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের সম্ভাব্য দোষগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া ইহাকে স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করা একেবারে অসম্ভব নহে। তবে এই সচেতনতার যেখানে অভাব সেখানে ইহা বর্জনীয়, একথা অবিসম্বাদিত। ঠিকমতভাবে পরিচালিত হইলে অভিনয় যে বিশুদ্ধ আনন্দ জোগাইতে পারে, এবং স্কুলের আবহাওয়াও তাহাতে অমলিন থাকিতে পারে, ইহা যেমন সত্য, ঐ পরিচালনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকিলে যে একটা ব্যাপক অধঃপতন ঘটিতে পারে, ইহাও তেমনি সত্য। কোন্ শ্রেণীর বই, কাহাদের দ্বারা কি ভাবে, কাহাদের অর্থে, স্কুলের কোন্ সময়ে অভিনয় করা হইবে, ইত্যাদি বহু কথাই ঐ উপযুক্ত পরিচালনার বিচারে আসিয়া পড়ে। সুতরাং উপসংহারে কেবল ইহাই বলিতে হয় যে স্কুলে নাট্যাভিনয় ব্যাপারটিকে কখনও হাল্কা করিয়া দেখা চলে না, ইহার সমর্থন বিশেষ বিবেচনা ও প্রণিধান-সাপেক্ষ।

একটি খেলার বর্ণনা

ভালো-মন্দ অনেক খেলা অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময় একবার যে ফুটবল খেলা দেখেছিলাম তার তুলনা হয় না।

মাঠে পৌঁছেই আমার চক্ষু ছানাবড়া। চাষের মাঠ হিসাবে এটি অনবদ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু খেলার মাঠ যে এ রকম হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। মাঠটা লম্বা মন্দ নয়, কিন্তু এর একদিকটা ষাট-সত্তর হাত চওড়া, অপর দিকটা সরু—তিরিশ ফুট চওড়া হবে কি না সন্দেহ। মাঠে হয়তো বেগুন কি ঢ্যাঁড়শের চাষ হত—মাটি এবড়োখেবড়ো। এক জায়গায় একটু আলের মতো আছে; আর মাঠের প্রায় মাঝখানে আছে একটি জামগাছ। একদিকে দুটো আস্ত আর জ্যান্ত সুপুরিগাছ পুঁতে গোল-পোষ্ট করা হয়েছে—

অন্যদিকে হাতখানেক করে উঁচু দুটো বাঁশ পোঁতা। তারই পাশে, ছোটোমামার দেখাদেখি জামাজুতো ছেড়ে খেলতে নামলাম।

খেলোয়াড়রা সব দিক থেকেই বিচিত্র। আমার বয়স তখন বছর বারো-তেরো হবে। দেখলাম অপর খেলোয়াড়দের বয়স আমার প্রায় তিনগুণ। খেলোয়াড়ের সংখ্যা মোট সাতাশ জন—রেফারিকে বাদ দিয়ে। রেফারির কথাও বলছি এইজন্য যে, খেলা বেশ জমে উঠলে আর একজনকে বাঁশি গছিয়ে দিয়ে রেফারিও খেলতে নেমে গিয়েছিল। তবে রেফারি-বদল এই একবারই হয়েছিল।

দল ভাগ হলে একদিকে বারো জন আর একদিকে পনেরো জন হল। প্রত্যেক দলেই কে কোন্ জায়গায় খেলছে তা বোঝবার উপায় ছিল না, কারণ যেদিকে বল যাচ্ছিল প্রায় সকলেই সেই দিকে ছুটছিল। কেবল গোলে যারা খেলছিল তাদের স্থানই নির্দিষ্ট ছিল—কারণ দরকার হলে হাত দিয়ে বল ধরতে একমাত্র গোল-কীপারই পারে। তবে একদিকের গোলে বেশ বয়স্ক একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন—গোলরক্ষার দায়িত্বের চেয়ে বল হাতে ধরে হাইকিক্ মারার দিকেই তাঁর বেশি দৃষ্টি ছিল—হয়তো এরই লোভে তিনি একপ্রান্তে এসে দাঁড়ান। অপর দিকের গোলে তিনজন গোল-কীপার—যা এমনই অসম্ভব একটা ব্যাপার যে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। এই তিনজন গোলরক্ষী তিনটি নাবালক—এদের আড়াল করে বিশালদেহ এক ভদ্রলোক ব্যাকে খেলছিলেন। খেলা চলবার পর বুঝতে পারলাম—গোল পোস্টের পিছনে যে নালাটা রয়েছে সেটা থেকে বল কুড়োনোই এই তিনটি বালকের কাজ। তারই পুরস্কারস্বরূপ তাদের খেলতে দেওয়া হয়েছে।

রেফারির বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে খেলা আরম্ভ হ'ল। প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে এগিয়ে আসছে দেখে তার দিকে এগিয়ে যেতেই আর একজন খেলোয়াড় পায়ে ল্যাং দিয়ে আমাকে ফেলে দিলে। ফাউল হয়েছে জেনে রেফারির বাঁশির অপেক্ষা করলাম—কিন্তু কোথায় বাঁশি? ততক্ষণে বল গোল-কীপার ভদ্রলোকের কাছে চলে গেছে—তিনি জাঁদরেল একটা হাইকিক্ করে বলটিকে একেবারে নালা পার করে দিয়েছেন। এদিকের গোল-কীপারত্রয়ের একজন সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

প্রথম চোটেই আছাড় খাওয়ায় আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলার হালচাল বুঝতে পারলাম। এই মাঠে বীর খেলোয়াড় বলে গণ্য হতে গেলে হয় মারকুটে হতে হবে আর না হয়তো খুব জোরে জোরে কিক্‌ করতে হবে। প্রথমটা আয়ত্ত করা অসম্ভব জেনে দ্বিতীয়টার দিকে দৃষ্টি দিলাম। স্বপক্ষে বা বিপক্ষের দু-চারজন খেলোযাড় ছাড়া আর কারোরই বলের উপর পায়ের কণ্ট্রোল ছিল না—সুতরাং অনায়াসেই বল ছিনিযে নিযে হাফব্যাকের বল সরবরাহের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে প্রতিপক্ষের গোল উদ্দেশ করে জোরে জোরে কিক্‌ করতে লাগলাম। সৌভাগ্যক্রমে বলটি সুপুরি গাছ দুটোর মাঝখানে পড়ে ছেলে তিনটিকে দিশেহারা করে দিয়ে তিনবার গোল হল। সুতরাং অল্পবযস্ক হলেও আমিই মাঠের একজন সেরা খেলোযাড়ের পর্যাযে উঠে গেলাম—প্রায় সকলেই আমাকে একটু সমীহ করে খেলতে লাগল। প্রথমে দুএকজন আমাকে একটু বেকাযদায় ফেলতে চাইলেও আমার একটা রিটার্ণ কিক মাথায লাগায় যখন ওখানকার সবচেযে হুঁশিয়ার খেলোয়াড় বসে পড়ল তখন আর বড়ো কেউ আমার দিকে ঘেঁসতে চাইল না।

সেদিন আধ ডজন গোলে জিতে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে বাড়ি ফিরতে পারতাম, কিন্তু মধ্য থেকে একটা ফ্যাসাদ হওয়ায় খেলা ফেঁসে গেল। হ্যাণ্ডবলের দরুণ একটা ফ্রি কিক্‌ পেযে একজন খেলোযাড় যেমনি বলটি বসিয়ে মোশান নেবার জন্য পিছিযে গিযেছে, অমনি আর একজন খেলোযাড় অতর্কিতে ছুটে এসে বলে কিক্‌ করে দিলে। আর যায় কোথা, দুজনের মধ্যে প্রথমে ঝগড়া, তারপর মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল। বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সংঘর্ষ অনেকবার দেখলেও স্বপক্ষের খেলোযাড়দের মধ্যে মারামারি এই একবারই দেখেছিলাম। মারামারির বহর ক্রমশ বেড়েই চলল। সুতরাং রেফারি বাঁশি না বাজালেও ঐখানেই খেলার ইতি হয়ে গেল।

ঘরোয়া খেলা—কোন্‌টি তোমার প্রিয়তম

সংকেত ঃ—১। ভূমিকা ২। ঘরোয়া খেলার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা ৩। দাবা-পাশা-তাস-লুডো-ব্যাগাটেলি-বাঘবন্দী-ক্যারম ৪। প্রিযতম খেলা—টেবিল-টেনিস—কারণ বিশ্লেষণ।

খেলা বলতে আমরা সাধারণতঃ খোলা মাঠে দৌড়-ঝাঁপের খেলাই বুঝি, খেলাধুলার জগতে ফুটবল-ক্রিকেট-ভলিবল-বাস্কেটবল-টেনিস-ব্যাডমিণ্টনকেই প্রাধান্য দিই। কিন্তু এ শুধু ক্রীড়া-জগতের একটা দিক, অপর দিকে আছে

ঘরোয়া খেলা বা Indoor games। খোলা মাঠের খেলায় যেমন আছে উন্মাদনা ও প্রাণ-চাঞ্চল্য, ঘরোয়া খেলাগুলিরও তেমনি আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। দেশী-বিদেশী অজস্র রকমের ঘরোয়া খেলার প্রচলন এদেশে দেখা যায়। প্রত্যেকটি খেলার স্বতন্ত্র নিয়মাবলী আছে।

অবসর বিনোদনের দিক দিয়ে ঘরোয়া খেলা সত্যই অতুলনীয়। এ খেলায় দেহচালনার অবকাশ বিশেষ থাকে না বটে, কিন্তু মনের খোরাকের অভাব ঘটে না। বিশেষ ক'রে বর্ষণ-মুখর দিনে ঘরোয়া খেলার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। মানুষের মনটাই এমন যে, যতক্ষণ কাজের লাগাম পরানো আছে, ততক্ষণ একরকম; কিন্তু যেই লাগাম-ছাড়া হলো, অমনি তার উপর পাহারা রাখো। কখন কি করবে, কিছু ঠিক নেই। একটা কিছু সে করবেই সব সময়, হয় কাজ, না হয় অ-কাজ। আমরা যাকে বলি বিশ্রাম বা অবসর, তখনও সে একটা কিছু করেই চলে। সেই দেখতে-না-পাওয়া করার মধ্যেও আবার কাজও আছে অ-কাজও আছে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাদের চেহারা। এই যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অ-কাজ, এরই এক ভিন্নতর রূপ হলো সয়তানি, যার জন্য প্রবাদ রচিত হয়েছে, 'অলস মস্তিষ্ক সয়তানের কারখানা।' খেলা মাত্রই আনন্দ দেওয়া বাদে আরও যে একটা বড়ো কাজ করে আমাদের, সেটা হলো এই সয়তানির আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তাই বুদ্ধিমান মানুষ চিরকালই খেলার জয়গান গেয়ে এসেছে, আর মনে হয়, ঠিক এই দিক থেকে খেলার যে জয়গান তা আরও বেশী করে প্রাপ্য ঘরোয়া খেলার, যা প্রায়ই এমন এমন সময়ে বা ক্ষেত্রে খেলা হয় যখন বাইরে খেলা চলে না বা তার সুযোগ থাকে না, অথচ যার অভাবে মনের মধ্যে নানা অবাঞ্ছনীয় বস্তু গুঁটি পাকিয়ে উঠ্‌তে থাকে। এই কারণেই এদেশ-সেদেশের মানুষ চিরকালই বিচিত্র রকমের ঘরোয়া খেলা খেলে আসছে।

প্রথমেই নাম করা যাক দাবা (Chess) খেলার। এ খেলা প্রধানতঃ প্রবীণদের খেলা, সফল ঘুঁটি-চালনার জন্য পাকা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। দাবার আড্ডায় দেখা যায় আহার-নিদ্রা-জ্ঞানশূন্য খেলোয়াড়েরা তন্ময় হ'য়ে কখনো মাথা চুলকে চিন্তা করছে, কখনো বা নিজেদের চালের বাহাদুরীতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছে। দাবা আন্তর্জাতিক খেলা হিসাবে স্থান পেয়েছে; কিন্তু এ খেলা আমার মাথায় ঢোকে না, ঢোকাবার চেষ্টাও করি নি।

দাবার পাশাপাশি মনে পড়ে 'পাশা'র কথা। উভয়ই তুল্যামূল্য মান-মর্যাদায় হয়তো কিছু তারতম্য আছে, কিন্তু প্রকৃতি অনেকটা একধরণের। দুইয়ের মধ্যে আছে একটা আভিজাত্য। দাবা তো পুরোপুরি রাজকীয় ব্যাপার, যেমন-তেমন ব্যাপার নয়, রাজায়-রাজায় যুদ্ধের এক দস্তুরমত মহড়া। বিভিন্ন আঙ্গিকে সন্নিবেশিত উভয় পক্ষের শিবির-আক্রমণ, পাল্টা-আক্রমণ, জয়-পরাজয়,—এ যেন এক সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের নীরব অভিনয়। যতদূর জানা যায়, দাবা-খেলার উৎপত্তি হয়েছিলো গ্রীকপুরাণ-খ্যাত ইলিয়াদের যুদ্ধে। ট্রয়-নগরী অবরোধ করে যখন দশবৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো আক্রমণকারী গ্রীক-সৈন্যদের, তখন তাদেরই সেনাপতি নাকি তাদের মধ্যে সমরস্পৃহা জাগিয়ে রাখার জন্ম আবিষ্কার করেন এই খেলার। যাই হোক, এখন কিন্তু আমরা ঘরে-ঘরে, রোয়াকে রোয়াকে, রাস্তার এ-মোড়ে ও-মোড়ে যেসব দাবা-খেলোযাড়দের দৈখি তাঁদের ঠিক গ্রীক-বীর বলে চেনা যায় না!

'পাঁশা'ও ছিল বাজা-রাজড়ার খেলা। এর বিশুদ্ধ নাম 'অক্ষ'ক্রীড়া বা 'দ্যূত' ক্রীড়া। অনেক সন্ধি-বিগ্রহের নিয়ন্তা হিসাবে এরও খ্যাতি বড় কম নয়। মহাভারত-প্রসিদ্ধি ললাটে এঁটে এও ঘরোয়া খেলার আসরে এক অভিজাত আসন দখল করে রযেছে। এ খেলারও ভক্তদলকে দেখা যাবে ঐ দাবার মতই বিচিত্র চিহ্নিত-করা স্থানে যেখানে সর্বদাই দর্শকের ভীড়ে খেলোয়াড়দের দেখা যায় না, এবং একই খেলায অংশগ্রহণ করেন ন্যূনকল্পে পঁচিশজন। দাবা ও পাশা দুই খেলাতেই বিশেষ বুদ্ধি-বিবেচনার প্রযোজন হয় বলে শুনেছি।

আর একটা নেশার খেলা প্রায ঘরে ঘরে প্রচলিত, সেটা 'তাস'খেলা। ব্রে, ব্রিজ, স্ক্রু, টোযেন্টিনাইন, বিন্তী ইত্যাদি নানা ধরণের তাস খেলার প্রচলন দেখা যায়। চারজন ভাল খেলোয়াড় একত্রিত হ'লে তাস খেলতে খেলতে সময হুহু ক'রে কেটে যায়।

'লুডো' বালক-বালিকা এবং মহিলাদের প্রিয় খেলা। এ খেলায় ছক্কার ওপর একান্ত নির্ভরশীল হ.তে হয়। 'ব্যাগাটিলি' (Bagatelle) খেলায় ছোট ছোট লোহার গুলি কাঠি দিয়ে চেলে পয়েন্ট করতে হয়। প্রচুর পয়েন্ট করবার পর শেষের দিকে যদি 'L.T.P.'তে গুলি পড়ে সব পয়েন্ট নষ্ট হয়ে যায়, তবে বিপক্ষের উল্লাস আর দেখে কে! মাটিতে ছক কেটে 'বাঘ-বন্দী'

খেলা গ্রামের ছেলেদের মধ্যে খুব প্রচলিত, এ খেলাতে কিছুটা মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন হয়।

ঘরোয়া খেলাগুলির মধ্যে 'ক্যারমে'র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ক্যারমের একক প্রতিযোগিতা এবং দ্বৈত প্রতিযোগিতা উভয়ই পরম উপভোগ্য। ক্যারম খেলায় ভাগ্য-নির্ভরতার মাত্রা সামান্য, স্বীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্যে জয়শ্রীকে লাভ করা যায়। কলেজে এবং ক্লাবে মাঝে মাঝে ক্যারম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ঘরোয়া খেলায় অল্পবিস্তর অনুরক্ত হ'লেও 'টেবিল-টেনিস'-ই আমার প্রিয়তম ঘরোয়া খেলা। শুধু আমার নয়, অধিকাংশ লোকেরই এটা প্রিয় খেলা। দিন দিন এ খেলার প্রচলন বেড়ে চলেছে, টেবিল-টেনিস-অনুরাগীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। এখানে-ওখানে-সেখানে টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হবে নাই বা কেন, বৈশিষ্ট্যে এ যে অনন্য। ঘরের মধ্যে টেবিল পেতে খেলা হলেও মাঠের খেলার চাঞ্চল্য ও গতিবেগ এতে পুরোমাত্রায় বর্তমান, এ যেন একই সঙ্গে ঘরের খেলা ও মাঠের খেলা। মাঠে না নেমেও টেবিল-টেনিস খেলার মাধ্যমে দেহচালনার যে সুযোগ পাওয়া যায়, তা অন্য কোন ঘরোয়া খেলায় সম্ভব নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, ক্ষিপ্র সঞ্চালন, তীব্র গতিবেগ এবং নিপুণ মারের খেলা টেবিল-টেনিস যেমন দর্শনীয় তেমনি উপভোগ্য।

সংকেত সূত্র

১। ছুটি ও কাজের সম্পর্ক—ছুটির মাধুর্য তার পক্ষে অনাস্বাদ্য যার কোনো নির্দিষ্ট কাজের বাঁধন নেই।

২। একটা মুক্তির আস্বাদ দিয়ে ছুটি আমাদের স্বাধীন মনকে ধন্য করে, পুলকিত করে। তাই ছুটি সকলেরই পরমপ্রিয় বস্তু।

৩। বিভিন্ন জাতের ছুটির বিভিন্ন আস্বাদ ও আবেদন :—বয়স্কদের ছুটি ও শিশুদের ছুটি ; ধরা-বাঁধা ছুটি ও আকস্মিক ছুটি; দীর্ঘ-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী

ছুটি; বিভিন্ন ঋতুতে ছুটির বিভিন্ন আস্বাদ; আনন্দের ছুটি, বিষাদের ছুটি, বাধ্যতামূলক ছুটি, ধর্মীয় ছুটি ও অন্যান্য ছুটি।

৪। ছুটি-কাটানোর বিভিন্ন পন্থা,—ভালো ও মন্দ।

রেলভ্রমণ

১। অনেকের মতে ভ্রমণের রাজা রেলভ্রমণ। গতি, আরাম, মর্যাদা,—এই ত্রয়ীর সমাবেশ। গতি এখানে স্থিতির যতি-তে ছন্দায়িত।

২। রেলযাত্রার উপভোগ্য বস্তু :—ক্রমাগত নূতন নূতন স্থানের পরিচয়—যেন পৃথিবী-পরিক্রমায় রত—দৃশ্যমান বস্তুগুলো যেন যায় পিছনে, আর আমরা চলি সামনের দিকে। কত ঝকঝকে দীঘি, কত পচা ডোবা, কত ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম, কত ধূ ধূ-করা প্রান্তর; ক্বচিৎ গ্রামের বধূ, দলছাড়া কোনো শিয়াল, ভিতরে বিচিত্র যাত্রীর বিচিত্র আলাপ-ভাবভঙ্গী, কোন অপরিচিতের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠতা।

৩। রেলভ্রমণের অসুবিধা বা দুর্ভোগ—বিশেষত তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ যাত্রীর,—ভীড়, স্থানাভাব, মালপত্রের হাঙ্গামা, কুলী ও যাত্রীর উৎকট কলরব, নোংরামি, ক্বচিৎ কোনো দুর্ঘটনা।

৪। তবু স্বভাবত ভ্রমণপ্রিয় মানুষ মাঝে মাঝে সব ভুলে গিয়ে আকৃষ্ট হয় রেলভ্রমণের প্রতি। ভ্রমণের প্রস্তাবে যেই টাইম্ টেবল্ দেখে, বুকের তলায় নেচে ওঠে পুলকের ঢেউ।

ছায়াছবিতে কোন এক সন্ধ্যা-অতিবাহন

১। রক্ষণশীল বাড়ীর ছেলে, ক'লকাতারই স্থায়ী বাসিন্দা হ'লেও সিনেমায় যাওয়াটা খুব চালু নয় এবাড়ী, তাই সুযোগটা এলো আকাশের চাঁদের মত। ছবির নাম 'পথের পাঁচালী'। মায়ের সমর্থনে বাবার অজ্ঞাতে সর্বপ্রথম তিন বন্ধুতে ছবি দেখা।

২। 'বসুশ্রী'তে তিন বন্ধুর সান্ধ্য সম্মিলনের প্রস্তাব। সবচেয়ে কাছা-কাছি আমি, আর দু'জন আসবে যাদবপুর থেকে। টিকিট তাদেরই কাছে, গেটে মিলিত হওয়ার কথা। শো আরম্ভ হলো, তখনও তাদের দেখা নেই। উৎকণ্ঠিত দর্শকের চোখে অন্যান্য দর্শকের আনাগোনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

৩। ঢুকেই দেখা গেল নিউজ রীল চলছে। বিলম্বিত বন্ধুরা এনেছিলো বিলম্বের মাশুল প্রচুর বাদাম-ভাজা, তাই দিয়ে চলছিল নিউজ রীলের সম্বর্ধনা। সহসা একি! লজ্জাকর বিলিতি স্নানের দৃশ্য—কী বিড়ম্বনা!

৪। বই আরম্ভ হলো, বাদাম ফুরুলো না, পাওয়া গেল পিছন থেকে আপত্তি বাদাম-ভাঙার শব্দে। ছবির কথার চেয়ে বেশি শোনা যেতে লাগলো সামনের এক ভদ্রলোকের ব্যাখ্যা।

৫। বিশ্রাম। কিন্তু এয়ারকণ্ডিসন সত্ত্বেও গলদ্‌ঘর্ম! ঠিক সামনের তৃতীয় সারিতে দেখি বাবা বসে আছেন! কৌশলে আত্মগোপন; শুধু ভরসা, যদি বইয়ের নামে প্রাণটা বাঁচে।

৬। অবস্থানুযায়ী মনোবিশ্লেষণ—বন্ধুবিদায়—কণ্টকিত আনন্দের বার্তা।

মেলায় ভ্রমণ

১। উপলক্ষ—যাত্রার আয়োজন ও মেলায় উপস্থিতি।

২। মেলার আয়তন, জনসমাবেশ, জনকল্লোল ও অন্যান্য ধ্বনির গগন-মাতানো ঐকতান।

৩। মেলার বিভিন্ন বিভাগ:—শিল্প-কলা, ফুল-ফলের গাছ, কাঠের জিনিস, মাটীর জিনিস, কাঁচের জিনিস, লোহার জিনিস—প্রয়োজনের-বিলাসের-খেলনার; খাবার—পাঁপর-ভাজা, নাগর-দোলা ও চরকী।

৪। মেলা-পরিচালনার কথা—স্বেচ্ছাসেবক—প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হারানো-নিরুদ্দেশের পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা—একটি দৃষ্টান্ত।

৫। মনের উপর প্রভাব।

(গ) প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎ প্রসঙ্গ

১। বাংলার ঋতু
২। বাংলার ফুলফল
৩। বঙ্গে শরৎ
৪। বাংলার বর্ষার রূপ
৫। বাংলার পশুপক্ষী
৬। সাহিত্যে ইতরপ্রাণী
৭। কলিকাতার বর্ষা
৮। পশ্চিম বাংলার নদনদী
৯। বন্যা ও বন্যাপ্রতিরোধ
১০। একটি নদীর আত্মকাহিনী

সংকেত সূত্র

১। রাত্রি
২। একটি গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন
৩। শীতের সকাল
৪। একটি বর্ষণ-মুখরিত রজনী।

বাংলার ঋতু

সংকেত ঃ—১। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য ২। গ্রীষ্মের প্রখরতা ৩। বর্ষার বর্ষণ ৪। শরতের পরিপূর্ণতার শ্রী ৫। হেমন্তের প্রাচুর্যের আনন্দ ৬। শীতের সঞ্চয় ৭। বসন্তের উচ্ছ্বাস।

বাংলাদেশে ষড়ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে যে-রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্য কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের এই দেশটিতে প্রকৃতির বিচিত্র মূর্তি প্রতিদিন যেন নতুন হয়ে দেখা দেয়। বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে চৈত্র পর্যন্ত বাংলার প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়, তারই বর্ণনায় যুগে যুগে কবির লেখনী মেতে উঠেছে।

গ্রীষ্মে প্রকৃতির যে রূপটি ফুটে ওঠে তাকে কবি রুদ্রের প্রলয়ংকর মূর্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে পৃথিবী যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়—গ্রামের খালবিল সব শুকিয়ে কাঠফাটা হয়ে যায়। গায়ের ঘাম শুকোতে চায় না—সূর্য একটা প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ডের মতো অগ্নি বিকীরণ ক'রে সারা জগৎটাকে যেন জ্বলিয়ে দেয়। বাতাসও হয় আগুনের মত গরম।—

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ॥

তবে গ্রীষ্মের রুদ্রমূর্তির অন্তরালে একটা শান্তস্নিগ্ধ ভাবও লুকিয়ে থাকে। সারা দিনের খরতাপের পর সমীর-স্নিগ্ধ সন্ধ্যার মাধুর্যের তুলনা নেই। তাই কালিদাস গ্রীষ্মের বর্ণনায় বলেছেন,—'দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।'

গ্রীষ্ম যায়। ছুটে আসে 'ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা' 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভে' মেতে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়—সহসা মেঘ ডেকে ওঠে—বিদ্যুতের ঝলকে সারা আকাশের বুক চিরে যায়, তারপর ঝরঝর করে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে। কবি গেয়েছেন—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে॥

বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গেই সারা পৃথিবী সবুজ শোভায় ভরে যায়। বড়ো বড়ো গাছের পাতাগুলো গাঢ় সবুজ রঙে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মাটির বুকে অসংখ্য ছোটো বড়ো গাছ জন্মায়—'অনামা চারায় চলে অস্থখন পাতার গুঞ্জরণ।' পল্লীর গাছে গাছে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটার যে শব্দ শোনা যায় কী অপরূপ তার ধ্বনি!

বর্ষার কালো মেঘ ক্রমে ফিকে হয়ে আসে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। সোনার মতো ঝলমলে রোদের হাসিতে চারিদিক ভরে ওঠে। পৃথিবীতে চারিদিকেই পরিপূর্ণতার ছবি। নদী, পুকুর, খাল, বিল সব জলে ভরে গেছে, গাছের ডালগুলো পাতায় ছেয়ে গেছে, সারা মাঠ নতুন ফসলে সবুজ হয়ে উঠেছে। শরতের এই অমল মহিমা দেখে কবি গেয়েছেন—

আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলভার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল তোমাব কানন-সভাতে।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের শোভার মধ্যেই বাঙালী বিশ্বজননী দুর্গাব আবাহন করে।

হেমন্ত একদিকে শীতের আবাহন, অন্যদিকে পরিপূর্ণতায় পরিপক্কতায় অপরূপ। শরতের রোদের দীপ্তি ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ হয়ে যায় নিষ্প্রভ। শুধু মাঠে মাঠে ধান পাকতে থাকে।—

আধপাকা ধান নিয়ে ভরা মাঠ ঘুম যায় সুখে।
সোনালী স্বপন যেন তারা হয়ে আকাশেতে কাঁপে॥

তারপরে আসে শীত। রাত্রে হিম, সকালে কুয়াশা, গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়, ফুলের বাহার শেষ হয়ে আসে,—কিন্তু শীত রিক্ততার ভারে ক্লিষ্ট নয়, শীত হচ্ছে সঞ্চয়ের ঋতু। পৌষ আসতেই কবি গেয়ে উঠেছেন—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে।

শরতের বাংলা ফসলে ফসলে ভরে যায়। সমতল ভূমিতে শীত অসহ্য নয়, আর দার্জিলিং-এর প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও তুষার-ধবল শিখরের শোভা অপরূপ।

বসন্ত আসবার সঙ্গে সারা প্রকৃতির মধ্যে যেন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। অশোক, পলাশ, শিমুল ফুলের টকটকে লাল রঙে বনভূমির রূপ অপরূপ হয়ে ওঠে—চাঁপা, করবী, মাধবী, মল্লিকা, গন্ধরাজ, বেলা বাগানের সাজি ভরিয়ে দেয়। আম্রমুকুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়—কোকিল থেকে সুরু করে হরেক রকম পাখির ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। বসন্ত যেন নূতন প্রাণের, নূতন আনন্দের উল্লাস বয়ে নিয়ে আসে। কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী—

এসো এসো বসন্ত ধরাতলে ;
আনো মুহুমুহু নব তান, আনো নব প্রাণ, নব গান,
আনো নব উল্লাস হিল্লোল,
আনো আনো আনন্দের হিন্দোলা ধরাতলে ॥

বাংলার ফুলফল

সংকেত ঃ—১। ভূমিকা ২। বাংলার ফুলের অন্তরের কথা—বিচিত্র ফুলের কথাও বিচিত্র—চম্পা, জবা, আকন্দ, শ্বেতপদ্ম, অপরাজিতা, রক্তকরবী ৩। ফলেও বাংলার মায়া মাখানো —দৃষ্টান্ত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত বহুদিনের পরিচয়ের ফলে আমাদের যে রুচিবিকার ঘটিয়াছে, তাহাতে সর্বত্রই আমরা খুঁজিতে শিখিয়াছি গুণের পরিবর্তে রূপের আড়ম্বর, অন্তরের জ্যোতি অপেক্ষা বাহিরের চাকচিক্য। এই আড়ম্বর ও চাকচিক্যের চমক আমাদের এতই ভাল লাগিয়াছে যে আমরা আজ প্রিয়জনের হাতে তুলিয়া দিই গন্ধরাজের পরিবর্তে ডালিয়া, রজনীগন্ধার পরিবর্তে 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ'।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের ফুল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে গেলেই ফুলের এই আন্তর সম্পদের কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। আমাদের চম্পা, সে যে সূর্যের সৌরভ, আমাদের আকন্দ, সে যে স্বয়ং নীলকণ্ঠেরই দ্বিতীয় সত্তা, আমাদের জবা, তাহার যে আত্মপরিচয় হইল,

'ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ডটি আমি যে রক্তজবা,'—

ইহা না বুঝিলে বাংলার এই পুষ্পত্রয়ীর আন্তর ঐশ্বর্যের সঠিক পরিচয় লওয়া হয় না। তাহা ছাড়া বাংলার ফুলের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা বিলাতী মরসুমী ফুলের মত ফুলদানীতে শোভা পাইবার জন্য ফুটে না, বুঝি বা শুধু বাগান আলো করাই ইহার লক্ষ্য নহে, ইহার জন্ম হয় দেবতার চরণে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হওয়ার জন্য। তাহার মর্মমূলে নাই কোন মানুষের চোখে নেশা ধরাইবার আকাঙ্ক্ষা; সে ফুটিযা উঠে এক স্বর্গীয় মায়ামাখানো রূপে ও রঙে অপরূপ হইযা,—তাহার আবেদন যত কিছু সমস্তই দেবচরণোদ্দেশে, আর সেই সকল মানুষের অন্তরে, যাহারা স্বভাবতঃই থাকে ঐ স্বর্গীয় মায়ায় মুগ্ধ। তাই বাংলার ফুলে নাই কোন রূপের উগ্র মাদকতা, আছে এক শান্ত-স্নিগ্ধ-কমনীয় জ্যোতি আর আছে এক বুক-ভরানো প্রাণ-মাতানো স্বর্গীয় সৌরভ, যাহার কোন তুলনা খুঁজিযা পাওয়া যায় না। আমাদের বেল-মল্লিকা-যুঁই অথবা শিউলি-বকুল-ভুঁইচাঁপা, সমস্তই যেন বাংলার মাটি বাংলার জলের শান্ত কোমলপ্রাণের বাণীটিকে নীরবে বহন করিয়া চলিয়াছে। বাংলার শ্বেতপদ্মকে যাহারা বিলাতের লিলির সহিত তুলিত করে, তাহারা মূঢ়; কারণ লিলির ঐ গঠন আর সাদাটুকুই পুঁজি, আর আমাদের পদ্মে বিরাজ করে একটা শ্রী, যাহাতে মানুষের হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত হয়। তাই পদ্ম আমাদের পূজার শ্রেষ্ঠ ফুল, কারণ হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত না হইলে পূজাও নিষ্ফল। অপরাজিতায় গন্ধ কিছুই নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে আছে এমন এক কাজল-কালো চোখের করুণ মিনতি, যাহাতে মনে হয় সে যেন নীরবে বলিয়া চলিয়াছে,

"মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে
পূজা—শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত।"

তাই রক্তকরবীর পাশাপাশি তাহাকেও বলা হইয়াছে যন্ত্রপুষ্প, অর্থাৎ পূজায় সিদ্ধিলাভে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন উপচার। এখানে গোলাপ যেমন বহন করে চিরবসন্ত, তেমনি ধুতুরা ফুলে জাগায় চিরবৈরাগ্য। এখানকার অতসী রঙে রাঙানো হয় জগজ্জননীর দেহ, আবার কেতকীর বাসে জাগিয়া উঠে উদাসীর মনে মোহ। তাই বলিতে হয় বাংলার প্রতি ফুলে আছে এমনই একটা মোহিনী শক্তি, যাহা বাংলার একান্ত নিজস্ব বস্তু।

ফুলের ন্যায় ফলেও আছে বাংলাদেশের মায়া মাখানো; এখানেও

বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। তবে সকলের মূলে আছে সেই বাংলারই প্রাণস্পর্শ; শুধু কোমলতা, সরসতা ও মাধুর্যই নহে, তাহার সহিত শক্তি ও পুষ্টিকারিতার এক অপরূপ সমন্বয়। বাঙালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত যখন বেদানার পাশে আনারসের তুলনা করেন, তখন সেই প্রসঙ্গে শুধু আনারস নহে, অধিকাংশ বাংলার ফলেরই প্রাণের কথা আমরা শুনিতে পাই। এমন রসাল, এমন মধুর, অথচ এমন সর্বসাধারণের হইয়া বুঝি ফল আর কোথাও ফলে না। সত্যই বেদানা-আপেল-ন্যাসপাতি চলে ডাক্তারি সার্টিফিকেটের জোরে, অথচ আমাদের আনারস, বাতাবি লেবু বা সুপক্ক বিল্বফল সর্বাংশে ইহাদের অপেক্ষা হিতকর ও সুস্বাদু। বাংলাদেশে ফলের রাজা নারিকেল। ইহার মাহাত্ম্য-কীর্তনে বুঝি বা 'পঞ্চমুখ'ও পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। ইহার শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য ত্রিবিধ দশাই আমাদের আদরের। বিদেশী ইহাতে খুঁজিয়া পাইয়াছেন দু'খানি রুটি ও এক গ্লাস জল, অর্থাৎ প্রাণধারণের পর্যাপ্ত বস্তু। নারিকেলের পাশে কদলী যেন পুরুষের পাশে প্রকৃতি; স্বাদে-গন্ধে রসে-মাধুর্যে আর সর্বোপরি পুষ্টিসাধিনী শক্তিতে ফলরাজ্যে কদলী হইল অনন্যা। কিন্তু এখানে আমরা বুঝি অপরাধী হইলাম তাঁহার নিকট, যিনি বাংলার অমৃতফল বলিয়া খ্যাত। সত্যই অনেকের মতে আম্রই বাংলার শ্রেষ্ঠ ফল। ইহার আসরটি যেন রাজকীয়। একা আসিয়া দেখা দিতে ইহার আভিজাত্যে বাধে। তাই জাম-জামরুল-লিচু-কাঁঠাল-গোলাপজাম ইত্যাদি ইহার আসর জমকাইয়া রাখে। আম যদি হয় আসরের রাজা, তবে পাত্র-অমাত্য-সামন্তরূপে ইহাদেরও কেহ বড় কম নহে। ফলের এই বৈচিত্র্যের রূপরেখা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় যদি না আমরা এই ডালাতেই তুলিয়া ধরি পেয়ারা, শশা, পানিফল প্রভৃতি মুখরোচক ফলগুলিকে, যাহারা যোগায় বিচিত্র মানুষের বিচিত্র রুচির খোরাক। সকলে মিলিয়া যে ফলের পসরা রচনা করে তাহাতেই বাংলা মায়ের কোল সারা বছর ভরিয়া থাকে।

বঙ্গে শরৎ

কালস্রোত বয়ে চলে অবিরাম শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন। তার একঘেয়ে প্রবাহে বৈচিত্র্য আনবার জন্য নিজেকে সে জড়িয়ে নিয়েছে ঋতুচক্রের আবর্তনে। ষড়ঋতুর প্রথম দুটি অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষার মেয়াদ শেষ হলে প্রকৃতির দরবারে আসন পাতা হয় শরতের। গ্রীষ্মের সূর্যদীপ্তি আর বর্ষার সজলতার উপভোগ্য একটা সমন্বয় ঘটে শারদ প্রকৃতিতে। নাতিশীতোষ্ণ আরামদায়ক ঋতু হিসাবে বসন্তের চেয়ে শরতের দাবী কিছুমাত্র কম নয়। বর্ষার বিরক্তিকর সুদীর্ঘ বর্ষণের অবসানে পূর্বাচলে অমিতাভ উদিত হন, জ্যোতির্ময়ের স্নেহস্পর্শে ভুবন দীপ্ত হয়ে ওঠে। সুনীল অম্বরে শুভ্র মেঘরাজি নীল সাগরের বুকে ফেনপুঞ্জের শোভা নিয়ে ভেসে চলে। শিশিরসিক্ত প্রভাতের সুখস্পর্শ সমীরণ কবিকে সচেতন করে তোলে :

'এসেছে শরৎ হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে।'

শিশিরসিক্ত দূর্বাদল অরুণকিরণের স্পর্শে দীপ্ত হয়ে উঠতে দেখে কবি গেয়ে ওঠেন,

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।",

আনন্দময় শারদপ্রাতে প্রকৃতির শ্যামল শোভা কবিচিত্তকে বিভোর করে দেয়। শিউলী ফুলেব শ্বেত শোভায় ভুবন আলোকিত হয়ে ওঠে। হর্ষোজ্জ্বল প্রকৃতির অঙ্গনে বসে কবি ভেবে পান না—

'আজি শরত তপনে প্রভাত লগনে
কি জানি পরাণ কী যে চায়।'

দ্বিপ্রহরে শারদ প্রকৃতি আবার ভিন্নতর শোভায় শোভিতা। সূর্যকরোজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে এখানে ওখানে ভাসমান 'জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী।' শঙ্খচিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ পরিক্রমা করে দুরন্ত বালকের ময়ূরপঙ্খী ঘুঁড়ি। পল্লীর মাঠে মাঠে চলে 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা।' দেখতে দেখতে প্রহর কেটে যায়; বিদায়কালে দিনমণি পশ্চিম আকাশ রক্তরাগে রঞ্জিত ক'রে ধরণীকে উপহার

দিয়ে যান' মুহূর্তের স্বপ্নলোকের স্পর্শ। তারপর 'বকের পাখায় আলোর লুকায় ছাড়িয়ে পূবের মাঠ।'

শরতের দিবাভাগ যেমন দিনমণির প্রসাদে আনন্দোজ্জ্বল, শরত-শর্বরী তেমনি চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সুশোভিতা। শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না পৃথিবীকে রূপালী আলোকে ধৌত ক'রে অপরূপ স্বর্গীয় মহিমা দান করে। দীঘির কালো জলে একই সঙ্গে রূপালী চাঁদ আর শ্বেত কুমুদের শোভা দেখে কার না মন আনন্দে নেচে ওঠে?

শরৎ সত্যই অবিমিশ্র আনন্দের ঋতু। এ সময়

"পারে না বহিতে নদী জলভার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর।"

এই তো জগন্মাতার আগমনের উপযুক্ত সময়। ঘরে ঘরে আগমনী গান গীত হতে থাকে। গতানুগতিক দিন যাপনের গ্লানি ঘুচে গিয়ে বাঙালীর মনে জাগে আনন্দের জোয়ার। দুর্গোৎসবের আয়োজনে বাংলার আকাশে বাতাসে লাগে পুলকের শিহরণ। সত্যই বঙ্গদেশে এই মহাপূজাকে বাদ দিয়ে শরতের কল্পনাই অচল। এ শুধু শারদী পূজা নয়, এ বুঝি শরতেরই পূজা। এর বিচিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে বাংলার শরৎ। প্রতিমার পাশে 'নবপত্রিকা' সে তো শারদ প্রকৃতিরই মূর্ত প্রতীক। তাই এর চেয়ে বড় উৎসব বাংলার আর কী আছে? বঙ্গমাতার আহ্বানে ব্যাকুল প্রবাসী তাঁর অঙ্গনে ছুটে আসে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মাতৃবন্দনায় প্রাণমন ঢেলে দেয়। মহিষাসুরমর্দিনীর রাঙাচরণে প্রণত হয়ে দুর্বল প্রপীড়িত বাঙালী সর্বাগ্রে প্রার্থনা করে—

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

দেখতে দেখতে ঢাকে বেজে ওঠে বিসর্জনের বোল। নবমীর তিথি-ভোরে দেখা দেয় অশ্রু-ভরা বিজয়া। বিদায়ের ব্যথায় সন্তানই শুধু অশ্রু বিসর্জন করে না, মায়ের চোখও যেন ছলছল ক'রতে থাকে। বিসর্জনের পালা শেষ হয়ে যায়। মাতৃহারা বাঙালীর বুকে শুধু আঁকড়ে থাকে সেই বাষ্পাকুল আবৃত্তি—'সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।' এই অমূল্য ভাবাবেগ বাঙালীকে ভুলিয়ে দেয় যত বিবাদ-বিভেদ, বেঁধে দেয় আপামর বাঙালীর

মধ্যে নিগূঢ় এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, তাই এই দিনে সব একাকার হয়ে যায় বিজয়ার শুভ আলিঙ্গনে। /

শরতের মত, এত বেশী উৎসবময় ঋতু আর দেখা যায় না। দুর্গাপূজার পর আসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। এই দিন শরতের 'শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী'র অপরূপ শোভাসম্পদের মধ্যে যেন শরৎ-লক্ষ্মীর হয় পুণ্য অভিষেক।

উৎসবের স্রোত চলতে থাকে। আসে কালীপূজা ও দীপান্বিতা উৎসব। বাংলার ঘরে ঘরে দেখা যায় আলোর খেলা। মাসের হিসাবে যদিও এরা আসে শরতের গণ্ডী পেরিয়ে তবু হেমন্ত এখানে ভাবের জগতে শরৎপ্রবাহেই মিশে থাকতে চায়। সবশেষে আসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভাইবোনের নিত্যকার খুনসুড়ি এইদিন মাথা চাড়া দিতে পারে না, বোন থাকলেই ভায়ের আদর, আর ভাই থাকলেই বোনের কদর, এই সত্যটা প্রমাণিত হয়ে যায়।

উৎসবে-আনন্দে ছন্দে-গানে প্রাণের প্রাচুর্যে আর সৌন্দর্যের সমারোহে বাংলার শরৎ সত্যই অতুলনীয়।

বাংলার বর্ষার রূপ

সংকেত :—১। বর্ষার আবির্ভাব ২। বর্ষার বস্তুরূপ ও ভাবরূপ ৩। মলিন ও সজীব রূপ ৪। কল্যাণীমূর্তি ও ভয়ঙ্করী মূর্তি ৫। বর্ষার বিরহ-জাগানো শক্তি ৬। বিভিন্ন কবির চোখে বর্ষা ৬। সাধারণ মানুষের চোখে বর্ষা।

ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গপ্রকৃতি নব নব সজ্জায় সজ্জিত হয়। নিদাঘে তাহার ভৈরবী মূর্তি; নববর্ষের পুণ্যবাসরে সে যেন কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় আত্মশুদ্ধিতে রত থাকে, তপস্যায় শুষ্ক ও কঠিন হইয়া উঠে। অবশেষে সিদ্ধিলাভ হয়, ভয়াল কঠোর গ্রীষ্মের অনল-জ্বালার অবসানে বর্ষারাণীর অভিষেক-কাল আসিয়া যায়। ঘুচিয়া যায় যত কিছু শুষ্কতা, কঠোরতা, রুক্ষতা, বর্ষার বারিধারার সুধাস্পর্শে প্রকৃতি হইয়া উঠে সজল-কোমল ও সজীব। কঠিন-হৃদয় গ্রীষ্ম প্রকৃতিকে দিয়া যে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করাইয়া লইয়াছে তাহাতে করুণাময়ী বর্ষার প্রাণে বড় লাগিয়াছে। তাই সে অশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে বারিধারা বর্ষণ করিয়া শান্তির প্রলেপ লাগাইয়া চলে।

বাংলার বর্ষার যেমন আছে একটি বস্তুরূপ তেমনি আছে একটি ভাবরূপ। দীর্ঘ গ্রীষ্মের দাবদাহের পর ঈশান কোণের ঘনকৃষ্ণ মেঘেই বর্ষার শুভাগমন আমাদের নিকট সুবিদিত হইয়া যায়। সুগম্ভীর গুরু গুরু মেঘমন্দ্র ভেরী বাজাইয়া বর্ষারাণীর আগমন ঘোষণা করে। বর্ষা আসে, কালিদাসের ভাষায়, 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'।

মেঘের কালো-কাজল রূপ দেখিয়া ময়ূরী পেখম মেলিয়া নৃত্য করিতে থাকে, আবার হর্ষোৎফুল্ল চাতকের সংগীতে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠে। প্রথম আগমন কালে বর্ষাকে সকলেই জানায় সাদর অভ্যর্থনা। বর্ষা চলিতে থাকে, কখনো প্রবলভাবে কখনো বা ইলশে গুঁড়ির মত। আকাশ সর্বদা থাকে মেঘাচ্ছন্ন ছাইমাখা, বর্ষা তাহার নীলিমাকে হরণ করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখে কেহই তাহা বলিতে পারে না। বর্ষার মলিন রূপটি স্বভাবতঃই আমাদের চোখে বেশী করিয়া ধরা পড়ে। যে সূর্য না থাকিলে দিন-মান অনুভূত হয় না, সেই দিন-মানকে বর্ষা তাহার সিক্ত অঞ্চলে প্রাণপণে ঢাকিয়া রাখে। সারা গ্রীষ্মকাল ধরিষা সূর্যদেব বাংলার মাটি ফুটিফাটা করিয়াছেন, তাহার নদী-খাল-বিলের জল শোষণ করিয়া লইয়াছেন। তাই সূর্যের উপর বর্ষার চির-আক্রোশ। রিম্ ঝিম্ শব্দে একটানা বৃষ্টি চলিতে থাকে ; নদনদী, খাল-বিল, দীঘিপুষ্করিণী-খানা-খন্দে, জল বাড়িতে থাকে ; গাছপালা, ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট সমস্তই বর্ষণ-সিক্ত হইয়া উঠে। নববর্ষণে হাওযায ভাসে সোঁদা গন্ধ, মন হইয়া উঠে উদাসী।

কিন্তু বর্ষার এই মলিন রূপের মধ্যেই আছে 'নব বিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।' বর্ষার জলধারার স্পর্শে মৃত্তিকা হইয়া উঠে উর্বরা ও শস্যশ্যামলা। পল্লীমায়ের বক্ষে ধান্যক্ষেত্রগুলির শোভা বর্ষাকালে সত্যই অপরূপ হইয়া উঠে। এ দৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে হয যে সোনার বাংলা সোনার বর্ষারই সৃষ্টি। বর্ষাতেই সারা বাংলার প্রধান ফসল ফলিয়া উঠে, বঙ্গবাসীর সারা বৎসরের খোরাক এই বর্ষাই যোগাইয়া থাকে।

কিন্তু পরিমিত এবং সময়োপযোগী বর্ষণ যেমন কল্যাণকর, অনিয়মিত এবং খেয়ালী বর্ষণ তেমনি ক্ষতিকর। তাই দেখা যায়, এই বর্ষাই আবার অতিরিক্ত বারিবর্ষণে নদীতে প্লাবন ডাকিয়া আনে। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলগুলিতে জাগিয়া উঠে মর্মভেদী হাহাকার। লোকে তখন বর্ষাকে প্রাণ ভরিয়া অভিশাপ দেয়।

করুণাময়ী বর্ষা তখন রাক্ষসীমূর্তি ধরিয়া চালায় এক-ধ্বংসের তাণ্ডব। কত যে শস্য, কত গোধন, কত ঘরবাড়ী ধ্বসিয়া ভাসিয়া যায়, কত কত মানুষের যে জীবনান্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বর্ষার একঘেঁয়ে সুরে যেন একটা বিরহের বেদনা বাজিয়া চলিয়াছে, এ সুর যেন প্রোষিতভর্তৃকার বেদনায় সকরুণ। বর্ষার বারিঝরা রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে অস্থায়ী জলাশয় হইতে ভেক-কণ্ঠের আনন্দধ্বনি শোনা যায়, গৃহমধ্যে শোনা যায় একটানা ঝিল্লিরব; কোণে কোণে জমিয়া উঠে রূপকথার আসর।

বর্ষা যেমনভাবে মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে, তেমন আর কোন ঋতুই পারে না। বাংলাদেশে বর্ষাকে লইয়া যুগে যুগে কত যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাংলার বর্ষা কতই না যুগান্তকারী অমর কাব্যের উৎস। মহাকবি কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত 'মেঘদূত', বর্ষারই কাব্য। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সেও বর্ষার কাব্য। আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ষার কতই না আধিপত্য। বিদ্যাপতির অমর লেখনীতে বর্ষা ধরা পড়িয়াছে রূপে-রসে অপরূপ হইয়া:—

ঝম্পি ঘন গর   জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

যেন গর্জনসহ বৃষ্টির ঘন ঘন পশলা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া জগৎ ভাসাইয়া দিতেছে। কোনো গতিকে দিনটি কাটিল, রাত্রে আরও ঘনঘটা,—

তিমির দিগভরি   ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
মত্ত দাদুরী   ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

রবীন্দ্রনাথ তো বর্ষাকে লইয়া অজস্র কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন। বর্ষার আবির্ভাবেই তিনি উল্লসিত চিত্তে 'বর্ষামঙ্গল' গাহিয়াছেন,

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সুধা সৌরভ রভসে।"

কবি দেবেন্দ্রনাথ বর্ষাকে দেখাইয়াছেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে, তাঁহার চোখে বর্ষা করুণাময়ী ঋতুকুলরাণী; আবার সত্যেন্দ্রনাথের চোখে বর্ষা দুরন্ত পাগলী মেয়ে।

কবির কাছে বর্ষার ভাবরূপই প্রাধান্য পাইয়া থাকে ; কিন্তু সাধারণ মানুষ বর্ষার বস্তুরূপেই থাকে স্তব্ধ-মুগ্ধ। তাহার শক্তিমত্তায় মানুষ স্তব্ধ, আর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ। বর্ষার এই সাধারণ রূপটি ফুটিয়া উঠে—অজস্র বারিধারায়, মেঘের গুরুগর্জনে, কচি ধানের সবুজ মেলায়, অফুরন্ত জল-কাদায়, বর্ষাতিহীন-শিয়াল-ভেজা-লোকে-জমাট গাড়ীবারান্দার তলায়, 'ইল্‌শে গুঁড়ি, ইল্‌শে গুঁড়ি ইলিশ মাছের ডিমে', অথবা সাঁঝের বেলার ভিজে-গলায় 'বেল ফুল'-এর হাঁকে।

বাংলার পশুপক্ষী

সংকেত ঃ—১। বাংলার ইতর প্রাণীর মধ্যে আছে বাংলার বৈশিষ্ট্য ২। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গরু, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, ছাগল প্রভৃতি—অশ্বের আভিজাত্য ৩। পক্ষিজগৎ আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ,—বাংলার ও বিলাতের পাখী ৪। পক্ষিদের শ্রেণী-বিভাগ ও শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য ৫। উপসংহার।

আমাদের এই বাংলাদেশ কেবল সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা নহে, প্রাণিসম্পদেও সে সুসম্পন্না। বৃক্ষলতাপুষ্পাদির ন্যায় এখানে ইতর প্রাণীরও দেখা যায় অনন্ত বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের খবর লইতে গিয়া আমরা একটি সত্যের সন্ধান পাইয়া মুগ্ধ হই। সত্যটি হইল এই, সমগ্র বঙ্গ-প্রকৃতির গাত্রে যে একটি বাংলার মায়া মাখানো বলিয়া ধরা পড়ে, ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই বাংলাদেশের অন্যান্য বহুতর পরিচয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পরিচয় হইল, ইহা কোমলে-কঠোরে অনন্যা। তাই এখানে যেমন আছে গো-জাতির ন্যায় অতি নিরীহ প্রাণী যাহা বাঙ্গালীর কাছে পাইয়া থাকে ভগবতীর ন্যায় পূজা, তেমনই আছে দুর্ধর্ষ হিংস্র-চূড়ামণি সুন্দরবনের রাজা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। আছে যেমন পরম বিশ্বাসী প্রভুভক্ত কুকুর জাতি, তেমনি আছে বিশ্বাসঘাতক সাক্ষাৎ যমদূত গোক্ষুরাদি বিষধর সর্প। বলা বাহুল্য অঞ্চলবিশেষে এই বিভিন্ন শ্রেণীর ইতরপ্রাণীর বাসস্থান রচিত হয়।

মোটামুটি আমরা বাংলার পশুকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখি, এক গৃহপালিত, আর এক বন্য। গৃহপালিতদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল গরু, তাহার

পর কুকুর, বিড়াল, ছাগল প্রভৃতির স্থান। বাংলার পশু-বৃত্তান্ত যেখানে যে ভাবেই লিখিত হোক তাহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে গো-জাতি। একদিকে কৃষিপ্রাণ পল্লীবাঙ্গলার কৃষিকার্য ও তৎসংক্রান্ত বাহনাদি কার্য চালাইয়া, অপরদিকে দুগ্ধদানে প্রত্যক্ষ প্রাণশক্তির যোগান দিয়া গরু লাভ করিয়াছে বাংলার পশুসমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। মানবকল্যাণে এই গো-জাতির অবদানের কথায় পৃথক্ একটি দীর্ঘাবয়ব প্রবন্ধ স্বচ্ছন্দে রচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী যে গো-জাতিকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে, তাহার মূলে আছে গো-জাতির এই সর্বাত্মক কল্যাণ-সাধন-জনিত এক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার মনোভাব। বিদেশী বিধর্মী বাঙ্গালী-হিন্দুর এই পূজার আয়োজনের মধ্যে হয়ত মূঢ়তা ও ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু হিন্দু যখন এই চতুষ্পদ প্রাণীটিকে "গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ" বলিয়া প্রণাম জানায় তখন সে শুধু বাংলার নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীর হইয়া মানবের প্রতি গো-জাতির অশেষ উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উহাকে বসায় বিশ্ববাসীর মাতৃত্বের আসনে।

গরুর পাশাপাশি মহিষও দাবী করে তুল্যামূল্য মর্যাদা। দুগ্ধের গুণের বিচারে গো-দুগ্ধ ও মহিষ-দুগ্ধের তারতম্য আছে বটে, কিন্তু ভারবাহী হিসাবে মহিষ গরু অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। এই দুইটি প্রায় সমশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কিভাবে যে সুন্দর একটি পার্থক্য রাখিয়াছেন আমাদের বঙ্গপ্রকৃতি তাহা ভাবিলে বেশ কৌতুক বোধ হয়। একবার যদি শুধু গোষ্ঠ ও মহিষ-বাথানের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবেই আমরা বুঝিতে পারিব ইহাদের নিখুঁত পার্থক্য। মহিষ-বাথানের যে মালিন্য ও উদ্দামতা, উহার যে একটা বন্য বিশৃঙ্খল আবহাওয়া, তাহা গোষ্ঠকে কখনই স্পর্শ করে না। তাই বোধ হয়, প্রায় সমতুল্য হইলেও, মহিষকে বাদ দিয়া গাভীকেই ভগবতী বলা হইয়াছে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে অশ্বের আছে একটা আভিজাত্যের দাবী; কিন্তু অশ্ব যেন ঠিক বাংলার মাটি-ঘেঁষা প্রাণী নহে, সে যেন শুধুই সভাশোভন করে। বাংলাদেশের মাটিতে সে পাদচারণা করে যেন বিদেশী বাবুর মত, তাই এ দেশের লোকের তার সেই বাবুয়ানা দেখিয়া আর সাধ মিটে না।

গরুর মত কুকুরও প্রায় বাংলার গৃহস্থালীর একটা অঙ্গস্বরূপ। ইহাদের কথা বলিতে গেলে মনে পড়ে আমাদের ইহাদেরই সেই আন্তর্জাতিক বন্ধুদের যাহারা শীতপ্রধান দেশের বড়লোকের ড্রইং রুমে কাটায় প্রভুদের সম মর্যাদায়।

সেই সব স্বাচ্ছন্দ্য-পালিত বিলাস-লালিত সারমেয়-সমাজের তুলনায় আমাদের ঘরের আশেপাশে চির অবজ্ঞায় যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা কতই না হতভাগ্য। ইহাদের তুলনায় সহস্রাংশে নিকৃষ্ট যে বিড়াল, বাংলার গার্হস্থ্য পরিবেশে তাহার কতই না সমাদর। সর্বত্র অবাধগতি, কোথাও বা শয্যার অর্ধাংশ তাহার জন্য সুরক্ষিত! রহস্যটি বড়ই অদ্ভুত, বিড়াল নাকি মা ষষ্ঠীর বাহন। এ কথায় সহজেই পিত্ত জ্বলিয়া যায় প্রাঙ্গণে অবস্থিত অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত শক্তিশালী কুকুরের; তাই, মার্জারী বাহিরে আসিলেই প্রবল আক্রমণে সে জানায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ। অবশ্য নিরপেক্ষ পরামর্শদাতার অভাবে কুকুর ইহা বুঝিতে পারে না যে গৃহের আভ্যন্তরীণ কোন না কোন বিশেষ উপকারের পরিবর্তেই বিড়াল লাভ করে তাহার সমাদর, যদিও একটানা সমাদরলাভ একদিনের তরেও কোন বিড়ালের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

বাংলার পক্ষি-সমাজের কথা বলিতে গেলেই মনে হয় সে যেন এক আনন্দের রাজ্য। কবি যে গাহিয়াছেন, 'তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখীর ডাকে জাগে,' তাহাতেই বুঝিতে হয় বাংলার পল্লীজীবন কী সুন্দর ভাবেই না পক্ষিকাকলীময়! বিলাতের স্কাইলার্ক, ব্ল্যাকবার্ড, নাইটিঙ্গেল প্রভৃতির মত আমাদেরও আছে কয়েকটি অভিজাত শ্রেণীর পক্ষীর বিশিষ্ট খ্যাতি; কিন্তু ওদেশের পক্ষিপরিচয় যেমন ঐ দুই চারিটি নামের মধ্যেই সীমায়িত, আমাদের সেরূপ নহে। কোকিল অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের লোকের কাছেই সমভাবে খ্যাত; কিন্তু আমাদের ময়না, চন্দনা, টিয়া, তোতা, পাপিয়া, দোয়েল, শালিক, বুলবুলি ইত্যাদির কণ্ঠে যে মধুর কাকলী-লহরী প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয়, তাহার খবর সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাইয়া দিবার মত কতটুকুই বা সাহিত্যিক আয়োজন হইয়াছে? বস্তুতঃ, বাংলায় গায়ক-পক্ষীর সংখ্যা এত বেশী যে বিলাতের মত অমন দুই চারিটি নমুনার দ্বারা তাহাদের পরিচয় দেওয়া চলে না। যে স্কাইলার্কের সুর-মহিমা লইয়া সে দেশে নানা দার্শনিক গবেষণা চলিয়া থাকে, নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাহার পাশে স্বরমাধুর্যে ও তান-বৈচিত্র্যে আমাদের 'বৌ-কথা-কও' পাখীটির ম্লান হইবার কোন কারণ নাই।

গায়ক-পক্ষী ছাড়া বাংলায় আরও এমন অনেক পাখী আছে, যাহারা

বিশেষ ধরণের গতিবিধির জন্য এক একটি বিশেষ শ্রেণীতে বিন্যস্ত হইতে পারে। যেমন, আমাদের কপোত-কপোতী, চক্রবাক-চক্রবাকী (চকাচকি), ডাহুক-ডাহুকী, প্রভৃতি যুগল-প্রিয় পাখীরা শাশ্বত প্রেমের দ্যোতকরূপে প্রসিদ্ধ। বাংলার চাতক একাই একটি বিশেষ আকৃতির পরিচায়ক;—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়, মেঘ হইতে বারি বর্ষণ না হইলে তাহার তৃপ্তি নাই, অবিরাম ডাকিয়া চলে 'ফটিক জল'। পেচক সাধারণতঃ অমঙ্গলসূচক বলিয়াই বিদিত। তাহার এই দুর্নাম বোধ হয় সবদেশেই সমান। কিন্তু বাংলার মত কোথায় আছে লক্ষ্মী-পেঁচা, কালপেঁচা, ভুতুম (হুতোম) পেঁচা, কটোর পেঁচা প্রভৃতি পেচকের এত শ্রেণি-বিন্যাস? ইহাদের মধ্যে কেহ বা লক্ষ্মীর বাহন, কেহ বা অলক্ষ্মী বা অমঙ্গলের বার্তাবহ। বাংলার পক্ষি-সমাজে যে পাখীটির বিশেষ আধিপত্য, প্রধানতঃ তাহাকে দুর্নামের বোঝা বহিয়াই বেড়াইতে হয়। ইহার নাম কাক। কোকিলের বিপরীত দিকে ইহাকে বসাইয়া সর্বদাই এই পাখীটিকে কোণঠাসা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে কোথায় যে কত বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই নির্গুণ, কুদর্শন, কর্কশ-কণ্ঠ পাখীটিই আবার কোন এক বিশেষ পুণ্যদিনে 'বায়স' রূপে পায় একখানি নৈবেদ্য। মনে হয়, জগতের ময়লা-নিষ্কাশনে মানুষের সে যে উপকার করিয়া চলে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে, এই ব্যবস্থায় দেওয়া হয় তাহারই একটা স্বীকৃতি। একেবারে ঘরের মধ্যে চালের তলায় কোঠাঘরের অলিতে গলিতে বাসা বাঁধে বাংলার চড়াই পাখী। উপকার সে কিছুই করে না, কিন্তু তবু যেন আশে পাশে এক লক্ষ্মীমন্ত'র আবহাওয়ায় বেশ আরামে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে অনুশাসনের দেশ এই বাংলাতে চড়াইকে এই আরামের জন্য মাশুলও একটা দিতে হয়। বাস্তু-শিল্পী বাবুই যে স্বাধীনভাবে মেহনত করিয়া নিজের বাসা নিজেই রচনা করে সেই কথাতে চড়াইকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করা হয় পদে পদে।

বাংলার পশু অপেক্ষাও পক্ষি-বৃত্তান্ত বিচিত্রতর। ইহাদের নিখুঁত পরিচয় দেওয়া প্রায় অসম্ভব। শুধু পুলকিত বিস্ময়ে সেই গ্রীক সম্রাটের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলা যায়, 'কী বিচিত্র এই দেশ!'

সাহিত্যে ইতরপ্রাণী

সংকেত ঃ—১। বৃহত্তর সমাজে মানুষ ও ইতরপ্রাণী ২। পাখীর প্রাধান্যলাভের কারণ ৩। কোকিল ৪। স্কাইলার্ক ও নাইটিন্‌গেল বিভিন্ন কবির হাতে—আমাদের অন্যান্য পাখী—বলাকা—কাক ও কোকিল, চড়াই ও বাবুই, বোলতা ও ভ্রমর—হিতোপদেশ ও ঈশপের গল্প—প্রেমের পাখী ৫। কুকুর—বিড়াল ৬। পতঙ্গ ৭। সৌন্দর্য বর্ণনায় ইতরপ্রাণী ৮। উপসংহার।

সাধারণতঃ মানব সমাজের কথাতেই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। কিন্তু মানুষ যে বৃহত্তর সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে যেমন মানুষও আছে, তেমনি আছে—মনুষ্যেতর প্রাণী। ইহা ছাড়া গাছ-পালা—নদ-নদী—পাহাড়-পর্বতময় জড় প্রকৃতি তো আছেই। ইহাদের সকলকে লইয়াই চলে মানব জীবনের ছন্দের উঠা-নামা। একদিকে মানুষ ও অপরদিকে জড়-জগৎ ও প্রাণিজগৎ, এই দুইয়ের মধ্যে চলে প্রতিনিয়ত এক সূক্ষ্ম আদান-প্রদান। তাই সাহিত্যে যে ইতরপ্রাণীর প্রসঙ্গ আসে তা কোন আকস্মিক খেয়ালের বশে নহে, সঙ্গত প্রয়োজনের তাগিদেই।

যে বিশেষ কয়েকটি ইতরপ্রাণী সাহিত্যে সচরাচর স্থান পাইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পাখীর সমাদর সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ, মনে হয়, পাখীর বিচিত্র গানের মধ্যে মানুষ পায় তাহার বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি। সুখের ও দুঃখের বলিয়া যে দুইটি বিভিন্ন অনুভূতি মানুষের আছে, বিভিন্ন পাখীর গানের মধ্যে তাহাই গীতিমাধুর্যে অনুরণিত হইয়া উঠে। ইহাদের কেহ জাগায় বসন্ত, কেহ বৈরাগ্য; কেহ জাগায় ভোগ-লিপ্সা, কেহ বা জাগায় দার্শনিক চিন্তা-ধারা।

সকল দেশের সাহিত্যেই কোকিল বসন্তের পাখী। একাধারে সে জাগায় মিলন ও বিরহ। আবার কোথাও বা এই কোকিলই হয় দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার উৎস, বঙ্কিমচন্দ্রের "বসন্তের কোকিল" ইহার দৃষ্টান্ত। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "To The Cuckoo" নামক কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাহিত্যে কোকিলের প্রসঙ্গ মনে হয় অন্যান্য সমস্ত ইতরপ্রাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য পাখীদের মধ্যে বিলাতের স্কাইলার্ক ও নাইটিঙ্গেল, শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কীটস্-এর লেখনী-প্রসাদাৎ রীতিমত আসর জম্‌কাইয়া

আছে। শেলী ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক-কবিতাদ্বয় লাভ করিয়াছে একটি ক্ল্যাসিক মহিমা। উভয় কবিতাতেই পাখী শুধু উপলক্ষ্য নহে, লক্ষ্যও বটে।

আমাদের দেশে সাহিত্যে কোকিল ছাড়াও আছে পাপিয়ার 'পিয়া পিয়া' ডাকের কথা, আগমনী-গানে দোয়েলশ্যামার যোগদানের কথা, মনমাতানো মন-হারানো ছোট্ট পাখী চন্দনার কথা, চড়া পাখীতে ও বুলবুলিতে ধান খেয়ে যাওয়ার কথা, " 'বৌ-কথা কও' বলি পাখী এক ডাকে, 'গৃহস্থের 'খোকা হোক' বলি কেউ হাঁকে, " এইরূপ বহু বিচিত্র পাখীর প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'য় শ্বেত হংস জাতীয় এক শ্রেণীর পাখী অমর হইযা আছে। সামান্য শালিককে লইয়াও 'পুনশ্চ' কাব্যে তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন এক টুকরা পরমাস্বাদ্য কাব্যামৃত। ইহা ছাড়া কাক ও কোকিলকে লইয়া, চড়াই ও বাবুইকে লইযা, বোলতা ও ভ্রমরকে লইয়া আমাদের সাহিত্যে কতই না শিক্ষা দেওয়া হইযাছে। আর, শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে ইতরপ্রাণি-নির্ভর যে দুইটি বিখ্যাত সাহিত্যকৃতি অবিস্মরণীয়, তাহাদের একটি আমাদের 'হিতোপদেশ', আর একটি উহাদের 'ঈস্‌পস্‌ ফেবল্‌স্‌' বা ঈশপের গল্প। ইহা ছাড়া প্রেমের কথা জানাইবার কাজে আছে কপোত-কপোতী, চক্রবাক-চক্রবাকী, ডাহুক-ডাহুকী ইত্যাদি যুগল-প্রিয় পাখী। অমঙ্গল-সূচনায় আছে পেচক, হিংসার প্রতীকরূপে আছে বাজপাখী এইরূপ আরও কত কি !

কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি যাহারা মানুষের কাছাকাছি থাকিতে অভ্যস্ত, তাহারাও অনেক সাহিত্যিক উপাদান যোগাইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় কাব্যে বা গল্পে বর্ণিত কাহিনীর অঙ্গস্বরূপ কুকুরের উপস্থিতি। সে যে কেবল পটভূমিতে থাকিয়া শোভাবর্ধন বা পাদপূরণ করে তাহা নহে, ভাবের বিস্তারেও সে অংশ গ্রহণ করে। আশ্রয়দাতার প্রতি সহানুভূতি জানাতে অভ্যস্ত এই চতুষ্পদ জীবটি তাহার অঙ্গ-সঞ্চালনে বা অস্ফুট ধ্বনিতে যে একটা সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সক্ষম শিল্পীর হাতে তাহা চমৎকার সাহিত্যিক উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নায়ক বা নায়িকা-চিত্তের শূন্যতা বা পূর্ণতা জানাইতে এই ইতরপ্রাণীটির জুড়ি নাই। তাই "ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি" কবিতার 'সুনৃতা' যখন চঞ্চল হইয়া শাড়ী-সেমিজ-ব্লাউজ বাক্সে তুলিতেছে— তখন "কুকুরটা কাছ ঘেঁসে লেজ নাড়ছে, ঠেলা দিচ্ছে কোলে থাবা তুলে, ভেবে পাচ্ছে না কিসের আয়োজন, ভয় হচ্ছে পাছে ওকে ফেলে রেখে আবার যায়

কোথাও।" আবার যখন সেই 'সুনৃতা' একটি জটিল মুহূর্তে তাহার প্রিয়তমের বাড়ীর মোটরগাড়ীখানা ফিরাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তখন কুকুরটাও "কাছে এসে বসে রইলো চুপ করে।" বলা বাহুল্য স্পর্শকাতর এই ইতর প্রাণীটির প্রসঙ্গ এখানে যোগাইয়াছে এক বলিষ্ঠ সাঙ্কেতিকতা। নায়িকার নৈরাশ্যজনিত মর্মভেদী আঘাত সমবেদনা-কাতর ঐ কুকুরটির স্তব্ধতার মধ্যেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের "নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডী"। সেখানে এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ নেড়ী কুকুর অবলম্বন করিয়া কবি আমাদের দিয়াছেন মানবজীবনের চিরন্তন হাহাকারের এক জীবন্ত স্পর্শ।

বিড়ালের কথায় সর্বাগ্রে মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মার্জারী যে কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টিতে 'বড়ই সোসিযালিষ্টিক'। ইহা ছাড়া আছে বিড়াল তপস্বীর কথা, চক্ষুর নীলিমা বর্ণনায় 'বিড়ালাক্ষী'র বহুল প্রযোগ এবং অপরাপর বিড়ালবৃত্তির প্রসঙ্গ।

পতঙ্গ জাতীয় ইতরপ্রাণীও সাহিত্যের অনেক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ, অর্থাৎ কোন-না-কোন নেশার আগুনে পুড়িয়া মরিতেই ব্যস্ত, এই মূল ভাবটি, শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের 'পতঙ্গ' নামক প্রবন্ধে নহে, বহু বিচিত্র সাহিত্যিক প্রযাসে যোগাইযাছে রচনার সমৃদ্ধির খোরাক।

বাহ্য সৌন্দর্যের বর্ণনায় আমরা কথায় কথায় ইতরপ্রাণীর দ্বারস্থ হই। সেই কালিদাসের যুগ হইতে সুনযনার পরিচয়-প্রসঙ্গে আমরা কখনও বলিতেছি "চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা," কখনও "খঞ্জন-গঞ্জন" আবার কখনও বা

> "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ-আকার।
> মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥

অর্থাৎ এখানে প্রথমে আসিল হরিণ তাহার পর খঞ্জন পাখী ও তাহার পরে ভ্রমর।

এইভাবে দেখা যায় সাহিত্যে ইতরপ্রাণীর প্রসঙ্গ যেমন বিচিত্র তেমনই বিপুল। মানুষ যে ইতরপ্রাণীর গতিবিধি ও ভাবভঙ্গী কত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইহাদের জন্য জাগে তাহার কতই না দরদী অনুভূতি, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যে ইতরপ্রাণীর প্রসঙ্গে।

কলিকাতার বর্ষা

সংকেত ঃ—ক্রমাগত অসহ্য গরমে কাতর হইয়া লোক বৃষ্টি চায়—কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইলেই বৃষ্টিকে উপদ্রব বলিয়া মনে হয়—রাস্তায় জল জমে—ট্রাম-বাস বন্ধ হইয়া যায়—কাজকর্ম শিথিল হয়—জলনিকাশের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা—পরিকল্পনার অভাব—বস্তির লোকের দুর্দশা—পাকা পুরাতন বাড়ীও ধ্বসিয়া পড়ে।

দারুণ গ্রীষ্মের তাপে চারিদিক যখন দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠে, তখন কলিকাতাবাসী সকলেই একপশলা বেশ জোর বৃষ্টিই চাহেন। কিন্তু দুই-এক ঘণ্টার প্রবল বর্ষণের পর কলিকাতার চেহারাই যখন পাল্টাইয়া যায় তখন আকাশের স্নিগ্ধ ধারাকেও যেন একটা প্রবল উপদ্রব বলিয়া মনে হয়।

সারা কলিকাতায় যদি এক-আধ ঘণ্টা ধরিয়া প্রবল বর্ষণ হয়, তাহা হইলেই অনেক রাস্তায় জল জমিয়া যায়। রাস্তায় ট্রামগুলি বন্ধ হইয়া গিয়া সারি সারি দাঁড়াইয়া থাকে ; কদাচিৎ একটি দুইটি শাখায় দুই-একখানি করিয়া ট্রাম চলিতে থাকে। জল একটু বেশী জমিলে বাসও বন্ধ হইয়া যায়। দুই-একজন দুঃসাহসী বাসচালক বা লরীচালক জলের মধ্য দিয়াই বাস বা লরী চালাইতে চেষ্টা করে। যাহারা সৌভাগ্যবান্ তাহারা জল কাটাইয়া বেগে চলিয়া যায়। কিন্তু ইঞ্জিনের মধ্যে জল ঢুকিয়া ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হইয়া গেলে গাড়ি আর চলে না। চারিদিকে এক হাঁটু বা তাহার চেয়ে একটু বেশি জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, আর তাহার মাঝখানে এক একটি বিরাটদেহ বাস বা লরী চলমান দ্বীপের মতো দেখা যাইতেছে এইরূপ দৃশ্য বিরল নয়। যে সব অঞ্চলে বেশি জল জমে সে সব স্থানে কেবল ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা যে কাগজের নৌকা ভাসাইয়া দেয় তাহা নয়, বয়স্করা কাঠের নৌকা করিয়া জলবিহার করিতেছে এরূপ দৃশ্যও প্রায় প্রতি বৎসরই দুই এক দিন দেখা যায়। তখন কলিকাতায় আছি না ভেনিস শহরে আছি সে বিষয়ে যেন একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়।

কলিকাতার পথে-ঘাটে এই জলপ্লাবনের কারণ জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাব। এই বিরাট শহরটি কেহ পরিকল্পনা করিয়া গড়িয়া তোলে নাই, সুতরাং ইহার নগরোচিত ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরতিশয় অপর্যাপ্ত। সেই জন্যই অল্প কিছুক্ষণ বৃষ্টি পড়িলেই রাস্তায় জল জমে এবং ড্রেনের মুখ

খুলিয়া দিয়া জলনিকাশের চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও জল যে কখন নামিয়া যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরিয়া জল জমিয়া আছে এমন ঘটনাও ঘটে।

অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় যে সব বস্তি আছে, এই সময় সেগুলির শোচনীয় অবস্থা চরমে পৌঁছায়। এই অঞ্চলগুলির পথ-ঘাটতো ডুবিয়া যায়ই, অনেক সময় বাড়ির ভিতর, এমন কি ঘরের ভিতরও জল ঢুকিয়া পড়ে। চারিদিকের স্তূপীকৃত আবর্জনা ভাসিয়া বাড়ীঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে এরূপ দৃশ্য এই সময় অসম্ভব নয়। বৃষ্টির ফলে মেটে ঘর বা জীর্ণ বাড়ীগুলি প্রায়ই ভাঙিয়া পড়ে।

কেবল বস্তি অঞ্চলেই নয়, অন্যত্রও বর্ষায় পুরাতন বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িবার সংবাদ প্রত্যেক বৎসরই দেখা যায়। বাহ্যত বোঝা না গেলেও অনেক বাড়ীই বাসের দিক দিয়া নিরাপদ নয়। বৃষ্টি হইলেই ঐগুলির ছাদ দিয়া বা দেওয়াল বাহিয়া জল পড়িতে থাকে। ছাদ ও দেওয়াল সর্বদাই এমন ভিজা অবস্থায় থাকে যে মনে হয় এইবার বুঝি তাহা ভাঙিয়া পাড়িবে। কলিকাতা কর্পোরেশনকে প্রতি বৎসরই কয়েকটি বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে হয়—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু বাড়ী প্রত্যেক বৎসরই ভাঙিয়া পড়ে।

বর্ষা নামিলেই কলিকাতার জীবনযাত্রা যেন কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়ে। পথে-ঘাটে ভিড় থাকে না। দুই-তিন দিন বাদলা থাকিলে সকলেই যেন বর্ষাকে আপদ বলিয়া মনে করে। চারিদিকের প্যাচ-প্যাচানি যেন অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যেই দুই-তিন দিনের জন্য বৃষ্টি বন্ধ হইয়া রোদ ওঠে, অমনি সকলে আবার এক পশলা বৃষ্টির জন্য ছটফট করিতে থাকে। অসুবিধার কথা পরে ভাবা যাইবে—এখন এই গরম হইতে প্রাণটা একটু বাঁচুক তো!

পশ্চিম-বাংলার নদনদী

নদীমাতৃক বাংলার বেশীর ভাগ নদীই পূর্ব-বাংলায়—কিন্তু পশ্চিম-বাংলার নদনদীর পরিমাণও কম নয়। ছোটো বড়ো অসংখ্য নদী পশ্চিম-বাংলাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

পশ্চিম-বাংলার নদীগুলির মধ্যে সকলের আগে ভাগীরথার নাম করিতে

হয়। ইহা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গারই শাখা। বাংলা দেশে প্রবেশ করিবার অল্প কয়েক মাইলের মধ্যেই গঙ্গা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটি শাখা পদ্মা নামে পূর্ব-বাংলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অপর শাখাটি ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা এবং পশ্চিম দিকে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার পাশ দিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ বণিক এই নদীর তীরে হুগলী শহরে কুঠি স্থাপন করিবার পর হুগলী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অংশকে হুগলী নদী নামে অভিহিত করিয়াছে। বিদেশী বণিকমহলে এই নামই প্রচলিত—জনসাধারণ ইহাকে বিষ্ণুচরণ-স্রুতা গঙ্গা বলিয়াই জানে।

পশ্চিম-বাংলার সভ্যতার উপর ভাগীরথীর প্রভাব অসাধারণ। এই সুপ্রাচীন নদীর উপকূলে স্মরণাতীত কাল হইতে অগণিত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নদীটি নাব্য হওয়ায় ইহা বাণিজ্যার্থীদের একটি প্রধান পথ ছিল। পাশ্চাত্ত্য বণিকেরা আসিয়া ইহার তীরেই কুঠি তৈয়ারী করিয়াছিল। জলপথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এখনও এই নদীটি অন্তর্বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ হইয়া রহিয়াছে।

জলপথে মাল আমদানি-রপ্তানির সুযোগ থাকায় ভাগীরথীর দুই তীরে অগণিত শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলগুলি জনবসতি স্থানগুলির অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। বহু লোক-সমাবেশের ফলে এই স্থানগুলি সংস্কৃতির এক একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রও হইয়া উঠিয়াছে।

এই নদীর তীরেই মহানগরী কলিকাতা অবস্থিত। ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, এই নগরী ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরও বটে। হুগলী নদী দিয়া প্রতি বৎসর যত মাল আমদানি-রপ্তানি হয়, পৃথিবীর আর দুই-তিনটি ব্যতীত অপর কোন নদীতে তাহা হয় না। ডায়মণ্ড হারবার পশ্চিম-বাংলার একমাত্র পোতাশ্রয় এবং ভারতের পোতাশ্রয়গুলির মধ্যে অন্যতম।

ভাগীরথীর পরেই দামোদর নদের নাম করিতে হয়। সাওতাল পরগণার পর্বতগুলি হইতে উদ্ভূত হইয়া এই নদীটি বাঁকুড়ার উত্তর সীমা বাহিয়া পশ্চিম-বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পর বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগর হইতে কিছু উত্তরে হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। এই নদীটি তাহার উচ্ছ্বসিত জলধারার তাণ্ডবলীলার জন্য

সকলের সভয় ও সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা প্রায় প্রতি বৎসরই আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে দুই কূল ভাসাইয়া দিত। বর্তমানে এই খেয়ালী নদে বাঁধ দিয়া বন্যা-প্রতিরোধ, সেচব্যবস্থা ও জলজ বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়ায় এই নদটি পশ্চিম-বাংলার অশেষ কল্যাণের উৎস হইয়া উঠিতেছে। ইহার তীরে বা তীর হইতে অদূরে সোনামুখী, কাঞ্চননগর, জামালপুর, তারকেশ্বর, আমতা, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি নগর প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম-বাংলার অপরাপর নদীর মধ্যে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী বা কাঁসাই, বেহুলা, ব্রাহ্মণী, সরস্বতী, রসুলপুর, জলঙ্গী প্রভৃতি নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদীর একাংশ মেদিনীপুর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীগুলি সব সময় নাব্য না হইলেও দেশের অন্তর্বাণিজ্যে বিশেষ সহায়তা করে। অধুনা মজিয়া গেলেও সরস্বতী নদী এক সময় একটি বাণিজ্য-নদী হিসাবে সুপরিচিত ছিল এবং এই নদীর তীরে সপ্তগ্রাম বাংলার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ দিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। জলঙ্গী নদীও বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য বিখ্যাত। অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব, বায়পুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অজয় যেখানে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে তাহার অদূরে কাটোয়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান। দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ একটি দীর্ঘ নদী। ইহার তীরে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ, ঘাটাল প্রভৃতি স্থান প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি ইহার মোহনায় গেঁয়োখালি নামক স্থানে নূতন একটি বন্দর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হইতেছে। কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর তীরে রায়পুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। সুবর্ণরেখার তীরে গোপীবল্লভপুর উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়াও ছোটো ছোটো নদীগুলি বাংলার পল্লী-জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই নদীগুলি পলিমাটি বহিয়া দুই কূলকে উর্বর করিয়াছে, সেচের জল যোগাইতেছে এবং অনেক স্থানে এই নদীগুলিই স্নান-পানের একমাত্র উপায়। বাংলার প্রতিদিনের জীবনে নদী না হইলে নয়—কৃষিপ্রধান এই দেশটির সংস্কৃতি নদীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বন্যা ও বন্যাপ্রতিরোধ

সংকেত ঃ— ১। বন্যার কারণ—নদীগুলি নানা কারণে মজিয়া যাইতেছে—নদীগর্ভ উঁচু হইয়া উঠিতেছে ২। বন্যায় যে ক্ষতি হয় তাহার বর্ণনা ৩। বন্যার গতি রোধ করিবার জন্য বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ ৪। বিজ্ঞানসম্মত উপায় ৫। দামোদর ও ব্রহ্মপুত্র ৬। উপসংহার।

নদীমাতৃক দেশের অনেকগুলি সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। নদীগুলি কৃষিকার্যের সহায়তা করে। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে নদীগুলি উপযুক্ত পথরূপে ব্যবহৃত হয়। নৌকার সাহায্যে অতি সামান্য ব্যয়েই একস্থান হইতে অন্যস্থানে জিনিসপত্র লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে বা শরৎকালের প্রথমে নদীগুলি কূল ছাপাইয়া প্রবল বন্যা বহাইয়া অশেষ দুর্গতি ঘটায়। ভারতবর্ষে হিমালয়ের পাদদেশে, উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিহার, বাংলা ও আসামে প্রায় প্রতি বৎসরই গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাগুলি প্রবল বন্যায় ভাসিয়া যায়। নিম্নভূমিতে যে সকল লোক বাস করে তাহাদের দুঃখের আর সীমা থাকে না। অগণিত মানুষ গৃহহারা হইয়া যায়। বন্যার জলে ডুবিয়া কত লোক আর গৃহপালিত পশু যে প্রাণ হারায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বন্যার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহারও পরিমাণ সামান্য নয়। তাহা ছাড়া বন্যার পর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ করাল মূর্তি ধারণ করে। সরকার অথবা কোনো কোনো জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান যে সাহায্য করে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যৎসামান্য।

উত্তর-ভারতে যে বন্যা হয় তাহার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে হিমালয়শৃঙ্গের তুষারস্তূপ গলিয়া যাইতে থাকে—এই গলিত তুষারের পরিমাণ খুব বেশী হইলে নদীগুলি জলভারে স্ফীত হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া দেয়। বৃষ্টিপাতের আধিক্যও বন্যার অপর কারণ। পার্বত্য প্রদেশে যে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় তাহা এই নদীগুলি দিয়াই নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হয়। বর্ষায় বৃষ্টিপাতের প্রাবল্যে নদীগুলি পূর্ব হইতেই জলে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার উপর এই অতিরিক্ত জলপ্রবাহ আসিয়া পড়িলে স্বতঃই বন্যায় নিম্নভূমি প্লাবিত হইয়া যায়। এই বন্যা-প্রতিরোধ করিবার জন্য উপযুক্ত বাঁধ এদেশে নাই। পূর্বে তরাই অঞ্চলের বনভূমি

প্রাকৃতিক বাঁধের মতো এই আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসকে কতক পরিমাণে সংযত করিত কিন্তু যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার এই বন উচ্ছেদ করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করায় বন্যাপ্রতিরোধের একটি প্রাকৃতিক উপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলে নদীর তটভূমি ক্ষয়িত হইয়া নদীবক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণে মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়াতে বন্যা প্রায় নিয়মিতভাবেই ঘটিতেছে। ভূমিকম্পের ফলেও ভূভাগ এরূপভাবে পরিবর্তিত হয় যাহাতে অনেক সময় বন্যা দেখা যায়। রেল-লাইন পাতার ফলে অনেকস্থলে জলনিকাশের স্বাভাবিক পথগুলি রুদ্ধ হওয়াতেও বন্যার স্বাভাবিক প্রতিরোধের উপায় দূরীভূত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে বন্যার ফলে সাময়িকভাবে ক্ষতি হইলেও পরিণামে তাহা ফলপ্রদ হয় সন্দেহ নাই। বন্যার জলে প্লাবিত ভূভাগের উপর যে পলিমাটি সঞ্চিত হয় তাহাতে ভূমির উর্বরা-শক্তি বহুগুণে বর্ধিত হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসর যে পরিমাণ শস্য জন্মায় তাহাতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়। কিন্তু এককালে অকস্মাৎ যে ঘোরতর বিপর্যয় আসে তাহা কাহারও কাম্য নয়। সেইজন্য ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হইলেও বন্যাকে মানুষ ভগবানের আশীর্বাদরূপে না দেখিয়া একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা রূপেই দেখে এবং ইহার প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহে।

বহুকাল পূর্ব হইতেই মানুষ বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য বাঁধ তৈয়ারি করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই বাঁধগুলি ছোটো-খাটো বন্যা প্রতিরোধ করিতে পারিলেও প্রবল জলোচ্ছ্বাসের নিকট এগুলি হার মানে। নিম্নভূমিগুলিতে জলসেচন করিবার জন্য যে খাল কাটা হয়, তাহাতেও নদীর অতিরিক্ত জল অনেকটা বাহির হইয়া যায়। নদীর পথ সরল করিয়া দিলেও অনেক সময় বন্যা এড়ানো যায়। কিন্তু প্রবল বন্যার নিকট এই উপায়গুলি নিষ্ফল হইয়া যায়।

আধুনিক যুগে পূর্ত বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বন্যাপ্রতিরোধের বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। যে স্থানে বন্যা হয় সেই স্থানে প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা না করিয়া নদীর উৎস-অভিমুখে কোনো স্থানে বন্যাপ্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কেবল বাঁধ দিয়াই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। বড়ো বড়ো কৃত্রিম জলাধারে জল রক্ষা করিয়া ঐ জলকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

যথেষ্ট সংখ্যক কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ অবশ্যই একটি বৃহৎ এবং বহু-ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। একমাত্র সরকারই এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে হাত দিতে পারে। আধুনিক বন্যাপ্রতিরোধ পরিকল্পনা যে কতটা কার্যকরী, দামোদর পরিকল্পনা তাহার অন্যতম প্রমাণ। সেবার ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যায় আসামের বহুস্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে। অথচ দামোদর পরিকল্পনার ফলে ইহার অববাহিকায় আদৌ বন্যা হয় নাই। অপরপক্ষে যে বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে তাহা এই অংশের অধিবাসীদের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। রাষ্ট্র যদি এইরূপ দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তবে যুগপৎ বন্যানিয়ন্ত্রণ ও ইহার আনুষঙ্গিক অপরাপর কল্যাণসাধন সম্ভবপর হইতে পারে।

একটি নদীর আত্মকাহিনী

আমি গঙ্গা। হাজার হাজার বছর আগে থেকে ভারতবাসী আমাকে চেনে। আমাকে পবিত্র বলে সে শ্রদ্ধা করে আসছে। আমার বাতাসের স্পর্শ লাগলেও উদ্ধার হয়ে যাওয়া যায়—ভারতের হিন্দুদের এই বিশ্বাস।

আমার জন্ম সম্বন্ধেও পুরাণে অনেক অলৌকিক কল্পনা আছে! দেবর্ষি নারদ নিজেকে খুব বড়ো গাইয়ে বলে মনে করতেন। ব্রহ্মলোকে একদিন গান শুনিয়ে ফেরবার সময় তিনি দেখলেন যে, পথের পাশে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর দেবদেবী বিকৃতাঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন তারা কে আর তাদের এরকম দশা কী করে হল। তারা জানাল যে, তারা রাগ-রাগিণী। নারদ নামে একজন মুনি নিজেকে বড়ো গাইয়ে বলে মনে করেন—কিন্তু তিনি এমন গান করেন যে রাগ-রাগিণীর বিকৃতি হয়। বিকৃতভাবে গাওয়ার ফলে তাদের এই রকম অঙ্গবিকৃতি হয়েছে।—তাদের কি করে আবার স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করে নারদ জানতে পারলেন যে, মহাদেব যদি রাগ-রাগিণী অবলম্বন করে সংগীত করেন, তা হলে তাদের আকৃতি স্বাভাবিক হতে পারে। নারদ মহাদেবের কাছে সব কথা নিবেদন করে তাঁকে শুদ্ধভাবে সংগীত করতে অনুরোধ করলেন। মহাদেব জানালেন যে, উপযুক্ত শ্রোতা পেলে তিনি গান শোনাতে পারেন। নারদ বুঝলেন যে, গাইয়ে

হওয়া তো দূরের কথা, শ্রোতা হওয়ার যোগ্যতাও তাঁর নেই। মহাদেবের নির্দেশমতো তিনি ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে আমন্ত্রণ করে আনলেন। মহাদেব যে গান গাইলেন ব্রহ্মা তার একটুখানি বুঝেই আর বুঝতে পারলেন না ; বিষ্ণু বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু কিছুটা শোনার পরেই তিনি এত মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে, তাঁর পা দুখানি গলে যেতে লাগল। ব্রহ্মা তখন সেই বিগলিত চরণকে কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন—সেই বিষ্ণুচরণ-স্রুত ধারাই আমার উৎস।—তারপরে সগররাজার ষাট হাজার সন্তানকে উদ্ধার করবার জন্য ভগীরথ আমাকে যেভাবে এনেছিলেন, রামায়ণ থেকে সে কাহিনী সবাই তো পড়েছ।

এখনকার লোকেরা কিন্তু পুরাণের কথায় তেমন আর বিশ্বাস করে না। তারা আমার উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে হিমালয়ের গাড়োয়াল প্রদেশের গিরিগুহা পর্যন্ত পৌঁচেছে। হিমালয়ের অফুরন্ত তুষাররাশি আমার আ৻াকে প্রতিনিয়ত পুষ্ট করছে—ত্রিশূল আর নন্দাদেবী এই দুটি গিরিশৃঙ্গের মধ্য দিয়ে আমি এসে পড়েছি গঙ্গোত্রীতে। এই আট মাইল পথ বরফে ঢাকা—আমার পায়ের নিচে ছোটো-বড়ো শিলাখণ্ড, আমার গায়ের উপর ধোঁয়ার মতো তুষারকণা উড়ছে—এখানে আমার গতি সর্পিল—পাথরের পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে আমি চলেছি। এখান থেকে খাড়া কিছুদূর নেমে এসে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিশলাম—এর আগে আমার ভাগীরথী আর জাহ্নবী নাম ছিল—এখান থেকে গঙ্গা নামেই সবাই আমাকে ডাকে।

পর্বতের অজস্র বাধা ভেদ করে আমি ত্বরিত গতিতে বয়ে চলেছি—সমুদ্রে পৌঁছুতে হবে এই আমার লক্ষ্য। এ যুগের ভূতাত্ত্বিকরা বলতে চায় যে, যে-দিকে ঢালু সে দিকেই সব নদী যেতে বাধ্য হয়! কী আশ্চর্য! তা হলে সব নদীই তো এক জায়গায় মিশতো! হিমালয়ের বন্ধুর পথের পালা শেষ হয় হরিদ্বারে—এখানে পাহাড়ের কোল ছেড়ে আমি সমতল মাটিতে এসে পড়েছি। পাথরের বাধা দূর হয়ে যাওয়ায় আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এখান থেকে একটু ধীর গতিতে আমার যাত্রা শুরু হয়েছে। আমি প্রথমে একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে মোড় ফিরে এলাম। এখানে আমার তীরে দেরাদুন, সাহারাণপুর, মজঃফর নগর—আরও কত শহর গড়ে উঠেছে। বুলন্দ শহরের কাছে রামগঙ্গার সঙ্গে দেখা। তারপর এলাহাবাদে কৃষ্ণতোয়া-যমুনার সঙ্গে মিশলাম—আমাদের এই মিলনের ক্ষেত্রকে প্রয়াগ বলে! এর পর একটু পূর্ব-

দিকে ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়ে বারাণসীধামে গিয়েছি—হিন্দুদের এই পুণ্যতীর্থ আমার সলিলে যুগ যুগ ধরে অভিষিক্ত। এর পর গোমতী আর ঘর্ঘরা নদী আমার সঙ্গে এসে মিশেছে। তাদের মিলিত ধারাকে নিয়ে পাটলিপুত্র, রাজমহল, কুশী নদী, সকরিগলি পার হয়ে মুর্শিদাবাদে এসে পড়লাম। আমার একটা ধারা পদ্মা নাম ধরে পূর্ব-বাংলায় চলে গেছে : আর আমি ভাগীরথী নামে ত্রিবেণী, হুগলী, নতুন মহানগরী কলিকাতা পার হয়ে এসে পড়লাম সাগরে—সাগরের সঙ্গে আমার মিলনের ক্ষেত্র হিন্দুর পুণ্যভূমি।

আমার তীরদেশে এই ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। আমার ধারায় শত শতাব্দীর ভাঙা-গড়ার কাহিনী মিশে আছে। সুদূর অতীতে আমার কূলে হারিয়ে-যাওয়া এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তারপর আর্যরা এল—আমার কূলে কূলে নতুন উপনিবেশ গঠন করে তারা এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করল। সেই সংস্কৃতি যুগে যুগে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। বেদ-উপনিষদের সভ্যতার পর বৌদ্ধধর্মের প্লাবন এসেছে—মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত কত সাম্রাজ্য ভেঙেছে, গড়েছে—ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে—পাঠান-মোগল এসে আমার তীরে রাজ্য স্থাপন করে কয়েক শ' বছর শাসন করেছিল—আমারই তীরে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের অভ্যুদয়ে ভারতে আধুনিক যুগের উদ্ভব হয়েছে—সেই ইংরেজও বিলুপ্ত হয়ে গেছে—এখন স্বাধীন ভারতবর্ষ আমার জলধারাকে নিয়ে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করে আর একটা যুগান্তর আনতে চেষ্টা করছে।

আমার মধ্যে অতীত আর ভবিষ্যৎ একসঙ্গে মিশে আছে। এখন আমার স্রোতে বাঁধ দিয়ে শক্তি-উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার কুম্ভ মেলায় লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী আমার জলে অবগাহন করে—দু' হাজার বছর আগে যে ভক্তি নিয়ে অবগাহন করত এখনও তার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। স্যাণ্ডহেডে আধুনিকতম বাণিজ্যপোত চলে—তারই পাশে গঙ্গাসাগরে প্রতি বছর অগণিত তীর্থযাত্রীরা সমবেত হয়। আমি যেখান দিয়ে বয়ে এসেছি সেখানে রেখে এসেছি আমার স্নেহস্পর্শ ; স্নান-পানের জল দিয়েছি, মৃত্তিকাকে উর্বর করেছি, যাত্রার পথকে সুগম করেছি, জনগণের মালিন্য দূর করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি। হিমালয়ে আমি গিরিবালিকার মতো চঞ্চলা, লঘুচারিণী—এখানে জননীর স্নেহ নিয়ে কোটি কোটি সন্তানকে যুগ যুগ ধরে লালন করবার দায়িত্ব নিয়ে শান্ত ধীর গতিতে বয়ে চলেছি—বয়েই চলেছি।

সংকেত সূত্র

রাত্রি

১। দিন কাজের, রাত্রি বিশ্রামের সময়। দিন উগ্র, রাত্রি শান্ত। দুইয়ের মিলনে বজায় থাকে জীবনের সমন্বয়।

২। বাহ্যরূপের দিক দিয়া দিন ও রাত্রি, একটি আলোকে উজ্জ্বল, অপরটি আঁধারে মলিন। আলোতে প্রকৃতি যেন হাসে, আঁধারে সে যেন কুটিল। নীচে জমাটবাঁধা অন্ধকার, উপরে আকাশে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। অন্ধকারে জ্বলে জোনাকী, ডাকে ঝিল্লী—দূরে নৈশ পাখীর ক্বচিৎ সাড়া—যামঘোষ-দল জানায় প্রহর।

৩। বিভিন্ন মানুষের কাছে রাত্রির রূপের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা—সাধারণ মানুষ অন্ধকারে ভয় পায়—আবার উৎসাহ পায় এমন মানুষও আছে—"রাত্রিরও যে একটা রূপ আছে" (শ্রীকান্ত)

৪। একদিকে রাত্রি হইল যত দূষিত-কুটিল প্রবৃত্তি বা তামসিক বৃত্তির কাল ; অপরদিকে রাত্রিই আবার গভীর চিন্তা-ধ্যান-তপস্যার উপযুক্ত সময়।

একটি গ্রামের মধ্যাহ্ন

১। গ্রীষ্মের বন্ধে পল্লীর কোনো আত্মীয়বাড়ীতে দিনযাপন—গ্রীষ্মের পল্লীর প্রত্যক্ষ স্পর্শ—পরিবেশ বর্ণনা।

২। প্রচণ্ড সূর্যকিরণ—প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি। ঘরে অসহ্য গরম। হাওয়া উত্তপ্ত। ঘাম—হাতপাখা—আইঢাই।

৩। পথ জনবিরল—দূরের মাঠ জনশূন্য—ঝিকিমিকি রৌদ্রের জালবোনা—মনে হয় কে যেন তপস্যার আগুন জ্বেলেছে। উঠানের একধারে ধানের গোলাটায় ছায়ায় শুয়ে লালা ফেল্‌ছে এক বৃহৎ কেলে কুকুর, গায়ে কাদামাখা—গরম এড়াবার উপায়।

৪। গ্রামের জীবনটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে দুপুরে। নিজেরও আসে ঝিমটানি। ঘুম আসে না, শুধু চেয়ে থাকি ঐ আগুনজ্বালা তপস্যার দিকে। 'তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাই ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।' ঘুঘুর ডাকে তন্দ্রা জমে ওঠে, ভেঙে যায় 'ফটিক জলে'।

শীতের সকাল

১। ভোরে ওঠার সংকল্প রাখাই দায়—প্রধান বাধা লেপের আরাম, বাইরে কন্‌কনে শীত, একগাদা জামাকাপড় না পরে বেরোবার উপায় নেই, অতএব বিছানা অপরিত্যাজ্য।

২। বাইরে খেজুর রস হেঁকে যায়, ঘরে চা'য়ের পেয়ালার আওয়াজ, দুর্বার আকর্ষণ, তার ওপর পিসীমার বকুনি। উঠ্‌তেই হয়।

৩। শীতের সকালে প্রাতর্ভ্রমণ যেমন উপভোগ্য তেমনি স্বাস্থ্যকর। কুয়াসা ও রদ্দুর দুইই উপভোগ্য। তপনে-পশমে শরীরের পুলক মনেও জাগায় স্ফূর্তি। এটা পায় না তারা যারা শীতে জড়সড়।

৪। ভারী কৃপণ ও কুটিল এই শীতের সকাল। এর ঐশ্বর্য অনেক, কিন্তু সবাইকে দিতে কুণ্ঠিত। দেখা দেয় যেন ছোট্ট হ'য়ে—কোথা দিয়ে কেটে যায়, কিন্তু ঘড়ির হিসাবে ঠিক দেখো চলে গেছে অনেকটা সময় ফাঁকি দিয়ে। কুঁড়ে লোকদের দেখায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, শুধু কড়াপাহারার কাজের লোককে কিছু করতে পারে না।

একটি বর্ষণ-মুখরিত রজনী

১। 'নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে'—দেখতে দেখতে আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, সঙ্গে নিয়ে এলো দুরন্ত বাদল, যাকে দীর্ঘমেয়াদী বলে বুঝতে বাকী রইলো না।

২। অবিরাম বর্ষণ, কখনো জোরে কখনো আস্তে। জানালা দিয়ে দেখা বাইরের দৃশ্য—বারিধারা—অন্ধকার—বিদ্যুচ্চমক। চোখের কাজ কমে যাওয়ায় বেড়ে গেল কানের কাজ. আর কান থেকে প্রাণে সুরু হলো নানা আনাগোনা।

৩। বাইরে যেন এক বিরাট ঐকতান বেজে চলেছে—শন্‌ শন-ঝিমঝিম মাঝে মাঝে সঙ্গতের মতো 'গুরু গুরু দেয়া ডাকে'।

৪। জেগে ওঠে স্বপ্নলোক—ভালো লাগে না কাজ, মন হয়ে ওঠে ছেলে-মানুষের মত স্বপ্নালু। কত দুঃস্বপ্ন, কত সুখের স্বপ্ন, কত উদ্ভট স্বপ্ন। রূপকথায় উপযুক্ত পরিবেশ। বর্ষার রাত্রি যেন মন্ত্র জানে। ভুলিয়ে রাখে সব কিছু কাজের চিন্তা।

৫। টুটে গেল স্বপ্ন এক দূরশ্রুত আর্তনাদে। দেওয়াল ধ্বসে গিয়ে অদূরে এক কুঁড়ে ঘরে ঘটেছে বিপদ। এলো কাজের ডাক।

৬। কেমন লাগলো রাত্রিটা।

(ঘ) জীবনী-প্রসঙ্গ

১। গৌতম-বুদ্ধ
২। বিদ্যাসাগব
৩। স্বামী বিবেকানন্দ
৪। রবীন্দ্রনাথ
৫। শ্রীঅরবিন্দ
৬। নেতাজী সুভাষচন্দ্র
৭। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
৮। রাণী ভবানী
৯। মহাত্মা গান্ধী

সংকেত সূত্র

১। ঝাঁসীর রাণী
২। কোনো এক আদর্শ ভারতীয় নারীর জীবনী (সরোজিনী নাইডু)
৩। কোনো বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক (জওহরলাল নেহরু)
৪। কোনো বিখ্যাত নাট্যকার (শেক্‌স্‌পীয়র)
৫। বাংলার কোনো জনপ্রিয় নেতা (শ্যামাপ্রসাদ)

গৌতম বুদ্ধ

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুর অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবী গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার উদরে এক শ্বেতহস্তী প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে লুম্বিনী উদ্যানে মায়াদেবী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, নাম রাখা হইল সিদ্ধার্থ। জন্মের পরেই সিদ্ধার্থ হইলেন মাতৃহারা এবং মাতৃস্বসা-বিমাতা গৌতমীর স্নেহযত্নে বড় হইতে লাগিলেন। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম গৌতম। গৌতম বাল্যকাল হইতেই একটু ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন, কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না। রাজ-ঐশ্বর্যে প্রতিপালিত হইলেও বিলাস-ব্যসনে তিনি ছিলেন উদাসীন, অনাসক্ত।

পুত্রের বৈষয়িক অনাসক্তিতে রাজা শুদ্ধোদন বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং পুত্রকে সংসার-সুখে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত ষোড়শ বৎসর বয়সে গোপা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত গৌতমের বিবাহ দিলেন। কিন্তু গৌতমের বিষয়-বিরাগী মনকে বাঁধিবার মন্ত্র বুঝি বিবাহ-মন্ত্রের মধ্যে ছিল না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল মায়াময় সংসারে মোহান্ধ মানুষ শুধু সাময়িক সুখের ছলনায় শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াই মরে। কথিত আছে, এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ এবং একটি মৃতদেহ দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই একজন সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি দর্শনে তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল যে ভোগে নহে, ত্যাগেই মুক্তি-আনন্দের স্বাদ গ্রহণ সম্ভব।

সংসার-বন্ধনের জ্বালা ক্রমেই তাঁহার নিকট তীব্র হইয়া উঠিল। এমন সময় রাজ-পরিবারের আনন্দ-সাগরে সুখের হিল্লোল তুলিয়া গৌতমের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। গৌতমের সংসার-বিরাগী মন ইহাতে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে সংসার তাঁহাকে মায়ার বন্ধনে জড়াইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল একদিন গভীর রাত্রে মহাকালের ইঙ্গিতে তিনি তাহাকে চিরকালের মত উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার কাছে তখন দু'টি মাত্র পথ—

"হয় মিশে থাক্ মিথ্যে মায়ায়
ঘরের প্রেমে থাকরে মিশি,
নয় ছুটে আয় জগৎবুকে
এই তো সুযোগ নীরব নিশি।"

সুতরাং "ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল চাইল এবার আকাশ পানে,
জগৎ তাঁরে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে, প্রেমের টানে।"—
সংসারের সুখ তুচ্ছ করিয়া গৌতম মুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগী হইলেন।

"রাজপুত্র সাজিয়াছে পথের ভিক্ষুক"; কিন্তু কে তাঁহাকে দিবে পথের সন্ধান? বৈশালী নগরে আসিয়া তিনি বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু পণ্ডিতের বিদ্যাবত্তা ও যোগীর যোগশিক্ষায় পথের নিদর্শন মিলিল না। নৈরাশ্য-পীড়িত রাজপুত্র পথের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে পাঁচজন শিষ্য লইয়া আরম্ভ করিলেন তপস্যার কৃচ্ছ্র-সাধন। সংকল্প করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন,—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি-মাংস প্রলয়ঞ্চ যাতু—

সত্যই শরীর ভাঙিয়া গেল। শিষ্যরাও তাঁহাকে একে একে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শাক্যসিংহ কিন্তু আপন সংকল্পে অটল। অবশেষে একদিন তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন রাজপুত্র এ-সংসারের শোক, দুঃখ, জরা হইতে মুক্তির উপায় লাভ করিলেন। তাঁহার পরমার্থ-জ্ঞান লাভ হইল। রাজপুত্র গৌতম হইলেন "বুদ্ধ" অর্থাৎ জ্ঞানী।

বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন রাজপুত্র যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন সেই জ্ঞানের আলোকে মায়ামুগ্ধ মোহান্ধ জগৎবাসীর চিত্তকে উদ্ভাসিত করাই তখন তাঁহায় একমাত্র কর্তব্য হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার নবলব্ধ নির্বাণতত্ত্বে মানুষকে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সংসার মায়াময়; ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু মায়াময় সংসারের মধ্যেও চিত্তকে সংযত রাখিয়া মুক্তি বা নির্বাণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নহে। সৎদৃষ্টি, সৎসংকল্প, সদ্বাক্য, সচ্চিন্তা ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা চিত্তকে নিস্পৃহ ও নিষ্কলুষ করিতে পারিলে পার্থিব জগতের ক্লেদ মানুষের মুক্তিপথের অন্তরায় হইতে পারে না। তাঁহার ধারণায় "জীবই শিব" সুতরাং "অহিংসা পরমো ধর্মঃ।" সর্বজীবে সমদৃষ্টি এবং তাহাদের দুঃখ-দৈন্য-নিবারণে সমপ্রচেষ্টা দ্বারা জীবসেবার মাধ্যমেই ভগবৎসেবা সম্ভব। বুদ্ধদেবের প্রচারিত এই নবীন ধর্ম ভারতবর্ষে এক নূতন জীবনের জোয়ার আনিল। শুধু ভারতে নহে,

মুক্তির দূত বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণ বহির্ভারতে চীন, জাপান, সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপে বুদ্ধের বাণী লইয়া উপস্থিত হইলেন। অনাড়ম্বর এই বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম অতি অল্পকালের মধ্যেই বহির্বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাণরসে পরিপূর্ণ এই বৌদ্ধধর্ম সহস্র সহস্র বৎসরের অসংখ্য রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যেও স্বকীয় মহিমায় আজও ভাস্বর।

রাজপরিবারের আদরের দুলাল যে রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রাজপ্রাসাদে নয়, লুম্বিনী উদ্যানে, রাজছত্রের পরিবর্তে বৃক্ষের সুশীতল ছায়াই ছিল যাঁহার নিকট অধিকতর কাম্য তিনি আশীবৎসর বয়সে নির্বাণলাভ করিলেন কুশীনগরের অনাড়ম্বর শান্ত পরিবেশে। তৎকালীন প্রচলিত যাগযজ্ঞ-বহুল বৈদিক ধর্মের তীব্র বিরোধিতা করিলেও হিন্দুগণ আজিও তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতাররূপে জ্ঞান করে। হিংসা-জর্জরিত এই পৃথিবীতে বুদ্ধের অহিংসার বাণীই আজ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের একমাত্র আশ্রয়। বুদ্ধের শান্তিময় বাণী গ্রহণ করিয়াই এই রণোন্মত্ত মোহান্ধ পৃথিবী শান্ত, সংযত হইতে পারে। তাই আজিও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ একান্ত নির্ভয়ে আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে,—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

বিদ্যাসাগর

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল বাঙ্গালী মনীষী স্বীয় প্রতিভাবলে স্বনামধন্য হইয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। কারণ তাঁহার ন্যায় আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এমন অখণ্ড বাঙ্গালীর আর কাহারও ছিল না। টোলের ছাত্রও যে জ্ঞানী-গুণী হইয়া পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া সমাজ ও স্বদেশের সেবা করিতে পারে একথা বিদ্যাসাগরের পূর্বে কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ তৎকালীন টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও সে পাণ্ডিত্য প্রায়শঃ ব্যয়িত হইত "তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল" ইত্যাদি তর্কের চুল-চেরা মীমাংসায়।

একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত নব্য বঙ্গ-সন্তানগণের প্রগতির নামে

ব্যভিচার, আর একদিকে স্বদেশীয় "টুলো পণ্ডিতগণে"র উৎকট গোঁড়ামি —বঙ্গসমাজের সেই দুর্দিনে আবির্ভূত হইলেন

"বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর
উদ্বেলিত দয়ার সাগর বীর্যে সুগম্ভীর।"

বীরই বটে! বাল্যে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, যৌবনে মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে লড়াই, সমগ্র জীবনে সমাজের ক্লেদ-গ্লানি, ক্রুটি-বিচ্যুতি-অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের সংগে লড়াই,—কিন্তু সর্বত্রই তিনি অপরাজেয়।

মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঁটেখাটো মানুষ, কিন্তু মাথাটা ছিল প্রকাণ্ড,—তাই ঈশ্বর বাল্যকালে সমবয়সীদের নিকট বড়ই বিড়ম্বিত হইতেন; কিন্তু গায়ের জোরেই তিনি সকলকে শায়েস্তা করিয়া দিতেন। এদিকে কাহারও দুঃখ-কষ্ট বা দারিদ্র্যের কথা শুনিলে তখনই তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের নিকট কঠোর এবং দুঃস্থ দরিদ্র দীনদুঃখীর নিকট পরম করুণাময় বালক ঈশ্বরচন্দ্রই উত্তর-জীবনে সমাজের সহস্র বাধা হেলায় অতিক্রম করিয়া যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি", সাগর-চরিত্রে এই পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশের জন্য তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষগণের নিকট ঋণী। মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন স্নেহ, মায়া দয়া ও করুণার জীবন্ত বিগ্রহ, আবার তাঁহার পিতৃপিতামহগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার বিলীয়মান গৌরব বহনকারী দারিদ্র্যপীড়িত নিষ্ঠাবান হিন্দু।

গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র পিতার সহিত কলিকাতায় আসিলেন উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইলেন। দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান; স্বহস্তে সংসারের রন্ধনাদি সকল কার্য সমাধা করিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে হইত। বৃত্তির টাকায় পাঠ্যপুস্তক ক্রয় এবং প্রদীপের তৈলের অভাবে রাস্তার লাইট্-পোষ্টের নীচে বসিয়া যে বালককে পাঠ অভ্যাস করিতে হইত, সেই ঈশ্বরচন্দ্রই পরবর্তী কালে তাঁহার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তির জন্য বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হন। কাল-ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের প্রধান কাজ হইল সমগ্র দেশে শিক্ষাবিস্তার করিয়া সাধারণ

মানুষের নিকট শিক্ষাকে সহজলভ্য করিয়া তোলা। তিনি 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' রচনা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজবোধ্য করেন। নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর জ্ঞান শিখাইবার জন্য তিনি যেমন 'বর্ণ-পরিচয়' প্রণয়ন করেন, তেমনি শিশুর মনভোলানো গল্পের মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষকে নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন, 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি। বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যক্তি যিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকের অনুবাদ করেন সহজ-বোধ্য বাংলা ভাষায়। তাই বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক।

শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের দান অতুলনীয়। কলিকাতায় মেট্রোপলিটন স্কুল স্থাপন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, গ্রামে গ্রামেও অসংখ্য প্রাথমিক ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের নিকট শিক্ষাকে সহজলভ্য করিয়াছেন। ইহাছাড়া তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, করুণা, উদারতা ও মহানুভবতার অসংখ্য উপাখ্যান বিদ্যাসাগরের কর্মবহুল জীবনে ভীড় করিয়া আছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের দুঃখে তিনি সমভাবে ব্যথিত হইতেন; এমন কি দেশ ও কালের গণ্ডীও তাঁহার করুণার স্রোতকে আটক করিতে পারিত না। মায়ের ডাকে যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া ঝড়ের রাত্রে সাঁতার কাটিয়া দামোদর পার হইয়াছিলেন, বালবিধবার ভাঙ্গা বুকে যে বিদ্যাসাগর নতুন আশার সঞ্চার করিবার জন্য বিধবা বিবাহের প্রচলনে গোঁড়া সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই বিদ্যাসাগরই আবার বিদেশে-বিভুঁয়ে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত স্বধর্ম-ত্যাগী মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অর্থ সাহায্য করিয়া নূতন বাংলার মহাকবিকে বিপদসাগরে উদ্ধার করেন। বিদ্যাসাগর অখণ্ড পৌরুষের জীবন্ত আদর্শ। বঙ্গ-সমাজের তদানীন্তন হীনবীর্যতার আবহাওয়ায় কিরূপে যে এমন একটি বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ঘটিল সেই কথা চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।" অজেয় পৌরুষ ও অক্ষুণ্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব বাংলাদেশে সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

স্বামী বিবেকানন্দ

যুগে যুগে দেশে দেশে যে সকল মহান সাধক, ধর্মগুরু ও সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও প্রচারের জন্যও এক বা একাধিক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাসের এই মহাসত্য পালন করিতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে শিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে নরেন্দ্রনাথ নামে এক দিব্য-কান্তি শিশুর জন্ম হয়। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী। বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন ধীর, স্থির, গম্ভীর, দয়ালু, বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী এবং সুরসিক—আর জননী ভুবনেশ্বরীও অসামান্যা বুদ্ধিমতী এবং নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী। নরেন্দ্রনাথ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বাল্যকাল হইতেই সর্ববিষয়ে নরেন্দ্রনাথের অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার দৈহিক বল, মনের একাগ্রতা, অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, প্রখর স্মৃতি ও শ্রুতিশক্তি সকলেরই বিস্ময়ের বস্তু ছিল। শোনা যায় পাঁচ বৎসর বয়সেই তিনি শুনিয়া শুনিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমস্ত শ্লোকগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং রামায়ণের সমস্ত পালাখানিই ছিল তাঁহার কণ্ঠস্থ। খেলাধূলা, ব্যায়াম, কুস্তি, অশ্বচালনায় নরেন্দ্রনাথ সমবয়স্কদের মধ্যে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্কুল-কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র নানা সদগুণের আধার মহাপরাক্রম-শালী এই "দস্যি ছেলে" নরেন্দ্রনাথই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সংঘর্ষে তৎকালে এদেশের সমাজ ও জীবন-ধারা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল। একদল পাশ্চাত্যের ভোগ-সর্বস্ব সংস্কৃতিকে শিরোধার্য করিয়া অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিল, আর একদল প্রাচ্যের সনাতন জীবন-দর্শনকে আশ্রয় করিবার নামে পারলৌকিক চিন্তায় ইহকালে বিকৃত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি পরমার্থিক সত্যের সহিত ঐহিক জীবনের এক অভূতপূর্ব যোগাযোগের সন্ধান দিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন কলেজের ছাত্র। অপরিণতবুদ্ধি পাশ্চাত্য-শিক্ষার্থিগণ এদেশীয় সাধু-সন্তগণকে সাধারণতঃ ভণ্ড বলিয়াই ধরিয়া লইতে অভ্যস্ত এবং পরমহংসদেবও তাহার কোনো ব্যতিক্রম ছিল বলিয়া তাহারা মনে করিত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে

আসিয়াই বুঝিলেন যে, এই ব্যক্তির মধ্যে কোন ভণ্ডামি নাই। পাঠ্যাবস্থায়ই দর্শনশাস্ত্রের উপর নরেন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং পরমহংসদেবের মধ্যে তিনি যেন দর্শন-শাস্ত্রের জটিলতম প্রশ্নেরও সহজ মীমাংসার সন্ধান পাইলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবকেই মনে-প্রাণে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ হইলেন বিবেক ও আনন্দের অধীশ্বর—বিবেকানন্দ।

ব্রহ্মজ্ঞানী পরমহংসদেবের মতে "জীবে" আর "শিবে" কোন তফাৎ নাই —"যত্র জীব তত্র শিব"। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য অথবা পারলৌকিক শান্তিলাভের জন্য ঘর-সংসার ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই,—জীব-সেবাই ভগবৎ সেবা। বেদান্ত দর্শনের এমন সহজ-সরল ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যায় এদেশের সমাজ ও ধর্মজীবনে এক নবযুগের সূচনা হইল। ধর্মোপার্জন করিতে হইলে কোন একটা বিশেষ দলের কথামত চলিতে হইবে এমনও কোন কথা নাই—"যত মত তত পথ"। ঈশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় কল্পনা করিয়া জড়-জীব সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যেই ভগবৎ-দর্শন সম্ভব। সকল মানুষই সমান—একই ব্রহ্মের সন্তান। সুতরাং

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"—ইহাই

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ইষ্ট মন্ত্র।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই স্বামিজী ভারত-পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। সমস্ত ভারতব্যাপী সাধারণ মানুষের দুঃসহ জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন। যাহারা বিত্তবান—যাহারা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ, তাহাদের শাসনে, শোষণে, অবজ্ঞায়, অবিচারে দরিদ্র ও তথাকথিত ছোট জাতের মানুষগুলির জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামিজী সমাজের এই দুষ্টচক্রে আঘাত করিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, "যে ধর্ম বা ঈশ্বর দরিদ্র মানুষের এক টুক্‌রা রুটি দিতে পারে না—আমি সে ধর্ম বা সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না।" তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য হইল, ধর্ম প্রচারের কথা চিন্তা করিবার পূর্বে এই

সকল অবজ্ঞাত, অবহেলিত মানুষকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার পথ দেখাইতে হইবে—তাহাদের দুইবেলা দুই মুষ্টি অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজে যাহারা ছোটজাত, সেই চির-অবজ্ঞাত সবার অবহেলিত বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত তাঁতী-জোলা, মুচি-মেথর-অজ্ঞ-দরিদ্র ভারতবাসীকে মনুষ্যত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে,—সকলকে ভাই বলিয়া কাছে টানিতে হইবে। সকলের দুঃখকষ্টকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বিবেকানন্দের এই বাণী ভারতের তরুণ-মনে এক নব প্রেরণার সঞ্চার করিল।

দুঃস্থ দরিদ্র ভারতবাসীকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধিবার মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ সমাজ অসহায় দরিদ্র ভারতবাসীর মধ্য দিয়াই ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষকে স্বদেশ ও মাতৃভূমিরূপে কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। সুরু হইল জাতীয় চেতনা। বিবেকানন্দ এই জাতীয় চেতনার উন্মেষক। সাহিত্যে, কাব্যে, গানে এবং কর্ম-প্রেরণায় প্রকট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল এই জাতীয়তা-বোধ। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বামিজীর নিজস্ব দানও অসামান্য। তাঁহার বক্তৃতাবলী, প্রবন্ধাবলী এবং শাস্ত্রীয় আলোচনামূলক গ্রন্থাদি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অপরাপর সাহিত্যসাধকের সহিত তিনিও কথ্যভাষাকে সাহিত্যের আসনে সম্মানের সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী বিবেকানন্দ ছিলেন অখণ্ড মানবতার পূজারী। দেশ কাল বা রাজনৈতিক সীমারেখার গণ্ডী সেই অখণ্ড মানবতাবোধকে খণ্ডিত করিতে পারে না বলিয়াই তিনি চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় দাঁড়াইয়া উদাত্তকণ্ঠে সম্বোধন করেন, "হে আমার আমেরিকার ভাই-ভগ্নিগণ!" এই মানবতা-বোধ হইতেই জন্মে সত্যিকারের বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। স্বার্থোদ্ধত রণোন্মাদ-ক্লান্ত পৃথিবীতে শান্তি ও সৌভ্রাত্র স্থাপন করিতে হইলে বিবেকানন্দের ধর্মমতই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ ইহাই ধর্মজগতে বর্তমান মানুষের একমাত্র যুগোপযোগী পন্থা।

রবীন্দ্রনাথ

সংকেত :—১। ২৫শে বৈশাখ। ২। পরিবার পরিচয়। ৩। ছেলেবেলা। ৪। কবি ও কাব্য পরিচয়। ৫। গদ্যরচনা পরিচয়। ৬। কর্মি-পরিচয়—শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন। ৭। ঋষি ও সত্যব্রতী রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালীর জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাহার মতো উৎসবপ্রিয় জাতি পৃথিবীতে খুব অল্পই দেখা যায়। তাহার উৎসবের দিনগুলি প্রধানতঃ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু একটি দিন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত না হইয়াও তাহার জাতীয় উৎসবের দিনে পরিণত হইয়াছে—সেই দিনটি ২৫শে বৈশাখ।

শতাব্দীকাল পূর্বে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ তারিখে বাংলায় এক মহামানবের আবির্ভাব হয়—তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিকে যেমন ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তৎকালীন ধনি-সমাজকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই এদেশে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রণী হইয়া ভারত-পথিক রামমোহনের সাধনাকে সফল করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ধর্মসাধনায় জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন অপরদিকে তেমনই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এযুগে পুনরুজ্জীবিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারত-সংস্কৃতিকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করিয়া উভয়ের মিলন সাধন করিয়াছেন। বিশ্বের উদার পরিসরে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশ্বমানব ও বিশ্ব-সংস্কৃতির মিলন-সাধকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তিনি যথার্থই বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা একটি ঘরকুনো ছেলের কাহিনী। তিনি ছোটো বেলা হইতেই একটু লাজুক-প্রকৃতির ছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর বিরাট পরিসরে তাঁহারা কয়েকটি বালক ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন—সেইজন্য তাঁহার পক্ষে স্বাধীনচিত্ত হইবার অবকাশ ছিল না। অথচ ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতির ধারা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই। পিতা দেবেন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেইজন্য স্কুল-পালানো ছেলে হইলেও কৈশোরেই তাঁহার অধ্যয়নের সীমা সুবিস্তৃত ছিল। মাত্র বারো বৎসর

বয়সেই তিনি সুললিত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। প্রথম কৈশোরে রচিত কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথের অংশবিশেষের অনুবাদ তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার পরিচয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধারা যেমন সুদীর্ঘ তেমনই বিচিত্র। তাঁহার কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সুর লাগিয়াছে—তটপ্লাবিনী নদীর মতোই তাঁহার কাব্যধারা বারবার বাঁক ফিরিতে ফিরিতে নূতন সৌন্দর্য ও অভিনব পলি-মৃত্তিকায় বাংলার কাব্যক্ষেত্রে নব নব শস্য উৎপন্ন করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহার কৈশোরের কাব্যে স্বপ্নাবেশই সুপ্রচুর। তাহার পর প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, মানসী প্রভৃতি কাব্যে হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হইয়াছে। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি কাব্যে তাঁহার জীবনানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশিত হইয়াছে। কল্পনা, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে প্রাচীন ভারতের গৌরববোধ ও তাহার ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত হইয়াছে। খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি তাঁহার সুগভীর অধ্যাত্মবোধের পরিচয় বহন করে। ইহার পর বলাকা, পূরবী প্রভৃতি কাব্যে জীবনের স্ফূর্তি ব্যক্ত হইয়াছে। শেষ জীবনেও অসংখ্য কবিতায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাঁহার বিচিত্র জীবনবোধ ও গভীর অনুভূতি। এত বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ পৃথিবীর আর কোনো কবির রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেবল কবিতাই নয়, গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর তিনিই সর্বপ্রথম উপন্যাসের মধ্যে নূতন রস সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আধুনিক যুগে টানিয়া আনিয়াছেন। বাংলা ছোটো গল্পের তিনিই প্রথম এবং সার্থকতম স্রষ্টা। তাঁহার নাটকগুলি ভাবের দিক দিয়া অনবদ্য। রাজা, ডাকঘর, রক্তকরবী প্রভৃতি যেসব সাংকেতিক নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সহিত একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য। সাহিত্য, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া রচিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সর্বোপরি তিনি গানের রাজা—কীর্তন বা শাক্ত-সঙ্গীতের মতোই, কথা ও সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার একটি অমূল্য সম্পদ। তাঁহার আঁকা ছবিগুলি বিশ্বের রসিকগণের কাছে অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। তিনি যে নৃত্যের ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা বাঙালীর হৃদয় জয় করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর বরপুত্র।

কিন্তু মাত্র এইটুকু বলিলেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব কিছু বলা হইল না। রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্য ও শিল্পের সাধনাই করেন নাই—তিনি জীবনের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের একদিকে যেমন শিল্পব্রত, অপর দিকে তেমনই কর্মব্রত। স্বদেশের কল্যাণের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। বাল্যকালে হিন্দুমেলার আয়োজনে তাঁহার স্বদেশসেবার হাতেখড়ি হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গের সময় যখন সারা দেশে স্বাদেশিকতার বন্যা বহিয়া গিয়াছিল তখন তাহার প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও গান দেশবাসীকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। রাখীবন্ধন উৎসবের সময় তিনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী পরাইয়া মিলনের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিবার পর তাহার খ্যাতি বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছিল; ইহার পর বৃটিশ সরকার তাহাকে 'স্যার' উপাধি দিয়া নাইটের সম্মানে ভূষিত করেন। কিন্তু পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা-বাগে ডায়ার নামে জনৈক বৃটিশ সেনাপতি সভায় সমবেত শান্ত জনগণের উপর নির্বিচারে গুলি চালাইলে তিনি বৃটিশ সরকারের শাসনের প্রতিবাদে সেই উপাধি পরিত্যাগ করেন। দেশের সংকট-মুহূর্তে তিনি বারবার উপদেশ দিয়া দেশবাসীকে সত্যপথের নির্দেশ দিয়াছেন। তাহার ঋষিজনোচিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণীর জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

দেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগের সীমা ছিল না। গুরুর সাহচর্য লাভ করিয়া ছাত্ররা যাহাতে উপযুক্তভাবে জীবন গঠন করিতে পারে এইজন্য তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমই কালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পরিণত হয়: উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি বিশ্বভারতী স্থাপন করেন। এই স্থানে পৃথিবীর সকল দেশের সংস্কৃতির মিলনসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।—এই দুই বিদ্যায়তনকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন।

পল্লী-উন্নয়নের দিকেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল। রাশিয়ার অনুসরণে তিনি এদেশে সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন

করিয়া কৃষকগণকে মহাজনদের হাত হইতে রক্ষা করাও তাঁহার অন্যতম প্রচেষ্টা। শ্রীনিকেতনে কুটিরশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই স্বাধীন ভারতের গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনায় প্রেরণা দান করিয়াছে।

গীতাঞ্জলি-প্রমুখ কাব্যে ও শান্তিনিকেতন নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে ভগবৎ-প্রীতি ব্যক্ত হইয়াছে তাহার জন্য তাঁহাকে ঋষি বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ঋষিদের মতোই সত্যের সাধক ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণের সহিত তাঁহার মত মেলে নাই, সেখানেও তিনি সত্যকথা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের প্রচেষ্টার অনেকটাই যে উচ্ছ্বাসমাত্র আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের যে দেশের সংগঠনের দিকে দৃষ্টি নাই, একথা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সেবাব্রত সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হইলেও চরকা কাটিয়া স্বরাজলাভের আদর্শকে তিনি অবাস্তব কল্পনা বলিয়াছেন। লোকায়ত মতের বিরুদ্ধে অভিমত দেওয়ায় বহুবার তাঁহাকে নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল—কিন্তু তিনি উপলব্ধ সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ তাঁহার দেহাবসানের পর আমরা তাঁহার সেই সত্যভাষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি।

শ্রীঅরবিন্দ

সংকেত ঃ—১। জন্ম ও পারিবারিক পরিবেশ। ২। ছাত্রজীবন। ৩। বরোদায় কর্মজীবনের আরম্ভ। ৪। রাজনৈতিক জীবন। ৫। পত্রিকা-সম্পাদন। ৬। রাজদ্রোহিতার অভিযোগ। ৭। গভীরতর দার্শনিক সাধনা। ৮। দিব্যজীবন—জ্ঞানযোগী শ্রীঅরবিন্দ। ৯। পণ্ডীচেরী আশ্রম—দেহাবসান।

১৫ই আগস্ট তারিখটি কেবল ভারতের স্বাধীনতা-দিবস বলিয়াই যে স্মরণীয় তাহা নয়, এই তিথিতে ভারতের এক মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেন—তিনি এ যুগের ঋষি, জ্ঞানযোগী শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার মাতামহ। কৃষ্ণধন ঘোষ পাশ্চাত্য শিক্ষার ভক্ত ছিলেন এবং আপনার পুত্রদের পুরোপুরিভাবে ইংরেজী শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। অতি শৈশবেই তিনি পুত্রদের প্রথমে দার্জিলিংয়ের লরেটো বিদ্যালয়ে ইংরেজী কায়দায় শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে পাঠান। ইহার পর অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর, তখন তিনি সপরিবারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। অরবিন্দ প্রথমে ম্যানচেস্টার শহরে ডুরাট-দম্পতির নিকট কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন; তাহার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স্ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে তাঁহার অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শীঘ্রই শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করিয়া প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় গ্রীক ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি গুণানুসারে দশম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ-বিদ্যার পরীক্ষায় যোগদান না করায় তিনি এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলিয়া পরিগণিত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কিংস কলেজে প্রবেশ করিয়া কেমব্রিজের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপস্ লাভ করেন। এইভাবে তাঁহার ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অরবিন্দের কর্মজীবন আরম্ভ হয় বরোদায়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার মহারাজা ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সহিত অরবিন্দের পরিচয় হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া তিনি বরোদা রাজ্যে প্রথমত রাজস্ব বিভাগে যোগ দেন—পরে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করেন। এখানে তিনি তেরো বৎসর কাল অবস্থান করেন এবং ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদে উন্নীত হন। এইখানেই সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা এবং ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। স্বরাজ, স্বদেশী ও বয়কট—এই তিনটি ছিল তাঁহার আদর্শ। কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী নেতারা তাঁহার আদর্শ প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয় তখন তাঁহার আদর্শ গৃহীত হয়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ—মোটামুটিভাবে এই আট নয় বৎসর

কাল তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি। প্রথম দিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি সুবোধচন্দ্র মল্লিকের 'বন্দে মাতরম্' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের ভার গ্রহণ করিয়া এই পত্রের মাধ্যমে অগ্নিগর্ভ বাণীতে দেশকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন। এই পত্রিকা তৎকালীন যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল এবং দুই একটি বিপ্লবীদলকে প্রেরণ জোগাইয়াছিল। এক সময়ে তিনি রাজদ্রোহিতা-ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত হন, কিন্তু এক বৎসরের কিছু বেশিকাল বিচারোপলক্ষে কারাবাসের পর নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলায় তাঁহার ও বিপ্লবীদের পক্ষ গ্রহণ করেন।

এইখানেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। সুরাট হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তিনি বিষ্ণু ভাস্করের নিকট যৌগিক সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। পুলিশের বিরক্তিকর সংস্পর্শ এড়াইয়া গভীরতর সাধনা করিবার জন্য তিনি প্রথমে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর এবং তাহার পর পণ্ডিচেরিতে গমন করেন। এইখানেই তাঁহার ধ্যানজীবনের সূত্রপাত হয়।

পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ চার বৎসর মৌনযোগে অতিবাহিত করেন, তাহার পর 'আর্য' নামে একটি ইংরেজী দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে আপনার চিন্তাগুলি পরিবেশন করিতে থাকেন। এই সময় হইতে তাঁহার গুণমুগ্ধ শিষ্যের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি আশ্রমের মতো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। দার্শনিক ও জ্ঞানযোগী হিসাবে তাঁহার নাম অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

ভারতের প্রাচীন ঋষিদের মতোই শ্রীঅরবিন্দ একাধারে কবি ও দার্শনিক। 'উর্বশী', 'দি হিরো অ্যাণ্ড দি নিম্ফ', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি কাব্য তাঁহার ভাবকল্পনা ও শিল্পকর্মে দক্ষতার পরিচয় দেয়। 'এসেজ অন গীতা', 'লাইফ ডিভাইন' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বের মূল্যবান সম্পদ। মানুষের মধ্যে যে দিব্যশক্তি আছে এবং মানুষ যে তাহার সাধনাবলে একদিন দেবত্ব লাভ করিবে ইহাই তাঁহার দর্শনের মূল বাণী।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দের দেহাবসান হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ কয়েকদিন অবিকৃত

অবস্থায় থাকে এবং তাহা হইতে এক অপার্থিব জ্যোতি নির্গত হইতে থাকে।

তাঁহার স্বদেশবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে স্বদেশীযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতারূপেই দেখেন এবং তাহাদের ধারণা, তিনি রাজনৈতিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে হয়ত ভারতকে এরূপ বিকৃত স্বাধীনতার গ্লানি বহন করিতে হইত না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সংকেত :—১। ভূমিকা ২। সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন। ৩। স্বদেশপ্রেম, মর্যাদাবোধ ও তেজস্বিতা। ৪। কর্মজীবন—দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র—অসহযোগ আন্দোলন—বাংলা ও ভারতের নেতৃত্ব—মতবিরোধ—ফরওয়ার্ডব্লক ৫। মহাযুদ্ধ—আজাদ হিন্দ্ সেনাবাহিনী। ৬। উপসংহার।

বাংলা দেশে একদিকে যেমন মনীষী ও সাধকবৃন্দ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন, তেমনই এদেশে বীরেরও অসদ্ভাব হয় নাই। বঙ্গজননী বীরপ্রসূতিও বটেন। রামপাল, ভীম, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অসংখ্য বীর এদেশে শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের শৌর্য-বীর্যের উত্তরাধিকার লইয়া আর এক বীর এ যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—যিনি 'নেতাজী' এই নামে কেবল বাঙালীর নয়, সারা ভারতবাসীর হৃদয়ে অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

২৩শে জানুয়ারী ভারতবাসীর পক্ষে একটি গৌরবের দিন—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এই তারিখটিতে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান কটক। পিতা জানকীনাথ বসু পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় মুগ্ধ। সুভাষচন্দ্র প্রথমে স্থানীয় ইউরোপীয় বিদ্যালয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের সহিত অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হন ও তাহার পর র‍্যাভেনশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি একবার অধ্যাত্মসাধনার পথে অগ্রসর হইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন —কিন্তু ভারতবাসীর সৌভাগ্যবশত পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু জনৈক

ইউরোপীয় অধ্যাপক ভারতীয়দের সম্পর্কে নিন্দাসূচক উক্তি করায় ছাত্রদলের নিকট অপমানিত হইলে বিদ্রোহী ছাত্রদের নেতা বলিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হন—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতার ফলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন নাই। ইহার পর স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হইয়া তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষার সময় কোনো একটি প্রশ্নপত্রে ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি অসম্মানসূচক উক্তি থাকায় তিনি তাহার প্রবল প্রতিবাদ করেন। দেশের প্রতি অনুরাগ প্রবল হইয়া উঠায় তৎকালীন অসহযোগ অন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সরকারের অধীনে চাকুরী করিতে অস্বীকৃত হইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি কেমব্রিজে দর্শনে ট্রাইপস্-সহ উপাধিও লাভ করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে নির্দেশ গ্রহণ করিবার জন্য গান্ধীজীর নিকট গমন করেন। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন ও চরকার সাহায্যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া গান্ধীজী তাঁহাকে বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে প্রেরণ করেন। দেশবন্ধুর আবেগদীপ্ত দেশপ্রেম তাঁহাকে মুগ্ধ করে এবং দেশবন্ধু ইহার পর যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন। দেশবন্ধু যখন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন, তখন তিনি ইহার প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে উত্তরবঙ্গে যে প্রবল বন্যা হয় তাহাতে তিনি তিনমাস কাল অক্লান্ত-ভাবে পরিশ্রম করিয়া দেশবাসীর সেবা করিয়া সকলের হৃদয় জয় করেন। তাঁহার অসাধারণ জনপ্রিয়তা বৃটিশ সরকারের যথেষ্ট ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী গান্ধীজীর সহিত তাঁহার মতের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। গান্ধীজীর স্বরাজ লাভের আদর্শকে অস্বীকার করিয়া তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতবাদকে দুর্বল বলিয়া তাহার বিরোধিতা করেন।

বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনই একমাত্র পথ বলিয়া তিনি নির্দেশ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া তিনি ইউরোপের আসন্ন মহাসমরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার কথা বলেন। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে আধুনিক জগতের উপযোগী করিবার পরিকল্পনাও তিনি এই সময়ে গ্রহণ করেন। গান্ধীজী সুভাষ-চন্দ্রের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পর বৎসর তিনি তাঁহার জনপ্রিয়তার জন্য পুনরায় সভাপতির পদে নির্বাচিত হন, কিন্তু গান্ধীপন্থী নেতারা তাঁহাব সহিত সহযোগিতা না করায় পদত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক নামে এক স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তোলেন। অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ তাঁহার এই যুগের আন্দোলনের ফল।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই বৃটিশ সরকার তাঁহাকে বন্দী করে। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি স্বগৃহেই আবদ্ধ থাকেন। বৃটিশ পুলিশ ও গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়াইয়া তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পাঠানের ছদ্মবেশে কাবুল যাত্রা করেন, তাহার পর জার্মান সরকারের সহায়তায় তিনি চলিয়া যান জার্মানি। জার্মানিতে তিনি ভারতের মুক্তি সাধনের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার প্রস্তাব করিলে হিটলার তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহার পর তিনি জাপানে গিয়া রাসবিহারী ঘোষের সহায়তা লাভ করেন। জাপানের আক্রমণে সিঙ্গাপুরের পতন হইলে যেসব ভারতীয় সৈন্যদের ফেলিয়া বৃটিশ বাহিনী পলায়ন করিয়াছিল তাহাদের লইয়া তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং তাহাদের সহায়তা লাভ করিয়া ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়েই তিনি নেতাজী আখ্যায় ভূষিত হন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া ভারতে পদার্পণ করে। কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র ও খাদ্যের অভাবে তাঁহাকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। ইতিমধ্যে জার্মানি ও জাপান পরাজিত হইলে আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র একটি জাপানী বিমানপোতে সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করেন। ১৮ই আগস্ট তারিখে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হয়।

কিন্তু ভারতের জনগণ ঐ সংবাদ বিশ্বাস করে না। এই বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীটি তাহাদের নিকট একটি রহস্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

তাহাদের বিশ্বাস যে, নেতাজী জীবিত আছেন এবং স্বাধীনতা লাভ কবিলেও ভাবতে যে. দুঃখ-দুর্দশাব সীমা নাই তাহা দূব কবিবাব জন্য নেতাজী একদিন নিশ্চয়ই আসিবেন। প্রতি বৎসব ২৩শে জানুযাবী তারিখে ভাবতবাসী. বিশেষ কবিযা বাঙালী এই ববেণ্য বীবকে অন্তব হইতে আহ্বান জানায। অনেকে আবাব বিশ্বাস কবেন যে, ভাবতোদ্ধাব ব্রত পালন কবিবাব পব নেতাজী অধ্যাত্মসাধনাব পথে যাত্রা কবিযাছেন। ভাবতেব অগণিত জনগণেব এই বিশ্বাস প্রিয় নেতাব প্রতি তাহাদেব অপবিসীম ভালবাসাবই নিদর্শন।

—জযতু নেতাজী।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সংকেত ঃ—১। ভূমিকা ২। চিবকুমাব জ্ঞানতপস্বী—ছাত্রজীবন ৩। কর্মজীবন—'নিজে কেবল বিজ্ঞান চর্চা কবেন নাই, নিজেব চাবিধাবে ছাত্রগণকে বিজ্ঞান অনুশীলনে ব্রতী কবিযাছিলেন ৪। বাংলাব কল্যাণকামী বন্ধু—বেঙ্গল কেমিকল ব্যবসায প্রতিষ্ঠান ৫। উত্তরবঙ্গের বন্যা ও আর্তত্রাণ ব্রত।

প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইযা ববীন্দ্রনাথ বলিযাছিলেন, "আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁব ছাত্রেব চিত্তকে উদ্বোধিত কবেছেন, তাকে কেবলমাত্র জ্ঞান দেন নাই—নিজেকে দিযেছেন যাঁদেব প্রভাবে সে নিজেকে পেযেছে। বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে প্রকাশিত করে বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাব চেযে গভীবে প্রবেশ কবেছেন কত যুবকেব মনোলোকে, ব্যক্ত কবেছেন তাব গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচাবশক্তি, বোধশক্তি। সংসাবে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষেব মনেব মধ্যে চবিত্রেব প্রভাবে তাকে ক্রিযাবান্ কবতে পাবেন. এমন মনীষী সংসাবে কদাচ দেখতে পাওযা যায়।"

এই সর্বত্যাগী বৈজ্ঞানিক, যিনি চিবকুমাব থাকিযা ছাত্রদেব কল্যাণেব জন্য ও দেশেব উন্নতিব জন্য আত্মদান কবিয়াছিলেন, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে খুলনা জেলাব কায়স্থকুলেব প্রখ্যাত বায় পবিবাবে জন্মগ্রহণ কবেন। এই বৎসবেই ববীন্দ্রনাথও

আবির্ভূত হন। ছাত্রজীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত রুগ্ন থাকায় তাঁহার পাঠচর্চায় প্রায়ই বিঘ্ন হইত। তাহা সত্ত্বেও তিনি যখন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দুষ্প্রাপ্য গিলখ্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন তখন অনেকেই বিস্ময়বোধ করেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি ডি. এস্-সি. উপাধি লাভ করেন। এডিনবরার রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাদি বিজ্ঞানসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। বহুপূর্বকাল হইতেই তিনি রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাঁহার গবেষণা পূর্ণোদ্যমে চলে। গন্ধক দ্রাবকের সহিত বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই সময় তিনি ঘৃত, মাখন, চর্বি প্রভৃতি তৈল জাতীয় পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করেন। তিনি যে কেবল নিজেই বিজ্ঞান লইয়া গবেষণা করিতেন তাহা না, এদেশে যাহাতে বিজ্ঞানচর্চা ছড়াইয়া পড়ে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে যাহাতে এদেশও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মতো উন্নতি লাভ করে তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি এ দেশে একদল বিজ্ঞানসাধক দুষ্কর কর্মে প্রবৃত্ত ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রীতি সঞ্চারের চেষ্টা করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ নিয়োগী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন নিয়োগী, নীলরতন ধর, বিমানবিহারী দে, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বীরেশচন্দ্র গুহ, হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতি বিজ্ঞানচর্চায় বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার পালিত অধ্যাপকরূপে (Palit Professor) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বদেশের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগ ছিল অসাধারণ। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে রসায়নের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আয়ুর্বেদ, চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, চক্রপাণি প্রভৃতির গ্রন্থাদি মন্থন করিয়া তিনি প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন সাধনার বিবরণ সংগ্রহ

করেন। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' তাঁহার সেই সাধনার ফল।—এককালে রসায়নে বিশেষ দক্ষতা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য পাশ্চাত্ত্যের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়—এই ঘটনাটি তাঁহাকে পীড়া দিয়াছিল। মাত্র সামান্য মূলধন লইয়া তিনি মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস নামে একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধি লাভ করিয়া অন্যান্য রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানস্থাপনে প্রেরণা দান করিয়াছে। ইহা ছাডাও, বাংলার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। স্বদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে উন্নতিলাভ করে সেজন্য তাঁহার চেষ্টার সীমা ছিল না।

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ তাঁহাকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানচর্চায় বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার জীবনকে সীমাবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই। জনসেবার আদর্শরূপেও তিনি সর্বজনের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের বন্যা বা খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুর্গতদের সেবা করিবার জন্য নিজে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের লইয়া তিনি যেভাবে সাহায্য বিতরণ করেন, তাহাতে দুর্গতের দুঃখ অচিরেই দূর হইয়া যায়।

বাঙালীর জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। বাঙালীর জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত না হইলেও তাহার চাল যে বাড়িয়া যাইতেছে—ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আহারে বিহারে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণের তিনি বিরোধী ছিলেন। চা, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি জলপান যে নিতান্তই শৌখিন এবং খাদ্যমূল্যের দিক দিয়া চিডা, মুডি, নারিকেল, গুড প্রভৃতির মূল্য যে খুব বেশি ইহা তিনি বারবার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নামে অযথা বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। একাধিক প্রবন্ধে তিনি বাঙালী সমাজকে শ্রমশীল এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশে অবাঙালীরা অনেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এবং কাজ যে একচেটিয়া করিয়া লইতেছে দেখিয়া তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র চাকুরির দিকে না তাকাইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ করিতে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী যুবকবৃন্দকে উপদেশ দেন—বাস্তবিক পক্ষে এই পথেই বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে এই জ্ঞানতপস্বী, স্বদেশানুরাগী, ছাত্রপ্রেমিক কর্মব্রতীর জীবনাবসান হয়

রাণী ভবানী

সংকেত ঃ—ভূমিকা—দরিদ্র গৃহে জন্ম—পরবর্তী কালে অর্ধবঙ্গেশ্বরী—নিজে সন্ন্যাসিনী থাকিয়া বিশাল জমিদারির আয় নানা কল্যাণকর্মে দান—রাণী ভবানীর দান ও পুণ্যকর্মের বিবরণ—বৈষয়িক ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারেও মনোযোগী—সিরাজউদ্দৌলা ও রাণী ভবানী—রাণীর জনপ্রিয়তা—উপসংহার।

ভারত মহিলা চিরদিনই ধর্মশীলতার জন্য বিখ্যাত। ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ জাতি। বিশেষ করিয়া এদেশের রমণীবৃন্দ ধর্মব্রত উদ্‌যাপনে চিরদিনই অগ্রণী। গৃহের প্রতিটি কল্যাণকর্মেও যেমন, দানব্রত ও পুণ্যকর্মেও তেমনই ভারতের নারী যুগ যুগ ধরিয়া আত্মদান করিয়া আসিতেছেন। নারীর কল্যাণী মূর্তির কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের পূজার্হা এবং গৃহের দীপ্তি স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ভারতের মহিলাবৃন্দ দান ও সেবাকার্যে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান যুগেও এমন অনেক নারীর পরিচয় আমরা পাই যাঁহারা কল্যাণকর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। এই পুণ্যশ্লোকা মহিলাদের মধ্যে রাণী ভবানীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে হয়।

ভবানী পরে রাণী হইলেও দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতা কস্তুরী দেবী,—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া নাটোরের রাজা রামজীবন কনিষ্ঠ পুত্র রামকান্তের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ঘরে আনেন।

নাটোরের রাজবংশ বাংলার একটি প্রখ্যাত বংশ। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে বৈধব্য-কবলিত ভবানীর উপর যখন জমিদারির ভার পড়িল তখন ইহার আয় ছিল বার্ষিক প্রায় দেড় কোটি টাকা। রাণী ভবানী কর্মচারীদের সহায়তা লইয়া নিজেই এই জমিদারির শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

রাণী ভবানীর মতো দানশীলা মহিলা অতি অল্পই আছেন। জমিদারির

বিপুল আয়ের মধ্যে সত্তর লক্ষ টাকা নবাব সরকারে প্রেরণ করিয়া তিনি অবশিষ্ট সমস্ত অর্থই ধর্মকার্যে ও সাধারণের মঙ্গলকর্মে ব্যয় করিতেন। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়াও তিনি নিজে কঠোর ব্রতাচরণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর মতো থাকিতেন।

রাণী ভবানী যে কত পুণ্যকর্ম ও জনহিতকর কার্য করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। বারাণসীতে তিনি ভবানীশ্বর নামক শিবমূর্তি স্থাপন করেন—বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ি ও দুর্গাকুণ্ডও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গা-কুণ্ডের অদূরে কুরুক্ষেত্রতলায় যে জলাশয় আছে, এটিও তিনি খনন করান। ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য বিভিন্ন ছত্র, ভাস্কর পুষ্করতীর্থে পুষ্করিণী খনন, পিশাচ-মোচন তীর্থে পুষ্করিণী খনন, আদি কেশবের ঘাটে মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ, পঞ্চকোশীর পথ নির্মাণ ও তাহার পাশে পাশে স্থানে স্থানে ধর্মশালা স্থাপন প্রভৃতি অসংখ্য কার্য তাঁহার কীর্তি। তিনি অনেক সময় বর্তমান আজিমগঞ্জের নিকটবর্তী বড়নগর নামক স্থানে বাস করিতেন। এইস্থানে অনেকগুলি ছোটো ছোটো মন্দির আছে। এখানে ভবানীশ্বর শিবমন্দির, রাজরাজেশ্বরী মূর্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ইহাকে দ্বিতীয় কাশীধাম করিয়া তোলেন।—তাঁহার কন্যা তারাও এই স্থানে গোপালমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রাণী ভবানী যে কেবল দেবসেবার ব্যবস্থা বা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন তাহা নয়। তিনি বহু দরিদ্র ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিষ্কর জমির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণ দুঃস্থ মানুষের জন্যও তাঁহার সমবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি কবিরাজ বা হাকিম নিযুক্ত করিয়া দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি পশুপক্ষীদের আহারাদির জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় যখন বাংলাদেশের দুর্গতির সীমা ছিল না তখন তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়া দুঃস্থদের সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অপরিসীম করুণার জন্য অগণিত নরনারী তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিত। তিনি যে অর্থ, ভূমিদান বা পুণ্যকার্যে ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হইবে না। তাঁহার দানশীলতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য তাঁহাকে অনেকে বাংলাদেশের অহল্যাবাঈ বলিয়া থাকেন।

রাণী ভবানী অহল্যাবাঈয়ের মতোই একদিকে যেমন ধর্মনিষ্ঠ ও

দানশীলতায় সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ছিলেন অপর দিকে তেমনই বৈষয়িক কার্য পরিচালনার দিকেও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার শাসনগুণে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার অধিকারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার স্বদেশপ্রেমও ছিল অসাধারণ। কথিত আছে যে, মীরজাফর, রাজবল্লভ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যখন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজদের আহ্বান করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা রাণী ভবানীকে আহ্বান করিলে তিনি তাঁহাদের আচরণের জন্য নিন্দা করেন। তাঁহার শাসনে প্রজাগণ এতদূর সন্তুষ্ট ছিল যে, হেষ্টিংস যখন তাঁহার জমিদারির কিছু অংশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া কান্তবাবুকে প্রদান করেন, তখন প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া নূতন ভূস্বামীকে কর দান করিতে অস্বীকার করে।

রাণী ভবানীর পুত্রসন্তান ছিল না। যশোহর জেলার খাজুরা গ্রামের রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তাঁহার কন্যা তারার বিবাহ হয়। কিন্তু অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া তারা মাতার সহিত থাকিয়া তাঁহার ধর্মসাধনার সঙ্গিনী হন। ভবানী যে লোকটিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন তিনিই সাধক মহারাজ রামকৃষ্ণ। তিনি মাতার জীবৎকালেই লোকান্তরিত হন। ঊনআশি বৎসর বয়সে বড়নগর গ্রামে রাণী ভবানী পরলোক গমন করেন।

মহাত্মা গান্ধী

"মহাত্মা তিনিই—সকলের সুখ-দুঃখ যিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলিয়াই জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁহার স্থান, তাঁহার হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালবাসা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাকে আমরা মোটের উপর এই বলিয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি হৃদয় দিয়া সকলকে ভালোবাসিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে সার্থক হইয়াছে। গান্ধীজীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা প্রেম। ইহারই প্রেরণায় তিনি আঘাতের জন্য ফিরিয়া আঘাত করিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই—অথচ আপনার সুদৃঢ় বিশ্বাসও পরিত্যাগ করেন নাই। ভারতের জনগণের জন্য যখন তাঁহার চিত্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তিনি যখন তাহাদের দুঃখ দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকার তখন তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার জন্য তিনি ইংরেজকে ঘৃণা করিতে বা প্রতিঘাত দিতে নিষেধ করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁহাকে অকথ্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল—কিন্তু তিনি অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার আদর্শ যে সম্ভবপর তাহা প্রমাণিত করিতে তিনিই একমাত্র উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালিত আন্দোলন যখনই অহিংসার সীমা পার হইবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন।

গান্ধীজী তাঁহার জীবনকেই তাঁহার বাণী বলিয়াছেন। তিনি যে আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন তাহাকে তিনি সত্যানুসন্ধান বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি সর্বত্র সত্যের সাধনা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁহার প্রায় আশী বছরের জীবন সত্যান্বেষীরই জীবন।

কাথিয়াওয়াড়ে—গুজরাটের পোরবন্দরে একটি জৈন পরিবারে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাবা গান্ধী, মাতার নাম পুত্তলিবাঈ। জৈন পরিবারের সন্তান হওয়ায় অহিংসার আদর্শ তাঁহার মজ্জাগত ছিল। তিনি পিতার নিকট হইতে ধৈর্য ও মাতার নিকট হইতে ধর্মপরায়ণতা লাভ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর আত্মকথা হইতে তাঁহার শৈশব ও বাল্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে সত্যের জন্য তাঁহাকে কীভাবে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং কীভাবে নানা প্রলোভনে পড়িয়াও তিনি পরিশেষে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি।

তাঁহার দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবস্থান কালে ইংরেজরা ভারতীয় ও আফ্রিকার

কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল—আইন করিয়া কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার হরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। গান্ধীজী শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া আন্দোলন করেন—অথচ তিনি হিংসার পথ গ্রহণ করেন নাই। অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই গান্ধীজী বুয়র যুদ্ধে আহত বৃটিশ পক্ষের সৈনিকদের শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার সত্যাগ্রহের আদর্শ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপই পাল্টাইয়া দিল। অত্যাচারের প্রতিবাদে চম্পারণ সত্যাগ্রহ, রাউলাট বিলের প্রতিবাদে হরতাল, খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ নীতি গ্রহণ, বিলাতী বর্জন প্রভৃতি নানা আন্দোলন করিয়া তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে জনতার মধ্যে বিস্তারিত করিয়া উহাকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে আইন অমান্য আন্দোলন করেন তাহা সমগ্র ভারতকে জাগ্রত করিয়া তুলে—১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট 'ভারত ছাড়' বলিয়া তিনি ইংরেজকে যে চরম পত্র দেন তাহাতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য বিলাতী বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশী পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়াসী হন। শ্রম ও আত্মনির্ভরতার প্রতীকস্বরূপ তিনি চরকার প্রবর্তন করেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তিনি সারাজীবন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ভাঙ্গি পল্লীতে তিনি আপনার আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশে যখনই কোনো বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, তখনই পাপের আবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া পাপমোচনের জন্য তিনি যে অনশন করিয়াছেন তাহা অভিনব ব্যাপার। সর্বধর্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল—প্রার্থনাসভায় তিনি গীতা-উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে কোরানও পাঠ করিতেন। রামায়ণের রামরাজ্য ছিল তাঁহার স্বপ্নের ধন—তাঁহার জীবনের শেষ দুটি শব্দ 'হা রাম'।

সংকেত সূত্র

ঝাঁসীর রাণী

১। স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র গ্রহণ ও তৎপক্ষে রাজ্যশাসন—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রথম স্বাধীন মনের পরিচয়। প্রথম জীবনের কথা।

২। ইংরাজ রেসিডেন্টের সহিত সংঘর্ষ—সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদান—বাহুবলে হস্তচ্যুত ঝাঁসীর পুনরুদ্ধার।

৩। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহ—ইংরাজের সহিত পুনর্বায় যুদ্ধ—অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন।

৪। ভারতের বীরাঙ্গনার একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

কোনো এক আদর্শ ভারতীয় নারীর জীবনী

(সরোজিনী নাইডু)

১। জন্মস্থান—হায়দ্রাবাদ : পিতার নাম, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—পুরাপুরি বাঙালী : প্রথম শিক্ষা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে লণ্ডনে ও কেম্ব্রিজে।

২। স্বামী ডাঃ এম্. জি. নাইডু,—সংস্কারমুক্ত পিতার সংস্কারমুক্তা কন্যা।

৩। বিলাতফেরত নারীর শান্ত গার্হস্থ্য জীবন যাপন। চর্চার বিষয় কাব্য (স্ব-প্রণীত ৩ খানি ইংরাজী কবিতা পুস্তক) ও দেশের প্রয়োজনে রাজনীতি।

৪। মধ্যবয়সে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ। বাগ্মিতা ও বিজ্ঞতা সর্বজন-প্রশংসিত। ১৯২৫ সালে অর্থাৎ ৪৬ বৎসর বয়সে কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিতা ; ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান ; ১৯৩২, ১৯৪০, ১৯৪২-এ কারাবরণ , ১৯৪৭-এ স্বাধীন ভারতে উত্তরপ্রদেশের গভর্ণরপদ গ্রহণ—ভারতের প্রথম মহিলা গভর্ণর,—বাংলার প্রথম মহিলা-গভর্ণর তাঁরই কন্যা পদ্মজা নাইডু

৫। চরিত্রে বিভিন্ন গুণের সমন্বয়েই তিনি আদর্শ ভারতীয় নারী।

কোন বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক (নেহরু)

১। ব্যক্তিজীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমান সাফল্যের অধিকারী এক অসাধারণ পুরুষ।

২। নায়কত্বের বৈশিষ্ট্য—ভারত-রাষ্ট্রের গঠনে ও তাহার স্বকীয়তা রক্ষায় আজীবন সেবা এবং নায়কত্ব পাইয়াও সেই সেবার মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখা।

৩। একাধারে দেশকর্মী, জননায়ক, রাজনীতিক ও দার্শনিক। পঞ্চশীলের একনিষ্ঠ প্রচারক।

৪। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা :—শান্তির দূত ; বান্দুং কন্‌ফারেন্স—চীনের সমস্যা—পাকিস্তানের সমস্যা—অন্তর্দেশীয় বিবিধ জটিল সমস্যায় অটল

৫। বৈদেশিক মৈত্রী-সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কোন বিখ্যাত নাট্যকার (শেক্‌সপীয়র)

১। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার (১৫৬৪-১৬১৬), জন্ম এভন্ নদার ধারে ষ্ট্র্যাট্‌ ফোর্ড গ্রামে। দরিদ্র জীবন।

২। বিশবৎসরে নাটক লেখেন ছত্রিশটি, মোট নাটক ৩৮ খানি, শেষ নাটক 'টেম্পেষ্ট'।

৩। ট্রাজেডি, কমেডি ও ঐতিহাসিক নাটকে সমান সিদ্ধহস্ত জগতে আর দ্বিতীয় কোনো নাট্যকার নাই। প্রতি শ্রেণীর কয়েকখানি নামকরা নাটক ও তাহাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ।

৪। একাধারে নাট্যকার, কবি, দার্শনিক ও মানবদরদী।

৫। নাটকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য বা আত্মমত প্রচার না থাকাই তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

বাংলার কোন জনপ্রিয় নেতা (শ্যামাপ্রসাদ)

১। বীর পিতার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ স্যার আশুতোষের বহু পুরুষোচিত গুণের উত্তরাধিকারী।

২। শিক্ষাজীবন—কলিকাতায় এম. এ. ও ল., ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী।

৩। কর্মজীবন—মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে ভাইস-চ্যান্সেলার ; বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য—পদত্যাগ— পুনর্নির্বাচন—বাংলার সেবায় প্রগাঢ় নিষ্ঠা— বাগ্মিতা, বিচার শক্তি ও স্বাদেশিকতায় দেশবাসী মুগ্ধ। হিন্দু-বিদ্বেষী লীগের প্রতিরোধ-কামনায় "হিন্দুমহাসভা" গঠন। হক্-মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব—অন্যায়ের প্রতিবাদে পদে ইস্তফা। ১৯৪৬-এ লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও ভারতবিভাগ-ক্ষেত্রে বীর শ্যামাপ্রসাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মধ্যে অন্যতম। কংগ্রেসে যোগদান—নেহরু-লিয়াকৎ 'চুক্তি'র ফলে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। বাস্তুহারা সমস্যায় বুক পাতিয়া দেন—গঠিত হয় 'জনসঙ্ঘ'। কাশ্মীর-সমস্যায় আত্মনিয়োগ—নিশাতবাগে রহস্যজনকভাবে জীবনের অবসান।

৪। বাংলার প্রাণ শ্যামাপ্রসাদ।

———

(ঙ) বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

১। বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা
২। বিজ্ঞান কি অভিশাপ ?
৩। সাহিত্যশিক্ষা বনাম বিজ্ঞানশিক্ষা
৪। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দান
৫। আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি
৬। প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ
৭। শিক্ষাবিস্তারে বেতার-বার্তা
৮। শিক্ষাবিস্তারে বিজ্ঞানের অবদান

সংকেত সূত্র

১। আধুনিক যন্ত্রযুগ
২। বিজ্ঞান ও কৃষি
৩। দেশোন্নয়নে বিদ্যুতের স্থান
৪। বেতার ও টেলিভিশান
৫। বিজ্ঞান ও আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ

বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা

সংকেত ঃ—অগ্নির আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা—সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ—শিল্প-বিপ্লব—প্রাচীন ব্যবস্থার লোপ—আণবিক অস্ত্রের দানবীয় শক্তি—রোগমুক্তির অমৃত—বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুভ হোক—মানব-সভ্যতা সমৃদ্ধ হোক।

মানব জগতের ইতিহাসে এক অমৃতক্ষণের অপূর্বতাকে নিয়ে অগ্নির আবির্ভাব। জগৎ ও জীবনের নব নব রহস্যের উন্মোচনে মানব-সভ্যতার ইতিহাস সেই জন্মক্ষণকে প্রতিমুহূর্তেই বিকশিত করছে। আর তারই প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিতে সমস্ত মানব-সভ্যতা শুধু পরিবর্তিতই নয়, বিবর্তনের অগ্ররূপতায় নিজেকে স্পন্দিত করছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে বাঁকে বহু মানুষের উদগ্রকামনার আত্মাহুতি, বহু মানুষের প্রাণদানের শেষ উল্লাসধ্বনি স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু মানুষের মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা-পীড়িত আর্তনাদকে অতিক্রম করেও বিজ্ঞান তার জয়পতাকা বহু উচ্চে উড্ডীন করেছে। সেই বিশাল অনন্ত আকাশ-তলে বিজ্ঞানের পতাকার স্থান নিঃসন্দেহে নিজ গরিমায় দীপ্ত। সভ্যতার ইতিহাসে তাই পাতায় পাতায় বিজ্ঞানের জয়গান।

আগুনের আবিষ্কার যেমন একদিন আদিম মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এনেছিল আলোড়ন—ঠিক সেই আলোড়নের আনন্দধ্বনিতে সমগ্র মানবজাতি নিজেদের চকিত করলো শিল্প-বিপ্লবের জন্মমুহূর্তে। বিজ্ঞানের এই নূতনতর উদ্ভাবনার কথা নিঃসন্দেহেই এই জন্যই স্মরণযোগ্য যে, সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এরকম বিপ্লব দ্বিতীয়-রহিত। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সমস্ত ক্ষেত্রেই এক বিরাট পরিবর্তনের সূত্র টেনে আনলো এই বিপ্লব। এমন কি, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তরকে ভেঙ্গে চুরমার করে নতুনতর মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো মানুষের জীবন। আধুনিক মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ ও জীবন সত্যের বিস্তৃততর ভূমিকায় একক মানুষের জিজ্ঞাসাকে বিজ্ঞান-অন্বিত বলেই মনে করতে হয়।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তার বিবর্তনের প্রতিটি স্তরের বিশ্লেষণ যেমন সম্ভব নয়—তেমনি সেই গঠনমূলক ভূমিকায় বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়নও অসম্ভব। মৃত্যুর একান্ত নিকটে বসে তার শীতলতার কথা ভাবতে ভাবতেও হয়ত মানুষ ফিরে পেয়েছে জীবনের উষ্ণতাকে—জীবনকে

ভালোবাসবার স্বপ্নকে। যে শক্তিবলে মানব-সভ্যতার এই মৃত্যুঞ্জয়ী মানবদরদী রূপলাভ, সে তো বিজ্ঞানেরই অবদান—বিজ্ঞানের মহত্ত্ব সেইখানেই। নিত্যনূতন আবিষ্কারে মানুষেরই সেবা ক'রে বিজ্ঞান যেন হাতে ক'রে মানুষকে শিখিয়েছে সমাজসেবা, করেছে তাকে সেবা-সুন্দর-সভ্যতার অধিকারী। বিজ্ঞানই ভেঙেছে মানুষের কূপমণ্ডুকতা, ভেঙেছে গণ্ডিবদ্ধ সভ্যতা-রচনার উৎকট গোঁড়ামি, জাগিয়েছে বিশ্বমানবতাবোধ। বিজ্ঞানের হাত ধরে এগিয়ে চলাতেই মানব-সভ্যতায় এসেছে ঔদার্য, জেগেছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষ মানবপ্রীতি। রুচি হয়েছে সভ্য, শিষ্ট, মার্জিত, সুন্দর।

কিন্তু একথাও অস্বীকার করা চল্‌বে না যে, এই বিজ্ঞানেরই প্রসাদে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস রাজনৈতিক কূটচক্রজালে হয়েছে আবদ্ধ। বিজ্ঞানের নবীনতর অস্ত্রের উদ্ভাবনে সদম্ভে চক্রান্তকারীরা স্বার্থ রক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্কিত সভ্যতার রূপ। জগতের সভ্যতম জাতিগুলির হাতে নরহত্যার যে ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে, তাতে জীবনের প্রতি মমতা ঘুচে যায় ও আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। আজ তাই সমগ্র পৃথিবীর বুকে এই দুইটি যুদ্ধের তাণ্ডব ফ্রাঙ্কাস্টাইনের মতো আতঙ্ক ঝুলিয়ে রেখেছে প্রতিটি মানুষের মনে। আধুনিক মানবমনে এক তীব্র বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এই বিশ্বযুদ্ধ। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক মানবের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক পটভূমিকায় বিজ্ঞানের এই অপকীর্তির ইতিহাস জাগিয়ে রেখেছে একটা কালো নৈরাশ্যবাদ।

তবে কি মানব-সভ্যতার ক্ষেত্র থেকে বিজ্ঞান বিতাড়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়? মানুষ কি ফিরে যাবে সেই চকমকি-জ্বালা অনুন্নত যুগে। হাজার বছরের স্তূপীকৃত অমূল্য সম্পদ বিসর্জন দেবে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে? তাও কি হয়? বরং বিসর্জন দিতে হবে মানুষেরই মনোবিকার যার ফলে আশীর্বাদ হয়েছে অভিশাপে রূপান্তরিত। ভরসা কবি, একদিন যে-বিজ্ঞান সভ্যতার বিবর্তনকে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিজেই হাতে তুলে নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই নব নব পরিকল্পনার ঐতিহ্যে ও আবিষ্কারের নিত্যনূতন সম্ভারে একটি বিশেষ শিল্পীর দায়িত্বই বহন করবে। তাই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়ে সে যে একটি নিপুণ জীবনের ছবি এঁকে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। আর এ আশাও

বোধ হয় অন্যায় নয়, একদিন যেমন আমরা গাছের বাকল থেকে অংশুকের ক্রমোন্নতিতে আরোহণ করতে পেরেছি—তেমনি বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান নিয়ে হয়ত একদিন সমস্ত জীবন ও জগতে সত্যকে নির্বিকল্প দৃষ্টিতে দেখতে পারবো—সেই দেখার দৃষ্টিই প্রকৃত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এবং সেই দৃষ্টিকোণেই সমগ্র মানব-সভ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন।

বিজ্ঞান কি অভিশাপ ?

সংকেত ঃ—মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা—জনকল্যাণে বিজ্ঞানের আবিষ্কার—মানুষের অসাধু বুদ্ধির কাজ।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ব্যোমপথে বিমানযোগে বোমাবর্ষণে যেভাবে বহু দেশে অগণিত নিরপরাধ নরনারীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, বিষাক্ত গ্যাসপ্রয়োগে জীবনহানির আশঙ্কা দেখা গিয়াছে, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে মানব-সভ্যতার কীর্তিগুলি একে একে বিধ্বস্ত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সভ্যতাভিমানী শক্তিশালী জাতিগুলি যেভাবে দুর্বল জাতিগুলির উপর হিংস্র অভিযান চালাইয়াছে, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণ করিয়া কয়েক লক্ষ নির্দোষ নরনারীকে যেরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে, আর সাম্প্রতিককালে উহা অপেক্ষা আরও ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক বোমা বিস্ফোরণের যে মহড়া চলিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে মানুষের মনে এই প্রশ্নই জাগে—বিজ্ঞান কি অভিপাপ ? যুদ্ধ মিটিবার পরও আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে পরীক্ষা চলিতেছে, আপনার একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সহায়তা লইয়া যেভাবে নিত্যনূতন মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া চলিতেছে তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ এই সন্দেহ আমাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিবেই।

বিজ্ঞান আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের দান রহিয়াছে। মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তায় বহু প্রকার যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে পারিয়াছে। সামান্য

দেশলাই হইতে বিমান পর্যন্ত সবই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইয়াছে—মানুষ এখন অন্য গ্রহে যাইবার আশা করিতেছে। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি তাহার অন্ন ও বস্ত্র উৎপাদনের পরিশ্রম কমাইয়া দিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার মানুষের শক্তিকে বহুগুণে বর্ধিত করিয়া দিয়াছে। এখন সুইচ্ টিপিবামাত্র ঘর আলোকিত হইয়া ওঠে, পাখা বা বেতারযন্ত্র চলে, বড়ো বড়ো কলকারখানা চলিতে এক মুহূর্তও দেরি করে না। মানুষের জ্ঞানের পরিধিও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সুদূর গ্রহ বা নক্ষত্রের খবর হইতে শুরু করিয়া জীবদেহের ভিতরের খবরও তাহার অজ্ঞাত নয়। রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দেহের মধ্যে কোথায় গ্লানি তাহা পরীক্ষা করিবার বহুবিধ ব্যবস্থা বর্তমান। পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন, টেরামাইসিটিন প্রভৃতি ঔষধ আবিষ্কারের ফলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সহজেই নিরাময় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শল্যবিদ্যার উন্নতিও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম দান।

বাইবেলে আছে যে, মানুষ যেদিন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে সেদিন হইতেই তাহার দুঃখের পালা শুরু হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বাইবেলের এই কথাটির তাৎপর্য অনুভব করা যায়। মানুষ তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য এবং হয়তো কল্যাণ সাধনের জন্য কোনো জিনিষ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে সেই আবিষ্কারকেই পরম অকল্যাণকর কাজে লাগানো হইতেছে। পথ পরিষ্কার করিবার জন্য বা কয়লার খনিতে ব্যবহারের জন্য স্যার আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহার আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া মারাত্মক বিস্ফোরক সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষের শারীরিক যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য মর্ফিয়া বা ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু ঐগুলির কত ক্ষতিকর প্রয়োগই না করা হইতেছে। মানুষের চাহিদা মিটাইবার জন্য যন্ত্রের আবিষ্কার করা হইয়াছে। কিন্তু শহরের মধ্যে কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় অগণিত মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই বহুবিধ অকল্যাণজনক ব্যাপারও ঘটিতেছে।

কিন্তু ইহার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করা যায় না। দেশলাইয়ের আবিষ্কার যে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অভাব মিটাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই দেশলাই জ্বালিয়া কেহ যদি ঘরে আগুন দেয় তাহার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করা সঙ্গত হইবে না। অসাধু ব্যবসায়ী যদি খাদ্যদ্রব্যের সহিত কৃত্রিম কোনো উপাদান মিশায়, তাহা হইলে ঐ কৃত্রিম উপাদান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল বলিয়া বিজ্ঞানকে দোষী করা চলে না—ব্যবসায়ীর অসাধুতাই তাহার জন্য দায়ী।

বাস্তবিকপক্ষে কল্যাণ বা অকল্যাণের দায় আমরা যে বিজ্ঞানের উপর চাপাই, তাহা সমীচীন নয়। বিজ্ঞান নিরপেক্ষ বিষয়—মানুষ তাহাকে যেভাবে চালায়, সে সেইভাবে চলে। মানুষের মধ্যে সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি দুই-ই আছে। মানুষ যখন কল্যাণব্রত গ্রহণ করে তখন সে বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করে; আর যখন শয়তানের উপাসনা করে তখন সে বিজ্ঞানকে অকল্যাণের নিদান করিয়া তুলে। বিজ্ঞান মানুষের শক্তিকে বহুগুণিত করিয়াছে এইমাত্র বলা চলে। মানুষের কুবুদ্ধি যতদিন আছে, ততদিন বিজ্ঞান মাঝে মাঝে কুবুদ্ধির যন্ত্রহিসাবে অমঙ্গলই সাধন করিবে। কিন্তু যাঁহারা কল্যাণসাধক, তাঁহারা বিজ্ঞানকে চিরদিনই কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিবেন।

সাহিত্য-শিক্ষা বনাম বিজ্ঞান-শিক্ষা

সংকেত ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সাহিত্যপ্রধান—বর্তমান যুগের শিক্ষা বিজ্ঞান-প্রধান—বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবতা বোধবর্জিত—চিত্তবৃত্তির বিকাশ ও প্রকাশ-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাহিত্যশিক্ষার প্রয়োজন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও শিক্ষা বলিতে প্রধানত সাহিত্য-শিক্ষাই বুঝাইত। এদেশে প্রাচীন বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল—দর্শনের চর্চা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পণ্ডিত করিতেন। ইউরোপেও ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। কেহ কেহ সাহিত্য শিক্ষা করিবার পর ইতিহাস বা দর্শন লইয়া চর্চা করিতেন। অতি অল্প কয়েকজন

লোক বিজ্ঞান লইয়া চর্চা করিতেন। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নিতান্ত অপ্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞান আর কয়েকজন কৌতূহলী ব্যক্তির পাগলামির উপাদান হইয়া নাই—ইহা বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানব-সভ্যতা এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমানে নিত্যনূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন; আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিপদেই বিজ্ঞান একটা অতি-প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এ অবস্থায় বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া শিক্ষার কল্পনা বাস্তববোধের অভাবের পরিচায়ক। বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকিলে এক পাও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। বিজ্ঞানচর্চা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের বহু বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি শিক্ষা গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক। রামধনু কেন হয়; সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের সম্পর্ক কী; শিশির পড়ে কেন; স্টিম ইঞ্জিন বা মোটর গাড়ী কীভাবে চলে; বিদ্যুৎ কীভাবে পাখা চালায় বা আলো জ্বালায়—এই ধরণের সাধারণ বিষয়গুলি-সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে চলিবে না। বিজ্ঞান এতটা উৎকর্ষ ও প্রসার লাভ করিয়াছে যে, ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানকে এড়াইলে আমরা সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ হারাইব।

বিজ্ঞান-শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় হইলেও সাহিত্য শিক্ষারও যে অনুরূপ প্রয়োজন আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্য মানুষের চিত্তকে প্রশস্ততর করিয়া তোলে। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে বলিয়া সাহিত্য তাহার অন্তরকে মহৎ চিন্তায় পরিপূরিত করিতে পারে। ইহা তাহার রুচিকে উন্নত করিয়া তাহাকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করিয়া তোলে। মানুষের হৃদয়ের ভাব ও আবেগগুলি পরিমার্জিত করিয়া সাহিত্য মানবমনে প্রশান্তি ও স্থৈর্য আনয়ন করিতে সক্ষম হয়। তাহা ছাড়া, ইহাতে ভাষার জ্ঞান বর্ধিত হওয়ায় মানুষ আপনাকে আরো ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে। সুতরাং সাহিত্য শিক্ষাও অবশ্য প্রয়োজন।

বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুইটি বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রত্যেকটির বিশিষ্ট গুণ আছে এবং আমরা এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটিকে বাছিয়া লইয়া অপরটিকে এড়াইয়া যাইতে পারি না। নিছক সাহিত্যের চর্চা করিলে কল্পনাপ্রবণ ও বাস্তব-জ্ঞান-বর্জিত হইবার আশঙ্কা আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকার জন্য আমরা আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলি স্বীকার করিয়া লইয়া অধ্যাত্মবাদ বা আদর্শবাদের নামে সব কিছু চাপা দিতে চাহি। অপরপক্ষে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের চর্চায় মানবমনের রসধারা শুকাইয়া যাইতে পারে। তখন আমরা সামঞ্জস্যবোধ হারাইয়া ফেলিয়া অহমিকামত্ত হইয়া উঠিতে পারি। জীবনের রহস্য ও ইহার বহুবিচিত্র রূপের দিকে তখন আর আমাদের দৃষ্টি থাকে না।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য এই দুইটির কোনো একটিকে অবহেলা করিলে চলিবে না। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোর পর্যন্ত দুইটি বিষয়ই সমভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে—তাহা হইলে সাহিত্যপাঠের ফলে যে উদারচিত্ততা, কল্পনাশক্তি, মহত্ত্ববোধ ও রসবোধ সঞ্চারিত হইবে, তাহার সঙ্গে বিজ্ঞানশিক্ষা সংযুক্ত হইয়া শিক্ষার্থীকে জীবন-সচেতন, ঐশ্বর্যসম্পন্ন, তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারী, সৃষ্টিশীল ও আত্মবিশ্বাসী করিয়া তাহার জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, যেখানে বিশেষ বিশেষ বিভাগের শিক্ষা প্রয়োজন সেখানে অবশ্য এই দুইটি বিষয় একসঙ্গে শিক্ষা করা যায় না, বা তাহার প্রয়োজনও নাই।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দান

বিজ্ঞান বলিতে আমরা সাধারণতঃ যন্ত্রবিজ্ঞানই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বিজ্ঞানকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—একটি তাহার বিদ্যাগত দিক, অপরটি তাহার ব্যবহারিক দিক। বিজ্ঞানের দান সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে এই দুইটি দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে।

বিজ্ঞান শব্দের মূল অর্থ বিশেষ জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান। বর্তমানে এই শব্দটির অর্থ অনেকাংশে সংকীর্ণ হইয়াছে। এখন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জৈববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ভেষজবিদ্যা, প্রভৃতিকে

বিজ্ঞান বলা হয়। গণিতকেও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে—গণিতের অন্তর্গত বলবিদ্যা তো আধুনিক যুগের যন্ত্রবিজ্ঞানের মূলে বর্তমান।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের আলোচনা করিয়া মানুষ বিশ্বের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম, তাপের ধর্ম, শব্দের ধর্ম, আলোর ধর্ম, চুম্বক ও তড়িতের ধর্ম সম্পর্কে সে বহু তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। পদার্থকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে সে অণু, ও অণু হইতে পরমাণুতে পৌঁছাইয়াছে। পরমাণুর ধর্ম সম্পর্কে সে যে সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সম্প্রতি পরমাণুকেও বিশ্লেষণ করিয়া প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন আবিষ্কার করিয়া সে একদিকে পদার্থের গঠন সম্পর্কে নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অপরদিকে অসামান্য শক্তির উৎস আবিষ্কার করিয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির মূলে বিজ্ঞানের এই দুইটি শাখার উৎকর্ষ বর্তমান। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রভূত গতিশক্তি লাভ করিয়াছে। সাবেক আমলের গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীর তুলনায় মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, বিমান প্রভৃতির প্রচণ্ড গতির তুলনা করিলে উন্নতির পরিমাপ করা যাইবে। মানুষের শ্রমকে কমাইবার জন্য বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে কল-কারখানায় যে বিপুল শক্তি নিয়োগ করা হয়, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমাদের প্রয়োজনের প্রত্যেকটি সামগ্রী বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রস্তুত হইতেছে। দুধ হইতে যে গায়ের জামা তৈযারি করা যায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহা কল্পনারও অগোচর ছিল। মহাশূন্যে কৃত্রিম চাঁদ প্রেরণ আর অতি সাম্প্রতিক 'গ্যাগারিণ' ও 'টিটভে'র রকেটযোগে মহাকাশ ভ্রমণ বিজ্ঞানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিরই নিদর্শন। ব্যবহারিক বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

জীবদেহ বিশ্লেষণ করিতে করিতে মানুষ অসংখ্য বিস্ময়কর তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছে। জীবদেহ কী বিচিত্র উপাদানে গঠিত, তাহার দেহযন্ত্র যে কীভাবে পরিচালিত হইতেছে, কোনো বিশেষ অবস্থায় তাহার যে কীরূপ প্রতিক্রিয় হয়, বিশ্বের জীবসমাজ যে কীভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষ কিছুটা অবগত হইয়াছে

জীবদেহের সহিত উদ্ভিদের একটা নিকট সম্পর্ক আছে; উদ্ভিদের জীবনও যে জীবের মতোই প্রাণময় এবং তাহার জীবনযাত্রারও যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে ইহা মানুষ জানিতে পারিয়াছে। পৃথিবীর মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া মানুষ পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে নানা বিষয় জানিতে পারিয়াছে; পৃথিবীর গঠনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি রকম জ্ঞানও সে লাভ করিয়াছে। কেবল পৃথিবী নয় অসীম আকাশের গ্রহ-তারকা সম্পর্কেও সে অনেক কিছু জানিতে সক্ষম হইয়াছে। এই বিরাট বিশ্বে পৃথিবীর স্থান যে কোথায় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় তাহাও অজ্ঞাত নাই। মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য বিজ্ঞান আপনার শাখাগুলিকে চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

ভেষজবিদ্যায় জ্ঞানের দিকটা কম নয়, তবে ইহার ব্যবহারিক উপযোগিতাই সবচেয়ে বেশি করিয়া উল্লেখযোগ্য। বাসিলাই, ভাইরাস, কক্কাস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রোগ-বীজাণু আবিষ্কারের পর রোগ-নিরাময়ের জন্য সালফাগোষ্ঠী বা পেনিসিলিনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ঔষধ-উদ্ভাবন এ যুগের ভেষজবিদ্যার অন্যতম কৃতিত্ব। মৃত্যুকে কেহ চিরকালের জন্য প্রতিরোধ করিতে পারে না—তবুও মানুষ আজ প্রায় সর্বপ্রকার রোগের নির্ভরযোগ্য ঔষধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যে-বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণসাধন করিতেছে, সেই বিজ্ঞানকে একদল কূটচক্রী মানব অকল্যাণজনক কার্যে নিয়োগ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অবলম্বন করিয়া যে সব মারণাস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে সেগুলি মানবজাতির মঙ্গলের পরিপন্থী। বন্দুক-কামান হইতে আরম্ভ করিয়া সাবমেরিণ, টর্পেডো, বোমা—সাম্প্রতিক যুগের আণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা,—৫০ মেগাটন বা ১০০ মেগাটন বোমা সবগুলিই মানুষের জীবনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতে হয়, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অবদানও যত অপদানও তত।

আধুনিক যুগে যন্ত্রহ শক্তি

আধুনিক যুগের একটা পরিচায়ক বিশেষণ হ'ল যন্ত্রযুগ। বিজ্ঞানের কল্যাণে জন্ম নিয়েছে এই নূতন যুগ, যদিও এর জন্মতারিখ চিহ্নিত ক'রে রাখার কোনো সহজ উপায় নেই। মানুষের সেবাতেই বিজ্ঞানের জীবনের সার্থকতা, আর সে সেবার অন্যতম পন্থা হ'ল হরেক রকম যন্ত্রের উদ্ভাবন। যন্ত্রযুগ কথাটার বিচিত্র ব্যঞ্জনা থাকাই স্বাভাবিক; উপস্থিত আমরা একে এই ব'লেই বুঝে নিই, যে-যুগে যন্ত্রের বহুল প্রয়োগ সাধারণ জীবনের অঙ্গীভূত সেইটাই যন্ত্রযুগ অভিধা পেতে পারে।

শক্তির নানা শ্রেণীভেদের মধ্যে একটি হ'ল জনশক্তি ও যন্ত্রশক্তি। সেকালে অর্থাৎ যখন বিজ্ঞানের এমন দিগ্বিজয় শুরু হয়নি, তখন শক্তি বলতেই বোঝাতো জনশক্তি, বড় জোর, তার সঙ্গে কিছু পশু-শক্তিও যোগ করে নেওয়া হ'ত। ভুবনেশ্বরের মন্দির-চূড়ায় যে একটা বিপুলায়তন পাথরের পাগড়ী পরানো দেখা যায়, তা যে কয়টি প্রস্তরখণ্ডের সম্মিলনে রচিত, তার প্রত্যেকটি এক একখানি ঘরের মতো—যার ওজন মাথায় ক'রে রাখতে এখনকার দিনের বোধহয় পঞ্চাশজন মানুষের দরকার হয়। কি ক'রে সেগুলিকে অত উঁচুতে তোলা হ'ল, কোথা থেকে কি উপায়েই বা অমন বিশালায়তন অখণ্ড প্রস্তর একত্র সংগ্রহ করা হ'ল, তা এযুগে হয়তো কোনো বিস্ময়ের কথাই নয়। কারণ, এযুগে ক্রেনে ক'রে হাতী তোলা হয় জাহাজের খোল থেকে। কিন্তু সেযুগে? কোথায় ক্রেন, কোথায়ই বা জাহাজ! তবে হাতী ছিলো, আর সঙ্গে ছিলো ঘোড়া-মহিষ-বলদ প্রভৃতি অপরাপর ভারবাহী পশু-শক্তির সংযোগ। কিন্তু 'এঞ্জিন' বলতে যা বোঝায়, তা ছিলো মানুষের বাহুবল অথবা জনশক্তি। কিভাবে যে জনশক্তি ধীরে ধীরে যন্ত্রশক্তিতে রূপান্তরিত ও পরিণত-বিকশিত হয়ে উঠ্‌লো সেই কথাই বিজ্ঞানের প্রাণের কথা।

জনশক্তি দুইভাগে বিভাজ্য, বাহুবল ও বুদ্ধিবল। প্রথমটি আদিম প্রকৃতির স্বহস্ত-বণ্টনে পশুতে মানুষে ভাগ ক'রে পাওয়া। কিন্তু দ্বিতীয়টি একটি অদ্ভুত সম্পদ। প্রকৃতির দান হিসাবে এটাও আদিম হ'তে পারে। কিন্তু এতে দাত্রীর কারসাজির অন্ত নেই,—পশুর বেলা সীমিত, মানুষের বেলা নিঃসীম। মানুষ যত ইচ্ছা বুদ্ধিবল বাড়াতে পারে। কার্যসিদ্ধির উপায়

বা কৌশল আবিষ্কারের জন্য যে উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হয়, মানুষের মস্তিষ্কে তার অফুরন্ত জোগান চলে আসছে সেই প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগ থেকে। এই উদ্ভাবনী শক্তির প্রযুক্তিবিদ্যাই হ'ল বিজ্ঞান। এ শক্তি অনন্ত, অনন্ত এর সম্ভাবনা ; আর এই সম্ভাবনারই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত মানুষ ক্রমাগত যে নব নব শক্তির অধীশ্বর হয়ে চলেছে তারই পরিচায়করূপে মানুষের এই বৈজ্ঞানিক যাত্রাপথের দু'ধারে স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্‌ছে অজস্র রকমের যন্ত্র। যেখানে যন্ত্রেই কার্যসিদ্ধি, সেখানে মানুষ কেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে যাবে? শুধু তাই নয়, দশজন মানুষের তিনদিনের কাজ যদি একটি যন্ত্রের সাহায্যে তিন ঘণ্টায় সম্পন্ন হয় নিয়মিত, সুশৃঙ্খল, নিশ্চিন্তভাবে, তবে কেন অকারণ ঐ দশজনের ঠেলা সামলানো? কেন ঐ যন্ত্রটির উপর ভার দিয়ে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে না? এইভাবেই দিনের পর দিন যন্ত্রশক্তি এসে জনশক্তিকে ছুটি দিয়ে নিজে আসর জমিয়ে বসেছে।

আধুনিক যুগ মানবসভ্যতার অতি দ্রুত অগ্রসরের যুগ। বিজ্ঞান-সহায় বলেই তার এই অতিদ্রুততা। শক্তির কী অদ্ভুত রহস্য-কুঞ্চিকাই না বিজ্ঞানের হস্তগত। যেখানে সেখানে দু'টি-চারটি মোড়া দিয়েই সে বার ক'রে নিয়ে আসছে বিপুল শক্তিভাণ্ডার, আর তাই দিয়ে সভ্যতার চেহারাটাকে গড়ছে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করে। দু'টি পশুর পশ্চাদ্ভাগে খাড়া দাঁড়িয়ে খর-রৌদ্রে মানুষ গলদ্‌ঘর্ম হয়েই যদি মাসের পর মাস কাটালো দু'টি ধান বা গম ফলাবার জন্য তবে আর সভ্যতা কিসের? যেদেশে এমন কঠিন পরিশ্রমী মানুষ কম, সেদেশে খাদ্যও কম, শক্তিও কম। কেন? কিসের জন্য এই দুর্বলতা স্বীকার? বিজ্ঞান এসে হাতে তুলে দিল ট্রাক্টর। যন্ত্রশক্তিতে হ'ল চাষ, ফললো খাদ্য, বাড়লো শক্তি। আকাশে জল নেই, মাটিও কঠিন, কোথা থেকে রসের যোগান হবে? জনশক্তি এখানে কতটুকুই বা সুরাহা করতে পারে? কিন্তু কাছে হোক, দূরে হোক একটি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক প্ল্যান্ট বসিয়ে হাজার হাজার একর জমি জলসিক্ত ক'রে রাখা যায়। অধিকন্তু সেই একটি যন্ত্রই যোগাবে শক্তি—বন্যা-নিয়ন্ত্রণে, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহ-যোগে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগঠনে, জমির ক্ষয়নিবারণে, এমন কি বনসংরক্ষণে। গরুর গাড়ী বা পানসী নৌকার যুগ চলে গেছে, এখন রেল-মোটর-স্টীমার-বিমানের যুগ ; লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে কাজ করার দিন এ নয়, এ হ'ল

টেলিগ্রাফ-ওয়্যারলেস-বেতার-টেলিভিশানের দিন। চাষের কাজে, পরিবহণে, সংবাদ আদান-প্রদানে, শিল্প-কারখানায় তো কথাই নেই, শক্তি-সংগ্রহের যতকিছু উৎস সর্বত্রই আজ যন্ত্রের প্রচলন। শক্তিমানেরা সবাই আজ যন্ত্র-সহায়। যেখানে অপর সবাই এই যন্ত্রশক্তির সহায়ে শক্তির বহর বাড়িয়ে চলেছে দ্রুততর তালে, সেখানে তো যন্ত্রকে বাদ দিয়ে দুর্বল হয়ে টিঁকে থাকার উপায় নেই। তাই আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি।

সভ্যতা শুধু সৃষ্টি বা সংগ্রহই করে না, তাকে বিনাশও করতে হয়। বাঞ্ছিতের সৃষ্টি ও অবাঞ্ছিতের বিনাশ এই তার কাজ। যন্ত্র এই উভয় কাজেই সভ্যতার সহায়। যন্ত্রই এযুগের "শিব ও রুদ্র, রক্ষক ও সংহারক"। কোটি কোটি লোককে মারাত্মক রোগের বীজাণু-আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে; কি ক'রে ধরা যাবে দেহের মধ্যে সে আক্রমণ শুরু হয়েছে কি না? একটি 'এক্স-রে' যন্ত্র মাত্র কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে শত শত লোকের পরীক্ষা ক'রে সব ব'লে দিল। রক্ষা পেল তারা উপযুক্ত বিধান মেনে। এ হ'ল যন্ত্রের শিবশক্তি বা রক্ষকমূর্তি। আবার, বিপজ্জনক ইমারতখানিকে যখন 'ডিনামাইট্' দিয়ে ফাটিয়ে ফেলা হয় অবাঞ্ছিত ব'লে, তখন পাওয়া যায় যন্ত্রের রুদ্র-শক্তি বা সংহারক মূর্তি। আধুনিকযুগে সভ্যতাকে এগুতে হয় অজস্র ভাঙা-গড়ার মধ্যে, আর সেই ভাঙন ও গড়ন উভয় কাজেই যন্ত্রই হ'ল শক্তি। যদি যুদ্ধ এযুগে অপরিহার্যই হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই আত্ম-রক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত থাকতে হবে, আর থাকতে হ'লেই চাই যন্ত্র-শক্তির অনুশীলন। শক্তিহীনের কোনো স্থান নেই এজগতে, আর সে-শক্তি যখন বর্তমানে যন্ত্র-নিহিত, তখন সেই যন্ত্রশক্তিই আয়ত্ত করতে হবে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ

বর্তমানে মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রাত্যহিক অবদান পরিমাপ করবার সহজতম পন্থা হ'ল বিজ্ঞান ব্যতিরেকে আমরা কতটুকু কি করি তারই একটা হিসাব নেওয়া। বাস্তবিক, ভেবে দেখলে, গোটা মানব-সভ্যতার ইতিহাস বিজ্ঞানেরই দানশীলতার ইতিহাস। আজ আমাদের বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে

এক পাও চলবার জো নেই। যতই কালস্রোত বয়ে চলেছে সামনের দিকে ততই বিজ্ঞানের কাছে আমরা নিজেদের আরো বেশি ক'রে সঁপে দিচ্ছি। অথচ একদিন আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা আদিমযুগে প্রকৃতির খামখেয়ালী কোল-নাড়ায় দুলতেন অসহায় শিশুর মত। তখন এই বিজ্ঞান কোথায় ছিল ?

তারপর ক্রমবিবর্তনের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে পার হয়েছে কত কত যুগের সুদীর্ঘ পথ, আর সেই পথেরই বাঁকে-বাঁকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন বিজ্ঞান। এই বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এত বিস্ময়কর, এত বিপুল ও ব্যাপকরূপে দেখা দিয়েছে যে, সম্পূর্ণ বিবৃতি দিতে যাওয়া অন্তহীন আকাশের অসংখ্য তারাগুলোকে গুণবার মতই এক অসাধ্য প্রচেষ্টা।

ঘুমঘুম চোখেই শোনা যায় ট্রাম চলাচলের সোঁ সোঁ শব্দ। কিন্তু রোজই যে ঠিক সাড়ে-চারটেয় ঘুম ছুটে যায়, আশ্চর্য নয় কি ? আশ্চর্য হ'লেও ভেল্‌কি নয়, কারণ এর ভার দেওয়া আছে এ্যালার্ম টাইমপিস্‌টার ওপর। এ্যালার্ম থামলেই ট্রামের আওয়াজ, আর তারই পিঠ্‌পিঠ্‌ স্টেটবাসের আকাশ-বাতাস কাঁপানো ব্রেক্ কষার এক যান্ত্রিক আর্তনাদে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে হয় একেবারে। এই ট্রাম আর বাস যেন বিজ্ঞানেরই দেওয়া দু'খানা পা, যার অভাবে আজ নিজেকে খঞ্জ মনে হয়। যাক্, এ দুটোরই সাড়া পাওয়া গেল, বোঝা গেল পা-দু'খানাই আছে। দৈনিক জীবনটা চালু। এরপর চাই হীটারে (heater) করা বেড্‌টি রেডিওর টাইম সিগন্যালের সঙ্গে সঙ্গে। চাই সংবাদ-পত্র—ঝর্‌ঝরে লাইনো টাইপে-ছাপা, ওয়ান্টার প্রেসে যা ঘণ্টায় বাহাত্তর হাজার ক'রে বেরিয়ে আসছে। বইপত্র-ঝর্ণা-কলমের কথা ছেড়েই দিলাম, যদিও প্রত্যেকটাই আজ বেরিয়ে আসছে বিজ্ঞানের কল্যাণী স্পর্শ মেখে।

শোনা যায় পাম্প-এর আওয়াজ, সে লেগে আছে বাথ্‌রুমে জল-তোলার কাজে, সেখানে যাতে ঝর্ণাকলে স্নানের আরামে ব্যাঘাত না হয়। প্রাত্যহিক রান্নাবান্নার জন্য ইলেকট্রিক ওভেনের শরণাপন্ন হ'তে হয় অনেককে। গ্যাসের উনুন তো অনেক বাড়িতেই জ্বলছে। না হ'লেও, যে কালো-মাণিক আজ ঘরে ঘরে চোখ রাঙিয়ে রান্না করে দিচ্ছেন তিনিও যে বিজ্ঞানের একটি উপহার তা কি ভুলতে পারি! পরিধেয় বস্ত্রাদি সাদা-ঝক্‌ঝকে ইলেকট্রিক ইস্ত্রীর সাহায্যে ঘষে নেওয়া যায়, এতে পরিশ্রমও কম হয়, দাগ লাগবারও ভয় থাকে না। রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলে কাঁচা মাছ-মাংস ও অন্যান্য খাদ্যের সজীবতা

দীর্ঘসময় বজায় থাকে। আবার থার্মোফ্লাস্কে ভরে রাখা গরম চা, দুধ বা কফির উষ্ণতা যে কী করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অটুট থাকে তাও কম বিস্ময়কর নয়। গরমে বা ক্লান্তিতে আরাম দিতে প্রয়োজনমত চালাও সিলিং ফ্যান কিংবা টেবিলফ্যান। শহরকেন্দ্রিক জীবনের মুখ্যতম প্রতীক ইলেকট্রিক লাইটের উপযোগিতার কথা আর মুখে নাই বললাম!

বিজ্ঞানের অবদানগুলি বিত্তশালী ব্যক্তিরাই পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে। যার অর্থসম্পদের প্রাচুর্য সে বেশি ক'রে বিজ্ঞান-নির্ভর হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের দানে সে প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্ ঘরে বাস ক'রে। কষ্ট ক'রে সিঁড়ি ভেঙ্গে তলার পর তলা তাকে উঠতে হয় না, লিফ্‌টের সুইচ্ টিপেই সে কার্যসিদ্ধি। মার্কিনী ধনীদের তো একেবারে ঘরে ঘরে টেলিভিশন পর্যন্ত রয়েছে!

টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি অবিস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি নরনারীর কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রিক ট্রেনে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করার সুখ-সুবিধাটুকু ভোগ ক'রে আজ হাজার হাজার যাত্রী ভুলে যায় তাদের এই নবতর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য বিজ্ঞানকে ধন্যবাদ জানাতে। রামায়ণের পুষ্পকরথের বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ কি ঐ এয়ারোপ্লেন, আনন্দের শিহরণ গায়ে মেখে দূর-দূরান্তরের লোকজন মালপত্র বহন ক'রে যা শূন্যপথে উড়ে চলেছে সাগর-মহাসাগর পেরিয়ে?

চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান এক অনন্যমহিমার আসনে আসীন। লক্ষ লক্ষ মরণাপন্নকে সে দান করছে পরমায়ু, অসংখ্য আহতের জ্বালা-বেদনার উপশম ঘটাচ্ছে। মৃত্যু আজ তাকে এক বজ্রকঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে জেনেছে। আমাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আজ বিজ্ঞানই পুরোপুরি বরণ করে নিয়েছে। আলাদীনের প্রদীপের মত বিজ্ঞানকে শুধু হুকুম করারই অপেক্ষা, সে হুকুম যে তামিল হবেই এ আস্থা আমরা বিজ্ঞানের ওপর রাখি।

শিক্ষাবিস্তারে বেতারবার্তা

আধুনিক যুগে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছে বেতার তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহার কর্মপদ্ধতি চিত্তাকর্ষক, কর্মসূচী ব্যাপক এবং কর্মক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী। জাতিভেদ, বর্ণ-ভেদ, ধর্ম-ভেদ বেতারের শ্রোতাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না; দুস্তর সমুদ্র, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, দুর্গম মরুভূমি ইহার পথ রোধ করিতে পারে না, রাজনৈতিক পণ্ডিত ইহার কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করিতে অক্ষম। মানুষের জ্ঞান-পিপাসা সীমাহীন—তাহার শিক্ষার ক্ষেত্রই বিশ্বব্যাপী। রবীন্দ্রনাথকেও আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইয়াছে, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"। এই বিপুলা ধরণীর দেশে দেশে ঘুরিয়া ইহার সমস্ত জ্ঞাতব্যকে আয়ত্ত করা সাধারণের স্বপ্নাতীত। বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে এই স্বপ্ন আজ আর ঠিক স্বপ্নমাত্রে পর্যবসিত থাকিতে বাধ্য নহে। পঙ্গুও আজ গিরি-লঙ্ঘনের ধারা-বিবরণী শুনিয়া পর্বতারোহীর উন্মাদনা নিজের মধ্যে অনুভব করিতে পারে। মরুভূমির বুকে দাঁড়াইয়া যে-সব দুর্দান্ত মানুষ অতি ভয়ানক বোমা-বিস্ফোরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, অথবা ইংলিশ্ চ্যানেলের তুষার-কুটিল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা তাহার করাল তুফান লইয়া খেলা করে, তাহাদের হৃদ্‌স্পন্দনের অনুভূতি আজ বেতার মারফৎ সর্বসাধারণের সুলভ বস্তু। লোক-গীতি, লোক-সাহিত্য এবং বিচিত্র সংবাদের মাধ্যমে বেতার আজ গাঁথিয়া দিয়াছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে এক অভিনব সম্পর্কে। এক কথায় মানুষে মানুষে যে একটা নাড়ীর যোগ প্রচ্ছন্ন ছিল, বেতারযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে তাহাতে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হইয়াছে,—আজ তাহা পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইহার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হইলেও শিক্ষা জগতে ইহা এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে।

বেতার আজ অন্ধকেও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে—এই উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র আতিশয্য নাই। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে একদিন নিরক্ষর সম্রাট আকবর তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য নবরত্ন সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিতেন; আর আজ লক্ষ কোটি নিরক্ষর মানুষ বেতার-যন্ত্রের শ্রোতারূপে নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ।

অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বিপুল জনসংখ্যার জীবন-পথে জ্ঞানের আলোক তুলিয়া ধরিতে বেতারের জুড়ি নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই কথকতা, যাত্রা, ঢপ, পাঁচালী গান, কবিগান প্রভৃতি জনচিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপক লোকশিক্ষা প্রসারের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডি-বদ্ধ। বেতার এই গণ্ডিকে লুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়া শিক্ষায় অনুন্নত দেশগুলির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

যান্ত্রিক সভ্যতা প্রচুর সম্ভাবনাময়—যদিও ইহার সু এবং কু উভয় দিকই আছে। তাই যান্ত্রিক অবদানকে জনহিতকর করিয়া তুলিতে হইলে ইহার পরিচালনভার যোগ্য হস্তে অর্পিত হওয়া আবশ্যক,—অযোগ্যের হাতে পড়িলে একই যন্ত্র কল্যাণের স্থলে অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতে পারে, কিছু না হউক অন্ততঃ একটা বিকৃতি ঘটাইতে ইহার জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রুতি-সূত্রে বেতার যে শিক্ষাবিস্তার করে তাহা যেমন ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ তেমনি ইহার নির্দোষ হইবার পথে প্রধান কণ্টক হইল, ইহা একান্তই একতরফা। অপরের কেমন লাগিল বা তাহার মতামতই বা কি তাহার অপেক্ষা না রাখিয়াই ইহা কেবলই এক তরফের আদর্শ বা মত প্রচার করিতে থাকে। বিপদ এইখানেই, সতর্কতার প্রয়োজনও এইখানেই। শিক্ষার সৌষ্ঠব নির্ভর করিতেছে এই সতর্কতার উপর। তাই বেতার-পরিচালনার দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সামগ্রিকভাবে শিক্ষাবিস্তারে বেতারের ক্ষমতা অসামান্য।

স্কুল-কলেজের মাধ্যমে শিক্ষার্থিগণ যাহা লাভ করে তাহা অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বলিতেন 'বিদ্যালয়ের ঠিকা রেশনে মনের স্বাস্থ্য সুষ্ঠু গড়িয়া উঠিতে পারে না'। পাঠ্যসূচীর গণ্ডীর বাহিরে ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ছড়াইয়া আছে তাহা হইতে ছাত্রসমাজকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং বিকলাঙ্গ হইতে বাধ্য। বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে ছাত্রদের সহিত বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপন আজ কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। শিক্ষার্থিগণ আজ অনায়াসেই নিজগৃহে বসিয়া দেশ-বিদেশের মনীষীদের বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী তাহাদের জ্ঞানের সাজি ভরিয়া তুলিতে পারে। পরিব্রাজকের মুখে দেশভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করিতে পারে। সর্বস্তরের শিক্ষাথার নিকটই বেতারের উপযোগিতা আজ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত।

ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন সকলের সমান নহে। বিভিন্নশ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান-সূচীর ব্যবস্থায় সকলেই ইহাতে উপকৃত হইতে পারে। তাই দেখা যায় পল্লীবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পল্লীমঙ্গল আসর, মেয়েদের জন্য মহিলা-মহল, শ্রমজীবীদের জন্য মজদুর-মণ্ডলীর আসর, শিশুদের জন্য শিশু-মঙ্গল-আসর প্রভৃতির আয়োজনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হুজুর-মজুর সকল শ্রেণীর মানুষেরই চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা কল্পিত হয়।

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। এই দারিদ্র্য শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নয় শিক্ষাক্ষেত্রেও। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চতুর্দশ বৎসর পরেও ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা আশিজনেরও বেশি। সুতরাং বেতারের উপযোগিতা ভারতবর্ষে বুঝি অন্য কোনো দেশ অপেক্ষা কম নহে। যে দেশের প্রায় ত্রিশকোটি নিরক্ষর মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে পায়ে পায়ে ঠোকর খাইয়া কাঁদিতেছে সে দেশে কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে হয়ঃ "ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য--সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।" সুতরাং দেশকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলেঃ

"·········এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—"

কিন্তু এই কাজের গুরুদায়িত্ব বহন করা কোনো এককের পক্ষেই সম্ভব নয়। শিক্ষাবিস্তারের যত যত পন্থাই অবলম্বিত হইয়া থাকুক, তন্মধ্যে যে পন্থায় বেতার তুলিয়া লইয়াছে স্বীয় স্কন্ধে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব তাহার অনন্যতা সর্বজনস্বীকৃত।

———

শিক্ষাবিস্তারে বিজ্ঞানের অবদান

অতীতকালে সাধনালব্ধ জ্ঞান ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার বস্তু। ব্যক্তির গণ্ডির মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকিত এবং ব্যক্তির সাথে সাথেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। তাহাকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করিবার শক্তি মানুষের ছিল না বলিয়াই প্রাচীনকালে গুরুর সাধনালব্ধ জ্ঞান শিষ্য-পরম্পরায় শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা আয়ত্ত করিয়া মুষ্টিভিক্ষার মত মুঠি মুঠি সমাজে বিতরণ করিতেন। তারপর আসিল লিখন ও পঠন-প্রণালী, সৃষ্টি হইল শিলালিপি, বৃক্ষের পত্র ও বল্কলে লিখিত পাণ্ডুলিপি। এই লিখন ও পঠন-প্রণালীও বিজ্ঞানের অবদান সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল, সেকেলে ও কাঁচা হাতের অপরিপক্ক অবদান। সেদিনকার বিজ্ঞান আজিকার মত নয়নাভিরাম, দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রন-ব্যবস্থার কল্পনাও করিতে পারে নাই বলিয়া সেকালের শিক্ষা-ব্যবস্থাও তালপাতা, ভোজপাতার পাণ্ডুলিপির সাহায্যে টোল, চতুষ্পাঠীর গণ্ডির বাহিরে আসিতে পারে নাই। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের কৃপায় পঠন ও পাঠন-প্রণালীর চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছে।

বিজ্ঞানের কৃপায় আবিষ্কৃত কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে আজ মানুষের সাধনালব্ধ জ্ঞানকে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে কোনই বাধা নাই। কালি ও কলমের দুই পৃথক সত্তা আজ ঝর্ণাকলমরূপে এক ও অবিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আজ শিশু-শিক্ষার্থীও নয়নাভিরাম মসৃণ কাগজের খাতায় ফাউণ্টেনপেনের সাহায্যে বর্ণ-পরিচয় লেখে যাহা তাহার পিতৃ-পিতামহ ঐ বয়সে কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা আজ অসাধ্য সাধন হইতেছে। দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ, শ্রবণশক্তিহীন বধির, চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুরও আজ বাণীমন্দিরে প্রবেশে কোন বাধা নাই। ব্রেইলী সাহেবের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে আজ দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষ স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই নিজের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ। মূক, বধির ও অন্ধের সম্মুখে আজ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত। যাহারা নিরক্ষর তাহারা চোখ থাকিতেও অন্ধ। কিন্তু বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের অভাব মিটাইতে তাহাদেরও আজ বাধা নাই। বেতারের আবিষ্কার শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

বিশ্বব্যাপী জ্ঞানসমুদ্র আজ পঙ্গুও স্বগৃহে বসিয়া মন্থন করিতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্র, উচ্চ-শিক্ষার্থিগণ তাহাদের শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত বিভিন্নদেশের মনীষিগণের সাধনালব্ধ ফল বেতার মারফতে লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। আবার স্থূলবুদ্ধি মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সবাক্‌চিত্র। সেলুলয়েডের ফিল্মে জীবন্ত চিত্রগুলি সহজেই মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাইতে পারে। ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বেতার ও চলচ্চিত্রের অবদান অপরিসীম।

পার্থিব বস্তু সকলই নশ্বর। বিজ্ঞান তাহাকে একটা স্থায়িত্ব দিবার সংকল্প লইয়াই যেন আবির্ভূত হইতেছে। তাই জীবদেহকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঠিক তেমনই অতীতকালের জ্ঞানসাধনার স্মারকচিহ্ন-স্বরূপ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি ও বিভিন্ন ধরণের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসম্ভার কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞান নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া চলিয়াছে। রেকর্ড্, টেপরেকর্ড, ফিল্ম, ফটোস্টাট্, লিথোগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যে অতীতের শব্দ বা বস্তুর হুবহু নকল ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে—তাই আজও আমরা শুনিতে পাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গীত রবীন্দ্র সংগীত, বিদ্রোহী-বীর সুভাষচন্দ্রের চিত্তবিপ্লবী হুঙ্কার।

মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আজ ক্ষুদ্র-বৃহৎ এমন অসংখ্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করিয়াছে যাহার ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশ-কাল-দূরত্বের ব্যবধান তো ঘুচিয়াছেই, এমন কি জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিও আজ তাহার নিকট ধরা পড়িতেছে। বিজ্ঞানের দয়ায় মানুষ আজ মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর বুকে যন্ত্র স্পর্শ করাইয়া তাহার শরীরাভ্যন্তরস্থিত রোগ, শোক ও অনুভূতির সন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। মাটির বুকে যন্ত্র স্পর্শ করাইয়া পৃথিবীর অতল গর্ভে কোন্ ধন লুক্কায়িত আছে তাহার সন্ধান লইতেছে। মহাশূন্যে রকেট, স্পুটনিকের সাহায্যে তাহারা সুদূরতম গ্রহের সন্ধান লইয়া ফিরিতেছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র তো আজ ছেলের হাতের খেলনা। ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, আণবিকতত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব ও চিকিৎসা-তত্ত্বে রোমাঞ্চকর সাফল্য একমাত্র বিজ্ঞানেরই কৃপায় সম্ভব হইয়াছে।

বিজ্ঞান জ্ঞানপিপাসুর নিকটে শিক্ষাকে সহজলভ্য করিয়া তুলিয়াছে গবেষকের গবেষণালব্ধ-জ্ঞান বিজ্ঞান দু'হাতে মুঠি মুঠি ছড়াইয়া দিতেছে

আবার গবেষকের গবেষণাকার্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সাহায্য করিয়া চলিয়াছে। গবেষণাগারে বসিয়া গবেষক সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করেন, বিজ্ঞান তাহাকেই আবার বৃহদাকার যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া যদি না সাধারণের নিকট সহজলভ্য করিয়া তুলিত তাহা হইলে দরিদ্র সাধারণ মানুষ মুদ্রিত পুস্তকের, ফাউণ্টেনপেনের ব্যবহার কোনদিন করিতে পারিত না। রেলভ্রমণ, বিমানযাত্রা বা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া তো তাহার নিকট স্বপ্নই থাকিয়া যাইত। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান ত্রিমুখী। প্রথমতঃ, ইহা জ্ঞানসাধকের সাধনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, সাধনার পথকে সুগম করিয়া তুলিতেছে, তৃতীয়তঃ, সাধনালব্ধ জ্ঞান আবার বৈজ্ঞানিক অবদানের সাহায্যেই নানা উপায়ে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া শিক্ষাকে সাধারণের নিকট সহজলভ্য করিয়া তুলিয়াছে।

———

সংকেত সূত্র

আধুনিক যন্ত্রযুগ

১। যন্ত্র এনেছে জীবনে খরতর গতি, নিয়ম-শৃঙ্খলার আধিপত্য ২। কাজের পরিমাণ ও রকম বেড়েই চলেছে। ৩। অবসর বা বিশ্রাম বা ধ্যান তিরোহিত ৪। যন্ত্রের চাপে মানুষও হয়েছে যন্ত্র, জীবন হয়েছে যান্ত্রিক ৫। পাশ্চাত্ত্য জীবন যন্ত্রের ব্যবহারে সমৃদ্ধ, কিন্তু অশান্তিময় ৬। যন্ত্র ভাল, যন্ত্রের নেশা ভাল নয়; নেশায় ঘটে সমূহ অনর্থ, তাই বর্তমান বিশ্বে যন্ত্রসভ্যতা এনেছে এক ঘোর বিভীষিকা।

বিজ্ঞান ও কৃষি

১। কৃষিকে বাদ দিয়ে কোনো দেশ বাঁচতে পারে না। ২। কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক—শিল্পোন্নত দেশেও কৃষির স্থান ৩। কৃষির বহর ও উৎকর্ষ বাড়ানো সকলেরই কাম্য। ৪। জমির স্বাভাবিক উর্বরতা সসীম, একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থায় একে বাড়ানো যেতে পারে ৫। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞান-সহায় কৃষির প্রসঙ্গ ও ভারতে বৈজ্ঞানিক চাষের বহুল প্রচলন।

দেশোন্নয়নে বিদ্যুতের স্থান

১। বিদ্যুৎ বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান শক্তি ২। দেশের বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা—বিচিত্র যন্ত্রের প্রয়োগ—যন্ত্রের অধিকাংশই বিদ্যুন্নির্ভর ৩। বৈদ্যুতিক ট্রেন, বিবিধ শিল্প-কারখানা, বেতার, টেলিফোন ৪। পল্লী-অঞ্চলে সস্তায় জলবিদ্যুৎযোগে কুটীরশিল্পের উন্নয়ন ৫। হাসপাতাল ও বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ৬। শিক্ষা-প্রসারেও বিদ্যুৎশক্তি।

বেতার ও টেলিভিশান

১। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগসূত্র। ২। বেতার শোনায়, টেলিভিশান দেখায়; বেতারযোগেই ঘটে টেলিভিশানের ক্রিয়া—উভয়বিধ যন্ত্রের পৃথক পৃথক ক্রিয়া-পদ্ধতি। ৩। বেতারের কাজ: জাতিবিশেষের, দেশ বিশেষের, রাষ্ট্রবিশেষের মুখপাত্র,—আন্তর্জাতিক বার্তাবহ—কৃষ্টিগত বৈচিত্র্যের পরিবেশক—শিক্ষাবিস্তার ও অবসর বিনোদন ৪। টেলিভিশানের কাজ: বেতারের সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষকে ও তাহার কাজকে প্রত্যক্ষীকরণ ৫। উভয়ে মিলে দূরকে খালি নিকটই করেনি, করেছে আত্মীয়।

বিজ্ঞান ও আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ

১। বিজ্ঞান যুদ্ধ-জগতে এনেছে যুগান্তর। ২। সেকালের যুদ্ধে পরীক্ষা হ'ত শক্তি-সাহস-শৌর্য-বীর্যের, ব্যূহরচনা ও যুদ্ধ-কলা-কৌশলের, একালে পরীক্ষা হয় বৈজ্ঞানিক কসরতের ৩। সে-যুগে যুদ্ধ ছিল স্থানবিশেষে আবদ্ধ বিজ্ঞান-সহায়, আধুনিক যুদ্ধ দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়, তাই কথায় কথায় আজ বিশ্বযুদ্ধ ৪। যুদ্ধ-জনিত মৃত্যু বা ধ্বংস আধুনিককালে ব্যাপকতর—অগণিত নিরীহ লোকের বিনাশ ৫। সে-যুগে ছিল ধর্মযুদ্ধ, এযুগে লালসা-যুদ্ধ। ৬। বিজ্ঞান জাগিয়েছে যুদ্ধোন্মাদনা।

———

(চ) শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১। তোমার প্রিয় গ্রন্থ

২। ইতিহাসপাঠের আবশ্যকতা

৩। উপন্যাস পাঠ

৪। তোমার প্রিয় গ্রন্থকার

৫। দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ

৬। স্ত্রীশিক্ষা ও সহশিক্ষা

৭। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

৮। বৃত্তিশিক্ষা

৯। ছাত্রজীবনে সামরিকশিক্ষা

১০। তোমার প্রিয় কবি

১১। গ্রন্থনির্বাচনের মূল্য

১২। গল্প ও উপন্যাসপাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা

১৩। সাহিত্য ও সমাজ

১৪। সাধারণ গ্রন্থাগার

১৫। লোকশিক্ষা ও লোকসাহিত্য

১৬। সংবাদপত্র

সংকেত সূত্র

১। তোমার প্রিয় ঔপন্যাসিক

২। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি

৩ বাংলার ছোটগল্প

———

তোমার প্রিয় গ্রন্থ

যখন খুবই ছোটো ছিলাম, তখন হইতেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া আরম্ভ করিয়াছি। এ পর্যন্ত বইখানি কতবার পড়িলাম, তবুও তাহা পুরানো হইল না —যতবার পড়ি ততবারই যেন সব নূতন বলিয়া মনে হয়। সেই ত্রেতাযুগের কাহিনী এখনও আমার চোখের সামনে যেন সত্য ঘটনার মতো ভাসিতে থাকে—রামায়ণের ছবি আমার স্মৃতিপথ হইতে কোনো দিন মুছিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণ আমার চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণের গদ্যানুবাদ পড়িয়াছি। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণের ছত্রে ছত্রে যে লালিত্য আছে বাল্মীকির রামায়ণে তাহা নাই। মহাকবির রচনায় ভাবসম্পদ বা সৌন্দর্যের অভাব নাই—কিন্তু বাঙালী কবি যেন বাংলার নিজস্ব সরসতায় কাব্যখানিকে সিক্ত করিয়াছেন। অতীত যুগের বীরত্ব কাহিনী কবির অনুপম বর্ণনাকৌশলে বাঙালীর ঘরের কথায় পরিণত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে রামের পরিচয় আমরা পাই, সে রামের মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণের বীর্য বা ধর্মব্রতের পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠের দীপ্ত মূর্তির পরিবর্তে নবদূর্বাদলশ্যাম এক কিশোরের ছবিই সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন করিয়াছেন, অসংখ্য রাক্ষস বধ করিয়া বীর্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার ত্যাগব্রত ও ধর্মাচরণ অতুলনীয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি দশরথের নয়নের পুতলি, সীতা-হরণের পর বা সীতা-বিসর্জনের পর তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন, তিনি ভক্তবৎসল—বীরবাহু, তরণীসেন বা রাবণের স্তব শুনিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া যায়। এমন কি বৈষ্ণব বাঙালীর কল্পনা তাঁহার হাত হইতে ধনুর্বাণ কাড়িয়া লইয়া একবার বাঁশি পর্যন্ত দিয়াছে।

সীতাও বাঙালী ঘরের বধূ—রাজার নন্দিনী হইয়াও তিনি চিরদুঃখিনী। তাঁহার স্নেহময়ী কোমলা মূর্তি আমাদের চোখের সামনে যেন ভাসিতে থাকে। বিবাহের পরেই তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া বনে যাইতে হইল। সেখানে যদিও বা ঘর বাঁধিয়াছিলেন, রাবণ তাহা ভাঙিয়া দিয়া গেল; লঙ্কায় অশোক বনে তাঁহার উপর উৎপীড়নের সীমা ছিল না; রাবণবধের পর তাঁহাকে স্বামীর বিরূপ বাক্য সহ্য করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইয়াছে; অযোধ্যায়

ফিরিয়া কিছুদিন পরে বনবাস ; রামের সহিত লবকুশের মিলন হইল, কিন্তু সীতার ভাগ্যে পাতাল-প্রবেশ। এই চিরদুঃখিনীর বিষাদকাতর মূর্তি বাঙালীর হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছে।

দশরথের পুত্রবাৎসল্য আমাদের অতি পরিচিত বিষয়। কৌশল্যা ও সুমিত্রার স্নেহ-বাৎসল্য, কৈকেয়ীর দৃঢ়তা, মন্থরার কুটিলতা—প্রতিটি বিষয়ই কবির বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃবাৎসল্য ও তেজস্বিতা আমাদের মুগ্ধ করে। ভরত ও শত্রুঘ্ন এই দুই চরিত্রকেও কবি সুন্দর করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন ; বিশেষ করিয়া ভরত-চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

কেবল মানবচরিত্র নয়, কবির অপরূপ বর্ণনাকৌশলে বানর ও রাক্ষস চরিত্রগুলিও মানবতার গৌরব লাভ করিয়াছে। বীভৎস রস বা কৌতুকরস সৃষ্টি করিবার জন্য কবি অবশ্য মাঝে মাঝে তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতির কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাহারা মানুষের, বিশেষ করিয়া বাঙালীর পরিচয় লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বালী, সুগ্রীব বা হনুমানকে আমাদের মহামল্ল বলিয়া মনে হয় না—তাহাদের বীরত্বের অতিরঞ্জিত বর্ণনার চেয়ে তাহাদের জীবনের ছোটখাট বিষয়গুলিই আমাদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের রাবণ বাংলার এক পরাক্রান্ত জমিদারের বেশী কিছু নয়—রাণী মন্দোদরীও জমিদার-গৃহিণীরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।

এই কাব্যটিতে যে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত সমগ্র কাব্যখানিই আমার ভালো লাগে।

বর্ণনা যেমন সরল তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বড়ো বড়ো ঘটনা কবি অতি স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণের কাহিনী ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছে। হিন্দীভাষীদের কাছে তুলসীদাসের রামায়ণ যেমন, বাঙালীর কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণও তেমনই অতি প্রিয়, ইহার কাহিনী বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত। এই কাব্যটি পড়িতে বসিলেই মন যেন কল্পনার একটি স্বর্গলোকে ছুটিয়া যায়। আর কোন গ্রন্থ এমন করিয়া হৃদয়কে নাড়া দেয় না।

ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা

সংকেত :—১। অতীত যুগের তথ্য- মানবজীবনে অতীতের প্রভাব—২। অতীতকে জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন—৩। ইতিহাস জাতির জীবনে পথ নির্দেশ করে—৪। জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের আশ্রয়স্থল অতীতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছেন :

স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত জীবনের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

যাহা অতীত, যাহাকে আমরা ইতিহাস বলি, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। যাহা অতীত ছিল তাহাই বর্তমানের মধ্যে লীন হইয়া আছে। বর্তমানের মূলে সুদূর অতীতের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।—

হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও।

আমাদের বর্তমান জীবনকে ভালোভাবে বুঝিবার জন্য অতীতকে জানা প্রয়োজন—ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা আমাদের পূর্বযুগের বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। মানুষের সভ্যতা একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। পূর্বযুগে লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছে বলিয়াই মানুষ এত বড়ো হইতে পারিয়াছে—নতুবা সে আজও আদিম যুগেই থাকিয়া যাইত। ইতিহাস মানুষের সেই পূর্বযুগকে ধারণ করিয়া তাহার কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইতিহাস পাঠ করিয়া মানুষ আপনার গৌরবের কথা জানিতে পারে।

অতীত যুগে কোন্ কোন্ জাতি কী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা সে ইতিহাস হইতে জানিতে পারে। যে জাতি কালে সমৃদ্ধি হারাইয়া দুর্গতিগ্রস্ত

হইয়া পড়ে, সেই জাত আপনার অতীত গৌরবের ইতিহাস পাঠ করিয়া পুনরায় নবতর গৌরবের জন্য উৎসাহ পোষণ করিতে পারে। ইতিহাসে মানবশক্তির বিচিত্র প্রকাশের যে বৃত্তান্ত আছে তাহা মানুষকে গৌরবজনক কর্মসাধনে উৎসাহিত করিতে পারে।

ইতিহাস মানবজাতির অন্যতম শিক্ষকও বটে। অতীত যুগের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা কোন্ যুগে কোন্ সমৃদ্ধ জাতির কী কী কারণে পতন ঘটিয়াছিল তাহা জানিয়া সতর্ক হইতে পারি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবনের রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস বা স্যার যদুনাথ সরকারের মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস এইভাবে আমাদের পরম শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য।

জনৈক প্রাচীন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন যে, ইতিহাস জরার কুঞ্চন বা শুভ্র কেশ ব্যতীতই যুবককে বৃদ্ধের জ্ঞান দান করে। ইতিহাসের মধ্যে যে বহু যুগের জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত পরিচয়ের ফলে যুবকও অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া বয়োনিরপেক্ষভাবে অভিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাস ব্যবহারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারস্বরূপ।

এই গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেকেরই যখন রাষ্ট্রপরিচালনায় কিছু কিছু অধিকার আছে, তখন ইতিহাস পাঠ করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বিষয়ে নিজস্ব মতবাদ গঠন প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য। ইতিহাসই বহন করে, ভবিষ্যতের আভাস। 'History repeats itself' এই কঠিন সত্যটি স্মরণ না রাখিলে বিভ্রান্ত হইতে হয়। ইতিহাসপাঠ জাতির ভাবী জীবন নিয়ন্ত্রণের সহায়ক এবং আমাদের যোগ্য নাগরিক করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শিক্ষকও বটে।

ছাত্রজীবন হইতেই ইতিহাস-পাঠ কর্তব্য। ইতিহাসের মতো বিপুল বিস্তৃত বিষয় আর নাই—ইহার মধ্যে যতই অবগাহন করা যাইবে, ততই নূতন নূতন রত্নলাভ করা যাইবে। আমাদের দেশের প্রাচীন কবিও বলিয়াছেন যে, বেদপ্রমুখ শাস্ত্র প্রভুর মতো উপদেশ দেয় কিন্তু ইতিহাস বন্ধুর মতো উপদেশ দান করে।

———

উপন্যাস-পাঠ

সংকেত ঃ—১। গল্প শুনিবার আগ্রহ ২। কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস ৩। কেবল গল্প নয়, উপন্যাসেও আমরা জীবনের চিত্র পাই, জীবন সম্পর্কে নূতন অভিজ্ঞতা জন্মে—৪। মানব চরিত্রের জ্ঞান লাভ করা যায় ৫। ঐতিহাসিক উপন্যাস ৬। শিল্পবোধ ও রুচিজ্ঞান জন্মে ৭। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের সুফল।

গল্পশোনার ঝোঁক মানুষ মাত্রেরই আছে। ভালো একটি উপন্যাস পাইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা লইয়া বসিয়া থাকে এমন লোকের অভাব নাই। সময় থাকিলে হাতে একটা ভালো উপন্যাস আসিয়া পড়িলে তাহা পড়ে না এমন লোক নিতান্তই বিরল।

বাংলা দেশে এমন একদিন ছিল যখন কিশোরদের পক্ষে উপন্যাস-পাঠ একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। শরৎচন্দ্র বাল্যকালে কীভাবে লুকাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিঠিপত্রের মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য সেযুগে ভালো উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাস বাদ দিলে এমন উপন্যাস ছিল না বলিলেই হয় যাহা অল্পবয়স্ক পাঠকের উপযোগী হইতে পারে। উপন্যাসের মধ্যে পরিণত জীবনের যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া সুকুমারমতি তরুণ-তরুণী অকালপক্কতা লাভ করে বা উপন্যাসের মধ্যে অনাচারের চিত্র দেখিয়া সুনীতি হইতে ভ্রষ্ট হয়, এমন আশঙ্কাই তখনকার অভিভাবকদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

কিন্তু সেদিন এখন আর নাই। এখন উপন্যাস বড়োদের যেমন, তেমনই ছোটোদেরও হাতে হাতে। এখন বড়োদের পাঠ্য উপন্যাস ছোটদের উপযোগী করিয়া রচিত হইতেছে ; ছোটোদের জন্য আলাদা করিয়া উপন্যাস রচনা করা হইতেছে—অবশ্য এই সব উপন্যাসের মধ্যে একদিকে যেমন দক্ষিণারঞ্জন-প্রমুখ শিশু-সাহিত্যিকের রচনা আছে অপরদিকে তেমনই কাঞ্চন-জঙ্ঘা সিরিজের লোমহর্ষক কাহিনীও আছে। কিশোরদের পাঠ্য ভালো উপন্যাসের সংখ্যা এখনও প্রচুর নহে।

বাস্তবিকপক্ষে বয়স্কদের পাঠ্য ভালো উপন্যাসের সংখ্যাও নিতান্ত কম। এযুগের তরুণ-তরুণী হইতে সুরু করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত যে সমস্ত উপন্যাস গিলিতে থাকেন, সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগই অসাহিত্য বা কুসাহিত্য।

আমাদের দেশে যথার্থ ডিটেকটিভ্ উপন্যাস বা গল্প রচিত হয় নাই ;—এদেশে রহস্যলহরী-সিরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া রোমাঞ্চ বা মোহন-সিরিজে আমরা যে বস্তু পাই তাহার বেশির ভাগই মেকি বা তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্য। বহু শক্তিহীন লেখক উপন্যাসের নামে বৃহৎকায় অসার গল্প লিখিয়া নাম কিনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের ভিড়ে ভালো উপন্যাস যেন হারাইয়া যাইতেছে।

ভালো উপন্যাসের মধ্যে কেবল যে গল্পই আছে তাহা নয় ; ইহাতে এমন অনেক বিষয় থাকে যাহা আমাদের মনটাকে গড়িয়া তুলিতে পারে। ইহার মধ্যে জীবনের চিত্র থাকায় আমরা ইহা পাঠ করিয়া জীবন সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতার অধিকারী হইতে পারি। উপন্যাসকে মানবচরিত্রের আকর বলা যায়। পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষের পরিচয় আমরা পাই,—উপন্যাসের মধ্যেও আমরা পাই বিচিত্র চরিত্রের সন্ধান। মানবচরিত্র সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা গড়িয়া তুলিতে উপন্যাসের জুড়ি নাই।

শিক্ষালাভ বলিতে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ বুঝায় না। রুচিকে গড়িয়া তোলা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ভালো উপন্যাস পাঠ করিলে আমাদের রুচি পরিমার্জিত হইতে পারে। বিশেষত উপন্যাস সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট শাখা ; সুতরাং ইহার মধ্যে সাহিত্যের কলাগত সৌকর্যের দিক্‌টাও উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের কলাগত সৌন্দর্য আমাদের চিত্তকে পরিমার্জিত করিয়া উহাকে সৌন্দর্যপিপাসু করিয়া তোলে। বাস্তবিকপক্ষে সৌন্দর্যবোধ ও রুচি না থাকিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায় ; কারণ, শিক্ষা বলিতে স্তূপীকৃত জ্ঞান বোঝায় না, মানবচরিত্রের উৎকর্ষ বিধানই ইহার উদ্দেশ্য।

সৎ উপন্যাস পাঠ করিলে হৃদয়ের মধ্যে কোনো মহৎ কার্য সম্পন্ন করিবার প্রেরণা লাভ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসটি এক সময়ে আমাদের দেশকর্মীদের অন্তরে স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেশোদ্ধারের প্রেরণা দান করিয়াছিল।

সাহিত্যের বিভিন্ন অংশের মতো উপন্যাসেরও রীতিমত চর্চা প্রয়োজন। গল্পের সহিত সংযুক্ত থাকায় সাহিত্যের এই শাখাটিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু কেবলমাত্র গল্পটুকু উপভোগ করিবার জন্য উপন্যাস-পাঠে প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয়। উপন্যাস-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে

আলোচনাও অবশ্য কর্তব্য। কোনো কোনো উপন্যাস মুখ্যত মনোরঞ্জনের রচিত—কিন্তু শক্তিমান ঔপন্যাসিক মহাকবির মতোই গ্রন্থ মধ্যে এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশ করেন যাহা উপযুক্ত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই বিষয়-গুলির জন্যই কোনো কোনো উপন্যাস সাহিত্য হিসাবে আদরণীয় হইতে পারে।

উপন্যাস পাঠ করিলেও উপন্যাসের নেশা যাহাতে না পাইয়া বসে সে দিকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উপন্যাসের প্রতি অনুরাগের জন্য অন্য কাজে অবহেলা করিয়া কেবল এই দিকে মনোযোগ দিলে চলিবে না। যথার্থ ভালো উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিয়া উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যয়ন করিলে উপন্যাসের নেশা জন্মিতে পারিবে না এবং ইহাতে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও হইবে।

তোমার প্রিয় গ্রন্থকার

তখন আমার বয়স দশ বারো বছর হবে। গল্পের বইয়ের নেশা তখনও তেমন হয়নি। এমন সময় একখানা বই হাতে এল—বইখানার নাম 'পথের পাঁচালী'। ছোট্ট অপু আর দুর্গার গল্প। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন আমাদেরই কথা বলা হচ্ছে—অথচ এ যেন এক অন্য জগতের কথা। লেখক কি করে যে আমাদের মনের কথা জেনে নিয়ে সব ফাঁস করে দিয়েছেন তা ভেবেই পাওয়া যায় না। নিশ্চিন্দিপুরের পথ-ঘাট, বন জঙ্গল সব যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ছোটো বেলায় অপু আর দুর্গা যে সব দৌরাত্ম্য করেছে সে সব আমরাই তো করে থাকি। অপুর মনে যে সব ভাবনা হয় সে সব তো আমাদেরই মনের স্বপ্ন। সর্বজয়াকে নিজেদের মা বলেই মনে হত।

তখন লেখকদের নাম নিয়ে ভাবতাম না, গল্পটাই পড়তাম। 'পথের পাঁচালী'র লেখকের নাম তখনই মনে করে রেখেছিলাম কি না মনে নেই। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নামটা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এরপর 'তালনবমী' নামে একটা গল্প পড়তে পড়তে মনে হল সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ যিনি অপুর জীবনটা ছবির মতো এঁকে দিয়েছেন। এখানে তিনি একটি গরীব ঘরের ছেলের তালের বড়া খাবার ইচ্ছেটা কী সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন! মানুষের মনের কথা—বিশেষ

করে ছেলে মানুষের মনের কথা—কিশোর-কিশোরীর মনের কথা তাঁর লেখায় কী অপরূপ হয়েই না ধরা পড়েছে।

এরপর বিভূতিভূষণের আর একখানি বড় বই হাতে এল—সেটির নাম 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। এই গল্পের নায়ক জিতুর জীবনটা যেন স্বপ্নের জীবন। প্রথম দিকে দার্জিলিং-এর যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা কী মিষ্টি। তারপরে বাংলা দেশের গ্রামে ফিরে এসে জিতু, তার দাদা আর বোন সীতাকে কী কষ্টেই না পড়তে হয়েছে। জিতুর বুদ্ধি ছিল সবল—আর ছিল স্বপ্নদৃষ্টি, যা দিয়ে সে কত সব আশ্চর্য ঘটনা দেখত। 'অতীত, ভবিষ্যৎ সবই তার কাছে মাঝে মাঝে আশ্চর্য ইশারার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ত। অথচ তাকে বুঝতে পারে এমন কেউ ছিল না—বিরূপ জগতের মাঝখানে থেকে তাকে কত কষ্ট কত দুঃখই না পেতে হয়েছে।'

"পথের পাঁচালী'র শেষ অংশ 'অপরাজিত' পড়লাম। এখানে ছোট্ট অপুই যেন বড়ো হয়ে এসেছে বলে মনে হল। তার সেই স্বপ্ন, ভাবের আবেগ, সবই সেই রকম আছে কেবল তার ক্ষেত্রটা পালটে গেছে এই যা। তার সরল জীবনে কত আঘাত এসেছে—কত লোক তাকে ভুল বুঝেছে—অথচ পৃথিবীর মতোই সে সব সহ্য করেছে—তার প্রাণ চির-সরস থেকে গেছে। অপুর ছেলে কাজলের মধ্যে ছোট্ট অপু আবার ফিরে এসেছে। বিভূতিভূষণ নিজেই বুঝি একটি বয়স্ক ছেলেমানুষ ছিলেন।

বিভূতিভূষণ যেন কবি হতে হতে গল্প-লিখিয়ে হয়েছিলেন। তাঁর দুই চোখে ছিল স্বপ্নের দৃষ্টি। তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন মানুষকে আর প্রকৃতিকে। এই যে যন্ত্রের সভ্যতা, চারিদিকে রুক্ষতা, কুটিলতা আর হাহাকার—এর মধ্যেই তিনি সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, মাধুর্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অথচ তিনি যে কল্পনার গজদন্তমিনারে বাস করতেন এমন নয়—সামান্য একটু দুঃখে, সামান্য একটু বেদনায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। এই কঠোর ধরিত্রীর মাঝখানে তিনি চির-সরসতার স্পর্শ পেয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে মায়ের জীবন হাজার দুঃখময় হোক না কেন, সন্তানের জন্য স্নেহরস তো শুকিয়ে যায় না। তাই জীবন-পূজারী বিভূতিভূষণের রচনায় এত সরসতা, তাই তা আমাদের মন এমন করে ভরিয়ে দিতে পারে।

'আরণ্যক' যখন পড়লাম তখন আর এক সৌন্দর্যের হিল্লোল চোখের

সামনে উথলে উঠল। কোথাকার এক অজ পাড়াগাঁ, নবটুরিয়া—কোনো ভূগোলের পাতায় যার নাম লেখা নেই, সেখানে বনভূমির মধ্যে এত সৌন্দর্য যে লুকিয়ে আছে তার ঠিকানা কে জানে? সেখানকার একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যেও বিচিত্রের স্বাদ কানায় কানায় উছলে পড়ে। —'দেবযান' পড়ে আর এক জগতের মধ্যে যেন দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। মৃত্যুর পরে আর একটা জগৎ আছে না কি? সেখানকার রূপ বিভূতিভূষণের কল্পনায় ধরা পড়েছে। আমরা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু দেবযানে যে জগতের কথা বলা হয়েছে তা সত্য—কবির মনোভূমিতে যা গড়ে ওঠে তাই তো আসল সৃষ্টি। পুষ্প, যতীন আর আশার চরিত্র তিনি কী সুন্দর করেই না এঁকেছেন।—ওদিকে 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র হাজারী ঠাকুরের সরল জীবনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণ তাকে যেন জীবন্ত করে এঁকেছেন। 'ইছামতী'তে যেন অপু অধ্যাত্ম দৃষ্টি নিয়ে ফিরে এসেছে।

বিভূতিভূষণ যে এমন করে আমাদের মনকে ভুলিয়ে রাখেন, এর সব চেয়ে বড়ো কারণ এই যে তাঁর ছিল মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি গভীর দরদ। ছোটো ছোটো গল্পগুলোতেও বা 'দুই বাড়ী', 'কেদার রাজা' বা 'বিধু মাষ্টার'এর মতো অপ্রধান লেখাতেও কোথাও তাঁর দরদের এতটুকু কমতি হয় নি। মন ঢেলে প্রাণ ঢেলে শিশুর নিভাঁজ সরলতা আর মুগ্ধতা নিয়ে যিনি কথাকে অক্ষরের মধ্যে প্রাণবন্ত করে তোলেন, তাঁর লেখা তো আমাদের মনপ্রাণ জয় করে নেবেই।

দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ

সংকেত: ১। ঘরের বাহিরে যাওয়ার জন্য মানুষের আদিম কৌতূহল ২। দেশভ্রমণে মনের সংকীর্ণতা কাটে ৩। নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয় ৪। দেশভ্রমণের সুফল—শিক্ষার অঙ্গ ৫। ভ্রমণের নেশা—পদব্রজে ভ্রমণই শ্রেষ্ঠ।

মানুষ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। বহির্বিশ্ব তাহাকে প্রতি মুহূর্তেই আহ্বান করিতেছে। মানুষ ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহা

প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশে—নিজের পাড়া ছাড়াইয়া অন্য পাড়ার লোকেদের সহিত মিশিতে চায়, নিজের দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে গিয়া সেখানকার মানুষের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। সেই আদিম যুগ হইতেই মানুষ নানা দেশে গিয়া বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিচিত্র মানব জীবনের পরিচয় লাভ করিয়া তাহার আকুল জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছে।

দেশভ্রমণের ফলেই মানুষ তাহার সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়া বিশ্বের উদার পরিবেশের মধ্যে আপনার জীবনকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথমাংশে ভারত যখন বাণিজ্য করিতে বা ধর্ম প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন তাহার মনের ও ধনের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। পরবর্তী যুগে যে তাহার অবনতি ঘটে তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহার পর হইতে ভারতবর্ষ সমুদ্র পার হওয়া নিষিদ্ধ করিয়া সব দিক দিয়াই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। এই সময় তাহার মধ্যে ঘোরতর কূপমণ্ডূকতা দেখা দেয়; ফলে তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। দেশভ্রমণের ফলে তাহার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিভিন্ন স্থানের রীতিনীতি, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দেশভ্রমণের ফলে অতি সহজেই লাভ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বিচিত্র জীবজন্তু বা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান দেখিয়া সে একদিকে যেমন আনন্দ লাভ করিতে পারে, অন্যদিকে তেমনই অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। বিভিন্ন দেশে গেলে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগও ঘটা সম্ভবপর।

দেশভ্রমণের ফলে মানুষের আলস্য দূর হইয়া যায়। এক সময় দেশভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল; বর্তমানে যানবাহন ও পথঘাটের উন্নতির ফলে দেশভ্রমণ অনেকটা সহজ হইয়াছে—তবুও ইহা মানুষকে পরিশ্রমী ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিয়া তোলে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে কত সুদূর-প্রসারী এবং পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত যে মানুষ এক পাও চলিতে পারে না, এই বোধটি জাগ্রত হয়। ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি বিলুপ্ত

হইয়া তাহার অন্তরে উদারতা, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি বিকশিত হইবার অবকাশ পায়। অথচ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার ভাবালুতা দূর হইয়া যায় এবং তাহার বাস্তববোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে।

পৃথিবীর মহামানবদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেশভ্রমণের মধ্য দিয়া আপনাদের শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। এ দেশের রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সারা পৃথিবীর সহিত যোগসূত্র রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যাহার যেটুকু সাধ্য ভ্রমণের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য।

তবে ভ্রমণকে নেশা করিয়া তোলাও সংগত নয়—সকলেই রামনাথ বিশ্বাস হইলে চলে না। কেবলমাত্র ভ্রমণের জন্যই ভ্রমণ নয়, মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই যে ভ্রমণ প্রয়োজন এই কথাটি স্মরণীয়। ভ্রমণের আনন্দটুকু উপেক্ষণীয় নয়; ইহার সংগঠনমূলক দিকটি যাহাতে বাদ না পড়িয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। অনেকে পূজার ছুটিতে বা অন্য কোনো অবকাশে কোনো প্রসিদ্ধ স্থানে কিছুদিন গিয়া বাস করিয়া আসেন। ইহাকে দেশভ্রমণ বলা চলে না—ইহাকে বায়ুপরিবর্তন বলা যাইতে পারে। যে দেশগুলিতে যাওয়া হইবে সেই দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা র্জন করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইজন্য স্বামিজীর মত পদব্রজে ভ্রমণই সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণ বলিয়া গণ্য।

———

স্ত্রীশিক্ষা ও সহশিক্ষা

সংকেত ঃ—১। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ২। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ৩। অর্থনৈতিক সমস্যা ৪। জীবন সংগ্রামে বাধ্য হইয়াই নারীর নানা বৃত্তি গ্রহণ ৫। সহশিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে মত ৬। উপসংহার।

এক শতাব্দীর কিছুকাল আগে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে

সঙ্গে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষা কর্তব্য কি অকর্তব্য সে প্রশ্ন কেহ তোলে না—এখন ছেলেদের মতোই মেয়েরাও বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। স্কুল ফাইন্যাল প্রভৃতি বিবিধ পরীক্ষায় ছাত্র-ও-ছাত্রী-সংখ্যার অনুপাতের মধ্যে এখন আর আকাশ-পাতাল তফাৎ নাই।

শিক্ষার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার। আধুনিক যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে—জ্ঞানের ক্ষেত্রেও উভয়ের দাবী সমান। এক সময় স্ত্রীলোক শিক্ষার অযোগ্য বলিয়া তাহাদের অবজ্ঞাত করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে নারীও মেধা, বুদ্ধি ও কর্মশক্তির পরিচয় দিতে পারে। সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে তো কথাই নাই, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নারী উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে।

বর্তমানে অনেকে বলিতেছেন যে, পুরুষ ও নারীর শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র করা কর্তব্য। পুরুষকে বাহিরে কাজ করিতে হয়, কিন্তু নারীর স্থান ঘরে। সুতরাং উভয়কে স্বতন্ত্র ধরণের শিক্ষা দেওয়া উচিত। পুরুষদের সহিত সমান শিক্ষাগ্রহণ করিলে নারীর পুরুষালী ভাব হইবে এবং তাহাতে দেশের অকল্যাণ সাধিত হইবে, এ আশঙ্কাও অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল যুক্তি প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীলদের চিন্তা হইতে উদ্ভূত। জ্ঞানের সাধনায় সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত। অবশ্য বিশেষ বিশেষ বিদ্যা নারীদের পক্ষে শিক্ষা করা তাহাদের শারীরিক অপটুতার জন্য হয়তো সম্ভবপর হয় না, কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই অর্থ নৈতিক সমস্যা এমন জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে 'পুরুষরা কাজ করিবে এবং নারীরা ঘর গোছাইবে' এই প্রাচীন ধারণাটি আমূল পরিবর্তিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। জীবনসংগ্রামে পুরুষদের সঙ্গে নারীও আগাইয়া আসিয়াছে—কতকটা বাধ্য হইয়াই। প্রথমে নারী শিক্ষিকা ও সেবিকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল—কিন্তু বর্তমানে করণিকের চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাবও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এইভাবে নারী নানা দিকে অগ্রসর হওয়ায় তাহার পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যক হইয়া

পড়িয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মতোই এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে।

স্ত্রীশিক্ষার সহিত আর একটি বিষয় জড়িত—তাহা সহশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত হইলেও সহশিক্ষা সম্পর্কে বিপুল মতবিরোধ দেখা যায়। যাঁহারা উদারপন্থী তাঁহারা বলেন যে, ছাত্রাবস্থা হইতেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রয়োজন। যদি উভয়কে পৃথক করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে উভয়েরই অপর পক্ষের জন্য একটা অদম্য কৌতূহল জাগে। যাহাকে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য করা জীবন গঠনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, বরং উহাতে প্রতিপদেই অশান্তি ও অসহযোগের সৃষ্টি হইতে পারে। পুরাতন পর্দাপ্রথার অনুসরণ করিয়া নারীর শিক্ষাকে স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ করার অর্থ নারীর ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা। তাহা ছাড়া বর্তমানে জীবনযাত্রা এমন জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, উত্তর জীবনে কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রায় একরূপ অপরিহার্য। ছাত্র অবস্থা হইতে মেলামেশা করার অভ্যাস না থাকিলে পরে অসুবিধা হইতে পারে। নারী পরিণত বয়সে যখন পুরুষের কর্ম-সঙ্গিনী হইবেই, তখন তাহাদের পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা করার কোনো সার্থকতা নাই।

যাঁহারা সহশিক্ষার বিরোধী, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা নিরতিশয় ভাবপ্রবণ। বিশেষত, যৌবনের প্রথম সমাগমে তাহাদের হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় উভয়ের মেলামেশা প্রণয়ের চাপল্যে রূপান্তরিত হইতে পারে। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে ছাত্রছাত্রীরা দায়িত্ববোধ হারাইয়া ফেলিয়া সমাজে অনেক অকল্যাণ আনিতে পারে। নৈতিক চরিত্রের শৈথিল্য বহু অনর্থের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সহশিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ সমর্থন করা যায় না।

উভয়পক্ষের যুক্তিই মূল্যবান্ সন্দেহ নাই। সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে ধীরভাবে বিচার করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ভারতের বহু স্থলেই প্রচলিত আছে। শৈশবে উভয়ের মধ্যে মেলামেশার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারে না এবং গোঁড়া সহ-শিক্ষা বিরোধীরাও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষার বিরোধিতা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সহশিক্ষা একরূপ অনিবার্য

হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যায়—প্রায় সকল মহাবিদ্যালয়েই ছেলে ও মেয়েরা একই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে; ছেলে ও মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাও অবাস্তব। বাস্তবিকপক্ষে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসে তাহারা কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়ায় কতকটা স্থিরবুদ্ধি ও দায়িত্বশীল হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হওয়ায় তাহাদের কর্তব্যজ্ঞান ও ভবিষ্যৎচিন্তা সহজেই জাগিয়া উঠে, এ অবস্থায় সহশিক্ষার ব্যবস্থা অসঙ্গত নয়। বরং উভয়ের মধ্যে মেলামেশার ফলে উভয়ের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই সহশিক্ষার সমস্যা প্রবল। কৈশোরেই ছেলে-মেয়েদের হৃদয়বৃত্তি দুর্দম হইয়া ওঠে। এই সময় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও অপরিণত থাকে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করিয়া দেওয় কিছুটা বিপজ্জনক সন্দেহ নাই। শহরে, যেখানে মেয়েদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় আছে সেখানে মেয়েরা স্বতন্ত্র বিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করে। কিন্তু মফঃস্বলে বা পল্লী অঞ্চলে অনেক স্থলেই মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নাই সুতরাং সেখানে বাধ্য হইয়াই সহশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়; তবে স্বতন্ত্র বেঞ্চি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সহশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে তাহার ফল খারাপ নাও হইতে পারে।

বর্তমানে অনেকে শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংযোগে গঠিত মিশ্রবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন। ভারতের কয়েকটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিদ্যালয় এই আদশে গঠিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকা উভয়ই থাকায় ছাত্র ও ছাত্রীদের সম্বন্ধ অনেকটা সহজ হইয়া আসে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবাঞ্ছিত বিপদের আশঙ্কা এড়াইতে পারিলে সহশিক্ষা নারী ও পুরুষ উভয়েরই চরিত্র গঠনে সহায়তা করে সন্দেহ নাই।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

সংকেত ঃ -১। আধুনিককালে ভাষা সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে ২। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কুফল। ৩। শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে নাই ৪। ভাষা শিক্ষায় বহু সময় ও উত্তমের অপচয় ৫। মাতৃভাষাই স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ বাহন। ৬। অন্তরায়গুলি দূর করিতে হইবে।

কোন্ ভাষা যে শিক্ষার বাহন হইবে, এ প্রশ্ন অন্য কোনো দেশে ভারতবর্ষের মতো এমন প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে কি না সন্দেহ। দীর্ঘকাল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এদেশে যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হইয়াছে তাহার সুফল আমরা পাইয়াছি।

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষায় সুফল যথেষ্ট থাকিলেও ইহার যে অন্য একটি দিক আছে তাহা আমাদের কাছে এখন সুস্পষ্ট। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাভ করার ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষা সারা দেশের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে নাই। এযাবৎ বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর অধিকাংশ উত্তম ইংরেজী ভাষা শিখিতেই ব্যয়িত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় অধিকার হইবার পর জ্ঞানচর্চা করিবার মতো সুযোগ খুব কম শিক্ষার্থীই পাইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে কোনো বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বিড়ম্বনার আশঙ্কা সমধিক। ছাত্রছাত্রীদের যে উত্তম জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত হইত, ভাষা শিক্ষা করিতেই তাহা ব্যয়িত হইত। শুধুমাত্র বর্ণপরিচয় হইলে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমে ক্রমে মাতৃভাষায় অধিকার লাভ করিতে পারে, কিন্তু বিদেশী ভাষায় দখল হওয়া সহজ নয়। সুতরাং যখন বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে তখন ভাষাশিক্ষার দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিতে হয়, জ্ঞান আহরণ যেন শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করার আর একটি বিপদ, অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞানের বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠে না। তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণার অনেকটা বিদেশী ভাষার প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে, ফলে উত্তর জীবনে জ্ঞানচর্চা করিবার কোনো স্পৃহা তাহাদের থাকে না। বিদেশী ভাষায় জ্ঞানের বিষয় গলাধঃকরণ করিতে তাহারা বুদ্ধিকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে শিক্ষা যে শতকরা প্রায় নিরানব্বইটি ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করিলে এই অন্তরায়গুলি সহজেই দূর করা যাইতে পারে। প্রথম হইতেই মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়বস্তুকে অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবে। বিদেশী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষায় অধ্যয়নাদি করায় কোনো বিষয়ই তাহার নিকট ঝাপ্সা থাকিবে না—ফলে তাহার পক্ষে জ্ঞান-লাভ হইবে সহজসাধ্য এবং তাহার শিক্ষার ভিত্তিও সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে।

শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হইলেই বুদ্ধির স্বাধীন বিকাশ সম্ভবপর হইবে। স্বাধীন বুদ্ধি যদি বিকশিত না হয়, তাহা হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও যথার্থ মননশীল ব্যক্তির সংখ্যা যে নিতান্তই কম, বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা তাহার অন্যতম কারণ। প্রথম হইতেই মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করিলে ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার যেমন বর্ধিত হইত, স্বাধীন জ্ঞানচর্চাও তেমনই সহজ হইয়া উঠিত।

অবশ্য প্রথম হইতেই মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের একটি বড়ো অন্তরায় ছিল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। বর্তমানে যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির অন্যতম বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছে সেই বাংলা ভাষায় গদ্যরীতি তখনও সবল হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তথাপি ইংরেজী ভাষামুগ্ধ কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ 'ইংরেজী ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই' এই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে দেন নাই। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক স্বচ্ছন্দে মাতৃভাষাতেই রচিত হইতে পারে।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিদেশী ভাষার গ্রন্থ পড়িতে হয় বটে কিন্তু কালক্রমে উহাদের মাতৃভাষা-সংস্করণ সহজেই সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, সেক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট বাহন বলিয়া কিছু নাই। যে ভাষায় প্রথম হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাহাকেই শিক্ষার বাহন বলিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহনের পদ হইতে অপসারিত হইবার পর